প্রশাসনের অন্দরমহল

বাংলাদেশ

জয়ন্তকুমার রায়
মুনতাসীর মামুন

প্যাপিরাস
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৪

প্রকাশ : ১ জানুয়ারি ১৯৮৭

প্রচ্ছদ : দেবব্রত ঘোষ

প্যাপিরাস-এর পক্ষে অরিজিৎ কুমার প্রকাশিত ও টেক্‌নোপ্রিণ্ট, ৭ সৃষ্টিধর দত্ত লেন, কলকাতা ৬ থেকে মুদ্রিত। বেঁধেছেন দীনেশ বিশ্বাস, ১৯/১ই পাটোয়ারবাগান লেন, কলকাতা ৯।

বাংলাদেশের
স্বাধীনতাযুদ্ধের
অনামা শহীদদের
স্মৃতিতে

প্রাক্-ভাষ

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে গত চল্লিশবছরে আমলা [প্রশাসক] আধিপত্যের দরুন কী সংকটের সৃষ্টি হয়েছে তাই মূলত তুলে ধরা হয়েছে এ গ্রন্থে। রচনার ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে প্রাথমিক ও আনুষঙ্গিক মুদ্রিত উপাদান এবং চল্লিশজন উচ্চপদস্থ আমলার সাক্ষাৎকার। শেষোক্ত উপকরণের ব্যবহার উন্মোচন করেছে এক্ষেত্রে এক নতুন দিকের। এতে পরিস্ফুট হয়েছে আমলা-মন, তাঁদের নিত্যদিনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পটভূমি, উন্নয়ন, সাধারণ ও সংকটকালীন পরিস্থিতিতে তাঁদের ভূমিকা, সামরিক-বেসামরিক আমলা সম্পর্ক ইত্যাদি। আরো দেখা যাচ্ছে, সামাজিক সম্পর্ক ও ব্যক্তিগত ব্যবহারের নিরত মিথস্ক্রিয়ায়, ব্যক্তি-আমলা ভোগ করেন প্রায় স্বায়ত্তশাসন এবং অহরহ ব্যবহার করতে পারেন তাঁর ক্ষমতা, পেশাগত দক্ষতা ও জনস্বার্থের পক্ষে বা বিপক্ষে। এবং এ সত্যও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজ স্বার্থের কারণে, আমলারা বলি দিয়েছেন পেশাগত দক্ষতা ও জনস্বার্থ। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক দুরবস্থা ও সংকট এর প্রমাণ। অন্যদিকে, এত হতাশা সত্ত্বেও চোখে পড়ে কম্পমান এক দীপশিখা – স্বল্পসংখ্যক আমলা আছেন যাঁরা বিসর্জন দেননি আত্মসম্মানবোধ, নতি স্বীকার করেননি জনস্বার্থ বা পেশাগত দক্ষতা রক্ষার খাতিরে। আমলাতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের সোচ্চার প্রতিবাদে তাঁরাও নীরব সমর্থক।

গ্রন্থের অধ্যায় ছয়টি। প্রথম অধ্যায় 'ভূমিকা'য় ১৯৪৭ থেকে ৮০-র দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বেসামরিক এবং পরে সামরিক ও বেসামরিক আমলা-আঁতাত ও আধিপত্যের পটভূমিকা ও ফলাফল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে পাকিস্তান ও বাংলাদেশে পার্লামেণ্টারি ও সামরিক আমলে আমলাদের কার্যকলাপ। এ চারটি অধ্যায় বিভক্ত কয়েকটি উপ-অধ্যায়ে। আমলাদের প্রাপ্ত ঘটনাবলীকে অভিহিত করা হয়েছে 'নকশা' হিসেবে। এবং এগুলিকে বিন্যস্ত করা হয়েছে প্রথমে প্রতিটি উপ-অধ্যায়ের ভূমিকায় এবং তারপর ঘটনা-পরম্পরায়। পাঠকদের সুবিধার জন্য উপ-অধ্যায় ও নকশার ক্ষেত্রে দেওয়া হয়েছে ক্রমিক সংখ্যা। বিস্তৃত তথ্যপঞ্জী দেওয়ায় আলাদা-

ভাবে আর গ্রন্থপঞ্জী দেওয়া হয়নি। উপসংহার বা 'শেষকথা'য় এ সিদ্ধান্তই হয়তো পুনরুক্তি করতে হয়েছে যে, পূর্বেও যেমন এ আধিপত্য বিনাপ্রতিরোধে মেনে নেওয়া হয়নি, এমনকি উৎখাত করা হয়েছিল ১৯৭১ সালে, এখনও যে তা মানা হবে না তাও ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে, বরং অদূর ভবিষ্যতে হয়তো এ আধিপত্য চিরদিনের জন্যই লুপ্ত করা হবে। ইতিহাসের এ অমোঘ গতি রোধ করা সম্ভব নয়।

এ গ্রন্থটি মূলত বেসামরিক আমলাদের প্রদত্ত 'নকশা'র ভিত্তিতে রচিত। আমাদের সহযোগী কোন বন্ধু যদি, সামরিক আমলাদের প্রদত্ত 'নকশা'র ভিত্তিতে এ ধরনের আরেকটি গ্রন্থ রচনায় এগিয়ে আসেন তা হলে বর্তমান গ্রন্থের পরিপূরক হিসেবে সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রেব চিত্রটি হয়তো আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

এ গ্রন্থ রচনাকালে আমরা বাংলাদেশ ও ভারতে আমাদের বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী সবার অকুণ্ঠ সমর্থন, সহযোগিতা লাভ করেছি। তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজনিরীক্ষণ কেন্দ্র (সেণ্টার ফর সোশ্যাল স্টাডিজ) এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় গবেষণাকেন্দ্র (সেণ্টার ফর সাউথ অ্যাণ্ড সাউথ-ইস্ট এশিয়ান স্টাডিজ) আমাদের সহায়তা করেছে বিশেষভাবে। বইটি দীর্ঘকাল হয়তো পাণ্ডুলিপি আকারেই থাকত যদি-না যাদবপুর বিশ্ব বিদ্যালয়ের তুলনামূলক বিভাগের অধ্যাপক স্বপন মজুমদার আগ্রহ দেখাতেন। মাত্র একমাসের মধ্যে সুমুদ্রিত ও শোভন আকারে এ গ্রন্থ প্রকাশের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব প্রকাশক শ্রীঅরিজিৎ কুমার এবং টেক্‌নোপ্রিণ্টের কর্মীবৃন্দের। নির্দেশিকা তৈরি করে দিয়েছেন শ্রীমতী সীমা মুখোপাধ্যায় ও শ্রীবিনয় রায়। এঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

কলকাতা
জানুয়ারি ১৯৮৭

জয়ন্তকুমার রায়
মুনতাসীর মামুন

সূচি

প্রশাসনের অন্দরমহল :
বাংলাদেশ

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

ভারতীয় প্রশাসকদের নিয়ে ১৯৮১ সালে অধ্যাপক জয়ন্তকুমার রায়ের একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল, গ্রন্থটির নাম 'অ্যাডমিনিস্ট্রেটরস ইন এ মিক্সড পলিটি' (দিল্লী, ম্যাকমিলান, ১৯৮১)। ঐ গ্রন্থে, ষাট জন প্রশাসকের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, ভারতীয় মিশ্র শাসন ব্যবস্থায় প্রশাসকদের অবস্থান, টাইপ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান আলোচনা বলা যেতে পারে করা হয়েছে ঐ গ্রন্থের সূত্র ধরেই। এ কথা স্বীকার্য যে, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিরাজমান। এবং বিরাজমান এ পার্থক্যই বাংলাদেশের প্রশাসকদের ওপর এ ধরনের একটি গ্রন্থ রচনায় আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছে।

বাংলাদেশের চল্লিশজন উচ্চপদস্থ আমলা-কর্তৃক প্রদত্ত নকশার (এখানে তাঁদের বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনাকে নকশা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে) ভিত্তিতে সূত্রপাত করা হয়েছে এ আলোচনার। এ চল্লিশ জনেব মধ্যে আছেন প্রাক্তন সি. এস. পি. (সিভিল সার্ভিস অফ পাকিস্তান), পি. এস. পি. (পুলিশ সার্ভিস অফ পাকিস্তান) এবং আরো কয়েকটি ক্যাডারের সিভিল সার্ভেন্ট বা আমলা যাঁরা ১৯৫০ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন পদে কর্মরত ছিলেন / আছেন। প্রশ্ন উঠতে পারে এই চল্লিশ জনের নির্বাচনের ভিত্তি, তাঁদের প্রদত্ত নকশার নির্ভরযোগ্যতা, গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা সম্পর্কে। এ প্রসঙ্গে আমরা অধ্যাপক রায়ের পূর্বোক্ত গ্রন্থের কিছু বক্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি করব।

'লোক প্রশাসকরা যা করেন তাই হচ্ছে লোক প্রশাসন'[১]. এবং প্রতিদিন তারা কিভাবে কাজ করছেন তা বোঝার সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে এ ধরনের নকশা। কিছু নকশা অনেকের কাছে তুচ্ছ মনে হতে পারে তবে এ কথাও ঠিক যে গুরুত্ব আরোপ বা তাচ্ছিল্য—সম্পূর্ণ ব্যাপারটি নির্ভর করে দৃষ্টিভঙ্গীর আপেক্ষিকতার ওপর, এবং যে-কোন নকশায় উল্লিখিত ঘটনা কোন-না কোন প্রশাসকের ব্যক্তিসত্তার গভীরতম স্তরের সন্ধান দেয়।[২]

প্রচলিত সমাজ বিজ্ঞানের গবেষণা যে পদ্ধতিতে করা হয়, এ বইয়ের নকশার ব্যবহার হয়তো তার মধ্যে পড়ে না। পুনরাবৃত্তির ঝুঁকি স্বীকার করে নিয়েও বলা

প্রয়োজন যে, বর্তমান গ্রন্থের নকশাগুলির গুরুত্ব ও সত্যতা যাচাই করা হয়েছে নিম্নলিখিত বক্তব্যের আলোকে :

১. অপ্রকাশিতনামা ব্যক্তির অভিজ্ঞতার বিবরণ হচ্ছে এই নকশা। অবসর গ্রহণের পর যখন কোন প্রশাসক তাঁর স্মৃতিকথায় বিভিন্ন স্থান, ঘটনা, তারিখের উল্লেখ করেন বা তাঁর বিবরণ, সাধারণত নির্ভরযোগ্য বলেই ধরে নেওয়া হয়। বর্তমান নকশাগুলোর বেলায়ও একথা প্রযোজ্য। এখানে ব্যক্তি স্থান বা নির্দিষ্ট সময় সুচিন্তিত করা হয়নি বলে যে এগুলো অনির্ভরযোগ্য তা নয়।

২. বরং স্মৃতিকথা থেকে এ ধরনের নকশা গুরুত্ববহ। যখন একজন প্রশাসক স্মৃতিকথা লেখেন তখন অনেক ঘটনা হয়তো এড়িয়ে যেতে পারেন। অন্তরঙ্গ আলাপের সময় বরং তিনি হন স্পষ্ট[৩] কারণ, এ ধরনের অন্তরঙ্গ আলাপ আইনগত[৪] / সামাজিক জটিলতার মধ্যে পড়ে না যার সম্ভাবনা স্মৃতিকথা লেখার সময় লেখককে অনেক নমিত করে তোলে।

৩. নামহীন ব্যক্তির বর্ণনায়, স্মৃতিকথা থেকে নিন্দা বা অহংবোধ[৫] থাকার সম্ভাবনা কম। কোন বুদ্ধিমান প্রশাসকই সময় খরচ করবেন না এ ধরনের কাজে যেখানে পাঠকদের কাছে ঘটনার নায়ক অচিহ্নিত।

৪. যে প্রশাসকদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে এ সব তথ্য (বা নকশা) তাঁরাই কিন্তু প্রস্তুত করেন সরকারী দলিল দস্তাবেজ, নথিপত্র (রিপোর্ট)। গবেষকরা, প্রায় ক্ষেত্রেই, এগুলিকে নির্ভরযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করেন এবং যে যত এগুলি ব্যবহার করতে পারেন তিনি তত পণ্ডিত বলে স্বীকৃত হন, সুতরাং গবেষকদের পক্ষে একথা বলা কষ্টসাধ্য যে, এসব নকশা যার ভিত্তি একই, তা গ্রহণযোগ্য নয়। বরং বলা যেতে পারে যেহেতু এসব নকশার সঙ্গে সরকারী প্রচারণার ব্যাপারটি জড়িত নয় (যা কোন-না কোন ভাবে থাকে সরকারী দলিলে) সেহেতু এ ধরনের নকশা কম তো নয়ই বরং ঐ ধরনের দলিল থেকে বেশি অর্থবহ।

৫. এ সব-কিছুই আবার মৌল প্রশ্ন তোলে সাক্ষাৎকার প্রদানকারী ব্যক্তির বিশ্বস্ততা সম্পর্কে। জান মিরডালের কথা সঠিক যখন তিনি বলেন যে, একটি গবেষণার জন্য গবেষককে বেশ কিছু উৎসের বিশ্বস্ততা মেনে নিতে হয়।[৬] তবুও বলে রাখা ভালো যে, এ ধরনের কাজের সময় ব্যক্তি নির্বাচনে সতর্ক হতে হয়। প্রশাসনের রহস্যময় আবরণ ভেদ করার জন্য উৎসাহী হয়ে সব প্রশাসককেই বিশ্বাস করা ঠিক নয়। এ থেকে রক্ষার উপায়, গবেষকের নিজের বিচারবুদ্ধির ওপর আস্থা রেখে এগোনো। পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস করতে হবে। দু'পক্ষকেই তাদের

পেশাগত দায়িত্ব স্মরণ রেখে পরস্পরের বিশ্বাসভাজন হতে হবে। দু'পক্ষকেই হতে হবে সতর্ক। কিছু অর্থনৈতিক বাস্তবতার ওপর গবেষণা, যেমন অসংগঠিত ক্ষেত্রে মহাজন কর্তৃক অস্বাভাবিক উচ্চহারে সুদগ্রহণ, বা দুষ্প্রাপ্য কোন জিনিসের কালোবাজারে দাম উল্লেখ করার সময় অনির্দিষ্ট উৎসের ওপর নির্ভর করতে হয়।[৭] প্রশাসনিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গবেষণার সময় এ ধরনের উৎসের ওপর আরো বেশি নির্ভর করতে হয়। আমাদের প্রদত্ত নকশা এর প্রমাণ। আরেকটি মৌল প্রশ্ন এখানে উত্থাপন করা যেতে পারে। দৃশ্যমান বা প্রত্যক্ষ উৎস থেকে একজন কতখানি জ্ঞান আহরণ করতে পারেন? এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যেতে পারে মাইকেল পলানীর বক্তব্য :

'..the amount of knowledge which we can justify from evidence directly available to us can never be large. The overwhelming proportion of our factual beliefs continue therefore to be held at second hand through trusting others, and in the great majority of cases our trust is placed in the authority of comparatively few people of widely acknowledged standing.'[৮]

এ বিশ্বাস, স্বাভাবিকভাবেই সাক্ষাৎকারীর সংখ্যা নির্ধারণ করে দেয় (যাঁরা সবাই অভিজ্ঞ ও উচ্চপদে আসীন)। এ কারণে, বুঝে নেওয়া কঠিন নয়, কেন বর্তমান গবেষকদ্বয় দু'বছর ধরে চলাকালীন গবেষণায় চল্লিশজন উচ্চপর্যায়ের প্রশাসকের থেকে ২৫৩টি নকশা গ্রহণের পর আরো তথ্য সংগ্রহে বিরত থেকেছেন।

গবেষণা শুরু করা হয়েছিল কয়েকজনের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে (নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে ছ'জন)। এঁদের গবেষকদ্বয় ঘনিষ্ঠভাবে চিনতেন, লক্ষ্য করেছেন তাঁদের কাজকর্ম, আচরণ এবং সব-কিছু মিলে এঁদের মনে হয়েছে তাঁরা সম্পূর্ণভাবে নির্ভরযোগ্য। এ ছয়জন আবার তাঁদের আরো কয়েকজন সহকর্মীর (অবসরপ্রাপ্ত / চাকুরিরত) নাম উল্লেখ করে সাক্ষাতের সুযোগ করে দিয়েছেন যাঁরা তাঁদের মতে আবার নির্ভরযোগ্য। এভাবে গবেষকদ্বয় ক্রমান্বয়ে চল্লিশজনের সংস্পর্শে এসেছেন এবং পরস্পর পরস্পরের আস্থা অর্জন করেছেন। তবে এটাও ঠিক যে, তারা এছাড়াও বেশ কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করেছেন কিন্তু পরস্পরের আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছেন।

৬. এখন এমন এক সময়, যখন গবেষকরা ভোটার, জনসমীক্ষায় উত্তরদানকারী, রোগী, বন্দী, পতিতা, ভিক্ষুক ইত্যাদির নামহীন সাক্ষাৎকারের বিবরণ

নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেন গবেষণার নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ধরে নেওয়া যায়, গবেষকরা এ বইয়ে উল্লিখিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তৈরী করা নকশাগুলিও গ্রহণ করবেন নির্ভরযোগ্য হিসেবে।

৭. প্রদত্ত বিভিন্ন নকশার বিশ্বাসযোগ্যতা পেশাগত প্রশাসকদের চোখে সহজেই ধরা পড়বে। একজন অ্যাকাডেমিক হয়তো তা চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হবেন। এর কারণ সরল—প্রশাসনিক বাস্তবতার সঙ্গে তিনি পরিচিত নন তেমনভাবে। এ গ্রন্থ হয়তো ব্যর্থ হবে তার মনে এ বিশ্বাস জাগাতে যে, প্রদত্ত নকশাগুলির ভিত্তি বাস্তবতা। বা হয়তো আশা করা যেতে পারে বাস্তবতার প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এ গ্রন্থ।

প্রশাসকদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে করা নকশা, যা তাদের আত্মপ্রতিকৃতিও, তাকে আনা যায় না কোন সংক্ষিপ্ত সংশ্লেষণে, কিন্তু এগুলি প্রদান করে সে সব উপাদান যা দিয়ে রাজনীতি ও প্রশাসনের (বেসামরিক ও সামরিক) মিথস্ক্রিয়া বোঝা সম্ভব। ধারণা করা সম্ভব রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্রের একজন উচ্চপর্যায়ের ব্যক্তি কিভাবে প্রতিদিন নানারকম অবস্থায় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। গবেষকরা এক্ষেত্রে অবহেলা করেছেন বাংলাদেশের মতো একটি ঘটনাবহুল দেশকে। ঘটনাবহুল বলার কারণ এই যে, ছোট এই দেশটির ওপর দিয়ে গত চল্লিশ বছর'ধরে যে ঝড় ঝাপটা গেছে, বিশ্বের অন্যকোন রাষ্ট্র সম্ভবত তার মুখোমুখি হয়নি। একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য প্রশাসনিক ক্ষেত্রে, যেখানে আমলারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন (সংকটময়) পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। ১৯৪৭ সালে সৃষ্টি হল পাকিস্তান। পার্লামেণ্টারি শাসনপদ্ধতি ছিল তখন কিন্তু অচিরেই সে ব্যবস্থা ধ্বংস করে সামরিক বাহিনী গড়ে তুলল সামরিক শাসন। ১৯৭১ সালে, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তান ভেঙে সৃষ্টি হল বাংলাদেশের, শুরুতে এখানে ছিল পার্লামেণ্টারি শাসন। কিন্তু এ ব্যবস্থা স্থায়ী হল অল্পদিন এবং এখানেও পাকিস্তানের মতো আবির্ভূত হল সামরিক আধিপত্যের শাসন। একজন আমলা যিনি, ১৯৪৯/৫০ সালে (পাকিস্তানী আমলে) চাকুরিতে ঢুকেছেন তাকে পেরুতে হয়েছে এসব পরিস্থিতি। এবং এক্ষেত্রে, যে সব প্রশাসক তাদের চারপাশের বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন তারা প্রদান করতে পারেন গুরুত্বপূর্ণ মানবিক সব দলিল। এসব দলিল পর্যালোচনা অন্তিম সত্যে পৌঁছাবার জন্য নয় বরং সত্যকে বোঝার একটি উপাদান মাত্র। সত্যকে বোঝার আরো উপাদান আছে, যেমন, প্রাথমিক বা আনুষঙ্গিক উপাদান, পরিষদীয় নথিপত্র, বই, সংবাদ সাময়িকপত্র, অনেককিছু যার প্রায় সবই আমরা ব্যবহার করেছি এখানে।

নকশাগুলির প্রধান বিষয় (বেসামরিক ও সামরিক) রাজনীতি, অর্থনীতি ও প্রশাসনের মিথস্ক্রিয়া। এগুলি তুলে ধরে যে সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেগুলি হল সংক্ষেপে : ক. রাজনীতিবিদ ও সামরিক ' বেসামরিক প্রশাসকের দায়িত্ব নিয়ে বিভ্রান্তি খ. প্রগতি ও রক্ষণশীল শক্তির সংঘাত এবং গ. ব্যক্তিস্বার্থ ও জনস্বার্থের দ্বন্দ্ব।

যদিও বর্তমান গবেষণায় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ব্যক্তিগত নকশার প্রতি, তার মানে এ নয় যে গবেষকদ্বয় দিতে চেয়েছেন ইতিহাসেব একটি ব্যক্তিক ব্যাখ্যা (individualist interpretation)। এখানে আমলাতন্ত্রকে নস্যাৎ করা বা তাদের পক্ষ সমর্থন—কোন কিছুই করা হয়নি। বা কোন আর্থ-সামাজিক অবস্থায় আমলাতন্ত্রকে জনমুখী ও সচল করে তোলা যেতে পারে সে বিতর্কও টানা হয়নি। বাংলাদেশেব বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থায় প্রশাসকের যে অবস্থান বা তার কর্মপদ্ধতিই শুধু তুলে ধরা হয়েছে। আলোচনা সীমিত রাখা হয়েছে শুধু প্রশাসকদের কার্যের ওপরই। হয়তো এর ফলে মনে হতে পারে এ গবেষণা অসম্পূর্ণ কিন্তু এ ছাড়া বিকল্প নেই।

বর্তমান (বাংলাদেশেব) সমাজ ব্যবস্থায় একজন আমলার (এলিটের) কার্যক্রম নির্ধারিত হয় প্রধানত সামাজিক সম্পর্ক দ্বারা। আমলাদের কর্মকাণ্ড তুলে ধরে সামাজিক সম্পর্ক এবং ব্যক্তিক প্রতিক্রিয়াব চমৎকার মিথস্ক্রিয়া, এবং সে প্রতিক্রিয়া কি অভিঘাতেব সৃষ্টি করে ছোট বড সিদ্ধান্ত গ্রহণে যা আবার সৃষ্টি করে প্রতিক্রিয়া বিশেষ ও সাধারণ প্রশাসনে। এ ধবনের সিদ্ধান্ত যা এই গবেষণার নকশাগুলির ভিত্তি তা তুলে ধরে সাধাবণ প্রশাসন, উন্নয়ন প্রশাসন, সংকটকালে প্রশাসনিক ব্যবস্থা, এবং বেসামরিক প্রশাসনে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপের দরুন যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাতে একজন আমলার সীমাবদ্ধতা ও কর্মক্ষমতা। এসব সিদ্ধান্তের পর্যালোচনা, পাবলিক পলিসি এবং প্রশাসনিক ব্যাপারে অ্যাকাডেমিকদের ধারণা হয়তো আরো স্পষ্ট করবে। বাংলাদেশে ভবিষ্যতে যারা সিভিল সার্ভিসে আসবেন তাদেরও হয়তো এসব পর্যালোচনা সাহায্য করবে জনস্বার্থ রক্ষা ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে। এবং শেষোক্ত কারণেও যদি এ গ্রন্থ সামান্য ভূমিকা পালন করতে পারে তাহলেই আমরা মনে করব আমাদের শ্রম সার্থক।

২

১৯৪৭ সালে, নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের শাসকচক্র মুখোমুখি হয়েছিল গণতান্ত্রিক ধারা অক্ষুণ্ন এবং সম অর্থনৈতিক বিকাশের কঠিন কাজে। ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক

দিক থেকে পাকিস্তানের দুটি ভিন্ন অঞ্চলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমন্বয়ের জন্য প্রয়োজন ছিল অতিরিক্ত সতর্কতা ও দূরদর্শিতার। সঠিকভাবে রাজনৈতিক উন্নয়নে ব্যর্থ হওয়ার সিংহভাগ দায়িত্ব রাজনীতিবিদদের। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলার অপেক্ষা রাখে না যে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের আমলাতন্ত্র (যার অধিকাংশ ক্ষমতাবান সদস্যই ছিল অবাঙালী) বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এ উন্নয়ন ব্যাহত করেছে। এসব ব্যবস্থা (যেমন, সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে অরাজী, আমলাতন্ত্রের পক্ষে গ্রহণীয় নয় এমন নির্বাচনী রায় প্রত্যাখ্যান) জনপ্রিয় দায়িত্ববান রাজনীতিবিদ, দল এবং ইণ্টারেস্ট গ্রুপ সৃষ্টিতে বাধার সৃষ্টি করেছে। অন্তিমে, রাজনৈতিক স্ট্রাকচারের কার্যকলাপ উৎখাতে পাকিস্তানের প্রশাসনিক স্ট্রাকচারের জয় সত্ত্বেও, আমলাতান্ত্রিক আধিপত্যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা ১৯৭১ সালের মধ্যে এমন অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি করল যে, শাসক এলিটরা দেখল তারা একটি কেন্দ্রীয় মূল্যবোধ—জাতীয় ঐক্য—বিনষ্ট করে ফেলেছে। কেন এবং কিভাবে পাকিস্তানের আমলাতন্ত্র নিজেদের ভূমিকা অতিরঞ্জিত করে রাজনৈতিক উন্নয়ন বিনষ্ট করেছে নীচে তা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এটা আরো তুলে ধরে কী ভাবে আমলাতান্ত্রিক অলিগার্কি শিল্পপতি এবং 'বিদেশী মিত্রের' সাহায্যে বিলাসবহুল জীবনযাপন করেছে যে সময় দেশের অধিকাংশ লোক বসবাস করেছে দারিদ্র্যসীমার নীচে। পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ হয়েছে কিন্তু যারা প্রশাসনে গত একদশক ধরে নেতৃত্ব দিয়েছেন বা দিচ্ছেন তারা সেই পাকিস্তানী আমলাতন্ত্রেরই অংশ। মুক্তি যুদ্ধ বাংলাদেশের জনগণকে স্বাধীনতা দিয়েছে কিন্তু আনতে পারেনি সামাজিক পরিবর্তন। ফলে, আমলাদের (বা এলিটদের) মনোভঙ্গীরও বদল হয়নি। যে কারণে, গত এক দশক ধরে বাংলাদেশের ইতিহাসে (প্রশাসনে) সে একই ধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ছিলেন বুদ্ধিমান রাজনীতিবিদ কিন্তু দুজনেই 'নির্ভরশীল ছিলেন আমলাদের ওপর।'[৯] আইয়ুব খান তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন, লিয়াকত আলী খানের ওপর চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর 'প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশী' [ভারতীয় অডিট অ্যাণ্ড অ্যাকাউণ্টস সার্ভিসের একজন কৃতী সদস্য চৌধুরী মোহাম্মদ আলী পাকিস্তান সরকারের সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন চার বছর]। আইয়ুব খান আরো লিখেছেন, 'অনেক সময় আমার মনে হয়েছে তিনি [লিয়াকত] যেন আমার ওপর বেশী নির্ভর করছেন'[১০] [আইয়ুব খান ছিলেন তখন পাকিস্তান

সেনাবাহিনীর প্রধান]। মুসলিম লীগের দক্ষ ও বিশ্বাসী সহকর্মীর অভাব হয়তো জিন্নাহ ও লিয়াকতকে প্রভাবিত করেছিল দক্ষ ও শিক্ষিত আমলার ওপর নির্ভর করতে। 'কিছু ব্যতিক্রম বাদে', লিখেছেন চৌধুরী মোহাম্মদ আলী মুসলিম লীগ নেতাদের সম্পর্কে, 'কোন আদর্শের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা তাদেব আছে এমন খ্যাতি তাদের ছিল না।'[১১] গণতন্ত্রেব কাণ্ডারী হিসাবে জিন্নাহ বা লিয়াকতও বিখ্যাত ছিলেন না। পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারে জিন্নাহ কিছুই লেখেন নি। তাঁর বক্তৃতাসমূহে এ ব্যাপারে কোন আগ্রহ বা গভীর চিন্তাও প্রতিফলিত হয় নি। লিয়াকত এমন ধৈর্যহীন ও ক্ষমতা ক্ষুধার্ত ছিলেন যে সবসময় কম জনপ্রিয় রাজনীতিবিদকে সমর্থন দিয়ে জনপ্রিয় রাজনীতিবিদকে উৎখাতের চেষ্টা করতেন। তিনি চাইতেন, তাঁর প্রতি অনুগত ক্ষমতাশালী একটি গোষ্ঠী গড়ে তুলতে, এমনকি তিনি পাকিস্তানে একটি শাসক বংশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন এবং এ লক্ষ্য সামনে রেখে প্রচার চালাতেন যে তিনি প্রাক ইসলামী ইরাণের একজন সম্রাটের বংশধর।[১২] রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে জিন্নাহর ধারণা এত খারাপ ছিল যে, আমলাদের তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন রাজনীতিবিদদের ওপর নজর রাখতে। এমনকি আমলাদের সাবধান করে দিয়েছিলেন, রাজনীতিবিদদের সম্ভাব্য খারাপ কাজ সম্পর্কে।[১৩] জিন্নাহর অনুগ্রহপুষ্ট এবং পূর্ববাংলার একসময়ের মুখ্য সচিব আজিজ আহমদ ১৯৫০ সালে এক আদালতে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, বাঙালী মন্ত্রীদের কর্মকাণ্ড বিচার বিশ্লেষণ করে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রিপোর্ট পাঠাতেন।[১৪] বাংলাদেশ হওয়ার পরও প্রায়ই একই ধরনের প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। প্রায় ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সামরিক আধিপত্যের সময়, রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীদের থেকেও বিশেষ কয়েকজন আমলার প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। আমলা থেকে সরাসরি নিযুক্তি প্রদান করেন মন্ত্রীপদে।

নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানে, লিখেছেন চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, 'প্রশাসকের দরকার ছিল বেশি এবং প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অফিসারের সংখ্যা সে তুলনায় ছিল অনেক কম।'[১৫] নীতি নির্ধারণ করতে পারেন এমন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন 'সরকারী অফিসারের সংখ্যা ছিল পঞ্চাশের মতো' যারা দাবি করতে পারতেন যে, 'বেশ কিছু দিন ধরে তারা রয়েছেন দেশ গড়ার কাজে।'[১৬] এ দাবি অবশ্য অতিরঞ্জিত। আমলারা গর্ববোধ করতে পারেন প্রধানত এ কারণে যে, রাজনীতিবিদরা তখন দেশের সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার বদলে লিপ্ত ছিলেন গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্বে। রাজনীতিবিদরা আমলাদের থেকে শ্রদ্ধা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছিলেন। 'সব ধরনের সন্দেহজনক

উপায়ে,' লিখেছেন চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, 'মুসলিম লীগের মধ্যে ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা করা হত। মিথ্যা সদস্য সংখ্যা দেখানো, বিরোধী গোষ্ঠীকে সভ্য হওয়ার ফর্ম না দেওয়া, কাউন্সিল সদস্য ও কর্মকর্তা নির্বাচনে জালিয়াতি সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল।'[১৭] নিজেদের কাজের জন্য গর্ব ও রাজনীতিবিদদের প্রতি ঘৃণা, রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বিহীন কাজ করার অভ্যাস সৃষ্টি করে আমলাদের মধ্যে যার শুরু বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমল থেকে। এ অভ্যাস বলবৎ থাকল স্বাধীনতার পরও, কারণ, আমলাতন্ত্র নিয়ন্ত্রণের জন্য শাসক রাজনীতিবিদরা না ছিলেন দূরদর্শী, না ঐক্যবদ্ধ বা সংগঠিত।

রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ছাড়া কাজ করার অভ্যাস, সাধারণভাবে রাজনীতিবিদদের প্রতি তাচ্ছিল্য এবং নিজের কাজের জন্য গর্ববোধ—এসব কিছুই হয়তো প্রজ্বলিত করেছিল আমলাদের রাজনৈতিক উচ্চাশা। চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, যিনি চার বছর ধরে সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে সমন্বয় সাধন করেছিলেন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কাজ, তাঁকেই আমলাতন্ত্রের রাজনৈতিক উচ্চাশার একটি প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এই পদটি সৃষ্টি করা হয়েছিল তাঁরই প্রস্তাবে এবং মন্ত্রী পরিষদ ও সংস্থাপন সচিবের পদটিও ছিল এর সঙ্গে যুক্ত।[১৮] ১৯৫১ সালে যখন তিনি এই পদ ছেড়ে অর্থমন্ত্রী হলেন তখন এই পদটিও বিলুপ্ত করা হল। সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে চৌধুরী মোহাম্মদ আলী লিখেছেন, মন্ত্রী পরিষদের সভায়, 'আমি যে রিপোর্ট পেশ করতাম তা দেখা হত মনোযোগ সহকারে এবং সাধারণত আমি যে পরামর্শ দিতাম তাই হত গৃহীত।'[১৯]

বলা যেতে পারে এ ভাবে যে, আমলাদের রাজনৈতিক উচ্চাশা, রাজনীতিবিদ ও আমলাদের স্বার্থের মধ্যে আপস করার যে সুযোগ ছিল, তা দিয়েছিল বিনষ্ট করে। খালিদ বিন সাইয়িদের মতে, রাজনীতিবিদ ও আমলাদের স্বার্থের মধ্যে একটি মৌল দ্বন্দ্ব ছিল। পাকিস্তানী আমলা ছিল সর্বময় ক্ষমতাধারী পূর্ব পুরুষ বৃটিশদের [আমলা] উত্তরাধিকারী। সে ভাবত বৃটিশ সিভিল সার্ভেন্টের যেমন সর্বময় ক্ষমতা ছিল এবং প্রায়ই নিয়ন্ত্রণে রাখত রাজনীতিবিদদের, তার ক্ষমতাও হবে সে রকম রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বিহীন।' এই দ্বন্দ্ব আরো তীব্র হয়ে উঠেছিল এবং রাজনীতিবিদদের ভাগ্য খারাপই বলতে হবে, কারণ, স্বাধীনতার পর চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর মতো কতিপয় আমলার হাতে অসীম ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল [বা কেন্দ্রীভূত ছিল]। এই দ্বন্দ্ব আরো তীক্ষ্ণ করে তুলেছিল দু'গ্রুপের মধ্যে সামাজিক দূরত্ব। অবশ্য এর ব্যতিক্রম ছিলেন পুরানো আমলের পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনীতি-

বিদরা যাদের সামাজিক অবস্থান ছিল আমলাদেব মতোই। 'সামরিক অফিসার এবং সিভিল সার্ভেণ্টরা পাঞ্জাবী ও সিন্ধী ভূস্বামীদের সঙ্গে সহজেই চলাফেরা কবত কারণ তাদের সামাজিক পটভূমি ছিল অভিন্ন। শুধু তাই নয়, তারা গেছে একই স্কুলে, সভ্য ছিল একই সামাজিক ক্লাবের।'[২১]

এ প্রসঙ্গ আরেকটি দিক তুলে ধরে, তা হল, আঞ্চলিক ভিন্নতা যা আমলা ও রাজনীতিবিদদেব স্বার্থ সংঘাতের কাবণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার। পশ্চিম পাকিস্তানী আমলা এবং পূর্ব-বাংলার রাজনীতিবিদদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সাধাবণ আমলা রাজনীতিবিদের দ্বন্দ্ব ছিল না। এটি আরো ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব, বিশেষ কবে পাঞ্জাবীদের সঙ্গে [যাবা ছিল পাকিস্তানে সংখ্যালঘু কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছিল বেসামরিক ও সামরিক আমলাতন্ত্র][২২] বাঙালীর [যারা ছিল পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ]। গণতান্ত্রিক কাঠামোয় সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসাবে শেষোক্তদেরই প্রভাব বিস্তার করার কথা। কিন্তু তাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছিল প্রথমোক্তরা। পশ্চিম পাকিস্তানীদের চোখ যা এড়িয়ে গিয়েছিল, তা হল, বাঙালীদের তথাকথিত আধিপত্য এড়ানো যেত যদি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং দল বিকাশে উৎসাহ দেওয়া হত। এ ধরণের দল এক ভাষাভাষী আঞ্চলিক না হয়ে সর্বব্যাপী গণমুখী কার্যক্রম-এর মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চল ও ভাষাভাষী গ্রুপ থেকে গড়ে উঠত। কিন্তু, অস্বাভাবিক উচ্চাশা থাকায় পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা বাজনৈতিক চ্যালেঞ্জেব মোকাবেলা করতে পারেননি। গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রণয়নে তারা দেরী করতে লাগলেন যাতে বাঙালীরা প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। শুধু তাই নয়, তারা বরং সচেষ্ট রইলেন আমলাদের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানে আধিপত্য বজায় রাখতে। পশ্চিম পাকিস্তানী এলিটরা আবার এ বিষয়ে সতর্ক ছিল এবং লেখা বা বক্তৃতায় এ প্রসঙ্গ থাকত না। তবে একজন প্রখ্যাত পাঞ্জাবী পার্লামেণ্ট সদস্য, পাকিস্তান কনস্টিটিউয়েণ্ট অ্যাসেম্বলীতে দাঁড়িয়ে এ সত্য উন্মোচন করেছিলেন। তিনি হলেন 'দি পাকিস্তান টাইমস'-এর প্রথম প্রকাশক মিয়া মোহাম্মদ ইফতেখার উদ্দিন।[২৩]

উচ্চ পর্যায়ের পশ্চিম পাকিস্তানী আমলারা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপর সংখ্যা-লঘিষ্ঠের শাসন পরিচালনা পরিকল্পনার মাধ্যম। তারাও কিন্তু পরবর্তীকালে তাদের লেখায় ঔপনিবেশিক রীতিতে শাসন চালাবার ইচ্ছার কথা অস্বীকার করেছে। যেমন চৌধুরী মোহাম্মদ আলী তাঁর গ্রন্থ 'দি ইমারজেন্স অফ পাকিস্তান'-এ প্রত্যাখ্যান করেছেন এই মত যে, পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের

সাংস্কৃতিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে আইনানুগ প্রত্যুত্তর যারা এমনকি বাংলার বদলে আরবী স্ক্রিপ্ট চালু করার কথা ভেবেছিল।[২৪] যখন তিনি লেখেন যে, 'পূর্ব বা পশ্চিম পাকিস্তানের কোন রাজ্য বা প্রদেশের মাতৃভাষা নয় উর্দু', তখন তিনি সত্যই লেখেন। কিন্তু একই বাক্যে তিনি মত প্রকাশ করে বলেছেন, উর্দু 'সব জায়গায় মুসলমানদের জাতীয় ভাষা হিসাবে 'ইউনিক' মর্যাদা পাচ্ছে।' এ বক্তব্যকে সত্যের অপলাপ ছাড়া কি বলা যায়? তিনি আরো লিখেছেন, 'জাতীয় ভাষা হিসেবে উর্দুর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিল পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষুদ্র একদল রাজনীতিবিদ যাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নাজিমুদ্দিন মন্ত্রীসভাকে বিব্রত করা। এরপর ছাত্ররা দায়িত্ব নিয়েছিল আন্দোলনের এবং কলকাতার শক্তিশালী হিন্দু পত্রিকাগুলি এ বিতর্কে যুগিয়েছিল ইন্ধন।' তারপর তিনি জিন্নাহর বক্তৃতা থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চ জিন্নাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এ বক্তৃতায় তিনি ভাষা আন্দোলনে 'পঞ্চম বাহিনী'র [অর্থাৎ হিন্দুদের] প্রভাবের সমালোচনা করে বলেছিলেন, পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হবে : 'Should be Urdu and cannot be any other.'[২৫] এ বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্ররা স্বতস্ফূর্তভাবে জানিয়েছিল প্রতিবাদ।

চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ১৯৪৭-৫১ পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রথম এবং একমাত্র সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে এবং পরপর অর্থ-মন্ত্রী [১৯৫১-৫৫] ও প্রধানমন্ত্রী [১৯৫৫-৫৬] হিসেবে তিনিই ছিলেন কয়েকজন উঁচু পর্যায়ের [সবাই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী] একজন যিনি আক্ষরিক অর্থে শুরু করেছিলেন 'setting the pace of political development in Pakistan.'[২৬] এর থেকেও গুরুত্বপূর্ণ আইয়ুব খানের বক্তব্য যিনি ১৯৫৮-৬৯ পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন। আইয়ুবের মতবাদ জানা যাবে তাঁর জীবনীকার কর্নেল মোহাম্মদ আহমদের লেখায়। ১৯৪৮-৫০ সালে আইয়ুব ছিলেন পূর্ব বাংলায় সেনা বাহিনীর জেনারেল অফিসার কমাণ্ডিং। ঐ সময় ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে কর্নেল মোহাম্মদ লিখেছেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্ররা বিদেশী মদত পুষ্ট 'disruptionist' প্রভাবে পড়েছে। দিনের সিংহ ভাগ সময় কাটায় তারা রাজনীতি করে, তাদের অবকাশ কাটানোর প্রিয় মাধ্যম হল রাস্তায় মিছিল করা, পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা উর্দু না বাংলা হবে এ বিষয়ে শ্লোগান দেওয়া...পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেলে প্রশাসন স্থানীয় সেনাবাহিনীর সাহায্য চাইত।'[২৭] পশ্চিম পাকিস্তানী আমলাদের বাস্তবতা অস্বীকার ও গতানুগতিক

চিন্তার এটি হল একটি উদাহরণ। আইয়ুব যখন তাঁর আত্মজীবনীর তৃতীয় অধ্যায়ে যেখানে ১৯৪৮-৫০ সালের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন পূর্ব বাংলার জি ও সি হিসেবে, সেখানেও বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন। আইয়ুব খানের ইংরেজীতে লেখা থেকেই উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

the political life of the province was given an agitational pattern and it worried and saddened me. I could see that some of the political demagogues were going to exploit the emotions of the people. I could not quite understand whether the agitational pressure in East Pakistan was the result of combination of little things, such as personal complaints and grievances, or the manifestation of some deeper malady.' তারপর এই আন্দোলনের যে কারণটি তিনি উল্লেখ করেছেন সেটি আরো চমৎকার : 'It is quite common for a West Pakistani to answer a simple question with a grunt and not realise that he is being impolite.'[২৮]

বইয়ের অন্য জায়গায় আইয়ুব খান ভাষা সম্পর্কে দর্শন আওড়েছেন যার মূল অর্থ উর্দুর বিপরীতে বাংলা ভাষার তেমন কোন গুরুত্ব নেই। লিখেছেন তিনি, 'ভাষা সমস্যাকে মূলত একাডেমিক ও বৈজ্ঞানিক সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে এই যে, বিষয়টি বিস্ফোরণমূলক রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হয়েছে যার ফলে এটি নিয়ে এখন আর কেউ কথা বলতে চায় না।' তাঁর মতে, 'উর্দু বা বাংলা কোনটিই পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হতে পারে না। আবার এ কথাও সত্য যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে যদি সংহতি সৃষ্টি করতে হয় তা'হলে একটি মাধ্যম দরকার···এই মাধ্যমকে অবশ্যই হতে হবে জাতীয় মাধ্যম। এ ধরনের মাধ্যম বিকাশে আমাদেরকে বাংলা ও উর্দুর কমন এলিমেন্টগুলি চিহ্নিত করে একটি কমন স্ক্রীপ্টের মাধ্যমে বিকশিত করতে হবে।' ভাষাগত দিক থেকে আইয়ুব-এর এই বিশ্লেষণের কোন অর্থ হয় না। তবে, রাজনৈতিক অর্থ এর আছে যার সরল অর্থ পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠের আইনানুগ সাংস্কৃতিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকে আইয়ুব খান বিচার করতে চেয়েছেন বন্ধু হিসেবে নয় প্রভু হিসেবে।[২৯]

১৯৪৭ সালে, পূর্ববাংলার সচিবালয়ের সমস্ত উচ্চপদগুলি ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী [যার মধ্যে অন্তর্গত ভারত থেকে উদ্বাস্তু হিসেবে আগত অবাঙালীরাও] আমলাদের

করায়ত্তে। স্থানীয় রাজনীতিবিদদের সঙ্গে তাদের ব্যবহার ছিল বন্ধুর মতো নয়, প্রভুর মতো।[৩০] রাজনীতিবিদরা এক অর্থে তাদের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন কারণ আমলাদের অধিকারে ছিল পৃষ্ঠপোষকতার সম্পদ। যদি রাজনীতিবিদরা সে সম্পদের কিছুটা দিতে না পারেন তার অনুগতদের তবে তার রাজনৈতিক অস্তিত্ব হয়ে উঠবে বিপন্ন এবং বিকশিত হবে না পার্টি ব্যবস্থাও। অবশ্য, পশ্চিম পাকিস্তানী আমলারা দেশের রাজনৈতিক উন্নয়নে তাদের কর্মকাণ্ডের অভিঘাতের বিষয় নিয়ে ভাবতেন না। রাজনীতিবিদদের বাদ দিয়ে পূর্ব বাংলার প্রথম মুখ্য সচিব আজিজ আহমদের হাতে বিপুল ক্ষমতা তুলে দেওয়ার যৌক্তিকতা ছিল না। সচিবদের বদলির ব্যাপারে মন্ত্রীদের প্রস্তাবই যে শুধু তিনি অগ্রাহ্য করতেন তা নয়, অফিসার, কর্মচারীদের বাড়ি বরাদ্দের ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করতেন।[৩১] আজিজ আহমেদ ও তাঁর পশ্চিম পাকিস্তানী সহকর্মীদের পূর্ব বাংলার রাজনীতিবিদদের ওপর প্রভুত্ব কায়েমের চেষ্টা শুধু আমলা রাজনীতিবিদের সংঘাতই ছিল না, এটি ছিল পাকিস্তানের সংখ্যালঘিষ্ঠের পক্ষ হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপব শাসন কায়েমে আমলাদের লড়াইও।

এই লড়াই সুতরাং হয়ে উঠল নিরন্তর। রাজনৈতিক উন্নয়ন হল ক্ষতিগ্রস্ত কারণ, আমলারা পৃষ্ঠপোষকতার ব্যাপারটি রাজনীতিবিদদের থেকে দূরে সরিয়ে এর শেকড় দিয়েছিল ছিন্ন করে। 'একবার যদি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত হয় দৃঢ় ভাবে, রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে যদি জনগণকে সংগঠিত করা যায় এবং স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে সহায়তা করতে থাকে তারা প্রস্তুত, দলের বিভিন্ন সদস্য যদি প্রদান করে অর্থ, তা'হলে উপাদান হিসেবে পৃষ্ঠপোষকতার ব্যাপারটির বিলুপ্ত করলেও চলে।'[৩২] কিন্তু পাকিস্তানের প্রেক্ষাপট ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমলারা পাকিস্তানের উভয় অংশে পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ন্ত্রণ করতে সচেষ্ট ছিলেন কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের পরি-প্রেক্ষিতে এ নিয়ন্ত্রণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল ফলেছিল, তা হল, পাকিস্তানের জাতীয় ঐক্যের ধারণা হয়ে উঠেছিল দুর্বল থেকে দুর্বলতর।

এটা ভাবা ঠিক হবে না যে, আমলারা পৃষ্ঠপোষকতা করায়ত্ত করে তা পক্ষপাত-হীনভাবে বিতরণ করতেন। রাজনীতিবিদ যাদের নিয়মিত কোন আয় ছিল না, উপায় ছিল না তাদের সৎ হওয়ার। কিন্তু এমন কোন দৃষ্টান্ত নেই যার দ্বারা বলা যেতে পারে যে, পাকিস্তানী আমলারা সৎ ছিলেন। বরং রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বিহীন হয়ে, পৃষ্ঠপোষকতার সম্পদ [আধুনিক রাষ্ট্রে যার পরিমাণ বিশাল] করে তুলেছিল তাদের দুর্নীতিবাজ। আইয়ুব এবং ইয়াহিয়া দু'জনেই প্রতিজ্ঞা করে-

ছিলেন, আমলাতন্ত্রকে দুর্নীতিমুক্ত করবেন। কিন্তু তাঁরা তা পারেন নি কেননা তা'হলে তাঁদের ক্ষমতার ভিত হয়ে যেত নড়বড়ে। যেমন, ইয়াহিয়ার আমলে 'অনুভূত হয়েছিল, আইয়ুব খানের এক দশকের সংস্কারে দুর্নীতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে আন্তরিক ভাবে তা দূর করতে গেলে প্রায় সম্পূর্ণ বেসামরিক প্রশাসন ও সামরিক বাহিনীর বিরাট অংশকে সরাতে হয়। সুতরাং ঠিক করা হয়েছিল যে, ব্যবস্থা নেওয়া হবে খালি সিভিল সার্ভিসের বিরুদ্ধে। এবং তার মধ্যেও শুধু রুই-কাতলাদের যাদের দুর্নীতি চোখে লাগে··· সামরিক বাহিনীতে হস্তক্ষেপ করা হয়নি··· এ বিষয়ে সমঝোতা করায়, এটা স্বাভাবিক ছিল যে প্রশাসনে আবার দুর্নীতির ক্ষত বৃদ্ধি পাওয়ার প্রতি চোখ বুঁজে থাকা। ফলে, আইয়ুব আমলের শেষ দিকের মতো, তাঁর আমলেও দুর্নীতি উঠেছিল চরমে।'[৩৩] পাকিস্তানী আমলারা যারা সবসময় রাজনীতিবিদদের দুর্নীতিবাজ বলে অভিযুক্ত করেছেন তাদের দুর্নীতির কাহিনী এখানেই শেষ নয়। 'উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান এবং জেনারেল ইয়াহিয়া খানের আমলে যে কয়েকশো সরকারী কর্মচারীকে চাকুরিচ্যুত করা হয়েছিল, তাদের সম্পদচ্যুত করা হয়নি।'[৩৪] পৃষ্ঠপোষকতার ওপর নিয়ন্ত্রণ আমলাদের রাজনৈতিক উচ্চাশা বৃদ্ধি করেছে এবং তারা সফল হয়েছে এ লক্ষ্য অর্জনে—একজন রাজনীতিবিদকে আবেকজনের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিতে।

এ প্রসঙ্গে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে সামরিক আমলারা একটির পর একটি সরকারকে অপসারণ করেছে এবং ক্ষমতায় গিয়ে রাজনীতিবিদ ও আমলাদের দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত করেছে এবং শপথ নিয়েছে দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করার। প্রতিটি সরকার, প্রথম দফায় কিছু রাজনীতিবিদকে গ্রেফতার ও কিছু আমলাকে চাকুরিচ্যুত করেছে। সামরিক বাহিনীর কারো বিরুদ্ধে একই অভিযোগে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এমন কথা শোনা যায় নি। কিছুদিন পর, একই শাসক 'দুর্নীতিবাজ' রাজনীতিবিদদের নিয়ে দল গড়েছেন ও আমলারা ফিরে পেয়েছেন চাকরি। পার্লামেন্ট বিহীন [অর্থাৎ রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ] এই দেশে গত এক দশক ধরে একই ঘটনা ঘটছে ঘুরে ফিরে।

পাকিস্তান সৃষ্টির পরই দেখা যায়, রাজনীতিবিদরা সামরিক বাহিনীর প্রভাবে প্রভাবান্বিত, কারণ তারা ভারতকে বিশেষ করে কাশ্মীর বিষয়ে একটি শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। এটিকে এক ধরনের 'হ্যাং ওভার' বলা যেতে পারে। আগে, মুসলিমলীগের রাজনীতিবিদরা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য ইংরেজ প্রভুর ওপর নির্ভর করেছেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পর তারা প্রমাণ করতে

চাইলেন পাকিস্তান ভারতের সমান। ১৯৪৭ এর অক্টোবরে, গভর্নর জেনারেল জিন্নাহ কাশ্মীরে পুরোপুরি সামরিক ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। পাকিস্তান বাহিনীর প্রধান জেনারেল ডগলাস গ্রেসী এ নির্দেশ মানতে অস্বীকার করেন এবং ফিল্ড মার্শাল ক্লড অচিনলেককে অনুরোধ জানান হস্তক্ষেপের।[৩৫] যার ফলে জিন্নাহ তাড়াতাড়ি তাঁর নির্দেশ প্রত্যাহার করে নেন। আইয়ুব খান এবং চৌধুরী মোহাম্মদ আলী দু'জনেই এ ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন এবং জানিয়েছেন গ্রেসীর সিদ্ধান্ত তাঁদের পছন্দ হয়নি।[৩৬] আমলারা এভাবে জিন্নাহর সামরিক ব্যবস্থা সমর্থন করেছেন যার ফলে ভারতের সঙ্গে পুরোপুরি যুদ্ধ বেধে যেত। অনেকেই অবাক হবেন এ ভেবে যে আমলারা 'র‍্যাশনালি' কি ভাবে এটা সমর্থন করতে পারেন ? কেননা, আইয়ুব নিজেই লিখেছেন, ঐ সময় পাকিস্তান বাহিনীর অবস্থা ছিল খুবই নাজুক এবং তারা ছিল অসংগঠিত। তাঁর মতে, 'তখন ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনীতে ব্যাটালিয়ান আকারে কোন মুসলিম ইউনিট ছিল না', এবং 'যখন পাকিস্তান হল, তখন ভারত থেকে ছোট ছোট দলে আমাদের লোকজন ফিরে আসতে লাগল। আমরা যাদের পেলাম তাদের মধ্যে ছিল প্রশিক্ষণহীন, অর্ধ প্রশিক্ষিত এবং উচ্চ প্রশিক্ষিত। তারা এসেছিল বিভিন্ন অঞ্চল ও বিভিন্ন ইউনিট থেকে। এসবকে জোড়া দিয়ে ডিভিসন এবং করপ্‌স তৈরী করা প্রয়োজন ছিল।'[৩৭] চৌধুরী মোহাম্মদ আলী লিখেছেন, 'টেকনিকাল আর্মস যেমন গোলন্দাজ এবং প্রকৌশলে ঘাটতি ছিল খুবই বেশি এবং পদাতিক বাহিনীতে স্টাফ এবং কমাণ্ড অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সিনিয়র অফিসারের সংখ্যা ছিল সীমিত।'[৩৮]

ভারতের সামরিক ক্ষমতা পাকিস্তানকে নিরুৎসাহিত করতে পারেনি ভারতের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায়। ১৯৫১ সালে, জানিয়েছেন আইয়ুব, 'প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত প্ররোচিত বোধ করছিলেন ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে।' 'লড়াই করে দেখা যাক,' বলেছিলেন লিয়াকত। 'আমি বললাম,' লিখেছেন আইয়ুব, 'যে তাঁর মন ঠিক করার আগে যুদ্ধ করা যাদের পেশা তাদের মতামতটা নেওয়া বাঞ্ছনীয়। আমাদের ছিল তেরটি ট্যাংক এবং ভারতীয় বাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার জন্য এদের 'ইঞ্জিন লাইফ' ছিল চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ঘণ্টা। এবং শুধু রাজনীতিবিদরা নন আমাদের সৈন্যরাও ভারতের সঙ্গে এসপার ওসপার করতে চাচ্ছিল। আমার কাজ ছিল এদের ধরে রাখা এবং ভাগ্য ভালো যে আমি তা পেরেছিলাম।'[৩৯]

এ অবস্থায় সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দিন দিন বাড়তে বাধ্য। 'পাকিস্তান সেনাবাহিনী' দেশের সবচেয়ে বৃহৎ একক 'vested interest and political

force' হওয়ার সঙ্গে, লিখেছেন একজন পাকিস্তানী লেখক, 'কাশ্মীর সমস্যা প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত।'[৪০] পাকিস্তানের সামরিক ব্যয় ছাড়িয়ে গেল তার অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে। ১৯ মে ১৯৫৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পাকিস্তানী সামরিক সহায়তা চুক্তি স্বাক্ষরের এটি একটি প্রধান কারণ। ১ মে ১৯৫৪ সালে জাতির উদ্দেশে ভাষণ প্রদান কালে প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী (বগুড়া) এই অর্থনৈতিক ফ্যাক্টরের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন,[৪১] পাকিস্তান প্রতি বছর তার আয়ের দু-তৃতীয়াংশ ব্যয় করছে সামরিক খাতে এবং বৈদেশিক মুদ্রার সিংহ ভাগ ব্যয় হচ্ছে সামরিক সরঞ্জামাদি সংগ্রহে। যুক্তরাষ্ট্র প্রভূত পরিমাণে সামরিক সাহায্য দিতে শুরু করল পাকিস্তানকে। এটা হয়তো অর্থনীতিকে খানিকটা সহায়তা করেছিল, কিন্তু তা অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল রাজনৈতিক উন্নয়নে। প্রভূত পরিমাণ সামরিক সাহায্য রাজনীতিবিদদের ক্ষমতা খর্ব করে সামরিক সংস্থার ক্ষমতা বৃদ্ধি করল। রাজনীতিবিদদের অদূরদর্শিতা তাদের প্ররোচিত করল সবসময় ভারতের বিরুদ্ধে একটি হিস্টিরিকাল ভাব নেওয়ার, সামরিক যন্ত্র তাতে আরো শক্তিশালী হল এবং পরিণামে রাজনীতিবিদরা নিজেদের তুলল আরো দুর্বল করে।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর অন্যভাবেও, তাৎক্ষণিক সুবিধার জন্য, রাজনীতিবিদরা এমন কিছু ব্যবস্থা নিয়েছিলেন অন্তিমে যা তাদের আমলাদের বিপক্ষে করে তুলেছিল দুর্বল। পাকিস্তানের প্রথম মন্ত্রীপরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করতে দেওয়া হয়েছিল জিন্নাহকে। শুধু তাই নয়, তাঁকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল ইচ্ছানুযায়ী মন্ত্রীপরিষদের সিদ্ধান্ত নাকচ করার।[৪২] রাজনীতিবিদরা এভাবে গভর্নর জেনারেলের হাতে তুলে দিয়েছেন ক্ষমতা। অথচ পার্লামেণ্টারি প্রথায় গভর্নর জেনারেল শাসনতান্ত্রিক প্রধান মাত্র। কয়েক বছরের মধ্যে দেখা গেল, রাজনীতিবিদরা যে ক্ষমতা অর্পণ করেছেন গভর্নর জেনারেলের হাতে তা পুনরুদ্ধার কঠিন, বিশেষ করে ১৯৫৩ সালের পর যখন গভর্নর জেনারেল হলেন একজন অবসর প্রাপ্ত আমলা—গুলাম মোহাম্মদ। এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, জিন্নাহর পর, খাজা নাজিমুদ্দিন সঠিক ভাবে একজন শাসনতান্ত্রিক প্রধান হিসেবে গভর্নর জেনারেলের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। একথা স্বীকার করেছেন রাজনৈতিক উচ্চাশাসম্পন্ন আমলা চৌধুরী মোহাম্মদ আলী।[৪৩] অবস্থার একেবারে পরিবর্তন হল তখন যখন গুলাম মোহাম্মদ বসলেন খাজা নাজিমুদ্দিনের জায়গায়। গুলাম মোহাম্মদ নিজের এবং উচ্চপর্যায়ের আমলাদের আধিপত্য বজায় রাখতে চরম হঠকারী ও স্বৈরাচারী ব্যবস্থা গ্রহণে প্রস্তুত ছিলেন।[৪৪]

আমলাদের ভেতর রাজনৈতিক উচ্চাশা বৃদ্ধিতে জিন্নাহ নিজেও ব্যক্তিগতভাবে খানিকটা দায়ী। বেসামরিক ও সামরিক আমলাদের তিনি উৎসাহ দিতেন সরাসরি তাঁর কাছে রিপোর্ট পাঠানোর জন্য। এক্ষেত্রে মন্ত্রী এমনকি প্রধানমন্ত্রীকেও ডিঙিয়ে যাওয়া হত। আমলারা এভাবে রাজনীতিবিদদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করছিলেন এবং তা হ্রাসে তারা বিন্দুমাত্র রাজী ছিলেন না।[৪৫] এভাবে যখন আমলা ও গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল তখন রাজনীতিবিদরা নিশ্চুপই ছিলেন। ১৯৪৯ সালে কনস্টিটিউয়েণ্ট অ্যাসেম্বলি পাস করল প্রডা (পাবলিক অ্যাণ্ড রিপ্রেজেণ্টেটিভ অফিসেস ডিসকোয়ালিফিকেশন অ্যাক্ট)। এ আইন বলে, ক্ষমতায় থাকাকালীন কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক কোন মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, পার্লামেণ্টারি সচিব বা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার কোন সদস্য অনাচার করেছেন বলে যদি মনে হয় [যেমন, ঘুষ, দুর্নীতি, পক্ষপাতিত্ব, ইচ্ছাকৃতভাবে কাজে গাফিলতি] তা হলে গভর্নর জেনারেল দশ বছর পর্যন্ত তাকে এ ধরনের পাবলিক অফিসে যোগ দেওয়ার অনুপযুক্ত বলে ঘোষণা করতে পারবেন। এ আইনে আরো বলা হয়েছিল, এ ক্ষেত্রে গভর্নর জেনারেল নিজের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী চলতে পারবেন, মন্ত্রী-সভার পরামর্শ লাগবে না। পরবর্তীকালে, গভর্নর জেনারেল গুলাম মোহাম্মদ রাজনীতিবিদদের প্রায় নপুংসকে পরিণত করে আমলাতন্ত্রের আধিপত্য বৃদ্ধির জন্য এ আইন ব্যবহার করেছিলেন।

ভারত বিভক্তির পর দ্রুত এবং অনেকসময় অনধিকারপ্রাপ্ত প্রমোশন আমলাদের করে তুলেছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং উৎসাহ যুগিয়েছিল রাজনীতিবিদদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার। আগে উচ্চপদগুলি অধিকার করেছিল ইংরেজরা এবং সেই শূন্য পদ পূরণের জন্য ছিল এই প্রমোশন। ভারত বিভক্তির আগে উচ্চতর পদের ৫৩ ভাগ অধিকার করেছিল বৃটিশরা। ফলে, সিনিয়ার আমলাদের কথা বাদ দিলেও, ১৯৪৭-এর পর যারা চাকুরিতে যোগ দিয়েছিলেন, 'তারাও চলে গেলেন উচ্চপদে, যে পদ পেতে আগে সাধারণত দশ থেকে বিশ বছরের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হত।'[৪৬] সামরিক বাহিনীর প্রমোশনের ব্যাপারে লিখেছেন আইয়ুব খান, 'আমি নিজেকে বলতাম স্বাধীন না হলে ব্রিগেডিয়ার পর্যন্ত হতে পারলে খুশি হতাম। স্বাধীনতার পর মেজর জেনারেল হিসেবে অবসর গ্রহণ করলেও নিজেকে সফল ভাবতাম। অধিকাংশের আশা ছিল লেঃ কর্নেল হয়ে একটি ইউনিটের কমাণ্ড এবং তারপর অবসর গ্রহণ। উচ্চতর পদের হঠাৎ অবমূল্যায়ন লোকের মনে অস্বাভাবিক সব আশার জন্ম দিয়েছে।'[৪৭] এখানে বলা

দরকার যে আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালের ক্যুর পর নিজেকে ফিল্ড মার্শাল পদে উন্নীত করেছিলেন।

যে শাসকগোষ্ঠীর সবচেয়ে ক্ষমতাশালী অংশ আমলাচক্র, সেই গোষ্ঠী কখনই এ আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে পারে না যে, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের ভিত্তিতে অবাধ নির্বাচনের ফলাফল তারা স্বপক্ষে আনার বন্দোবস্তে সক্ষম হবে। পাকিস্তানের ক্ষেত্রে এটি আরো বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। শাসক আমলারা সবাই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানী এবং পূর্বাঞ্চলে তাদের প্রতি কোন জনসমর্থন ছিল না। আবার শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে নেতৃত্ব কেন্দ্রীভূত ছিল পাঞ্জাবীদের হাতে যারা উচ্চ পর্যায়ের সামরিক বেসামরিক আমলাদের মধ্যে ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাই অনেকে যদি সন্দেহ করেন, ১৬ অক্টোবর ১৯৫১ সালে, প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের হত্যার ব্যাপারে নির্বাচন-বিরোধী চক্র যথেষ্ট সচেষ্ট ছিল তাহ'লে সে সন্দেহ একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ঐসময় লিয়াকত আলী খান ব্যস্ত ছিলেন পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, পূর্ববাংলা এবং সবশেষে কেন্দ্রীয় আইন-সভায় নির্বাচন সম্পন্ন করার প্রস্তুতি গ্রহণে। এইসময়ই আবার উচ্চ পর্যায়ের আমলারা গুলাম মোহাম্মদ [অর্থমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতাধর], চৌধুরী মোহাম্মদ আলী এবং ইসকান্দার মীর্জার [ভারতীয় পুলিশ সার্ভিসের সদস্য যাঁর সামরিক পদ-মর্যাদাও ছিল; ব্রিটিশ আমলে তিনি ছিলেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পলিটিকাল এজেণ্ট] নেতৃত্বে তাদের রাজনৈতিক আধিপত্য কায়েমে প্রস্তুতি (take off stage) নিচ্ছিলেন। লিয়াকতের মৃত্যু ছিল উচ্চ পর্যায়ের আমলাদের রাজনৈতিক আধিপত্য সংহত করণের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। পরবর্তী বছরগুলিতে তাদের এই আধিপত্য ক্রমান্বয়ে আরো সোচ্চার হয়ে উঠেছিল।

উচ্চ পর্যায়ের আমলারা কখনই লিয়াকত-হত্যা রহস্য উন্মোচনে বেশি আগ্রহ দেখাননি। 'কখনও কখনও বলা হত তাঁর মৃত্যু হয়েছে একটি পাঞ্জাবী চক্রের ষড়যন্ত্রে।'[৪৮] লিয়াকত ছিলেন ভারত থেকে আগত বাস্তুহারা। এবং প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনে তাঁকে নির্ভর করতে হত উচ্চ পর্যায়ের আমলাদের ওপর। তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না উচ্চ পর্যায়ের আমলাদের আনুগত্য লাভ। তা'ছাড়া গণ-তান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রণয়নে লিয়াকতের ইচ্ছা যা আমলাদের আধিপত্য খর্ব করবে তা নিশ্চয় পাঞ্জাবী আমলাদের মনঃপূত ছিল না। এ ছাড়া হয়তো তারা আরো লক্ষ্য করেছিলেন লিয়াকত তাদের সঙ্গে খুব একটা একাত্মতা ঘোষণা করতে চান না বা তাদের তেমন সুযোগ দেবেন না শাসনতান্ত্রিক বা আইন পরিষদে আধিপত্য

বিস্তার করতে। লিয়াকতের মৃত্যুর পর আমলাদের প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করেছেন আইয়ুব খান যা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আইয়ুব কিছু আমলা ও রাজনীতিবিদের নাম উল্লেখ করে [যাদের মধ্যে গুলাম মোহাম্মদ ও চৌধুরী মোহাম্মদ আলীও অন্তর্ভুক্ত] লিখেছেন, 'তাদের কেউই লিয়াকত আলী খানের নাম উচ্চারণ করলেন না, তাদের মুখে সমবেদনা বা দুঃখের কোন বাক্য উচ্চারিত হতেও শুনলাম না···ভাবছিলাম লোকের পক্ষে এ রকম স্বার্থপর, ঠাণ্ডা রক্ত, নিষ্ঠুর হওয়া কিভাবে সম্ভব। মনে হল তারা প্রত্যেকে নিজেকে কোন-না কোন ভাবে প্রমোশন দিয়ে দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যু তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে নতুন ক্যারিয়ারের। পুরো ব্যাপারটা ছিল ঘৃণা উদ্রেককারী এবং অপ্রীতিকর। বললে হয়তো রূঢ় শোনাবে কিন্তু আমার পরিষ্কার মনে হল তারা নিশ্চিত হয়েছেন, একমাত্র ব্যক্তি যে তাদের শাসনে রাখতে পারতেন তাঁর বিদায়ে। তাদের খেয়ালখুশি মতো চলার জন্য রাজনৈতিক মঞ্চ এখন উন্মুক্ত।'[৪৯]

লিয়াকত হত্যার পর আইয়ুব আমলাদের প্রমোশনের যে ইঙ্গিত দিয়েছেন, বুঝতে কষ্ট হয় না তা গুলাম মোহাম্মদ এবং চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর। এঁদের একজন উন্নাত হয়েছিলেন গভর্নর জেনারেল এবং অপরজন অর্থমন্ত্রী পদে। বইয়ের অন্য জায়গায় আইয়ুব, তাঁদের উচ্চাশার কথা আরো পরিষ্কার ভাবে লিখেছেন অবশ্য নাম উল্লেখ না করে—'একজন আমলা, স্বাধীনতার সময় যিনি ছিলেন অর্থমন্ত্রী নিজেকে তিনি উন্নীত করলেন গভর্নর জেনারেল পদে। আরেকজন এক রাতের মধ্যে সরকারের সচিব থেকে পরিণত হলেন অর্থমন্ত্রী রূপে। এজন্য যা প্রয়োজন হয়েছিল তা হল তাঁদের অফিস কক্ষের বাইরে নেমপ্লেটের বদল। স্বাভাবিক ভাবেই রাজনীতিবিদরা নির্ভরশীল ছিলেন স্থায়ী আমলাদের ওপর [পার্মানেন্ট সার্ভিসেস] কিন্তু আমলাদের মধ্যে যারা ক্ষমতাবান তাদের রাজনৈতিক উচ্চাশা বৃদ্ধি পেয়েছিল।'[৫০]

নিজেদের উচ্চাশা পূরণের জন্য, আমলারা গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নিতে দেরী করতে লাগলেন কারণ ঐ ধরনের শাসনতন্ত্রের অর্থ তাদের ক্ষমতা খর্ব।[৫১] একটি কৌশল যা নিয়মিত ব্যবহার করা হত তা হল শাসনতান্ত্রিক পরিষদের সভায় অনুপস্থিত থাকা এবং পরিষদের নিয়মিত কার্যকলাপে বিঘ্ন সৃষ্টি করা। পরিষদের একজন সদস্য বলেছেন, 'শাসনতান্ত্রিক পরিষদের অনেক সভা স্থগিত রাখতে হয়েছে। প্রায় দেখা গেছে পরিষদে বাঙালী সদস্যরা একা বসে আছেন আর পাঞ্জাবী সদস্যরা চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর ঘরে বসে চা খেয়ে সময়

কাটাচ্ছেন।'[৫২] শাসক আমলাদের নির্দেশ যেসব রাজনীতিবিদরা মেনে নিচ্ছিলেন তারা বোধহয় স্বপ্নেও ভাবেন নি যে এমন একসময় তারা আনতে সাহায্য করছেন যে সময়ে শাসনতন্ত্র প্রণয়নে তারা অংশগ্রহণের সুযোগই পাবেন না।

দৌলতানার মতো পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনীতিবিদরা আমলাদের সাহায্য চেয়ে, স্বৈরাচারী ক্ষমতা ব্যবহারে তাদের উৎসাহ দিয়ে, বিরোধী রাজনীতিবিদ বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের রাজনীতিবিদদের ওপর চাপ প্রয়োগ করে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেননি। পূর্ববঙ্গের রাজনীতিবিদদের ওপর চাপ প্রয়োগ করা হয়েছে শাসনতান্ত্রিক ছাড়ের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে যা ছিল পূর্বাঞ্চলের ন্যায্য পাওনা। ১৯৫৩ সালের ১৭ এপ্রিল দৌলতানা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনকে গভর্নর জেনারেল গুলাম মোহাম্মদ-কর্তৃক বরখাস্তের ব্যাপারেও ষড়যন্ত্র করেছিলেন। শাসনতান্ত্রিক পরিষদ যা কাজ করছিল কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ হিসেবে, সেখানে নাজিমুদ্দিনের প্রতি সমর্থন ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠের। বাজেটও অ্যাসেম্বলী-কর্তৃক তিনি মাত্র পাস করিয়ে নিয়েছিলেন। ঐ মুহূর্তে গভর্নর জেনারেলের নির্দেশ ছিল একতরফা। যেসব রাজনীতিবিদ ঐসময় নাজিমুদ্দিনের হেনস্থায় খুশি হয়েছিলেন তাঁরা তখন অনুভব করতে পারেন নি যে, তাঁরা এভাবে গভর্নর জেনারেলকে সমর্থন জানাচ্ছেন এবং আমলাদের আরো ক্ষমতাধর হতে সাহায্য করছেন, ন্যায্যত যে ক্ষমতা পাওনা রাজনীতিবিদদের।[৫৩]

ক্ষমতার ক্ষুধা আমলারা কিভাবে মিটিয়েছিলেন তার উদাহরণ ২৪ অক্টোবর ১৯৫৪ সালে গভর্নর জেনারেল -কর্তৃক শাসনতান্ত্রিক পরিষদ বাতিল ঘোষণা। পরিষদ, শাসনতন্ত্র প্রণয়ন প্রায় সম্পূর্ণ করে এনেছিল এবং ১৯৫৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর [জিন্নাহর জন্মদিন] তা ঘোষণা করার কথা ছিল। কিন্তু পরিষদের সদস্যরা গুলাম মোহাম্মদ ও তাঁর সহযোগী স্বৈরাচারী আমলাদের বিরুদ্ধে একটি মারাত্মক অপরাধ করেছিলেন। তাঁরা শাসনতন্ত্রে এমন একটি ধারা সংযোজিত করেছিলেন যাতে বলা হয়েছিল গভর্নর জেনারেল ইচ্ছে করলেই মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন না যে ক্ষমতা তাঁকে ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছিল ১৯৫৩ সালের ১৭ এপ্রিল। ২৫ ডিসেম্বরের পর গুলামের পক্ষে সম্ভব হত না এ পরিষদকে শাস্তি দেওয়ার যারা এমন এক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেছে যা আমলাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং ঠিক সময়ে তিনি আঘাত হানলেন।[৫৪]

এমনকি এ পর্যায়েও, বিরোধী রাজনীতিবিদদের হেনস্থা এবং কিছু সুযোগ-সুবিধা পাবার লোভে আমলাদের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য রাজনীতিবিদের

অভাব হয়নি। দৌলতানার নেতৃত্বে পাঞ্জাবের অনেক রাজনীতিবিদ সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছেন শাসক আমলা চক্রকে, পশ্চিম পাকিস্তানকে রাজনৈতিকভাবে পুনর্গঠিত করার এক পরিকল্পনায়। এ পরিকল্পনা ছিল বিভিন্ন প্রদেশ, রাজা-শাসিত রাজ্য ইত্যাদিকে একটি ইউনিটে পরিণত করা [অর্থাৎ একক পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশ]। আশা করা গিয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষুদ্র প্রদেশ সমূহ [সিন্ধু বা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত] এতে বাধা দেবে কারণ এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে পাঞ্জাবী আমলারা আরো ক্ষমতাশালী হয়ে উঠবেন। এ পরিকল্পনা পাসের জন্য উদ্যোক্তারা অবশ্য সব-কিছু করতে প্রস্তুত ছিলেন। এক ইউনিট পরিকল্পনা কার্যকর করার কৌশল রচনা করেছিলেন দৌলতানা।[৫৫] সোহরাওয়ার্দী [যিনি পরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন] এসব কৌশলের কথা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছিলেন শাসনতান্ত্রিক পরিষদে। কৌশলগুলি ছিল—'আইন পরিষদের সদস্যদের করা হবে গ্রেফতার; তাঁদের আত্মীয় স্বজনকে আটক করা হবে; অবাঞ্ছিত যারা এতে বাধা দেবে অফিসাররা যদি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয় তবে তাদের বদলি করা হবে; হস্তক্ষেপ করা হবে নির্বাচনে এবং আইন পরিষদের সদস্যদের ভীতি প্রদর্শন করা হবে।'[৫৬] এক ইউনিটের পক্ষে বিপক্ষে কে সমর্থন জানাচ্ছেন সে পরিপ্রেক্ষিতে সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এবং পাঞ্জাবে মন্ত্রী নিযুক্ত ও বরখাস্ত করা হচ্ছিল।[৫৭]

এই পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, সংখ্যাগরিষ্ঠ ও ঐক্যবদ্ধ পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে সংখ্যালঘিষ্ঠ ও কম ঐক্যবদ্ধ পশ্চিমাংশের এক ধরনের সাযুজ্য সৃষ্টি করা এবং তারপর কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ বা নতুন শাসনতান্ত্রিক পরিষদে দুই প্রদেশের [দুই অংশ] সমানসংখ্যক আসনের যৌক্তিকতা তুলে ধরা। নতুন শাসনতান্ত্রিক পরিষদ স্থাপনে গুলাম মোহাম্মদের তেমন কোন ইচ্ছা ছিল না। এখানে গুরুত্বপূর্ণ এই যে, যে মুহূর্তে পুরনো পরিষদে তিনি রাজনীতিবিদদের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিলেন সে মুহূর্তে সেনাধ্যক্ষ আইয়ুব খানকে তিনি অনুরোধ জানিয়েছিলেন ক্ষমতা গ্রহণে।[৫৮] আইয়ুব রাজী হন নি। কিন্তু তাঁর আত্মজীবনী পড়ে মনে হয়, পুরনো পরিষদে গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা হরণে রাজনীতিবিদদের প্রচেষ্টা তিনি পছন্দ করেননি। সুতরাং গুলাম মোহাম্মদ পরিষদ ভেঙে দেওয়ার মুহূর্তে আইয়ুবের সমর্থন সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন। অবশ্য, ফেডারেল কোর্টের রায়ে বলা হয়েছিল, আরেকটি শাসনতান্ত্রিক পরিষদ আহ্বান করতে হবে।[৫৯] গুলাম হয়তো ইচ্ছুক ছিলেন এ রায় না মেনে সেনাবাহিনীর হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে।

হতে পারে এসময়ই তিনি আইয়ুবকে কয়েকবার ক্ষমতা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন।[৬০]

কিন্তু আইয়ুব সাড়া দেন নি। ১৯৫৫ সালের ৭ জুলাই গুলাম মোহাম্মদ দ্বিতীয় শাসনতান্ত্রিক পরিষদের সভা আহ্বান করলেন। পরিষদে, দু-প্রদেশের সদস্য সংখ্যা ছিল সমান এবং প্রায় সবাই ছিল তাঁর অনুগত। নতুন পরিষদে পূর্ববঙ্গ থেকেও বেশ বড় সংখ্যক রাজনীতিবিদ যোগ দিয়েছিলেন এবং তারা এক ইউনিট পরিকল্পনা ও আমলাদের বায় মেনে নিতে রাজী ছিলেন। শাসনতন্ত্র তৈরী থেকে এক ইউনিট পরিকল্পনা বেশি গুরুত্ব পেল এবং ১৯৫৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পরিষদ পশ্চিম পাকিস্তান গঠনের বিল পাস করল। তবে, সেনাবাহিনীর সমর্থন না থাকলে, আমলাবা এ ধরনের পরিকল্পনা কার্যকর করবার সাহস পেতেন কিনা সন্দেহ। সেনাবাহিনী যে এ পবিকল্পনা সমর্থন করবে এ ব্যাপাবে আমলাবা নিশ্চিত ছিলেন, কেননা, আইয়ুব খান নিজেও ছিলেন এ পরিকল্পনার একজন উদ্যোক্তা। আইয়ুব দাবি কবেছেন, ১৯৫৪ সালের ৪ অক্টোবর লণ্ডনের এক হোটেলে 'কয়েকঘণ্টার' মধ্যে তিনি এই পরিকল্পনা তৈরী করেছিলেন।[৬১] তিনি মত প্রকাশ করেছিলেন, 'এক ইউনিট পরিকল্পনা কার্যকর হওয়ার আগে বিদ্যমান প্রাদেশিক, স্টেট লেজিসলেচারস ও কেবিনেট ভেঙে দিতে হবে যাতে এই পরিকল্পনার অন্তরায় হয়ে কেউ না দাঁড়ায়।'[৬২] অন্য কথায় রাজনীতিবিদদের এমন ভাবে দমিয়ে রাখতে হবে যাতে আমলারা রাজনীতিবিদদের ভূমিকা নিজেরা দখল করে নিতে পারেন।

পূর্ববাংলার প্রতি উচ্চপর্যায়ে অবাঙালী আমলাদের মনোভঙ্গী কী ছিল তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ আইয়ুব খানের প্রবন্ধ—'A Short Appreciation of Present and Future Problems of Pakistan'—যার মধ্যে এক ইউনিট পরিকল্পনাও অন্তর্গত। পুরো প্রবন্ধে ফুটে উঠেছে সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী। পূর্ববাংলা সম্পর্কে লিখেছেন আইয়ুব খান—'পাকিস্তান সৃষ্টির আগে তারা (বাঙালীরা) কখনও সত্যিকার স্বাধীনতা বা সার্বভৌমত্ব ভোগ করেনি। এবং এ কথা একটুও বাড়িয়ে বলা হচ্ছে না। পর্যায়ক্রমে তারা শাসিত হয়েছে বর্ণ হিন্দু, মোগল, পাঠান বা বৃটিশদের দ্বারা। এ ছাড়া, এখনও তারা হিন্দু সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত প্রভাবে বেশ প্রভাবান্বিত।' এর পরের বাক্যটি মূল ইংরেজীতেই তুলে দিচ্ছি যেখানে তাচ্ছিল্যের ভাবটা আরো প্রকট হয়ে উঠেছে—

'As such they have all the inhibitions of down trodden races

and have not found it possible to adjust psychologically to the requirements of the new-born freedom.'[৬৩]

এ ধরনের মন্তব্য এমনই সত্যের অপলাপ যে এর প্রতিবাদের আর দরকার পড়ে না। তবে, পশ্চিম পাকিস্তানী আমলাচক্রের মনোভাব বোঝার জন্য এগুলি গুরুত্বপূর্ণ এবং এতে আরো বোঝা যায় যে, ১৯৭১ সালের গণহত্যা তাদের পক্ষে অসম্ভব কিছু ছিল না।

পাকিস্তানে আমলারা প্রায়ই রাজনীতিবিদদের এই বলে অভিযুক্ত কবতেন যে তারা ক্ষমতা লাভ করতেন কৌশল এবং ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে। কিন্তু আগস্ট ১৯৫৫ সালে চৌধুবী মোহাম্মদ আলীর প্রধানমন্ত্রী হওয়া প্রমাণ করে যে, এ খেলায় রাজনীতিবিদরা আমলাদের তুলনায় কিছুই নন। এমনকি ম্যাসকারেনহাস লিখেছেন, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ক্ষমতায় আসীন হয়েছিলেন 'শস্তা কৌশলের মাধ্যমে। মুসলিম লীগের সংসদীয় দল এই সমঝোতায় তাঁকে নেতা নির্বাচন করেছিল যে তিনি তৎক্ষণাৎ সোহরাওয়ার্দীব সঙ্গে আলোচনায় বসবেন যাতে একটি কোয়ালিশন সরকার গঠন করা যায়। যখন সোহরাওয়ার্দী চরম মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করছেন তখন চৌধুরী মোহাম্মদ আলী সোজা গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেলেন গভর্নর জেনারেলের ভবনে এবং ইসকান্দার মীর্জা তাঁকে শপথ গ্রহণ করালেন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে।'[৬৪] ইসকান্দার ইতিমধ্যে স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন গুলাম মোহাম্মদেব স্থানে। আইয়ুব খান লিখেছেন, 'সোহবাওয়ার্দী দেখলেন তিনি পরাস্ত হয়েছেন এবং সুযোগ হারিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী হওয়াব।' অন্যদিকে, 'সোহরা-ওয়ার্দীর বিপরীতে তিনি [ইসকান্দার] ফজলুল হকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে লাগলেন এবং ভুলে গেলেন যে একবছর আগে তাঁকে তিনি বিশ্বাসঘাতক হিসেবে অভিযুক্ত করেছিলেন।'[৬৫]

যেহেতু দ্বিতীয় শাসনতান্ত্রিক পরিষদ এক ইউনিট স্কীম এবং দু-অংশের সমান সমান প্রতিনিধিত্ব মেনে নিয়েছিল সেহেতু আমলারা একটি শাসনতন্ত্র তৈরীতে বিলম্ব করলেন না। ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র ঘোষিত হল। ইসকান্দার মীর্জা তখন প্রেসিডেণ্ট এবং চৌধুরী মোহাম্মদ আলী প্রধানমন্ত্রী [শাসন-তন্ত্রে পূর্ববাংলার নাম পরিবর্তন করে রাখা হল পূর্ব পাকিস্তান]। কয়েকমাসের মধ্যে অবশ্য প্রধান মন্ত্রী অনুভব করলেন তাঁর চারিদিকেও বিছানো হচ্ছে ষড়যন্ত্রের জাল। রাজনীতিবিদদের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে তিনি ভাবছিলেন ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন সামরিক বাহিনীর হাতে। 'ক্ষমতা নিয়ে তুমি আমাকে এ ঝামেলা থেকে

বাঁচাও না কেন ?' বলেছিলেন তিনি সেনাধ্যক্ষ আইয়ুব খানকে। শেষোক্তজন তাঁকে পরামর্শ দিলেন প্রেসিডেণ্ট ইসকান্দার মীর্জার সঙ্গে কথা বলার জন্য।[৬৬]

দেশ পরিচালনা এবং নিজেকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখার ব্যাপারে মীর্জার অবশ্য নিজস্ব কিছু ধারণা ছিল। 'সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ সালে চৌধুরী মোহাম্মদ আলা সোহরাওয়ার্দীকে জায়গা ছেড়ে দিলেন যিনি ইতিমধ্যে প্রেসিডেণ্ট ইসকান্দার মীর্জার সঙ্গে সম্পর্ক ভালো করে ফেলেছিলেন।'[৬৭] মীর্জা নিজের প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য একজন রাজনীতিবিদকে আরেকজনের বিরুদ্ধে ইন্ধন যোগাতেন।[৬৮] উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পলিটিক্যাল এজেণ্ট হিসেবে নিজের ভূমিকা থেকে মীর্জা মুক্ত হতে পারেননি। তাঁর প্রশিক্ষণ এবং অভিজ্ঞতা এমন ছিল যে, 'লক্ষ্য-অর্জনের জন্য তিনি একটি পথই জানতেন, তা হল সীমান্ত প্রদেশের পুরনো খেলা, একটি উপজাতির বিরুদ্ধে আরেকটি উপজাতিকে ইন্ধন যোগানো।'[৬৯] ১৯৫৭ সালের অক্টোবরে তিনি একটি সুযোগ পেলেন সোহরাওয়ার্দীকে সরানোর এবং সে সুযোগ তিনি হারালেন না। বিভিন্ন দ্বন্দ্বের মাঝে সোহরাওয়ার্দী আবিষ্কার করলেন যে তাঁর অনেক সমর্থক তাঁকে ছেড়ে যাচ্ছেন। জাতীয় পরিষদে তিনি তাঁর শক্তি পরীক্ষা করতে চাইলেন। মীর্জা তাতে রাজী হলেন না বরং তাঁকে জানালেন তিনি যদি পদত্যাগ না করেন তবে তাঁকে বরখাস্ত করা হবে। পদত্যাগ করলেন সোহরাওয়ার্দী এবং প্রধানমন্ত্রী হলেন আই. আই. চুন্দ্রিগড। উনষাট দিনের মাথায় তাঁকে জায়গা ছেড়ে দিতে হল মালিক ফিরোজ খান নুনকে। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান প্রেসিডেণ্ট হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি টিকে ছিলেন।

সামরিক বাহিনীর ক্ষমতাগ্রহণ আমলারা সমর্থন করলেন। কারণ, তাদের মতে ঘন ঘন মন্ত্রীসভা পরিবর্তনের ফলে দেশে যে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছে তা সমাধানের এটাই মাধ্যম। কিন্তু এ অস্থিতিশীলতার সিংহ ভাগ দায়িত্ব অর্পণ করা যেতে পারে ইসকান্দার মীর্জা বা শাসক আমলাচক্রের ওপর। আইয়ুবের মতে, ইসকান্দার নিজে এ 'গোলযোগ' সৃষ্টি করেছিলেন, এবং 'ষড়যন্ত্রমূলক আবহাওয়ায় তিনি কাজ করতেন ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতেন।'[৭০] তাছাড়া, শাসকচক্র ১৯৫৬ সালে শাসনতন্ত্র ঘোষিত হওয়ার পর সাধারণ নির্বাচন আহ্বান করেনি যা ছিল তাদের প্রধান দায়িত্ব। শাসকচক্র প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ১৯৫৭ সালের নভেম্বরে নির্বাচন হবে, পরে তা পিছিয়ে ১৯৫৮ এবং শেষে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৯ সালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। 'আমার মনে হয় না তিনি [ইসকান্দার] কখনও আন্তরিকভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন,' লিখেছেন আইয়ুব।[৭১]

আইয়ুব খান নিজেও তা চাননি। পার্লামেণ্টারি ব্যবস্থার প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা কখনও তিনি লুকোবার চেষ্টা করেননি। ৪ অক্টোবর ১৯৫৪ সালে তিনি যে দলিলটি রচনা করেছিলেন তাতে মৌলিক গণতন্ত্রের একটি রূপরেখা ছিল। মৌলিক গণতন্ত্রের রূপরেখা প্রণয়ন করতে গিয়ে আইয়ুব যে বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা হল এ ব্যবস্থায় নির্বাচন হবে 'ম্যানেজেবল'।[৭২] অর্থাৎ আইয়ুব চেয়েছেন 'ম্যানেজেবল' নির্বাচন প্রথা বা পরোক্ষ নির্বাচন। তিনি এমন এক শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা চেয়েছেন যেখানে একজন থাকবে 'যিনি সব নিয়ন্ত্রণ করার অবস্থায় থাকবেন।' ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র তিনি পছন্দ করেননি। কারণ এই শাসনতন্ত্রে 'প্রেসিডেণ্ট, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীসভা এবং প্রদেশসমূহে ক্ষমতা ভাগ করে দিয়েছে। এর ফলে ক্ষমতার ফোকাল পয়েণ্ট (focal point) নষ্ট হয়ে গেছে এবং [সামগ্রিক] নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় কাউকে রাখা হয়নি।'[৭৩]

আইয়ুব এমন এক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যেখানে রাজনৈতিক অংশ-গ্রহণের সুযোগ থাকবে কম। তিনি জারী করেছিলেন 'ইলেকটিভ বডিজ (ডিসকোয়ালিফিকেশন) অর্ডার।' এর অর্থ জনপ্রিয় রাজনীতিবিদ যারা আইয়ুবের প্রতি হুমকি হয়ে উঠতে পারেন তাদের দমিত করা। বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিনান্স এবং প্রেস অ্যাণ্ড পাবলিকেশেন্স অর্ডিনান্সও জারী করেছিলেন তিনি। এর মাধ্যমে শহুরে এলিটদের নিয়ন্ত্রণে রাখার ইচ্ছে ছিল তাঁর। গ্রামাঞ্চলে ধনী গ্রুপকে নিজের পক্ষে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন তিনি কারণ তারাই নির্বাচিত হয়েছিল ইউনিয়ন কাউন্সিলর রূপে। আইয়ুবী ব্যবস্থা তাদের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে রাজনৈতিক মাত্রা যোগ করেছিল।[৭৪] ওয়ার্কস প্রোগ্রামের মাধ্যমে নগদ টাকা নাড়াচাড়া করার সুযোগ পেল তারা [প্রত্যেক ইউনিয়নে এর পরিমাণ ছিল প্রায় সাত হাজার টাকা]। আইয়ুব-বিরোধী রাজনীতিবিদরা এ প্রথা বিলোপ করে সর্বজনীন ভোটাধিকার এবং পার্লামেণ্টারি ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে-ছিলেন।[৭৫]

আইয়ুবের জন্য মৌলিক গণতন্ত্র ছিল—তাঁর ভাষা ধার করেই বলতে হয়—একটি 'ম্যানেজেবল' ব্যবস্থা, যেখানে আছে একটি 'ফোকাল পয়েণ্ট অফ পাওয়ার' এবং যে ব্যবস্থায় তিনি নিজেই 'ইন এ পজিশন অফ কণ্ট্রোল।' এটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল ১৯৬৪-৬৫ এর নির্বাচনে, যেখানে সরকারী কর্মচারীরা পৃষ্ঠপোষকতা ও চাপের সাহায্যে আইয়ুবের নির্বাচনী সভাগুলিতে লোক জড়ো করেছিলেন, সংগ্রহ করেছিলেন মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোট।[৭৬] কিন্তু তা সত্ত্বেও আইয়ুব নিশ্চিত

ছিলেন না, ফাতেমা জিন্নাহর বিরুদ্ধে তিনি জিতবেন কিনা। এ পরিপ্রেক্ষিতে ৮ নভেম্বর ১৯৬৪ সালে, ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে আবার তিনি সামরিক আইন জারীর হুমকি দিয়েছিলেন। তিনি স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর বিপক্ষে যাবে এমন নির্বাচনী রায় তিনি গ্রহণ করবেন না।[৭৭] এটা স্বাভাবিক ছিল যে, মৌলিক গণতন্ত্রীরা নিজেদের স্বার্থরক্ষার্থেই আইয়ুবকে ভোট দেবে। আইয়ুব জিতেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও লক্ষণীয় যে, অনেক মৌলিক গণতন্ত্রী নিজেব স্বার্থ বিসর্জন দিয়েও আইয়ুবকে ভোট দেননি। আইয়ুব পশ্চিম পাকিস্তানে পেয়েছিলেন প্রদত্ত ভোটের ৭৩·৬% এবং পূর্ব পাকিস্তানে ৫৩ ১%। এখানে উল্লেখ্য যে, 'সবকারী দলের কর্মীরাই স্বীকাব করেছিল, নির্বাচনে সরকাব জিতেছে, কিন্তু জনগণকে হারিয়েছে।'[৭৮]

১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে, পাকিস্তানেব দুই অংশে গণঅভ্যুত্থানেব পবিপ্রেক্ষিতে আইয়ুব খানকে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হল ইয়াহিযা খানকে। আইয়ুব খুব সম্ভব সামবিক বাহিনীর সমর্থন হারিযে ফেলেছিলেন। এক দশকেবও বেশি তিনি দেশ শাসন কবছিলেন এবং এটা স্বাভাবিক যে তাতে তাঁর সহকর্মীদেব মনে অসন্তোষ বৃদ্ধি ও উচ্চাশা সৃষ্টি করতে পারে। ইয়াহিয়াও এর বাইবে নন। যখন আইয়ুব-বিবোধী আন্দোলন মাথা চাড়া দিযে উঠেছিল তখন খুব সম্ভব ইয়াহিয়া তা ক্ষমতা দখলের সুযোগ হিসেবে কাজে লাগিয়েছিলেন।[৭৯] অথবা, এটাও বলা যেতে পারে যে, আইয়ুব নিজেই কৌশলে সরে যেতে চাচ্ছিলেন। কাবণ এতে তাঁর দুটি সুবিধা হয়—পারিবারিক সম্পদ রক্ষা কবা যাবে (এবং গিয়েছিলও) এবং রাজনীতিবিদদের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া যাবে যারা তাঁর পতন ত্বরান্বিত করছেন।[৮০]

মার্চ, ১৯৬৯ সালে, আইয়ুবের বদলে ইয়াহিয়া আসায় মৌলিক কোন পরিবর্তন হয়নি। 'ক্ষমতা তখনও ছিল সামরিক বাহিনী ও তাদের বেসামরিক উপদেষ্টাদের হাতে।'[৮১] পরোক্ষ নির্বাচনের বদলে প্রত্যক্ষ নিৰাচন দিয়ে ইয়াহিয়া ভেবেছিলেন, আইনসভায় কোন দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না ফলে শাসক আমলাচক্রের [তাঁর নেতৃত্বে] রাজনৈতিক আধিপত্য অক্ষুণ্ণ থাকবে এবং রাজনীতিবিদদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করা যাবে।[৮২] কিন্তু ১৯৭০ সালের নির্বাচনের [পাকিস্তানে এই প্রথম] ফল প্রমাণ করল তাদের অঙ্ক মেলেনি। শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ অর্জন করল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা। ঐ সময় আওয়ামী লীগের রাজনীতিবিদদের একতা ছিল ১৯৫৮-পূর্ববর্তী রাজনীতিবিদদের অনৈক্যের বিপরীত যা সাহায্য করেছিল আমলাচক্রের আধিপত্য বিস্তারে। শুধু তাই নয়, গুরুত্বপূর্ণ

দুটি বিষয়ে মুজিবের মনোভাব তাঁকে শত্রু করে তুলল শাসক আমলাচক্র, বিশেষ করে সামরিক বাহিনীর। শাসকচক্রের তীব্র ভারত-বিদ্বেষেব তিনি বিরোধিতা করলেন এবং ইচ্ছা প্রকাশ করলেন সামবিক খাতে ব্যয় হ্রাসের যা না হলে নির্বাচকদের কাছে প্রতিশ্রুত আর্থ সামাজিক সংস্কার অসম্ভব।[৮৩] শাসক আমলা-চক্রের পক্ষে এটা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না যার পরিপ্রেক্ষিতে গণহত্যা। সামরিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শুরু হল স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং তা সমাপ্ত হল ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে বাঙালীদেব বিজয়েব মাধ্যমে। শাসক আমলাচক্র জাতীয় ঐক্য বিনাশ করে প্রমাণ করল, রাজনৈতিক বিকাশ নিয়ন্ত্রণে তারা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ।

আইয়ুব এবং ইয়াহিয়ার মতো সামরিক অফিসাররা যেভাবে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র করে দেশেব সর্বোচ্চ পদে আসীন হয়েছিলেন তা নিশ্চয় তরুণ অফিসারদেব শৃঙ্খলা ও নৈতিকতায় সৃষ্টি করেছিল বিরূপ প্রতিক্রিয়ার। দ্রুত পদোন্নতির জন্য তারাও উৎসুক হয়ে উঠেছিলেন রাজনৈতিক যোগসাজশে। যোগ্য অফিসাররা শিকারে পরিণত হয়েছিলেন আন্তর্সার্ভিস দ্বন্দ্বের। 'ক্রমে অফিসারবৃন্দ যারা গর্বিত ছিল নিজেদের পেশাব জন্য, পরিণত হয়েছিল তৃতীয় শ্রেণীর রাজনীতিবিদ ও প্রশাসকে। সঠিক ভাবে গঠিত রাজনৈতিক সবকার না থাকায়, উচ্চ পর্যায়ের পদোন্নতি নির্ভর করত এক ব্যক্তির ইচ্ছার ওপর। ···১৯৫৫ থেকে ১৯৭১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত, প্রায় সতেরো বছরে চল্লিশজন জেনারেলকে অবসর প্রদান করা হয়েছিল যাদের মধ্যে মাত্র চারজন পৌঁছেছিলেন অবসব নেওযার বয়সে।··· কিছু অফিসারকে এমন পদে দেওয়া হয়েছিল যে পদে আসীন হওয়ার যোগ্যতা বা প্রশিক্ষণ তার ছিল না।'[৮৪] এসব কিছু মিলে ১৯৭১ সালের সংকট মোকাবেলা করার মতো ক্ষমতা বা অবস্থা ছিল না আমলাচক্রের।

লিয়াকত-হত্যার পর, দু'দশকে ক্ষমতা ব্যবহার করে আমলারা নিজেদের সম্পদ যেমন বৃদ্ধি করেছিলেন তেমনি নজর দিয়েছিলেন নিজেদের চাকুরিগত সুযোগ-সুবিধার দিকেও [কয়েকজন আমলা জানিয়েছেন, ঐ সময় সচিবরা গাড়িতে পতাকা ব্যবহার করতে পারতেন]। শুধু তাই নয়, তারা আবার সহায়তা করেছিলেন ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের। শেষোক্তরা আগ্রহী ছিলেন আমলাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে। জাতীয় নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে পাকিস্তানে আমলা ও শিল্পপতিরা হয়ে উঠেছিলেন সম্পদশালী। যুক্তরাষ্ট্রেও একই ব্যাপার ঘটেছিল। তবে, অনুন্নত পাকিস্তানে এর ফলে সাধারণ মানুষকে যে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল তার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থার তুলনা চলে না।

পাকিস্তানে শিল্পবিকাশের প্রক্রিয়ায় আমলাদের ছিল একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ। তত্ত্বগত ভাবে এর অর্থ ছিল, মুনাফালোভী শিল্পপতিদের হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করা। কিন্তু কার্যত, এর ফলে পাকিস্তানে সূচনা হয়েছিল আমলা-শিল্পপতিদের আঁতাতের। পঞ্চাশ দশকে, আমলারা যখন নিয়ন্ত্রণ করতেন সব প্রত্যক্ষভাবে তখন ব্যবসায়ীরা ছিলেন তাদের অধস্তন কারণ, আমলার অনুমতি ছাড়া লাইসেন্স পারমিট পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এবং লাইসেন্স পারমিট ছাড়া সম্ভব ছিল না ব্যাবসাও। ব্যবসায়ীরা তখন আমলাদের যোগাতে লাগলেন অর্থ। দ্রুত ধনী হওয়ার খাতিরে আমলাদেরও এ ব্যাপারে আপত্তি ছিল না। কিন্তু আমলারা ভুলে গিয়েছিলেন যে তাদের সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয়েছে দু-ডজনেরও কম ব্যবসায়ী পরিবারের ওপর।[৮৫]

প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের বদলে পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণের সময়ও বহাল রইল দুর্নীতি। ইতি-মধ্যে, ব্যবসায়ীরা হয়ে উঠেছেন আবো সম্পদশালী ও আত্মবিশ্বাসী। আগের অধস্তন ভাব কাটিয়ে মোটামুটি সমানে সমানে একটি আঁতাত গড়ে তুলেছেন তারা আমলাদের সঙ্গে। আমলারা নিজেরা [অবসর গ্রহণের আগে বা পরে] বা তাদের আত্মীয় স্বজনরা যোগ দিচ্ছেন ব্যবসায়ে শেয়ার হোল্ডার বা বড চাকুরে হিসেবে। আমলা ও ব্যবসায়ী পরিবারের মধ্যে বিয়ের ফলেও সম্পর্ক হয়ে উঠেছে আরো দৃঢ়। আমলারা রাষ্ট্রের টাকায় স্থাপন করছেন বড় শিল্প আর শিল্পপতিরা পরে তা কিনে নিচ্ছেন নামমাত্র দামে। উদাহরণ হিসেবে দাউদ পরিবারের কথা উল্লেখ করা যায়। কর্ণফুলী কাগজের কল তারা কিনেছিলেন দু কোটি টাকায়, যদিও সেই কারখানায় পাবলিক বিনিয়োগ ছিল তখন প্রায় আট কোটি টাকা।[৮৬]

কৃষি উৎপাদনের তুলনায় শিল্প উৎপাদনে লগ্নীর প্রয়োজন অনেক বেশি।[৮৭] নিজেদের এবং শিল্পপতিদের স্বার্থসন্ধানে আমলাচক্র দরিদ্র কৃষককে অবহেলা করে শিল্পায়নে মনোনিবেশ করে, এবং এজন্যে কৃত্রিম উপায়ে কৃষিপণ্যের বাজারে মন্দার সৃষ্টি করতেও পিছপাও হয়নি।[৮৮] ১৯৫৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তির ফলে উদ্বৃত্ত গম আসতে লাগল যুক্তরাষ্ট্র থেকে।[৮৯] ফলে গোটা চোটটা গিয়ে পড়ল কৃষকের ওপর। এমনকি ভূমি সংস্কারের নামে সরকার যখন উদ্যোগ নিলেন ভূমি পুনর্বণ্টনের তখন কিছু কিছু আমলা অনেক জমি রেখে দিলেন নিজেদের জন্য বা নিলামের বন্দোবস্ত করে পাইয়ে দিলেন তা ধনী সহকর্মী বা ব্যবসায়ী বন্ধু / সহযোগীকে।[৯০]

শহরের জমির ক্ষেত্রেও একই ধরনের পক্ষপাত ঘটেছিল। 'লাহোরে', বলা যায়

উদাহরণস্বরূপ, 'নতুন আবাসিক এলাকা গুলবার্গে সুদৃশ্য সব ইমারত তুলেছে সামরিক, বেসামরিক [আমলা] এবং শিল্পপতি এলিটরা। স্থানীয় লোকেরা এ আবাসিক এলাকার নামকরণ করেছেন রিসওয়াতপুর। উর্দুতে রিসওয়াত মানে ঘুষ।'[৯১]

১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান ক্ষমতায় আসার আগে সূচনা হয়েছিল শিল্পপতি-আমলা আঁতাতের। আইয়ুব খানের ক্ষমতা গ্রহণ তা আরো দৃঢ় করেছিল মাত্র। এ সম্পর্কে তারিক আলীর একটি মন্তব্য মূল ভাষাতেই উদ্ধৃত করা যেতে পারে: 'During Ayub's decade the two partners seemed to have indulged in an orgy of copulation without any regard for the techniques of birth control'.[৯২]

প্রথমদিকে আইয়ুব খান কালো টাকা ও চোরাকারবারী পণ্য-এর তালিকা দিতে বলে ব্যবসায়ীদের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু সে ভয় পরিণত হল আনুগত্য এবং সহযোগিতায় যখন প্রেসিডেন্ট তাদের হুকুম দিলেন কালো টাকার যে কর আসে তার অর্ধেক এবং চোরাকারবারী পণ্যের শুল্ক প্রদান করতে। তাদের প্রতি এ ধরনের নমিত মনোভঙ্গী নেওয়ার ব্যাপারে আইয়ুব খান বলেছেন, ব্যবসায়ীদের প্রতি স্বৈরাচারী আচরণ করা ঠিক নয় এবং নির্ভয়ে তাদের ব্যাবসা চালিয়ে যেতে দেওয়া উচিত।[৯৩]

তবে, এ নমিত মনোভাব অপ্রত্যাশিত ছিল না। ব্যাবসা-বাণিজ্যের দ্বারা তিনি ও তাঁর পরিবার প্রভূত সম্পত্তি করছিলেন। আর্মি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন আইয়ুবের দুর্বলতার কথা জানত। তাই আইয়ুবের আখ খেতের (Suger land) পাশে একটি চিনিকল বসিয়েছিল তারা এবং কল-সংলগ্ন আইয়ুবের জমিতে উৎপাদিত পণ্য তারা কিনে নিত।[৯৪] আইয়ুবের জ্যেষ্ঠ পুত্র গওহর আইয়ুব ১৯৬১ সালে সামরিক বাহিনীর চাকরি ছেড়ে যোগ দিলেন ব্যবসায়ে এবং চার বছরের মধ্যে হয়ে গেলেন ক্রোড়পতি। শোনা যায়, এ সময় আইয়ুব নিজে মালিক হয়েছিলেন পঁচিশ কোটি টাকা সম্পত্তির।[৯৫] আইয়ুব খান ব্যতিক্রম ছিলেন না। ইয়াহিয়ার আমলে, তাঁর চিফ অফ স্টাফ জেনারেল আবদুল হামিদ খানও একই কাজ করেছিলেন। তিনি পরিচিত ছিলেন প্রেসিডেন্টের ডান হাত হিসেবে। পাকিস্তানের এক সময়ের প্রতিরক্ষা সচিব জেনারেল ফজল মুকিম খান লিখেছেন, 'তিনি (হামিদ) তাঁর বন্ধুদের স্বার্থ রক্ষা করতেন নিজের প্রভাব খাটিয়ে। বলা হয়ে থাকে, শেষে তিনি নিজেও জড়িয়ে পড়েছিলেন ব্যবসায়ে।'[৯৬] শুধু তাই নয়, ১৯৭১ সালের অস্থির অবস্থার সুযোগ নিয়ে অনেক সামরিক অফিসার 'জমি ও অর্থ' দখল করে নিয়েছিলেন।[৯৭]

আইয়ুব করাচী থেকে রাওয়ালপিণ্ডির কাছে ইসলামাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন এই অজুহাতে যে, করাচীতে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আমলাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে এবং ব্যবসায়ীরা আমলাদের দুর্নীতিবাজ করে তোলেন।[৯৮] তবে রাজধানী স্থানান্তরকরণের আরেকটি ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। করাচী হচ্ছে বিশাল এক বাণিজ্যিক এবং পুরনো শহব যেখানে সরকারী কর্মচারীদের থেকে অন্যান্য পেশার লোকসংখ্যা বেশি। এ শহরে কোন্ আমলার সঙ্গে কোন্ ব্যবসায়ীর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ তা কারো অজানা থাকার কথা নয়। ইসলামাবাদ, অন্যদিকে গড়ে তোলা হয়েছে আমলাদের শহর হিসেবে. ঐ শহরে এ ধরনের সম্পর্ক খুব বেশি একটা চোখে পড়ে না। এবং দেখা গেল, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি অচিরেই লিঁয়াজো অফিস স্থাপন করতে লাগল ইসলামাবাদে, উদ্দেশ্য, আমলাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখা।[৯৯]

১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান যখন পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করেছিলেন তখন ঘোষণা করেছিলেন, তিনি এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে চান যেখানে জনগণ পাবে একটি সৎ, গণতান্ত্রিক এবং কার্যক্ষম সরকার। 'নিউইয়র্ক টাইমস' মন্তব্য করেছিল, আইয়ুবের আন্তরিকতায় সন্দেহ করার কোন কারণ নেই।[১০০] তারিক আলী অভিযোগ করেছেন, এই সামরিক অভ্যুত্থানে আইয়ুবকে সহায়তা করেছিল সি আই এ।[১০১] এমনকি আইয়ুবের ভাইও এ বক্তব্য স্বীকার করেছেন।[১০২] তারিক আলীর বইতে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পাকিস্তানের একজন প্রাক্তন মন্ত্রী তারিক আলীকে ঘটনাটা বলেছিলেন। 'সামরিক আইন জারির পর মন্ত্রীসভার প্রথম সভায় নতুন প্রেসিডেন্ট বৈদেশিক নীতির কথা নাকি স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন এ বলে যে, ব্যক্তিগত ভাবে একটি দূতাবাসের ব্যাপারেই তাঁর আগ্রহ তা হল মার্কিন দূতাবাস।'[১০৩] আইয়ুব খানের সঙ্গে মার্কিনীদের মধুর সম্পর্কের কথা কলিম সিদ্দিকীও উল্লেখ করেছেন। লিখেছেন, মার্কিনীরা তাকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে পেয়ে এতই খুশি হয়েছিল যে, এক বছরের মধ্যে মার্কিন সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেল তিনগুণ। ১৯৫৮ সালে যে সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৬ কোটি ১ লক্ষ ডলার, ১৯৫৯ সালে বৃদ্ধি পেয়ে তা দাঁড়াল ১৮ কোটি ৪ লক্ষ ডলারে।[১০৪] এখানে উল্লেখ্য যে, মার্কিন অস্ত্র সাহায্য নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে (অক্টোবর ১৯৫৩) যে আলোচনা হয়েছিল তাতে পাকিস্তান পক্ষে ছিলেন আইয়ুব এবং এর আগে এ বিষয়ে দু'দেশের মধ্যে তেমন কোন আলোচনাই হয়নি।[১০৫]

সামরিক খাতে প্রচুর মার্কিন সাহায্য সত্ত্বেও জাতীয় মোট উৎপাদনের তুলনায়

প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় হ্রাস না পেয়ে বরং বৃদ্ধি পেয়েছিল। নীচের সারণি তার উদাহরণ[১০৬]

পাকিস্তান সরকার রাজস্ব ও প্রতিরক্ষা ব্যয়

বছর	রাজস্ব (লক্ষ টাকা)	প্রতিরক্ষা ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১৯৪৭-৪৮	১৯৮.৯	১৫৩.৮
১৯৪৮-৪৯	৬৬৭.৬	৪৬১.৫
১৯৪৯-৫০	৮৮৫.৪	৬২৫.৪
১৯৫০-৫১	১,২৭৩.২	৬৪৯.৯
১৯৫১-৫২	১,৪৪৮.৪	৭৭৯.১
১৯৫২-৫৩	১,৩৩৪.৩	৭৮৩.৪
১৯৫৩-৫৪	১,১১০.৫	৬৫৩.২
১৯৫৪-৫৫	১,১৭২.৭	৬৩৫.১
১৯৫৫-৫৬	১,৪৩৫.৮	৯১৭.৭
১৯৫৬-৫৭	১,৩৪১.৪	৯০০.৯
১৯৫৭-৫৮	১,৫২৫.০	৮৫৪.২
১৯৫৮-৫৯	১,৯৫৮.৭	৯৯৬.৬
১৯৫৯-৬০	১,৯৭৭.৫	১,০৪৩.৫
১৯৬০-৬১	২,১২২.৫	১,১১২.৪
১৯৬১-৬২	২,৩১৬.৯	১,১০৮.৬
১৯৬২-৬৩	২,০৪৬.০	৯৫৪.৩
১৯৬৩-৬৪	২,৮২৯.৬	১,১৫৬.৫
১৯৬৪-৬৫	৩,৩০১.০	১,২৬২.৩
১৯৬৫-৬৬	৩,৭৯৭.৯	২,৮৫৫.০
১৯৬৬-৬৭	৪,৪৭৫.২	২,২৯৩.৫
১৯৬৭-৬৮	৪,৭০৪.২	২,১৮৬.৫
১৯৬৮-৬৯	৫,৭৭৪.১	২,৪২৬.৮
১৯৬৯-৭০	৬,৬০২.৬	২,৭৪৯.২
১৯৭০-৭১	৬,৪৬১.৩	৩,২০০.০
১৯৭১-৭২	৫,৮৯৮.৬	৪,২৬০.০

ওয়েন এ উইলকক্স একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের ফলে একদশক ধরে পাকিস্তানকে সমর খাতে খরচ করতে হয়েছে খুব কম। উপরের সারণি সে কথা বলে না। একই প্রবন্ধে আবার উইলকক্স স্বীকার করেছেন যে বৈদেশিক [অর্থাৎ মার্কিন] হস্তক্ষেপ দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক বিরোধগুলিকে প্রশমিত করতে পারেনি, বরং সেগুলির ব্যাপ্তি ও কুফল বাড়িয়ে তুলেছিল।[১০৭]

'নিউইয়র্ক টাইমসে'র মতে, ১৯৫৪-১৯৬৫ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র থেকে অস্ত্র খাতে সাহায্য পেয়েছে ১.৫ বিলিয়ন ডলার।[১০৮] ১৯৭২ সালে, মার্কিন প্রশাসন পাকিস্তানকে অস্ত্র সাহায্য সংক্রান্ত যেসব তথ্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে সাহায্যের পরিমাণ টাইমসে উল্লিখিত অঙ্কের অর্ধেক।[১০৯] দুটি উৎসের এ গরমিল থেকে ধরে নেওয়া যেতে পারে, গোপনে যেসব অস্ত্র দেওয়া হয়েছে তার পরিমাণ সরকারী নথিপত্রে উল্লেখ করা হয়নি। এমস জর্ডনের দেওয়া হিসাব এ সন্দেহ আরো জোরদার করে [ড্রেপার কমিটির সদস্য থাকাকালীন এমস সরকারী হিসাব দেখেছেন]। তাঁর মতে ১৯৬০ পর্যন্ত পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র থেকে সমরখাতে ৩৯০-৪৪০ মিলিয়ন ডলার সাহায্য পেয়েছে।[১১০] পাকিস্তান বিমান বাহিনীর একটি হিসাব নিলে এ বক্তব্য আরো স্পষ্ট হবে। ১৯৬২-এর দিকে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর ৭টি B-57-এর এক স্কোয়াড্রন এবং ১২টি F-104 এর এক স্কোয়াড্রন বিমান ছিল।[১১১] এক বছরের মধ্যে পাকিস্তানের যুদ্ধ বিমানের সংখ্যা দাঁড়াল ২৫০টিতে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল দুই স্কোয়াড্রন B-57B লাইট বোম্বার, এক স্কোয়াড্রন F-104 স্টার ফাইটার এবং চার স্কোয়াড্রন F-86F স্যাবর।[১১২]

এ পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসেনাল সাবকমিটির সামনে প্রদত্ত মার্কিন সহকারী প্রতিরক্ষা সচিব কর্নেল উলফ পি গ্রসের বক্তব্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে কমিটির সামনে এক শুনানীতে তিনি বলেন, ১৯৫৪-১৯৬৫-এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে ৬৯ কোটি ৩ লক্ষ ডলারের সমরাস্ত্র এবং ৭০ কোটি ডলারের অন্যান্য সরঞ্জামাদি দিয়ে সাহায্য করেছে। গ্রস-প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী এ পরিমাণ প্রায় ১.৪ বিলিয়ন ডলার যা 'নিউইয়র্ক টাইমস'-উল্লিখিত অঙ্কের কাছাকাছি।[১১৩]

১৯৫৩ সালে প্রকাশিত পাকিস্তানের ইকোনমিক এপ্রাইসাল কমিটির মত অনুসারে [১৯৫২ সালে] রাজস্বের ৫৪ থেকে ৮৬ ভাগ সমর খাতে ব্যয় না করে বরং উন্নয়ন ও সমর খাতের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করা উচিত।[১১৪] কিন্তু তাতে

কেউ কর্ণপাত করেনি। মার্কিন অনুদান বৃদ্ধির ফলে সমর খাতের উদ্বৃত্ত ব্যয় করা হয়েছিল সেনাবাহিনী ও তাদের পরিবারের আরাম আয়েস বা ভোগ-বিলাসের জন্য।[১১৫]

মার্কিন নীতি নির্ধারকরা ঠিকই জানতেন যে, তাদের সাহায্যের ফলে পাকিস্তানে বিলাসপ্রিয় এক সামরিক এলিটের বিকাশ হচ্ছে[১১৬] যাদের জীবন যাপনের মান সাধারণ লোক থেকে অনেক উঁচুতে। শুধু এ কারণেই সেনাবাহিনীর নীচের দিকে বা সাধারণ মানুষের মনে বিক্ষোভ দেখা দেওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু আমলারা এক্ষেত্রে সুচতুর ভাবে ভারতভীতির ব্যাপারটা আতঙ্কের পর্যায়ে নিয়ে গেলেন। প্রচার মাধ্যমগুলি ছিল তাদের নিয়ন্ত্রণে ফলে এ আতঙ্ক ছড়াতে তারাও সাহায্য করেছিল। ১৯৭১ সালের পরও পাকিস্তানে গণ অসন্তোষ মাথা চাড়া দেবার পরিস্থিতি ছিল। কিন্তু সেই একই আমলারা জনমনে উপরোক্ত আতঙ্ক-জনিত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে সমর্থ হয়েছিলেন নিজেদের বাঁচাতে।

পাকিস্তান এবং যুক্তরাষ্ট্রের আমলাদের যোগাযোগের ওপর তেমন কোন গবেষণা হয়নি। তবে, এ সম্পর্ক যে ঘনিষ্ঠ ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে স্বাধীনতা-যুদ্ধ-চলাকালীন ঘটনাবলীই এর প্রমাণ। ঐ সময়, পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহে মার্কিন সরকারের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও নিয়ত পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছিল। এবং এটা সম্ভব হয়েছিল দু দেশের আমলা বিশেষ করে সামরিক আমলাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে।

১৯৫৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র-পাকিস্তান সামরিক আঁতাত চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকেই এ সম্পর্কের শুরু। লিখেছেন ফজল মুকিম খান,[১১৭] 'শিগ্রীই পাকিস্তানের অফিসাররা মার্কিন মতামতকে গুরুত্ব দিতে শিখল। এ ধরনের বোঝাপড়া হয়ে যাবার পর পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অফিসারদের সম্পর্ক মধুর হতে সময় লাগল না।...[ফলে] প্রয়োজনীয় অস্ত্র সংগ্রহের কঠোর দায়িত্ব পালনের সময় যুক্তরাষ্ট্রের অফিসাররা পাকিস্তানী অফিসারদের সমর্থন জানিয়েছে।' 'সুস্থ ও বন্ধুত্ব-পূর্ণ সম্পর্ক'[১১৮] গড়ে তোলার জন্য বন্দোবস্ত করা হয়েছিল শিক্ষা সফরের। আয়োজন করা হয়েছিল 'অরিয়েন্টেশন ট্রেনিংয়ের।'[১১৯] এর অর্থ হ্যারল্ড এ. হোভের মতে, মার্কিন সামরিক কেন্দ্রগুলি দেখানো এবং বিভিন্ন ঘাঁটিতে অবস্থানরত মার্কিন অফিসারদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন। এ প্রশিক্ষণের তত্ত্ব ছিল যে, এর মাধ্যমে ঐ দেশের (পাকিস্তানের) উঠতি নেতারা মার্কিন সামরিক সংস্থা ও জনগণ সম্পর্কে জানতে পারবে। এবং মার্কিন নীতিরও তারা সমর্থক হয়ে উঠবে।[১২০]

তারিক আলীর মতে এসব শিক্ষা সফর ছিল ঘুষ এবং এভাবে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানেব সামরিক বাহিনীর ওপর প্রভাব বিস্তার করছিল।[১২১] আমরা লক্ষ্য করি এর ফলে সামরিক আমলারা এতই শক্তিশালী হয়ে উঠছিল যে পেণ্টাগনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সময় তারা সহযোগী বেসামরিক আমলাদের উপেক্ষা করত।[১২২] এ কারণেই বোধ হয় ১৯৭১ সালে সামরিক আমলারা নিশ্চিত ছিল যুক্তরাষ্ট্র তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবেই।[১২৩] যদিও সে আশা সফল হয় নি কিন্তু শেষ সময়ে মরিয়া হয়ে পৃথিবীর একটি মহা শক্তিশালী নৌযান, পরমাণু চালিত বিমানবাহী 'এণ্টারপ্রাইজ' বঙ্গোপসাগর অভিমুখে প্রেরণ প্রমাণ করে যে, দু' দেশেব সামরিক আমলাদের বন্ধন কত ঘনিষ্ঠ ও দৃঢ় ছিল।

৩

উপরে সামগ্রিকভাবে পাকিস্তানের আমলাতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে গুরুত্ব আবোপ করা হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানী আমলাদের উপর। কাবণ, ১৯৪৭-এর সময় থেকে ষাট দশক পর্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের আমলাদেব অধিকাংশ ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানী। বাঙালী যারা সিভিল সার্ভিসে যোগ দিয়েছিলেন সে সময় তাঁরা ছিলেন নিম্ন পর্যায়েব এবং প্রদেশের কম গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত। আবো লক্ষণীয় যে, পশ্চিম পাকিস্তানী আমলাদের কথা আলোচনা করতে গিয়ে আবার সামরিক আমলাদেব কথা বেশি বলা হয়েছে। এর কারণ, শাসনতন্ত্র বাতিলের পর থেকে ষাটদশকের শেষ পর্যন্ত, সামরিক আমলারা আইয়ুব খানের নেতৃত্বে নিজেদের ক্ষমতা সুদৃঢ় ও সুসংহত করে তুলেছিলেন।

এখানে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর আমলাতন্ত্রের বিন্যাস পর্যালোচনা করার আগে সামগ্রিক ভাবে তাঁদের সম্পর্কে দু'একটি কথা বলা যেতে পারে।

মধ্য পঞ্চাশ পর্যন্ত যাঁরা [বাঙালী] সিভিল সার্ভিসে ঢুকেছিলেন [সি এস পি ও পি এস পি] তাঁদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। তাঁরা এসেছেন মোটামুটি গ্রামীণ সম্পন্ন পরিবার থেকে, পড়াশোনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। অধিকাংশই ছিলেন কৃতী ছাত্র [শুধু তাই নয়, পরবর্তীকালেও যাঁরা সিভিল সার্ভিসে এসেছেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র এবং চাকরিতে যোগ দেওয়ার আগে অধিকাংশই ছিলেন শিক্ষক]। সে সময়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আকার ছিল ছোট, ছাত্রসংখ্যাও ছিল কম। ফলে, ছাত্ররা মোটামুটি ভাবে পরস্পরকে চিনতেন। এদের অনেক সহপাঠী এবং বন্ধু পড়াশোনা শেষ করে [বা না করে]

যোগ দিয়েছিলেন রাজনীতিতে, ষাট দশকের মধ্যভাগে যাঁরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃপদে আসীন ছিলেন। সিভিল সার্ভিসে যোগ দেওয়ার কারণ ছিল, বৃটিশ আমলে সৃষ্ট সরকারী চাকুরির মোহ, উচ্চ বেতন এবং নিরাপত্তা। তা ছাড়া অন্য চাকরির সুযোগও ছিল সীমিত।

পূর্ববাংলার বিভিন্ন মহকুমা, জেলা এবং পরে ঢাকাতেই তাঁদের চাকুরি জীবন অতিবাহিত হয়েছে। তাঁদের সহপাঠী যাঁরা রাজনীতি করতেন তাঁদের সঙ্গে [মধ্যপন্থী, বামপন্থী যে দলই হোক-না কেন] এদের সম্পর্ক ছিল ভালো এবং পুরনো বন্ধুত্বতার খাতিরে পরস্পরকে তাঁরা সাহায্যও করতেন। সাধারণ মানুষের প্রতি তাদের ধারণাটা ছিল পিতৃত্বমূলক। বিভিন্ন ক্যাডারের দ্বন্দ্বও তেমন ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানী আমলাদের মনোভাব তাঁদের ক্ষুব্ধ করত সন্দেহ নেই কিন্তু তারা চাকুরি নিয়েছিলেন নিছক সরকারী চাকুরি করার জন্য, ফলে ক্ষুব্ধ হলেও চাকুরির খাতিরে চুপচাপই থাকতেন। সরকারী ম্যানুয়েলই ছিল তাঁদের কাছে বেদবাক্য।

মন্ত্রীদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছিল সৌহার্দ্যের। পরস্পরকে তারা হয়তো চিনতেন বা জানতেন। এ ছাড়া ঐ সময় যাঁরা মন্ত্রী হয়েছিলেন তাঁদের একটি রাজনৈতিক পটভূমিকাও ছিল। গ্রামের সঙ্গে আমলাদের সম্পর্ক তখনও ছিল অটুট। তাই গ্রাম পর্যায়ের লোকজনকে তাঁরা বোঝার চেষ্টা করতেন, মন্ত্রীদেরও। প্রধানতঃ বৃটিশ রীতি-নীতিতে শিক্ষিত হওয়ায় পার্লামেণ্ট সম্পর্কে এক ধরনের মোহও হয়তো তাঁদের ছিল।

মধ্য পঞ্চাশ থেকে ষাট দশকের গোড়ার দিক পর্যন্ত যাঁরা আমলা হয়েছেন পূর্ববাংলা থেকে তারা প্রধানত এসেছেন অপেক্ষাকৃত কম সচ্ছল পরিবার থেকে। এদের মধ্যে অনেকেই আবার ছিলেন নিজের পরিবারের প্রথম শিক্ষিত পুরুষ।

ঐ সময়, আগেই বলেছি, সামগ্রিক ভাবে পাকিস্তানে আমলারা নিজেদের ক্ষমতা করে তুলেছিলেন সুদৃঢ় ও সুসংহত। একজন সিভিল সার্ভেণ্টের [প্রধানতঃ সি এস পি] অবস্থান তখন দেবদূতের মতো। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী তাঁর একটি আত্মজৈবনিক প্রবন্ধে ঐ সময়ে নিজের এবং বন্ধুদের সম্পর্কে লিখেছেন [আমার পিতার মুখ, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৯৫]—'তিনি জানতেন, আমি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবো। আমার মাও তাই জানতেন। আত্মীয় স্বজন সবাই জানতো। গোটা পরিবেশ জানতো। আমরা সবাই তখন ভেতরে ভেতরে আমলা। সরকারী চাকরির বাইরে কি আছে, কি থাকতে পারে আমাদের জানা ছিল না। পিতারা জানতেন না। ছেলেরাও জানতো না। আমার বন্ধুদের ভেতর কেউ কেউ ডাক্তার হয়েছে, কেউ বড় ইঞ্জিনিয়ার, কিন্তু সকলেই আমলা আসলে—ভেতরে ভেতরে।'

আসলে, সিভিল সার্ভিস পাওয়া মানে ছিল, আলাদা একটি দলভুক্ত হওয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় প্রতিটি ছেলেরই স্বপ্ন ছিল তখন সে দলে যোগ দেওয়া। কারণ, সি এস পি [বা সিভিল সার্ভেণ্ট] মানেই ক্ষমতা, অর্থ, সব— যাকে বলে, 'ক্রীম অফ দি ক্রীমস'। এদের অনেকে আবার বিত্তবান কিন্তু সামাজিক প্রতিপত্তি-হীন পরিবারে বিয়ে করে পড়াশোনা করেছেন ঐ লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য। স্বাভাবিক ভাবে তাঁরা ছিলেন পূর্ব-পাক্ষিক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়তন ততদিনে বেড়েছে। ছাত্রদের মধ্যে পূর্বেকার ঘনিষ্ঠ বন্ধনও ছিন্ন হয়েছে অনেকখানি। এ সময় সিভিল সার্ভিসে বাঙালীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে যদিও পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় তা ছিল নগণ্য। চাকুরিতে যোগ দিয়ে তাঁরা [বাঙালী আমলা] দেখেছেন আমলাতন্ত্রের ক্ষমতার সংহত-করণ ও দৃঢ়করণ হয়েছে। সিভিল সার্ভিস অ্যাকাডেমীতে প্রশিক্ষণের মূল কথা ছিল— তোমরা শাসক। এ পটভূমিকায় রাজনীতিবিদদের প্রতি [মন্ত্রী] তাঁদের তেমন শ্রদ্ধাবোধও ছিল না। এর অন্যদিকটিও বিবেচ্য। যাঁরা মন্ত্রী হতেন তখন তাঁদের অধিকাংশ ছিলেন আমলাদের হাতে তোলা [যেমন মোনেমখান]। দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামেব ঐতিহ্য তাঁদের ছিল না। সাধারণ মানুষও তাঁদের ঐ চোখে দেখতেন। এবং আমলাদের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ হওয়ায় তাঁরা জানতেন এ সব রাজনীতিবিদবা তাঁদের ওপর নির্ভরশীল। অন্যদিকে রাজনীতিবিদরাও তাঁদের কাছ থেকে তেমন কিছু [পৃষ্ঠপোষকতার অংশ] পেতেন না। ফলে, রাজনীতি-বিদদের সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক হয়ে পডল ক্ষীণ। সাধারণ মানুষ তাঁদের বিচারে ছিল অজ্ঞ, মূর্খ এবং ধান্দাবাজ। তাদের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল এক ধরনের ঔদ্ধত্যের। নিজের আর্থিক উন্নতির জন্য ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বরং তাদের গড়ে উঠেছিল এক ধরনের আঁতাত। এর কারণ, সেই সামাজিক পটভূমি ও হীনমন্যতা বোধ। অন্যদিকে, সামগ্রিক ভাবে পাকিস্তানের কাঠামোয় তাঁদের সংখ্যা খানিকটা বৃদ্ধি পেলেও পশ্চিমা আমলাদের তুলনায় তাদের স্থান ছিল অধস্তন। যারা সিনিয়র ছিলেন বা নিযুক্ত ছিলেন কেন্দ্রে, তাঁদের পদও তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। সন্তুষ্ট রাখতে চাইতেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা পশ্চিমা আমলাদের। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে।

ক-এর বন্ধু খ ছিলেন একজন অবাঙালী আমলা, উত্তর প্রদেশ থেকে যিনি চলে এসেছিলেন পাকিস্তানে। ক বাঙালী, কিন্তু একসঙ্গে পড়াশোনা করায় তাঁদের সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। ষাটের মধ্যভাগে খ নিযুক্ত হয়েছেন কেন্দ্রে। ক একবার

সেখানে গেলে দেখা করলেন তাঁর সঙ্গে অফিসে। ক যখন ঢুকছেন তাঁর অফিসে তখন দেখলেন গ বেরিয়ে আসছেন খ-এর অফিস থেকে। গ তরুণ একজন বাঙালী আমলা, যোগ দিতে এসেছেন কেন্দ্রে। ক-এর সঙ্গে গ-এর মোটামুটি চেনাজানা ছিল। গ বেরিয়ে গেলে খ বললেন ক-কে— 'চেনো তো ওকে, যোগ দিয়েছে আমার বিভাগে। কিন্তু ক, তোমাকে একটি কথা বলে রাখি, তোমাদের দেশ থেকে এ ধরনের লোক যদি সি এস পি হয় তা'হলে তোমাদের কপালে দুর্ভোগ আছে।' গ পরবর্তী জীবনে বাংলাদেশে উচ্চপদে আসীন হয়েছিলেন এবং এক সামরিক আমলে মন্ত্রীও নিযুক্ত হয়েছিলেন। এ ঘটনা উল্লেখ করলাম, এ কারণে যে, প্রয়োজনে বাঙালীদের হেয় করেও তাঁরা নিজ চাকুরিগত এবং অন্যান্য স্বার্থে সন্তুষ্ট রাখতে চাইতেন পশ্চিমা আমলাদের। কারণ, বাংলাদেশের স্বপ্ন তখনও অঙ্কুরিত হয়নি, একজন সিভিল সার্ভেণ্ট জানতেন যে তিনি হলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদার।

প্রদেশে বাঙালী আমলা যাঁরা নিযুক্ত ছিলেন তাঁদের সঙ্গে বাঙালী সামরিক আমলাদের তখনও কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়নি যেটি হয়েছে এবং হচ্ছে বর্তমান বাংলাদেশে। কারণ, বাঙালী সামরিক আমলাদের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য এবং খুব সম্ভবত তাঁদের কারো পদ ছিল না লেঃ কর্নেলের ওপর। ফলে প্রাদেশিক ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানে অসামরিক আমলারাই ছিলেন সামরিক আমলাদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী।

ষাটের মাঝামাঝি থেকে সত্তর দশক পর্যন্ত বাঙালীরা যাঁরা এসেছেন সিভিল সার্ভিসে তাঁরা ছিলেন দু'পুরুষের শিক্ষিত। তাঁদের সময়, মধ্যবিত্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, শিক্ষিতের হারও। মধ্যবিত্ত পরিবার থেকেই এসেছেন তাঁরা। ঐ সময় রাজনৈতিক অসন্তোষ দানা বাঁধছে, ছাত্র আন্দোলন হয়ে উঠছে জোরদার। যদিও এদের অনেকে যোগ দেননি আন্দোলনে কিন্তু এইসব আন্দোলনের অভিঘাত খানিকটা পড়েছিল তাঁদের ওপর। 'সি এস পি' হওয়ার মোহে তাঁরা যোগ দিয়েছিলেন সিভিল সার্ভিসে এবং 'সি এস পি' হওয়ার পর অনেকের মোহও ভেঙেছে। দেশ সম্পর্কেও তাঁরা খানিকটা চিন্তা-ভাবনা করেছেন। এক ধরনের অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগতেন তাঁরা।

এ সময় বাঙালী আমলার সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ পদ অবশ্য তাঁরা তখনও কেউ পাননি কিন্তু একটি বাঙালী গ্রুপ হিসেবে তাঁরা তখন আর তেমন শক্তিহীন ছিলেন না। আইয়ুবী শাসনের শেষ দিকে পশ্চিমা

আমলাদের নিয়ন্ত্রণও খানিকটা শিথিল হয়েছিল। তবে, পূর্বসূরীদের মতো তাঁদের সঙ্গেও রাজনীতিবিদ বা সাধারণ মানুষের তেমন সম্পর্ক ছিল না।

সামগ্রিকভাবে, স্বাধীনতা যুদ্ধের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে বাঙালী বেসামরিক আমলারা শক্তিশালী ছিলেন বাঙালী সামরিক আমলা থেকে। পশ্চিম পাকিস্তানী আমলাদের অধস্তনতা কাটিয়ে মোটামুটি তাঁরা তাদের সমানে সমানে চলে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁদেব নিরঙ্কুশ ক্ষমতা, অহংবোধ তাঁদের বিচ্ছিন্ন করে তুলেছিল সাধারণ মানুষ, রাজনীতিবিদদের থেকে। বিশেষ করে এ সময় তাঁদের মুখোমুখি হতে হয়েছিল বিভিন্ন গণ আন্দোলনের, দমন-নিপীডনও করতে হয়েছিল। সুতরাং তাঁদেব তখন পাকিস্তানী আমলাতন্ত্রের অংশ হিসেবেই সবাই বিবেচনা কবতেন।

স্বাধীনতার পর, সাধারণ মানুষ অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি আমলাতন্ত্রের ক্ষেত্রেও ভেবেছিলেন, এবার বুঝি পরিবর্তন আসবে। স্বাধীনতা যুদ্ধে আমলাদের একাংশ অংশগ্রহণ কবেছিলেন সক্রিয়ভাবে, যাঁরা দেশে ছিলেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা নিষ্ক্রিয় ছিলেন; কেউ কেউ ঝুঁকি নিয়ে আবার সাহায্যও করেছেন মুক্তি যোদ্ধাদের। তাই ভাবা হয়েছিল দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে পরিবর্তন হবে যাঁদের। এবং দারিদ্র্য মোচনে ও দেশের উন্নয়নে তারাও সবার সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে এগোবেন। দেশে আর সামরিক শাসন হবে না কারণ দু'ধরনের আমলারাই মুক্তিযুদ্ধ দেখেছেন এবং গত দুদশকে পশ্চিমা আমলাদের দ্বারা 'অপমানিত' হয়েছেন। কিন্তু, কিছু-দিনের মধ্যেই এইসব স্বপ্ন গুঁড়িয়ে গেল।

পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে রাজনীতিবিদরা (শাসক) সচেতন ছিলেন আমলাদের শক্তি সম্পর্কে। তাই, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই চেষ্টা করা হয়েছে আমলাদের নিয়ন্ত্রণে রাখার— যার জন্য চাকুরির নিরাপত্তাও খানিকটা ক্ষুণ্ন করা হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে, ১৯৭২-৮০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিস নিয়ে বেশ-কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে বা চেষ্টা করা হয়েছে আমলাতন্ত্র পুনর্বিন্যাসের। কিন্তু নীচের বিশ্লেষণে দেখা যাবে পুনর্বিন্যাস 'এলিটিজম'-এর বদলে তৈরী কবেছে 'সুপার এলিটিজম'; উচ্চপর্যায়ের বিভিন্ন চাকরির মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে অস্বস্তিকর সমঝোতার। সবাই আগ্রহী সচিবালয়ে উচ্চপদে পৌঁছাতে এবং নিজেদের সুযোগসুবিধা বৃদ্ধিতে। ফলে, মনে হয় না, এ পুনর্বিন্যাস দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করবে। বরং সমঝোতার অস্বস্তিকর দিকটি অসম্পূর্ণ করে তুলেছে পুনর্বিন্যাসকে যার উদ্বোধক ছিলেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। [সেপ্টেম্বর, ১৯৮০]। পরবর্তী বছরগুলিতে, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের

কাঠামোর বিভিন্ন বিভাগ ও উপবিভাগে অধিকতর সুযোগসুবিধা ও মর্যাদা বৃদ্ধির প্রশ্নে দেখা দিয়েছে ক্ষোভ।

বাংলাদেশের সংস্থাপন মন্ত্রী অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল মাজেদুল হক ঘোষণা [১৯৮০] করেছিলেন, আমলাতন্ত্রের পুনর্বিন্যাসের উদ্দেশ্য হচ্ছে এলিটিজম এর বদলে সমতা প্রতিষ্ঠা করা।[১২৪] প্রচ্ছন্নভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছিল এই এলিটিজমের সুবিধাভোগীরা হচ্ছেন প্রাক্তন পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের [সি এস পি] সদস্যরা।[১২৫] এর প্রধান সমর্থক ছিলেন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের অ-সি এস পি সদস্যরা। যখনই প্রাক্তন কোন প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ পরিবর্তিত হয় কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষে, বিশেষ করে স্বাধীনতার পর, তখন প্রাক্তন প্রাদেশিক সার্ভিসের সদস্যরা বিক্ষোভ শুরু করেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সার্ভিস একত্রীকরণের উদ্দেশ্যে। তাঁরা যে বক্তব্যটি সবসময় পেশ করেন তা হল, কেন্দ্রীয় চাকুরের মতো তাঁদেরও একই কাজ করতে হয়। তা হলে কেন এই এলিটিজম? সুতরাং এর বিলুপ্তিকরণ প্রয়োজন—যার অর্থ তাদের উন্নতির পথ সুগম করা। কিন্তু সবাই এ কথা তখন ভুলে যান যে, নিজ নিজ ইচ্ছায় প্রতি-যোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁরা নিজ নিজ চাকুরি বেছে নিয়েছিলেন।

উদাহরণস্বরূপ বার্মার কথা বলা যেতে পারে। ১৯৩৭ সালে বার্মা যখন ব্রিটিশ-ভারত থেকে আলাদা হয়ে গেল তখন এর এলিট সার্ভিস ছিল বার্মা সিভিল সার্ভিস ক্লাস ওয়ান [আই সি এসের সমতুল্য]। ১৯৪৮ সালে বার্মা স্বাধীন হলে এই সার্ভিস বিলুপ্ত করে একত্রিত করা হয় একে বার্মা সিভিল সার্ভিস ক্লাস টু-এর সঙ্গে [অর্থাৎ প্রাক্ ১৯৩৭ প্রাদেশিক সার্ভিস]।[১২৬] নতুন একীভূত সার্ভিসের নামকরণ করা হয় বার্মা সিভিল সার্ভিস। এই একত্রীকরণে ছিল না বিভিন্ন সিভিল সার্ভিসের সমন্বয় সাধন। ফলে, বার্মা সিভিল সার্ভিসে অন্যান্য অসামরিক চাকুরি থেকে উন্নতির সুযোগ ছিল বেশি।[১২৭] এক অর্থে, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস-এর সঙ্গে এটা তুলনীয় নয় কারণ বাংলাদেশে সমন্বিত করা হয়েছে সব সিভিল সার্ভিসকে। বাংলাদেশে দেখা যায় যে, অন্যান্য সার্ভিসসমূহ, বিশেষ করে বিশেষজ্ঞ সার্ভিসের দর কষাকষির শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের ভাষায়, এভাবে সম্ভব হয়েছে সি এস পি দের বিশেষ সুযোগ সুবিধার বিলুপ্তিকরণ।[১২৮]

১৯৫৪ সালে সি এস পি বিষয়ক যেসব নিয়মকানুন তৈরি করা হয়েছিল তার ভিত্তি ছিল ১৯৩৫ সালের গভর্নমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট-এর এক এবং দুই উপধারা। পাকিস্তানের পরবর্তী শাসনতন্ত্র সমূহ ঐসব নিয়মকানুনই অনুমোদন

করেছিল যার ফলে সচিবালয়ের উপসচিব পর্যায় থেকে সচিব পর্যায় পর্যন্ত উঁচু পদ গুলির দুই-তৃতীয়াংশই ছিল সি এস পি-র জন্য সংরক্ষিত। বাংলাদেশে সমন্বিত সিভিল সার্ভিস এবং সিনিয়র পলিসি পুলের প্রবর্তন [এস পি পি] এই সংরক্ষণ প্রথা বিলুপ্ত করেছে। উপ যুগ্ম অতিরিক্ত সচিব এবং সচিব পর্যায়ের পদগুলি অন্তর্ভুক্ত এস পি পির। এতে অবশ্যই সচিবালয়ে সৃষ্টি হয়েছে 'open structure system'-এর।[১২৯] বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের ১৪টি শাখার যে-কেউ সদস্য হতে পারবেন এই পুলের তবে তাঁর বয়স হতে হবে ৪৫-এর কম, প্রথম শ্রেণীর চাকুরিতে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে কমপক্ষে দশবছরের, পাস করতে হবে প্রমোশন সংক্রান্ত পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা।[১৩০]

সচিবালয়ে এলিটিজমের ওপর এস পি পি-এর অভিঘাত পর্যালোচনা করার আগে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা মনে রাখা দরকার। সি এস পি-দের বিরুদ্ধে [সংরক্ষণ প্রথার পরিপ্রেক্ষিতে] এলিটিজমের অভিযোগ আছে সত্যি, কিন্তু সি এস পি-দের সংখ্যা কখনই এত বেশি ছিল না যাতে তাঁদের জন্য সংরক্ষিত সব আসন পূরণ হতে পারে। সব সময়ই কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সার্ভিসের অ-সি এস পি সদস্যরা পূরণ করেছেন সচিবালয়ের পঞ্চাশ ভাগ এবং সচিবালয় ও বাইরের সি এস পি ক্যাডার পদের এক-তৃতীয়াংশ।[১৩১] এ ছাড়া বিশেষজ্ঞ / টেকনোক্র্যাট যারা সি এস পি বা কেন্দ্রীয় / প্রাদেশিক কোন সার্ভিসের সদস্য নন তারাও সচিবালয়ের যে-কোন পদে যেতে পারতেন। এস পি পির প্রবর্তন সচিবালয়ের উচ্চপর্যায়ের পদে বাইরের প্রতিভাবান কর্মদক্ষ লোকদের পার্শ্বিক প্রবেশ রুদ্ধ করে দিয়েছে [আইন মন্ত্রণালয়ের পঞ্চাশভাগ পদ এর ব্যতিক্রম]।[১৩২] সুতরাং যে বলা হয়ে থাকে, সমন্বিত সিভিল সার্ভিস বা বি সি এস এবং এস পি পি পুরনো এলিটিজমের মূলে কুঠারাঘাত করেছে তা বোধহয় ঠিক নয়। বরং বলা যেতে পারে, বাংলাদেশে উচ্চপর্যায়ের সিভিল সার্ভিসের পুনর্বিন্যাস এলিটিজম-এর বদলে সৃষ্টি করেছে সুপার এলিটিজমের।

বর্তমানে, সচিবালয়ের যে-কোন উচ্চপদে যে-কোন ক্যাডার থেকে যে-কেউ সহজেই উঠে আসতে পারেন। কিন্তু এও স্বীকার্য যে আগে সিভিল সার্ভিসের বাইরে থেকে বিশেষজ্ঞ / টেকনোক্র্যাটদের পক্ষে সচিবালয়ের যেসব উচ্চ পদে আসা সহজ ছিল এখন আর ততটা সহজ নয়।[১৩৩] এ কথা বলার উদ্দেশ্য এ নয় যে, পুনর্বিন্যাস এড়িয়ে যাওয়া উচিত ছিল। এখানে শুধু এলিটিজম এবং সমতার বিতর্কে কয়েকটি দিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হল মাত্র। এ ক্ষেত্রে ১৯৫০

সালে প্রবর্তিত পাকিস্তান ফিনান্স অ্যাণ্ড কমার্স পুলের কথা বলা যেতে পাবে যা ছিল স্থপার এলিটিজম।[১৩৪] ১৯৫৯ সালে এটি পুনর্গঠন করে নাম দেওয়া হয়েছিল ফিনান্স পুল।[১৩৫] এ পুলে অন্তর্ভুক্তির জন্য কোন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিতে হত না। পরে বিলুপ্ত করা হয়েছিল এ পুল যার বিলুপ্তির কারণ প্রকাশ্যে কখনও বলা হয় নি। হতে পারে এ পুলের স্ব-নিযুক্ত, স্থপার এলিটদের চরম অহংবোধ প্রশাসনিক মান ক্ষয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[১৩৬] বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে মৌলিক অধিকার-বিষয়ক অধ্যায়ে লেখা আছে প্রজাতন্ত্রে যে-কোন চাকুরিতে সকল নাগরিকের অধিকার সমান ('all citizens in respect of employment or office in the service of the republic.')।[১৩৭] ১৯৫৬ ও ১৯৬২ সালের পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে এ অধিকার দেওয়া হয়নি। যুক্তির খাতিরে বলা যেতে পারে এস পি পি গঠন বাংলাদেশের নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের ওপর আঘাত বিশেষ। এবং এ দৃষ্টিকোণ থেকে নতুন বিন্যাস পুবনো বিন্যাস থেকে কম গণতান্ত্রিক।

আসলে গণতন্ত্রায়নের জন্য পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে সিভিল সার্ভিস— এ দৃষ্টিকোণ আমাদেব খুব একটা সাহায্য করে না। বরং দীর্ঘদিন ধরে স্থযোগস্থবিধা লাভের জন্য অন্তঃ এবং আন্তঃ ক্যাডার প্রতিদ্বন্দ্বিতাই এর মূল কারণ। যেমন, বর্তমান নতুন চাকুরি ব্যবস্থায় একটি বৈশিষ্ট্য প্রাক্তন প্রাদেশিক সার্ভিসের সঙ্গে প্রাক্তন সি এস পি-দের একত্রীকরণ। আরো পিছন ফিরে তাকালে দেখা যাবে, প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসে এ ধরনের দ্বন্দ্বে নিম্নস্থ ক্যাডার জিতেছিল। ১৯৫৮ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে ইস্ট পাকিস্তান জুনিয়ার সিভিল সার্ভিসকে একত্রিত করা হয়েছিল ইস্ট পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস (একজিকিউটিভ) ক্লাস ওয়ানের সঙ্গে।[১৩৮] ১৯৭২ সালে সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) পদটি যা ছিল জাতীয় বেতন স্কেলের ষষ্ঠ পর্যায়ে, তা বিলুপ্ত করে ইপি সি এস (একজিকিউটিভ) ক্লাস ওয়ান এর অংশ হিসেবে নিয়ে আসা হয়েছিল জাতীয় বেতন স্কেলের পঞ্চম পর্যায়ে।[১৩৯] ১৯৮০ সালে বি সি এস-এর প্রবর্তনের আগে, ১৯৭৯ সালে এস পি পি গঠনের সময়, সিভিল সার্ভিস গণতন্ত্রায়নের প্রচেষ্টা ঘোষিত হয়েছিল বটে, কিন্তু যেটা প্রকট হল, সেটা এই যে প্রাক্তন ই পি সি এস ও সি এস পি-দের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কত তীব্র ছিল। সরকারী ভাষায়—'of the erstwhile regularly constituted services on the basis of selection in such manner as they deem fit'[১৪০]—মাত্র একবার এস পি পি-তে আসার স্থযোগ পাবেন। এবং এ

জন্য সরকার বয়স, চাকুরি সীমা, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা, এসব নিয়ম খারিজ করে দিয়েছিলেন। উপ-রাষ্ট্রপতি, সংস্থাপন এবং পরিকল্পনা মন্ত্রী সমন্বয়ে গঠিত কমিটি ১৯৭৯-৮০ সালে এস পি পি-তে যুগ্ম সচিব এবং এর ওপরের পর্যায়ের জন্য যে কুড়ি জনকে মনোনীত করেছিলেন তাতে প্রাক্তন ই পি সি এস ছিলেন ন'জন, সি এস পি একজনও নন। এতেই আন্ত সার্ভিস প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কাদের শক্তি ঐ মুহূর্তে উঠতির দিকে তার চিহ্নগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১৯৭১ সালে, মুজিব নগরে বাংলাদেশ সরকার স্থাপন করেছিলেন সদর দফতর। বাংলাদেশের কিছু আমলা যোগ দিয়েছিলেন প্রবাসী সরকারে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর স্বাভাবিক ভাবে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সুযোগ তাঁরা পেয়েছিলেন।[১৪১] অনেকে দ্রুত প্রমোশন পেয়ে এমন পর্যায়ে উঠে গেলেন স্বাভাবিক চাকরি-বিধি অনুযায়ী যা সম্ভব ছিল না। পাকিস্তানে আটকে পড়া সিনিয়র বাঙালী আমলারা [এবং দেশেরও] যখন ফিরলেন, তখন মুজিব নগরের আমলাদের আধিপত্যে তাঁরা খানিকটা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। এ ছাড়া আরেকটি কারণ ছিল। এ রকম একটি ইঙ্গিত করা হত যে, মুজিব নগরে যাঁরা ছিলেন তাঁরাই দেশপ্রেমিক, বাকিরা 'কোলাবরেটর'।[১৪২] তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধা ও কোলাবরেটররা করতে লাগলেন পরস্পরকে দোষারোপ[১৪৩]— সব সময় যে সঠিক ভাবে তা নয়।[১৪৪] কিছু অফিসার দেশে ছিলেন বা আটকে পড়েছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে। তাঁদের অনেকের বিরুদ্ধে পাকিস্তান বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতার অভিযোগ এনে তদন্ত করা হয়েছিল, সাসপেনশানে ছিলেন কেউ কেউ, পোস্টিং পেতেও দেরী হচ্ছিল। এসব কারণে তাঁরা হয়েছিলেন ক্ষুব্ধ, অপমানিতও বোধ করছিলেন।[১৪৫] সহযোগিতা বা 'কোলাবরেশনের' অভিযোগে বাংলাদেশ সরকার বেশ-কিছু কর্মচারীকে চাকুরিচ্যুত করেছিলেন যার মধ্যে ছিলেন ন'জন সি এস পিও। ১৯৭৫ সালে মুজিব-হত্যার পর সেই ন'জন এবং আরো অনেকে চাকুরি ফিরে পেয়েছিলেন। অন্যদিকে, মুজিবের কৃপাধন্য কিছু অফিসারকে করা হল চাকুরিচ্যুত বা ঘটল পদাবনতি। সিভিল সার্ভিসে দলাদলি তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠলো।[১৪৬]

শেখ মুজিবর রহমানের আমলেই এই দলাদলি তীব্র হয়ে উঠেছিল তাঁর ভগ্নীপতি প্রাক্তন এক ই পি সি এস অফিসারের জন্য। শেখ মুজিবরের কারণে অনেককে টপকে তিনি হয়েছিলেন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব। সরকারের সব অফিসারের নিয়ুক্তি তাঁর প্রভাবেই হত এবং স্বাভাবিক ভাবেই

তিনি প্রাক্তন সি এস পি-দের দাবি অগ্রাহ্য করে[১৪৭] প্রাক্তন ই পি সি এস-দের স্বার্থ দেখতেন। তাঁর অন্যায্য পদোন্নতি, প্রভাব-প্রতিপত্তি আমলাদের একাংশ বিশেষ করে সি এস পি-দের ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। দলাদলি আরো তুঙ্গে উঠল যখন মুজিব সরকার সিদ্ধান্ত নিলেন, বিশেষ পরীক্ষার মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের উচ্চ-পর্যায়ের সিভিল সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।[১৪৮] অন্য দিকে, ১৯৭০ সালে প্রতি-যোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে পাকিস্তানের কাঠামোয় যাঁরা সিভিল সার্ভিস পেয়ে-ছিলেন [১৯৭১ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাঁদের মৌখিক পরীক্ষা] তাঁদের নিযুক্তি কয়েক বছর ধরে আটকে রাখা হল।[১৪৯] সরকার ঘোষণা করলেন, যেহেতু মুক্তি-যুদ্ধ চলাকালীন তাঁদের মৌখিক পরীক্ষা নেয়া হয়েছে সেহেতু তা বাতিল ; তাঁদের নতুন ভাবে মৌখিক পরীক্ষা দিতে হবে। পাবলিক সার্ভিস কমিশন অবশ্য এতে আপত্তি করেছিল।[১৫০] মুক্তিযোদ্ধাদের সিভিল সার্ভিসে অন্তর্ভুক্তি আবার পুরনো সব আমলাদের সন্তুষ্ট করেনি। তাছাড়া অভিযোগ উঠেছিল অনেকে মিথ্যা সার্টিফিকেট পেশ করে মুক্তিযোদ্ধা হয়েছেন।[১৫১] অবশ্য এই অভিযোগ সর্বাংশে সত্য ছিল এমন বলা যায় না। কিন্তু সত্তরের গোড়ার দিককার অস্থির সময়ে এ ধরনের অভিযোগ [গুজব] অনেকেই অবিশ্বাস করেননি। এ কারণেও, দলাদলি বৃদ্ধি পাচ্ছিল, বিশেষ করে নতুন যাঁরা চাকুরিতে নিযুক্তি পাচ্ছিলেন তাঁদের মনে সৃষ্টি হয়েছিল বিরূপ প্রতিক্রিয়ার।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বি সি এস এবং এস পি পি জেনারিলিস্ট এবং বিশেষজ্ঞ / টেকনোক্র্যাটদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছিল। বি সি এস (প্রশাসন) ক্যাডারের মতে, বি সি এস ও এস পি পি বিশেষজ্ঞদের [ডাক্তার, প্রকৌশলী] বিজয় তুলে ধরছে। বি সি এস (প্রশাসন) ক্যাডারের সব উঁচু পদগুলি সচিবালয়ে। বিশেষজ্ঞদের [যেমন বি সি এস (কৃষি), বি সি এস (প্রকৌশল)] সব উঁচু পদগুলি সচিবালয়ের বাইরে। প্রশাসন ক্যাডারের কেউ বিশেষজ্ঞদের উঁচু পদে যেতে পারবেন না কিন্তু বিশেষজ্ঞ ক্যাডারের যে-কেউ সচিবালয়ের উঁচু পদে আসতে পারবেন। শুধু সচিবালয়ের শতকরা দশভাগ উপসচিবের পদ সংরক্ষিত থাকবে প্রশাসন ক্যাডারের উপক্যাডার সচিবালয় [উপক্যাডার]-এর জন্য।[১৫২] বি সি এস (প্রশাসন) ক্যাডারের প্রমোশন হবে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে এবং সরাসরি কারো পক্ষে উঁচু পদে যাওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু কৃষি বা প্রকৌশল ক্যাডারের অফিসারদের পক্ষে সরাসরি উঁচুপদে যাওয়া সম্ভব।

স্বাভাবিক ভাবে জেনারিলিস্টদের পক্ষে এ অবস্থা মেনে নেওয়া কঠিন। তার

ওপর ঐ সময় [১৯৭৮] প্রবর্তিত নতুন জাতীয় বেতন স্কেলে দেখা গেল টেকনোক্র্যাটদের তুলনায় জেনারিলিস্টদের নীচে নামিয়ে আনা হয়েছে। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। প্রশাসনের ইতিহাসে. জেনারিলিস্টদের ঐতিহ্যবাহী অন্যতম সেরা পদ হচ্ছে ডেপুটি কমিশনারের (ডি সি)। তার বেতন নির্ধারণ করা হল ১৪০০-২২২৫ টাকা, অন্যদিকে সুপারিনটেনডিং ইঞ্জিনিয়ারের করা হল ২১০০-২৬০০ টাকা।[১৫৩] এ পদক্ষেপ আহত করেছিল জেনারিলিস্টদের। জেনারেল জিয়াউর রহমান তাঁদের মধ্যে আরো হতাশার সৃষ্টি করলেন ১৯৭৮ সালে এ ঘোষণা করে যে, শতকরা পঁচাত্তর ভাগ ডি সির পদ সরকার পূরণ করবেন প্রাক্তন সি এস পি / ই পি সি এস নন এমন ব্যক্তিদের মাঝ থেকে। প্রাক্তন ই পি সি এস-দের চাপের মুখে পরে তা শতকরা পঞ্চাশভাগে হ্রাস করা হয়। ঐ সময় গুজব রটেছিল সরকার সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত অফিসারদের ডি সি হিসেবে নিযুক্ত করবেন। গুজবটি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছিল এ কারণে যে, ১৯৭৬-৮০ সালের মধ্যে তেইশ জন সেনা অফিসারকে সরাসরি পুলিশ সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত করে এস পি [সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ] হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল। এ নিযুক্তিতে পুলিশ সার্ভিসে তো বটেই, জেনারিলিস্টদের মনেও দারুণ হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। কারণ, বোঝা যাচ্ছিল, মুজিব-হত্যার পর সামরিক আমলারা প্রাধান্য বিস্তার করতে চাচ্ছেন [সামরিক আইনের সুযোগ] এবং অপেক্ষাকৃত নিম্নপদের সামরিক আমলাদের ঔদ্ধত্য [যা তাদের খানিকটা সহ্য করতে হয়েছে বিভিন্ন সামরিক শাসনামলে] তারা সহ্য করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। [এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ক একজন মেজর এবং খ চাকুরি করেন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে। তাঁরা দু'জনে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ক একদিন এসে জানালেন খ-কে যে তিনি একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার ডিরেক্টর পদে নিযুক্তি পেয়েছেন। এ ধরনের পদে যেতে সাধারণত বেসামরিক একজন আমলার কুড়ি-পঁচিশ বছর লাগে। খ বললেন, 'তুমি একজন মেজর, যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে তোমার কাজ, ঐ সংস্থায় গিয়ে তুমি কী বুঝবে?' আলোচনা উত্তপ্ত হয়ে উঠলে খ বলেই ফেললেন, 'একজন সামান্য মেজর কিভাবে এ পদ পেতে পারে?' ক বললেন, 'কেন পারে না। আমরা তো তোমাদের মতো ইনএফিসিয়েন্ট নই, তা ছাড়া জেনারিলিস্ট লাইনে এমন বোঝার কী আছে? আর সেনাবাহিনীতে আছি বলে কি আমি সিভিলিয়ান পদে মাঝে মাঝে যেতে পারব না এ কেমন কথা?' খ বললেন, 'তা'হলে আমি কেন সেনাবাহিনীর একজনে কর্নেলের পদ পাব না?'

ক বললেন, 'সেটা কিভাবে সম্ভব ? সেটা বিশেষ কাজ, সেখানে সিভিলিয়ান কি করবে ?' খ বললেন, 'তোমার যুক্তি অনুযায়ী সম্ভব। একজন মেজর যদি সিভিলিয়ান লাইনের যাবতীয় বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হতে পারেন এবং সামান্য অভিজ্ঞতা নিয়ে সংস্থার পরিচালক হতে পারেন তা হলে আমি কেন একজন জেনারিলিস্ট হয়ে কর্নেল হতে পারব না ? ঐ কাজ করা এমন কঠিন কিছু তো নয়।' এ কথার উত্তর অবশ্য ক আর দেননি]।

এক সার্ভিসকে ইচ্ছাকৃত ভাবে অন্য সার্ভিসের ওপর প্রাধান্য দিয়ে বিভেদ সৃষ্টি করা, সামরিক আমলাদের বেসামরিক প্রশাসনে সরাসরি নিয়োগ, জেনারিলিস্টদের মধ্যে সৃষ্টি করেছিল ক্ষোভ ও হতাশার। নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়েছিল মাঠ পর্যায়ের কাজে। নীচে, এর একটি উদাহরণ হিসেবে মাঠ পর্যায়ের ডি সি এবং এস পির সম্পর্কের কথা উল্লেখ করা যেতে পাবে।

১৯৬০ পর্যন্ত এস পির ওপর ডি সির নিয়ন্ত্রণ ছিল। ডি সি, এস পির সামগ্রিক কর্মক্ষমতা ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্কের ওপর বাৎসরিক একটি গোপন প্রতিবেদন পাঠাতেন বিভাগীয় কমিশনারকে।[১৫৪] নিজের মতামত যুক্ত কবে কমিশনার আবার তা পাঠাতেন ডি আই জির (ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ) কাছে। ১৯৬০ সালে, আইয়ুবী আমলে ডি সি-র এ ক্ষমতা লুপ্ত করা হয়।[১৫৫] কিন্তু এই ক্ষমতা ডি সির অন্যায্য কিছু ছিল না কারণ, জেলার আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব ডি সি-র এবং আইন শৃঙ্খলা ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়।[১৫৬] ১৯৭৩ সালে শেখ মুজিবের বেসামরিক সরকারের আমলে এই ক্ষমতা আবার ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল ডি সি-কে। কিন্তু ১৯৭৫ সালে জিয়াউর রহমানের সরকার আবার তা প্রত্যাহার করে নিয়েছিল।[১৫৭] অবশ্য, জিয়া ও তাঁর উপদেষ্টারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এস পির ওপর সরকারের কাছে ডি সি প্রতিবেদন পেশ করতে পারবেন।[১৫৮] কিন্তু, মাঠ পর্যায়ের অফিসাররা এ বিষয়ে সরকারী কোন নির্দেশ পাননি। পুরানো ঐতিহ্য ভঙ্গ করে ১৯৭৮ সালে, এস পি এবং ডি সির বেতন সমান করে দেওয়া হয়েছিল। এতে একজন ডি সি-র ভেবে নেওয়ার সঙ্গত কারণ আছে যে, তাঁর পদমর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার ব্যাপারে তাঁর কর্তৃত্ব হ্রাস পাচ্ছে। তা'ছাড়া ১৯৭৬-৮০ সালে সামরিক বাহিনী থেকে সরাসরি এস পি নিয়োগ, সামরিক শাসনের পটভূমিকায় ডি সি-দের জন্য নিশ্চয় খুব সুখকর ছিল না [পুলিশ ক্যাডারের সদস্যরাও এটা পছন্দ করেন নি]।

১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ মন্ত্রীসভা হয়তো ভেবেছিলেন ডি সি-দের (জেনা-রিলিস্ট) হেনস্থার পরিমাণ খুব বেশি হয়ে গেছে। সুতরাং ডি সি / এস ডি ও / সি-ও-দের নৈতিক মনোবল বৃদ্ধির জন্য বা উন্নয়ন কাজের সমন্বয় যাতে সুচারু ভাবে একজন জেনারিলিস্ট করতে পারেন সে জন্য তার হাতে মাঠ পর্যায়ের আমলাদের [এস পি সহ] নিয়ন্ত্রণ করার কিছু ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া দরকার। কেবিনেট সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বলা হয়েছিল, ডিসি / এস ডি ও / সি ও নিজ নিজ এলাকার সমন্বয় সাধনকারী এবং এ সমন্বয়সাধনে কোন অফিসার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে তদন্ত করা হবে এবং তদন্তে ঐ অফিসার দোষী প্রমাণিত হলে যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অন্তত সরকারের একজন সচিব সিদ্ধান্তটিকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে তাঁর অধস্তন কর্মচারীদের তা জানিয়েছিলেন।[১৬০] কিন্তু বাংলাদেশের মতো কম-উন্নয়নশীল দেশের আমলাতন্ত্রের [ভারতেরও] সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা জানেন এ ধরনের সিদ্ধান্তের তেমন কোন মূল্য নেই। কারণ, এ ধরনের নির্দেশ প্রেরণ এবং বিভিন্ন প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এর ব্যাখ্যা প্রদান, এবং এ প্রক্রিয়ায় অভূতপূর্ব সময় ক্ষেপণ সব-কিছু মিলে এ ধরনের নির্দেশ হয়ে পড়ে গুরুত্বহীন। ফলে, এ সিদ্ধান্তও জেনারিলিস্টদের মনোবল তেমন উন্নত করেনি।

এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সরকারী বিভিন্ন সিদ্ধান্তে যে বিভেদ ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় তা ব্যাহত করে উন্নয়ন কার্যক্রমকে [যেমন, ডি সি-র মতো জেনারিলিস্টদের কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়]। এ বিষয়টি আলোচনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে সিভিল সার্ভিসের পুনর্বিন্যাসের পক্ষে অনেকে যুক্তি দেখান যে তা অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করে কারণ এতে বিশেষজ্ঞরা লাভ করেন তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা।[১৬১] কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে বাংলাদেশের অধিকাংশ জনসংখ্যা বাস করেন গ্রামাঞ্চলে এবং দারিদ্র্য সীমার নীচে।[১৬২] ফলে সরকারের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায় অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় গ্রামীণ উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ।[১৬৩] সুতরাং ডি সি-র মতো একজন আমলাকে সমন্বয় করতে হবে জেলার বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড। এবং সমন্বয় সাধন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা নিয়ে ভাববার সময় এসেছে।

১৯৪৫ সালের 'রাওলাণ্ডস কমিটি রিপোর্ট'-এ-ও এ বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।[১৬৪] আশির দশকের বাংলাদেশ সম্পর্কেও এটি কমবেশি প্রযোজ্য। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে—

'জেলা অফিসার, সরকারী প্রশাসনের কর্মদক্ষতা।এবং জেলার সাধারণ

লোকদের মঙ্গল—এসব দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের বিচারে বর্তমান অবস্থা খুবই অসন্তোষজনক, কমিক অপেরার পুলিশের মতো জেলা অফিসারদের অবস্থাও খুব আনন্দদায়ক নয়। আশা করা হয় যে তার জেলায় কোন ঝামেলা হবে না। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টরের কাজের জন্য অর্পিত ক্ষমতা বাদ দিলে অন্য কোন ক্ষমতা তাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে দেওয়া হয় নি। আশা করা হয় সরকারী প্রকাশনার মতে, যেমন শাসক অন্যান্য কর্মকর্তাদের মতবিরোধ মিটিয়ে দেবেন, কিন্তু অবাধ্য কর্মকর্তাদের ওপর নিজ ইচ্ছা প্রয়োগ করার কোন ক্ষমতা তাঁর নেই। তিনি অনুরোধ উপরোধ করতে পারেন, বাধ্য করতে নয়। ধরে নেওয়া হয় তিনি অন্যান্য বিভাগের কাজে উৎসাহ দেবেন কিন্তু এ ধরনের কাজ করানো প্রায় ক্ষেত্রেই নির্ভর করে ব্যক্তিত্বের ওপর (Personal Factor)। যদিও তারা (অন্যান্য বিভাগের অফিসার) কি করছে তা তাঁকে জানিয়ে রাখে, কিন্তু তারা কী করবে সে পরিকল্পনা আগেভাগেই তাঁর সঙ্গে আলোচনার জন্য তারা বাধ্য নয়।'[১৬৫]

১৯৪৫ সালে যদি এই অবস্থা হয়ে থাকে তবে আশিব দশকে বাংলাদেশে সে অবস্থার আরো অবনতি ঘটেছে। ১৯৪৭ এবং ১৯৭১-এর পর দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার চাপ এখন আরো বেশি। অন্যদিকে, আংশিকভাবে হলেও প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের কারণে ডি সি এখন 'The drudges of many departments, masters of none।'[১৬৬] জেনারিলিস্ট-বিশেষজ্ঞ দ্বন্দ্ব, পুনর্বিন্যাসকৃত সিভিল সার্ভিসে প্রত্যেক ক্যাডারের নিজেদের স্বার্থ সুযোগ বৃদ্ধির প্রচেষ্টার[১৬৭] ভিতর প্রশাসন ও উন্নয়নের মিথস্ক্রিয়া চাপা পড়ে গেছে।

এই পরিবর্তনের অশুভ ফলাফল জেলা স্তরে ও সচিবালয়ের স্তরে চিহ্নিত করা যেতে পারে। বাংলাদেশের মতো একটি দরিদ্র দেশে গ্রাম উন্নয়নের অগ্রাধিকার সর্বজনস্বীকৃত। গ্রাম উন্নয়নের জন্য নানা বিভাগের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সমন্বয়সাধন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই কাজের ভার বহু যুগ ধরে সাধারণ প্রশাসক—যেমন জেলা শাসক-এর ওপরই ন্যস্ত। এই দায়িত্ব যে সবসময় যথাযথ প্রতিপালিত হয়েছে তা নয়। প্রত্যেক সাধারণ প্রশাসকই সফল সমন্বয়কারী এবং প্রত্যেক বিশেষজ্ঞই সমন্বয়সাধনে অসফল, এটাও বর্তমান লেখকদ্বয়ের বক্তব্য নয়। বক্তব্য এই যে অতীতে যাঁরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা মারফত সি এস পি জাতীয় সাধারণ প্রশাসনিক সার্ভিসে যোগ দিতেন—যাঁদের মধ্যে সাহিত্য-ইতিহাসের ডিগ্রীধারীও যেমন থাকতে পারতেন, তেমনি পদার্থ-রসায়ন-প্রকৌশল

বিষয়ের ডিগ্রীধারীও থাকতে পারতেন— তাঁরা মেধা-প্রশিক্ষণ-সুবিধা-মর্যাদা-অভিজ্ঞতা-পুষ্ট হয়ে এক ধরনের নৈপুণ্য অর্জন করতেন [সমন্বয়সাধনের ক্ষমতাও যার অন্তর্গত], যে নৈপুণ্য সচরাচর বিশেষজ্ঞরা অর্জন করতে পারেন না। এই মন্তব্যে বিশেষজ্ঞদের ক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ নেই। কারণ তাঁদের যে নৈপুণ্য আছে সেটি আবার সাধারণ প্রশাসকদের নেই। কতকগুলি অতিজটিল সমস্যার সমাধানে সফল হয়ে বিশেষজ্ঞরা দেশ ও জগতের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারেন। কিন্তু ঐ সাফল্য লাভ করার জন্য যে অভিজ্ঞতা-মানসিকতা প্রয়োজনীয়, তার সঙ্গে সাধারণ প্রশাসনে সাফল্যের জন্য অপরিহার্য অভিজ্ঞতা-মানসিকতাব ব্যবধান বিপুল। এ ব্যাপারে বিভিন্ন সরকারী আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে বিস্তর সহজবোধ্য উদাহরণ দেওয়া যায়। তবে সৌজন্যের খাতিরে যে কর্মক্ষেত্রে (অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে) বর্তমান লেখকদ্বয় নিয়োজিত, সেই ক্ষেত্রের উদাহরণ দেওয়াই সমীচীন। মানব-সমাজ-প্রকৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়তো অনেক বিশেষজ্ঞ আছেন যাঁদের খ্যাতি দেশ ও জগৎ জোড়া। কিন্তু, ব্যতিক্রম বাদ দিলে, এঁদের মধ্যে, অথবা এঁদের চাইতে কম খ্যাতিমান অধ্যাপক-বিশেষজ্ঞদের মধ্যে, সাধারণ প্রশাসনে দক্ষতাধাবী ব্যক্তি প্রায় নেই বললেই চলে। অথচ অধ্যাপকদের— অর্থাৎ বিশেষজ্ঞদের একথা স্বীকার করতে মানে লাগে যে সাধারণ প্রশাসনের অভিজ্ঞতা দক্ষতা মানসিকতা তাঁদের নেই। অতএব "গণতান্ত্রিক" দাবি অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে অধ্যাপক-বিশেষজ্ঞরাই অধিষ্ঠিত থাকেন। এটি একটি অন্যতম প্রধান কারণ— রাজনৈতিক উৎপাত ও আর্থিক টানাটানির মতো— যার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন কোন ব্যাপারেই, আর যাই হোক, সুবিন্যস্ত এটা বলা যায় না। সাম্প্রতিক প্রশাসনিক রদবদলের পর বাংলাদেশে বিশেষজ্ঞদের বেতন পদোন্নতির সুবিধা বেড়েছে, আর সাধারণ প্রশাসকদের কমেছে। ফলে, যখন জেলা শাসক বিবিধ উন্নয়নকার্যের সমন্বয়ের জন্য তুল্য স্তবের বিশেষজ্ঞদের কোন সভায় আসার আহ্বান জানান, ঐ বিশেষজ্ঞদের অনেকেই সভায় আসা প্রয়োজনীয় মনে করেন না। সেজন্য সমন্বয় ও উন্নয়ন ব্যাহত হয়। অতীতে যখন ঐ বিশেষজ্ঞদের বেতন ও পদোন্নতির সুবিধা সাধারণ প্রশাসনিক সার্ভিস-এর সদস্যদের [যেমন জেলাশাসকদের] চাইতে কম ছিল, তখন কিন্তু উন্নয়নমূলক কার্যক্রমগুলির জন্য জেলাশাসক-কর্তৃক আহূত সভায় বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতি নিয়মিতই ছিল। এখন তাঁদের বেতন ইত্যাদি জেলাশাসকদের চাইতে বেশি হওয়ায় তাঁরা মনে করছেন যে জেলা-

শাসককে অবজ্ঞা করে তাঁদের নবলব্ধ মর্যাদা তাঁরা ঘোষণা করবেন— যদিও তাতে উন্নয়ন ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অথচ, সাম্প্রতিক প্রশাসনিক রদ-বদলের মূলে যেসব বিতর্ক-চিন্তাভাবনা ছিল সেগুলির পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে বাংলাদেশে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্যই ঐ রদবদল সমর্থিত হয়।

বাংলাদেশে জেলাস্তরে যা ঘটছে, সেটা অনুরূপভাবে সচিবালয় স্তরেও ঘটছে। সাম্প্রতিক প্রশাসনিক রদবদলের পূর্বে বিভিন্ন দপ্তর-পরিদপ্তরের সভায় ডেকে সমন্বয়ের যে কাজ উপ / যুগ্ম সচিবেরা করতে পারতেন, এখন সে কাজ সচিবকে করতে হচ্ছে। কারণ আপেক্ষিকভাবে বেতন-ভাতা উপ / যুগ্ম সচিবের চেয়ে বেশি হবার জন্য তুল্যপদস্থ বিশেষজ্ঞরা উপ / যুগ্ম সচিব আহূত সভায় যাওয়া মর্যাদাহানিকর বলে মনে করেন। ফলে, সচিব স্তরে কাজ ও ক্ষমতা আরও বেশি কেন্দ্রীভূত হচ্ছে, যদিও উন্নয়নের স্বার্থে বিকেন্দ্রীকরণ অত্যন্ত প্রয়োজন। এছাড়া, সাম্প্রতিক প্রশাসনিক রদবদলের জন্য বাংলাদেশে বিশেষজ্ঞদের পদোন্নতির সুযোগ অনেক বেড়েছে— সচিবালয়ে উপ-সচিব স্তর থেকে সচিব স্তর অবধি পদগুলির জন্য সাধারণ প্রশাসনিক সার্ভিসের সদস্যদের দাবি ও বিশেষজ্ঞদের সার্ভিসগুলির সদস্যদের দাবি এখন প্রায় সমান সমান। কিন্তু, বিশেষজ্ঞদের সার্ভিসগুলির উচ্চস্তরের পদগুলির জন্য সাধারণ প্রশাসনিক সদস্যদের স্বভাবতই কোন দাবি নেই। রদবদলের পূর্বে সচিবালয়ের উচ্চ পদগুলির জন্য সাধারণ প্রশাসনিক সার্ভিসের দাবি অগ্রগণ্য ছিল— রদবদলেব পর ঐ দাবি অতিশয় সীমিত হয়েছে। সাধারণ প্রশাসনিক সার্ভিসে বেতন ও পদোন্নতির সুযোগ বিশেষভাবে হ্রাস পাওয়ায় সবচেয়ে মেধাবী ছাত্ররা আশির দশকে সাধারণ প্রশাসনিক সার্ভিসকে মনোনয়ন তালিকার সর্বনিম্ন স্তরে ঠেলে দিয়েছেন— যদিও রদবদলের পূর্বে এই সার্ভিসের স্থান ছিল সর্বোচ্চ। অর্থাৎ, উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য সাধারণ প্রশাসক বা সমন্বয়কারীর ভূমিকা গৌণ বিবেচিত হচ্ছে— যাতে উন্নয়ন ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য।

ভারতেও বিশেষজ্ঞর সঙ্গে সাধারণ প্রশাসকের দ্বন্দ্ব অজ্ঞাত নয়। কখনও কখনও গোষ্ঠীগত দাবি নিয়ে সোরগোল হয়, দ্বন্দ্ব হয় প্রকট, উভয় গোষ্ঠীই রাজনীতিকদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন। কংগ্রেস শাসনে বিশেষজ্ঞদের যে যে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছে, তা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন ক্ষেত্রে— যেমন আণবিক গবেষণার ক্ষেত্রে— বিশেষজ্ঞরা যে উৎকর্ষ লাভ করেছেন তা তাৎপর্যপূর্ণ এবং অনুকরণযোগ্য। বিশেষজ্ঞদের আরও বেশি সুযোগ-সুবিধা

দেওয়া উচিত কিনা এ নিয়ে তর্ক-আলোচনা চলতে পারে, এবং চলছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানপ্রযুক্তিতে প্রাগ্রসর ও স্বনির্ভর রাষ্ট্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের ভূমিকাকে কংগ্রেস নেতৃত্ব চিরকালই— জওহরলাল নেহরুর আমল থেকে রাজীব গান্ধীর আমল পর্যন্ত— অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু এই স্বীকৃতি জানাতে গিয়ে কংগ্রেস নেতৃত্ব এমন কোন অপরিণামদর্শী প্রশাসনিক সংস্কার প্রবর্তন করেননি, যার ফলে সাধারণ প্রশাসনে সেই ধরনের বিশৃঙ্খলা আসতে পারে— যেমন এসেছে বাংলাদেশে।

এখানে আরো বলা যেতে পারে যে যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশেও প্রশাসনে বিশেষজ্ঞরা বিশেষ মর্যাদা পান এবং জেনারিলিস্টরা এ সমস্ত কাজের সমন্বয় করেন কিন্তু তাই বলে বিশেষজ্ঞদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না।[১৬৮]

এ পরিপ্রেক্ষিতে আরো বলা যেতে পারে যে, এর আগে কয়েক দশক ধরে অন্যান্য অফিসারদের ওপর আনুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই একজন ডি সি [বা ডি এম] সমন্বয়কারীর কাজ কবেছেন, সাফল্যের সঙ্গে। সমন্বয় সাধনের জন্য কোন সবকারী নীতিমালা বা ম্যানুয়েলও ছিল না।[১৬৯] উন্নয়নের কঠিন কাজ তিনি সম্পন্ন করতেন বিভিন্ন বিভাগেব মধ্যে সমঝোতা করে। যেমন, একজন বিশেষজ্ঞ সেচ সুবিধার জন্য একটি খাল কাটতে চান কিন্তু আরেকজন তাতে বাধা দেন তার তৈরি রাস্তার ক্ষতি হবে বলে।[১৭০] কিভাবে এসব দ্বন্দ্ব তিনি নিরসন করতেন তার খানিকটা ইঙ্গিত আগেই দিয়েছি।

এ ভাবে সাম্প্রতিক পুনর্বিন্যাস বাংলাদেশের সাধারণ প্রশাসনে সৃষ্টি করেছে শূন্যতার এবং উন্নয়ন কাজে সৃষ্টি করছে প্রতিবন্ধকতার। ১৯৮০ সালে জিয়ার আমলে খুব সম্ভবত এই শূন্যতা পূরণের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল প্রতি জেলার জন্য ডি ডি সি (ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপমেণ্ট কো-অর্ডিনেটর)।[১৭১]

ডি ডি সির সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল এ ভাবে[১৭২] —তিনি হবেন পার্লামেণ্টের একজন সদস্য। তাঁর এলাকার উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের কাজে তিনি সমন্বয় ও সহযোগিতা করবেন। মর্যাদা হবে তাঁর উপমন্ত্রীর। তিনি এলাকার জনগণের অভিযোগ শুনবেন এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা নেবেন। জনগণ, নির্বাচিত প্রতিনিধি ও আমলাদের মধ্যের সম্পর্কের উন্নয়ন করবেন। প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সহজ যোগাযোগে তাঁর থাকবে প্রত্যক্ষ ক্ষমতা।[১৭৩] কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল ডি ডি সি কাজ করতে পারছেন না। ১৯৮০ সালের মে-জুন মাসে তাঁদের এক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে বলা হল, তাঁরা যেন প্রতিদিনের প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করা

থেকে বিরত থাকেন ও নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেন কৃষি উন্নয়ন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা রোধের কাজে।[১৭৪] এ ধরনের বিবেচনাহীন ও অসম্পূর্ণ কর্মতালিকা থেকে বোঝা যায়, আর যে কারণেই হোক সমন্বয় সাধনের জন্য ডি ডি সির পদ তৈরি করা হয় নি।

বাংলাদেশের মতো কম উন্নত দেশের মাঠ পর্যায়ে কাজে অগ্রগতি সাধন করতে হলে, বাস্তবসম্মত হবে,[১৭৫] প্রতিটি জেলার প্রধান প্রশাসককে অন্যান্য বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ করার মতো ক্ষমতা দেওয়া। এ ছাড়া, ঐ পর্যায়ে সমন্বয় সাধন সম্ভব নয়। শুধু সমন্বয়ের খাতিরেও যদি এই ক্ষমতা স্বীকার কবে নেওয়া হয় তা'হলে তারপর যাওয়া যেতে পারে অন্য বিতর্কে। যেমন, জেলার প্রধান প্রশাসক কে হবেন ?— একজন আমলা [ডি সি] না একজন রাজনীতিবিদ [ডি ডি সি] না অন্য কেউ ? শেখ মুজিব বাকশাল গঠনের পর জুলাই ১৯৭৫ সালে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন— প্রতি জেলায় নিযুক্ত হবেন একজন জেলা গভর্নর যাঁকে শাসক দল বা পার্লামেন্টের সদস্য হতে হবে।[১৭৬] বলা হয়েছিল, জেলা গভর্নর সাধারণ ও রাজস্ব প্রশাসনের হবেন প্রধান অফিসার এবং আদালত বাদে জেলার সমস্ত বিভাগের কাজ তিনি পর্যবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় করবেন। আইন বিভাগে যাঁরা আছেন তাঁরা ছাড়া জেলার সব আমলারা হবেন তাঁর অধস্তন। একজন আমলাও গভর্নর হতে পারবেন যদি তিনি শাসকদলের সদস্য হন। কার্যক্ষেত্রে এই পরিকল্পনাব ফল কেমন হত তা বোঝা যায়নি কারণ ১৯৭৫ সালের আগস্টে পতন ঘটে মুজিব সরকারের।[১৭৭] তবে, বলা যেতে পারে, এর পেছনে যুক্তি ছিল। এর বিপরীতে জিয়াউর রহমান প্রবর্তিত ডি ডি সি পরিকল্পনা ছিল আন্তরিকতাহীন। বোঝা যায়, প্রশাসন সমন্বয়ের চেয়ে নিজ দলের অন্তর্দ্বন্দ্ব সমাধানে ছিল এই পরিকল্পনা।

এ সবের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, বাংলাদেশে পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা তেমন সুফল আনেনি। বা উন্নয়নের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই, যদিও শাসকরা সেই ডি ডি সি থেকে বর্তমানের উপজেলা[১৭৮] পর্যন্ত সর্বক্ষেত্রে উন্নয়নের কথা বলেই প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস করতে চেয়েছেন। এ ছাড়া, পুনর্বিন্যাস বাংলাদেশের অর্থনীতির মৌলিক ব্যাধি সমূহও স্পর্শ করতে পারবে না। পারবে না উচ্চপর্যায়ের সিভিল সার্ভিসেও কিছু করতে যারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে উন্নয়নে, বিশেষ করে পল্লী পুনর্গঠনে।

বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রধান প্রতিবন্ধকতা. সম্পদের অভাব। কিন্তু যেটুকু আছে তার যথোপযুক্ত ব্যবহারের দায়িত্ব সিভিল সার্ভিসের, যা এখনও উন্নয়নের

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বড় সংস্থা, এবং যা সবসময় প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের কথা কথা বলে এসেছে দ্রুত অগ্রগতির জন্য।

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই ভূমিহীন বা নিঃস্ব।[১৭৯] গুরুত্বপূর্ণ ভূমি-সংস্কার ছাড়া এ অবস্থা পেরুনো কঠিন।[১৮০] কিন্তু, চল্লিশ বছরের (১৯৪৭ থেকে) ইতিহাস বলে অদূর ভবিষ্যতেও এ ধরনের আশা নিরাশা মাত্র।[১৮১] এ দৃষ্টিকোণ থেকেও উঁচু পর্যায়ের সিভিল সার্ভিসের পুনর্বিন্যাস উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত নয়।

ভূমি-সংস্কার সম্ভব না হলেও, এ কাঠামোয় অন্তত সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ কিছুটা কমাবার জন্য আমলারা এগিয়ে আসতে পারেন। কিন্তু তার জন্য আবার দরকার মাঠ পর্যায়ের নিঃস্বার্থ আমলা যাঁরা গ্রামীণ ধনী বা টাউটদের প্রভাবে পড়ে কাজ করবেন না।[১৮২] তবে, নিঃস্বার্থ হওয়াও মুশকিল। কারণ, গ্রামীণ ধনীরা শহুরে ধনী, প্রভাবশালী ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ এবং সরকারী আমলাদের সঙ্গে আঁতাত করে রেখেছে।[১৮৩] তাছাড়া, জেলা, মহকুমা (উপজেলা) পর্যায়ে যখন রটে যায় যে, উচ্চপর্যায়ের ব্যক্তিরা আক্ষরিক অর্থেই লুণ্ঠনে ব্যস্ত তখন স্বাভাবিক ভাবেই সৃষ্টি হয় নৈরাশ্যের।[১৮৪] আর কিছু না হোক, ক্রমবর্ধমান মুদ্রা-স্ফীতির কারণে যখন জীবনযাপনের মান কমতে থাকে তখন উচ্চপর্যায়ে এ ধরনের দুর্নীতি সমাজের সব স্তরে নৈরাশ্য সৃষ্টি করে বৈকি। ফলে, সাম্প্রতিক পুনর্বিন্যাস সমূহ এ ধরনের হতাশা থেকে মুক্তি দিতে পারবে কিনা সন্দেহ।[১৮৫]

বর্তমানে কার্য সম্পাদন থেকে চাকুরিকে আলাদা করা হয় (delinking performance from Jobs)। সরকারী চাকুরিতে এটি একটি ব্যাধি বিশেষ, পুনর্বিন্যাস যার কিছুই করতে পারবে না। আংশিক ভাবে উপরোক্ত হতাশা এবং আংশিকভাবে নিজের চাকুরি বজায় রাখার জন্য আবার দ্বন্দ্ব ভুলে সবধরনের আমলার একতার কারণে— কার্য সম্পাদন আর তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। একদল সরকারী আমলা নিজের চাকরির ক্ষতি না করে সৃষ্টি করতে পারে প্রতিবন্ধকতা, করতে পারে হেনস্থা, আদায় করে নিতে পারে অর্থ বা থাকতে পারে নৈর্ব্যক্তিক।[১৮৬] পরিশ্রম বা শৃঙ্খলার[১৮৭] কথা দূরে থাকুক, নিজের কর্মস্থলে নির্দিষ্ট সময়ের অর্ধেক সময় উপস্থিত থাকার ঘটনাও কমে আসছে। শহরে যাঁরা উচ্চশিক্ষিত বা প্রভাবশালী তাঁদেরই এই বিশাল যন্ত্রের সামনে নাজেহাল হতে হয়। সেক্ষেত্রে গরীব গ্রামবাসী যাকে নির্ভর করতে হয় সরকারী আমলার ওপর তার কথা সহজেই অনুমেয়।[১৮৮] জাতীয়করণকৃত শিল্পের উৎপাদনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে উন্নয়নের কাজে বাধা দেওয়ার মতো অভিযোগও আছে উচ্চপর্যায়ের অনেক আমলার বিরুদ্ধে।[১৮৯]

এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসিত ও আধাস্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলির কথা বলা যেতে পারে, যার সংখ্যা বাংলাদেশে কম নয়। কাগজে কলমে স্বায়ত্তশাসিত হলেও কার্যত এগুলি একেকটি মন্ত্রণালয়ের অধীন। অর্থাৎ ঢাকার সচিবালয়ই এগুলি নিয়ন্ত্রণ করে। সংস্থাগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তো বটেই কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও অনুমোদন নিতে হয় নিজ নিজ মন্ত্রণালয় থেকে। ফলে. চট্টগ্রাম বা বরিশালে স্থাপিত একটি সংস্থার উচ্চপদস্থ একজন [কোন কোন ক্ষেত্রে কয়েকজন]-কে প্রায় সময় বিভিন্ন বিষয়ে ধর্না দিতে হয় সচিবালয়ের শাখা প্রধান থেকে সচিব পর্যন্ত। এমন উদাহরণ আছে. যে একটি সংস্থার বাজেট পাস করতে ছ'বছর সময় লেগেছে. বা মন্ত্রণালয়ে থাকতে একজন যুগ্মসচিব একটি সংস্থার জন্য যে বিধি প্রণয়ন করে দিয়েছিলেন তিনি নিজেই আবার সেই সংস্থার প্রধান হয়ে গেলে সে বিধি নাকচ করে দেবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন মন্ত্রণালয়কে। এর একটি কারণ, সচিবালয়ের আমলারা চান [তিনি যে ক্যাডারেরই হোন-না কেন] সবাই যেন তাঁদের কাছে অনুরোধ নিয়ে আসেন। সরকার থেকে একবার আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে, কোন ফাইল চব্বিশঘণ্টার বেশি আটকে রাখা যাবে না। সে নির্দেশের ওপর জমেছে এখন ধুলো। সচিবালয়ের আমলারা যে কতটা ক্ষমতার অধিকারী এটা বুঝিয়ে দিতে চান তাঁরা। এ জন্যে বাংলাদেশের আমলাদের একটি বড় প্রবণতা সচিবালয়ে বদলি হওয়ার চেষ্টা।

স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা সম্পর্কে আরেকটি কথা বলা দরকার। বাংলাদেশে প্রচুর এ ধরনের সংস্থা আছে, যেখানে অনেকে কুড়ি-পঁচিশ বছর ধরে চাকুরি করছেন। তাঁরা পরিশ্রমী, নিজ সংস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পদে তাঁরা যেতে পারেন না। সেখানে সচিবালয় বা ক্যাডার সার্ভিসের অপেক্ষাকৃত তরুণ, অনভিজ্ঞকে বসিয়ে দেওয়া হয়। সংস্থার কাজ শিখে গুছিয়ে নিতে নিতে আবার তার হয়ে যায় বদলীর সময়। যেমন, বর্তমানে বাংলাদেশের এ ধরনের সংস্থাগুলির সর্বোচ্চ পদে আছেন সামরিক আমলারা। এক্ষেত্রে ক্যাডারভুক্ত আমলারা ঐক্যবদ্ধ। এ ধরনের সংস্থাগুলির প্রতি তাঁদের মনোভাব বহুজাতিক কোম্পানির মতো। অর্থাৎ তুমি উঠতে পারবে একটি পর্যায় পর্যন্ত, সর্বোচ্চ পর্যায়ে নয়, সেখানে আসবে শ্বেতাঙ্গ। ফলে, এসব সংস্থার কর্মরত অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে তীব্র হয়ে উঠছে হতাশা। এ বিষয়ে ভাবনা চিন্তা করার সময় এসেছে কারণ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনেকটা নির্ভর করছে এসব সংস্থার ওপর।

কৃষি, শিল্প এমনকি সমাজকল্যাণেও বর্তমানে সরকারের উন্নয়ন কাজের বিস্তার

ঘটেছে এবং তা সরকারী আমলাদের সুযোগ এনে দিয়েছে আত্মস্বার্থবর্ধনের, যে সুযোগ নিতে তাঁরা ইতস্তত করেন না।[১৯০] এ পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয়, সরকার চাকুরি-উৎপাদনের এক বিরাট কারখানা বিশেষ বা পৃষ্ঠপোষকতা বিতরণের এক বিশাল সংস্থা।

মাঠ পর্যায়ের কথাটা আসছে বারবার এ কারণে যে, বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষই থাকেন গ্রামে বা কৃষিই জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায়। কিন্তু এখানে কাজেব ক্ষেত্রে দু'ধরনের প্রতিবন্ধকতার কথা বিবেচ্য।

ক মাঠ পর্যায়েব আমলাদের সঙ্গে সচিবালয়ের সম্পর্ক

খ বিভিন্ন স্তরে প্রশাসক ও রাজনীতিবিদদের সম্পর্ক।

গ্রাম উন্নয়ন জটিল ব্যাপাব। স্থানীয় পরিবেশ যে-কোন সময় বদলে যেতে পাবে। সেক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে যিনি আছেন তাঁকে যদি অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়াব ক্ষমতা না দেওয়া হয় তা'হলে কাজ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। এর বিকল্প হিসেবে, সিদ্ধান্তের জন্য মাঠ পর্যায়ের কোন অফিসার যখন সচিবালয়ে নির্দেশের জন্য লেখেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে তা জানানো উচিত। কিন্তু, আমরা জানি সচিবালয় মাঠপর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কখনও দেবে না, সময়মতো সিদ্ধান্তও জানাবে না[১৯১] [এ প্রসঙ্গে ফবাসী বিপ্লবের ঠিক আগেব একটি ঘটনাব কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এক গ্রামের গীর্জার ফুটো মেরামতের জন্য আবেদন জানিয়ে সদরে অর্থাৎ রাজধানীতে লেখা হয়। সে চিঠির উত্তর এসেছিল একযুগ পবে]। ফলে সময়মতো মাঠ পর্যায়ের আমলা কাজ সম্পন্ন করতে পারেন না। বরাদ্দ অর্থ ব্যয়ের সময় পেরিয়ে যায়। এ ধরনের অভিজ্ঞতা মাঠ পর্যায়ের কর্মীকে হতাশ করতে পারে এবং এ পটভূমিকায় ক্রমান্বয়ে কাজ করার উৎসাহ তাঁর কমে যেতে থাকে।

বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিসে বিভিন্ন সংস্কার করা হয়েছে মোটামুটিভাবে কর্মকর্তাদের উচ্চতর পদ সংগ্রহের সুযোগ বাড়াবার জন্য, যার সঙ্গে সম্পর্ক নেই বিশেষ দক্ষতা অর্জনের বা নির্দিষ্ট কর্মসূচী রূপায়ণে সাফল্যের প্রমাণ দেওয়া, যদিও ঐ প্রমাণ ব্যতিরেকে প্রশাসনে উচ্চনীচ পদবিভাগের কোন মেধাগত ভিত্তি দৃশ্যমান হয় না। যেমন, একজন ডি সি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন কাজ শুরু করার পর হঠাৎ প্রমোশন পেয়ে সচিবালয়ে চলে যেতে পারেন। ঐ প্রমোশন তিনি পান, কেন্দ্রীয় বদলি ও প্রমোশনের নীতি ও সহযোগীদের ভ্রাতৃত্ববোধের জন্য।[১৯৩] এর সঙ্গে দক্ষতার বা কার্যপূরণের তেমন কোন সম্পর্ক নেই। আবার, একজন উপ-

সচিব ও যুগ্মসচিবের কাজের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য না থাকা সত্ত্বেও পৃথক-ভাবে পদগুলি কেন রাখা হয়েছে তার কারণ অনুসন্ধান করলে একটি ব্যাপারই স্পষ্ট হয় : সেটি হল যে কর্মকুশলতার সঙ্গে সম্পর্কহীন পদোন্নতি কয়েক বৎসর অন্তর ঘটাতে হলে ঐ ধরনের পদবিভাগ অপরিহার্য। এইসব প্রাথমিক গলদগুলি কিন্তু বাংলাদেশের সাম্প্রতিক প্রশাসনিক সংস্কার মারফত দূর করার কোন প্রচেষ্টাই হয়নি। ফলে, পুনরায় আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় প্রশাসনিক সংস্কারের প্রকৃত লক্ষ্যের দিকে যা হল ক্ষমতাভোগী কর্মকর্তাদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণ ও আত্মস্বার্থ পরিবর্ধন।

এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কারণ, রাষ্ট্র এখনও হচ্ছে কয়েকজনের আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যম। এ কয়েকজনের মধ্যে আছেন প্রশাসক. বিশেষ করে উচ্চ পর্যায়ের। ধনী কৃষক, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি এরা হচ্ছে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শক্তিশালী গোষ্ঠী, যারা দেশের অর্থনীতিতে পালন করছে গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যক্ষ ভূমিকা এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় পরোক্ষ ভূমিকা।[১৯৪] আমলারা সাধারণত বজায় রাখেন না নিরপেক্ষতা এবং নিয়ন্ত্রণ করেন না উপরোক্ত ক্ষমতাশালী গোষ্ঠী-গুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতা।[১৯৫] বরং তাঁরা নিজেরাই অহরহ এসব প্রভাবশালী চক্রের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও আঁতাতে মেতে থাকেন যাতে লুটের ভাগ কিছুটা পান। এ লুট হচ্ছে অধিকাংশ মূক, ক্ষমতাহীন, দরিদ্র থেকে উদ্বৃত্ত আত্মসাৎকরণ।

৪

উপরে স্বাধীনতার পর থেকে একদশক পর্যন্ত আমলাতন্ত্রের কথা আলোচনা করা হয়েছে। গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস ও উন্নয়নের ওপর। কারণ, স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন [বা করেছেন]। তাই সে আলোকে আমরা দেখাতে চেয়েছি, উন্নয়নের সঙ্গে পুন-র্বিন্যাসের আদৌ কোন সম্পর্ক আছে কিনা, না, আমলাদের চাপে পড়ে তাদের স্বার্থ-রক্ষার্থেই শাসকরা এগুলি করেছিলেন। আমাদের মনে হয়, শেষোক্তটিই সত্য।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়, অনেক সিনিয়র আমলা আটকে পড়েছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে। কেউ কেউ যোগ দিয়েছিলেন প্রবাসী সরকারে। যাঁরা দেশে ছিলেন তাঁদের মধ্যে কিছু ছিলেন নিষ্ক্রিয়। আবার জীবনের ঝুঁকি নিয়েও অনেকে সহযোগিতা করেছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের। অনেকে আবার সহযোগিতাও

করেছিলেন পাক সেনাবাহিনীকে। দেশ স্বাধীনের পর মুজিবনগরে যাঁরা ছিলেন তাঁরা তাঁদের অবদানের বিনিময়ে কিছু সুযোগ সুবিধা [প্রমোশন, সিনিয়রটি] দাবি করলেন। পাকিস্তান ফেরত সিনিয়র আমলারা তাদের যথাযোগ্য পদ চাইলেন। ই-পি-সি-এস-রা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সার্ভিসের সঙ্গে প্রাক্তন প্রাদেশিক সার্ভিসের একত্রীকরণ দাবি করলেন। এ ছাড়া 'মুক্তিযোদ্ধা' 'অমুক্তিযোদ্ধা' বিতর্কও হয়ে উঠেছিল প্রবল। সব মিলিয়ে দেখা দিয়েছিল অন্তর্দ্বন্দ্ব। সামরিক আমলাদের অবস্থাও ছিল তথৈবচ। কিন্তু, কিছুদিনের মধ্যে প্রশাসনিক শূন্যতা পূরণের জন্য অনেকে দ্রুত প্রমোশন পেলেন, বিশেষ করে ই-পি-সি-এস-রা। তবে, মোটামুটি সবাইকেই কিছু সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছিল যার ফলে আমলাতন্ত্রে খানিকটা শান্তি ফিরে এসেছিল। সামরিক বাহিনীতেও প্রমোশান হল দ্রুত। এবং খুব শিগ্রীই দেখা দিল এর প্রতিক্রিয়া।

আওয়ামী লীগের প্রবীণ সৎ নেতারা এবং শেখ মুজিব যে আমলাতন্ত্রকে চিনতেন না এমন নয়। বরং বলা যেতে পারে এঁদের সম্পর্কে সচেতনই ছিলেন। তাই. তাঁর আমলে দেখি. আমলাদের দ্রুত প্রমোশন হয়েছে ঠিকই. কিন্তু তিনি তাঁদের রাখতে চেয়েছেন নিয়ন্ত্রণেও। এর উদাহরণ. প্রেসিডেন্টের নয় নম্বর আদেশ যার বলে যে-কোন আমলাকে কোন কারণ না দেখিয়ে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা যেত। এই আদেশ-বলে বেশ-কিছু আমলাকে করা হয়েছিল চাকুরিচ্যুত। এই প্রথম আমলাতন্ত্রে রাজনীতিকদের শক্তি সম্পর্কে একটা আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল। ঢাকায় এমন রটে গিয়েছিল যে, সকালে আমলারা অফিসে যাওয়ার আগে খবরের কাগজ দেখে নিতেন। পার্লামেন্ট ছিল, যেখানে আমলাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রশ্নও তোলা যেত। সামরিক আমলাদের সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল ছিলেন শেখ মুজিব, তাই গড়ে তুলেছিলেন রক্ষীবাহিনী [ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য]। এক কথায় বলা যেতে পারে. আমলাদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন তিনি।

কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারেননি শেখ মুজিব। কিছুদিনের মধ্যেই দেখা দিয়েছিল আওয়ামী শাসনের অভিঘাত। পার্টির বিভিন্ন স্তরের কর্মী, নেতাদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ, রক্ষীবাহিনীর নির্যাতন, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, দুর্ভিক্ষ— সব মিলিয়ে জনজীবন হয়ে উঠেছিল দুর্বিসহ। শেখ মুজিবরের মতো নেতারও সমালোচনা করা হচ্ছিল। নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছিলেন তিনি সব-কিছুর ওপর, বোধহয় বিশ্বাসও। অধ্যক্ষ সাঈদুর রহমান তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন, মুজিবকে তিনি যখন এসব

কথা বলছিলেন তখন মুজিব বলেছিলেন, 'আমাকে একশো ভালো লোক দিতে পারেন ?' দলীয় লোকদের এ ধরনের আচরণ এবং এদের নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে তিনি আবার খানিকটা নির্ভর করা শুরু করেছিলেন বেসামরিক আমলাদের ওপর। তবে সেসব আমলার ওপরই তিনি নির্ভর করছিলেন যাদের সঙ্গে পঞ্চাশ দশকের গোড়া থেকেই তাঁর জানাশোনা ছিল। এটা ঠিক তাঁরা তখন সিনিয়র হিসেবে উচ্চপদ পেয়েছিলেন কিন্তু মুজিব যে তাঁদের ওপর নির্ভর করতেন তা বোঝা যায় তাঁদের সব গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানোতে।

কিন্তু এ সময় একই সঙ্গে আমলাতন্ত্রেও অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ঐ সময় মুজিব যাঁদের সচিব পদে উন্নীত করেছিলেন তাঁদের অনেকেই ছিলেন পুলিশ সার্ভিসের যা প্রাক্তন ই পি সি এস বিশেষ করে সি এস পি রা পছন্দ করেননি। শেখ মুজিব বাইরে থেকেও পছন্দসই ব্যক্তিদের এনে উচ্চপদে বসিয়েছিলেন যেটা আবার আমলাতন্ত্রের কেউই পছন্দ করেনি। তাঁর ভগ্নীপতি [প্রাক্তন ই পি সি এস] অনেককে ডিঙিয়ে উন্নীত হয়েছিলেন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে এবং প্রধান মন্ত্রী / প্রেসিডেণ্টের আত্মীয় হিসাবে তাঁর দাপট ছিল অসম্ভব। প্রাক্তন ই পি সি এস দের প্রতি স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর খানিকটা পক্ষ-পাতিত্ব ছিল। ই পি সি এস ছাড়া অন্য ক্যাডারের আমলারা এটা পছন্দ করেন নি। একটি বড় অভিযোগ ছিল, 'যিনি কয়েকদিন আগেও আমার সেকশন অফিসার ছিলেন [অর্থাৎ ই পি সি এস ক্যাডারের], তাঁর অধীনে আমি কাজ কবি কিভাবে ?' আমলাতন্ত্রের এক বড় অংশকে শেখ মুজিব এভাবে নিজের শত্রু করে তুলেছিলেন।

অন্যদিকে, সামরিক আমলারা প্রথমে দুর্বল হলেও সংহত করে নিয়েছিলেন নিজেদের [ক্ষমতা]। এ ব্যাপারে পরোক্ষ ভাবে হলেও শেখ মুজিবের খানিকটা অবদান ছিল। একটি নকশায় দেখি, সামরিক বাহিনীর বাজেট সম্পর্কে যখন তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল তখন তিনি স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে বলেছিলেন, ওটা আমি দেখব। তাঁর প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস ছিল যে, তিনি এদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন। কিন্তু কার্যত তা ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

পাকিস্তান থেকে আটক সেনাবাহিনী ফিরে এলে, মুক্তিযোদ্ধা-অমুক্তিযোদ্ধা দ্বন্দ্ব হলেও প্রায় সবাই কিছু-না-কিছু পেয়েছিলেন যা ছিল তাঁদের কাছে অনেকটা স্বপ্নের মতো। ফলে, তাঁরা হয়ে উঠেছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী। আর ক্যু করে ক্ষমতা দখল করার ঐতিহ্য তো ছিলই। দেশের অবস্থা বিশেষ করে রক্ষীবাহিনী সৃষ্টি,

আমলাদের ওপর রাজনীতিবিদদের আধিপত্য এসবই তাঁদের কাছে মনে হয়েছিল অসহ্য। পূর্বের ঐতিহ্য অনুসারে [মুক্তিযুদ্ধও যার কিছু করতে পারেনি] 'ভারতের কাছে দেশ বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে', 'অবহেলা করা হচ্ছে সেনাবাহিনীকে'— এসব কথা ছড়ানো হতে লাগল বিভিন্ন স্তরে। এবং তাই মুজিব হত্যার পর দেখি আমলাতন্ত্র মোটামুটি নির্বিকার থেকেছে।

শেখ মুজিবের মৃত্যুর পর থেকে এ পর্যন্ত আমলাতন্ত্রের ইতিহাস উনসত্তরের অভ্যুত্থানের আগে পাকিস্তানের আমলাতন্ত্রের ইতিহাসের মতোই। আমলাতন্ত্রের ভেতর যত অন্তর্দ্বন্দ্বই থাকুক-না কেন, সে থেকে তারা সামগ্রিকভাবে নিজেদের সংহত করে জাতীয় জীবনে আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছেন।

১৯৭৫ সাল পর্যন্ত তুলনামূলক ভাবে বেসামরিক আমলারা শক্তিশালী হলেও ৭৫-এর পর থেকে গত দশ বছরে সামরিক আমলারাই হয়ে উঠেছেন শক্তিশালী। বস্তুত জিয়াউর রহমানের আমল থেকেই শুরু হয়েছিল এ প্রক্রিয়ার। তবে, তাঁরা বেসামরিক আমলাদের সঙ্গে সমঝোতা করেই এগিয়েছেন। এর একটি মনস্তাত্ত্বিক দিকও আছে। শেখ মুজিবের পর যেসব সামরিক আমলা দেশের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন [বা মন্ত্রী] তারা উচ্চ পর্যায়ের বেসামরিক আমলাদের অধস্তন [যে কারণে ওয়ারেণ্ট অফ প্রিসিডেন্সেরও বদল ঘটেছে। একজন মেজর জেনারেল এখন একজন সচিবের সমপর্যায়ের]। হয়তো তাঁরা মাঝে মাঝে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেন কিন্তু এর বেশি কিছু নয়। আর বেসামরিক আমলারা যেহেতু রাজনৈতিক আধিপত্য তেমন পছন্দ করেন না তাই এ বিষয়ে তাদেরও তেমন আপত্তি নেই। এ সময় থেকেই দেখা যায়, আমলাতন্ত্রে প্রমোশনের হিড়িক। দীর্ঘ ছুটি নিয়ে উচ্চ ডিগ্রী আনার জন্য বিদেশ গমন [যে ডিগ্রীর সঙ্গে তাদের পেশার কোন সম্পর্ক নেই], আমলা টেকনোক্র্যাটদের মন্ত্রী হওয়ার হিড়িক। ঐ সময় থেকে এ পর্যন্ত আরেকটি জিনিস লক্ষণীয়। তা'হল অরাজনৈতিক, প্যাডসর্বস্ব রাজনীতিবিদ বা গণধিকৃকৃত ব্যক্তিদের পৃষ্টপোষকতা প্রদান করে রাজনীতিবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা।

পাকিস্তান আমলের মতো, ক্ষমতা সংহত করার পর আমলারা আবার দোষারোপ করা শুরু করেছেন রাজনীতিবিদদের দেশের দুর্দশা ও কুশাসনের জন্য। কিন্তু এ প্রশ্ন কি করা যায় না, রাজনীতিবিদদের [নিরস্ত্র] থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে কারা ? দেশের বাজেট [যার একটি বিরাট অংশ খরচ হয় অনুৎপাদনশীল খাতে] প্রণয়ন করছেন কারা ? দেশকে পরনির্ভরতার পথে নিয়ে যাচ্ছেন কারা ? জাতীয়-

করণ-কৃত শিল্পকারখানা সমূহ নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করে দিয়েছেন কারা? ধানমণ্ডী, গুলশান, বনানী বা বারিধারার মতো বড়লোকদের আবাসিক এলাকায় বাড়ি আছে ক'জন রাজনীতিবিদের? সবচেয়ে বড় কথা, শাসনতন্ত্রের মূল নীতি পরিবর্তন ও দেশদ্রোহীদের পুনর্বাসিত করেছেন কারা? রাজনীতিবিদরা? —এর কোনটির উত্তরই হাঁ-সূচক নয়। দেশদ্রোহীদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। এ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল জিয়াউর রহমানের আমলে যা পরিপূর্ণ রূপ পেয়েছে বর্তমানে। একজন আল-বদর বলে খ্যাত মাওলানা মান্নানের কথাই ধরা যাক।

১৯৭২ সালের ৬ মে 'দৈনিক বাংলা'য় একটি আবেদনপত্র ছাপা হয়েছিল—

'খুনী মওলানা মান্নানকে ধরিয়ে দিন।

কনভেনশন মুসলিম লীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, ইয়াহিয়ার প্রহসন উপনির্বাচনের প্রার্থী নিয়াজী-ইয়াহিয়া-ফরমান গ্যাংয়ের দোসর, রাজাকার বাহিনীর সংগঠক, কুমিল্লা জেলার ফরিদগঞ্জ থানার আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল মজিদ ও পুরানা পল্টনস্থ ডাক্তার আলীম চৌধুরী সহ অসংখ্য বাঙ্গালী হত্যার নায়ক মওলানা আবদুল মান্নান আজো ধরা পড়েনি। সে পাকিস্তানের সংহতির পক্ষে টেলিভিশনেও ভাষণ দিয়েছে। সে এখনো আত্মগোপন করে আছে। তাকে ধরিয়ে দিন।'

এই মওলানা মান্নানকে জিয়াউর রহমান করেছিলেন রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং জেনারেল এরশাদ করেছেন পুরো মন্ত্রী। মওলানা সাহেবের কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ-এর খবর বেরিয়েছে কয়েকদিন আগে সরকার-নিয়ন্ত্রিত একটি সাপ্তাহিকে, কিন্তু কোন্ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? না, বরং শহরের সবচেয়ে দামী এলাকায় মওলানা সাহেবের বিশাল মাল্টিস্টোরিড নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

ভাষাসাহিত্য সংস্কৃতির ওপর তাদের আক্রমণও অব্যাহত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে বাংলা ভাষা প্রচলনের কথাই ধরা যাক। পাকিস্তানী আমলে—

'বাংলা লেখ্য ভাষায় শব্দশুদ্ধি অভিযানের এই অশিক্ষিত ধারণা ও অশুভ প্রবণতা সরকারী নীতির প্রত্যক্ষ চাপে ততটা দেখা দেয়নি যতটা দেখা দিয়েছিল বাঙালি আমলাদের প্রভুপদলেহী আত্মসম্মানবোধহীন চাটুকার বৃত্তির কারণে, অপ্ররোচিত স্বপ্রণোদিত উৎসাহে। আয়ুবী আমলে (১৯৫৮-৬৯) ময়মনসিংহ নিবাসী অর্ধশিক্ষিত এক বাঙালি উকিল মোনায়েম খাঁ যখন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর, তখন এই অবস্থা তুঙ্গে উঠেছিল। সে আমলে টেলিভিশন অনুষ্ঠানে

'মা' সম্বোধন সংস্কৃতি-পরিপন্থী বিবেচনায় বর্জিত হয়েছিল কোনো সরকারী নির্দেশে নয়, তদানীন্তন টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ আমীরুজ্জামান খান নামক মেরুদণ্ডহীন এক আমলার ব্যক্তিগত উৎসাহে। বাংলা ভাষার ওপরে এহেন বলাৎকারের নজির অন্তহীন. সারা দেশ জুড়েই বিভিন্ন সরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে ঘটেছে বিভিন্ন সময়ে। কিন্তু, এ সবের জন্য 'সরকার' নামে বিশালাকার আকারহীন অদৃশ্য এক প্রশাসন যন্ত্রের ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপিয়ে দেওয়া অন্যায় হবে। এই সমস্ত লজ্জাজনক কুকীর্তির বিশাল অংশ সম্পাদিত হয়েছে বাঙালি উচ্চাভিলাষী বিবেক-হীন মধ্যবিত্ত আমলাদেরই কল্যাণে।'[১৯৭]

শেখ মুজিবের আমলে সর্বস্তরে বাংলাভাষা চালু করা হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর. স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষা চালু হয়ে গেলেও সরকারী প্রশাসনে [আদালতে] আজ পর্যন্ত তা চালু করা সম্ভব হয়নি। শেখ মুজিবের পর যত সরকার এসেছেন ক্ষমতায় তারা কোন-না কোন সময় প্রশাসনে বাংলা চালুর নির্দেশ দিয়েছেন কিন্তু এখনও আমলাদের দিয়ে তা কেউ করাতে পারেনি। একজন লেখক ক্ষোভে দুঃখে লিখেছেন-

'যে প্রশাসন যন্ত্রে ও প্রশাসন যন্ত্রের চালক আমলাবর্গের হৃদয়ে দেশপ্রেমের কোনো স্থান নেই সেখানে মাতৃভাষা বা রাষ্ট্রভাষার কোনো মূল্য থাকে বলে আমি অন্তত বিশ্বাস করি না। বর্তমানে যে অবস্থানে বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসন অবস্থান করছে সেখান থেকে 'সোনার পাথরবাটি' নির্মাণ সম্ভব হলে বাংলাদেশ নিশ্চয়ই সমগ্র বিশ্বের উদাহরণস্থল হয়ে থাকবে।'[১৯৮]

কিন্তু রাজনীতিবিদদের ভূমিকা কী? তাঁরাও কি দায়ী নন দেশের বর্তমান অবস্থার জন্য? অবশ্যই দেশের রাজনীতিবিদদের একাংশ এর জন্য দায়ী। তবে. এ কথাও আমাদের মনে রাখা দরকার এসব 'রাজনীতিবিদদের' অধিকাংশই সৃষ্টি আমলাদের, জনগণের প্রতিনিধিত্ব যাঁরা করেন না। যাঁরা সৎ এবং জনগণের প্রতিনিধিত্ব করছেন তাঁদের অধিকাংশ সময়ই দমিয়ে রাখা হয়েছে [অস্ত্রের জোরে, কারাগারে]। পাকিস্তান আমলে, আমলাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে যাঁরা 'রাজনীতি' করেছেন আজ তাঁরা বিস্মৃত। বাংলাদেশেও যাঁরা একই ভূমিকা পালন করছেন তাঁদের অবস্থাও হবে পূর্বসুরীদের মতো। ইতিহাস এ কথাই বলে।

বর্তমানে, ষাটের দশকের [পাকিস্তানের] মতো, বাংলাদেশ শাসন করছেন সামরিক বেসামরিক আমলারা। আমলাদের থেকে মন্ত্রী হওয়ার সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের সব-কিছু এখন তাদের নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু পাকিস্তান আমলেও

যেটা দেখা দেয়নি আশঙ্কাজনকভাবে এখন তা দেখা দিচ্ছে। সেটা হচ্ছে প্রশাসনের সামরিকায়ন। বেসামরিক চাকুরিতে অধিক সংখ্যক অনভিজ্ঞ সামরিক আমলা বসানো হচ্ছে। দেশের অন্যান্য চাকুরি থেকে সামরিক চাকরিতে বেশি বেতন দেওয়া হচ্ছে। অনেক সভ্য দেশেও যেটি নেই বাংলাদেশে এখন তাও হচ্ছে অর্থাৎ সামরিক আমলার মর্যাদা বেসামরিক আমলা থেকে বেশি। সম্প্রতি ভারতের পে কমিশনে একজন মেজর জেনারেলের বেতন করা হয়েছে কেন্দ্রের একজন যুগ্ম সচিবের সমান কিন্তু তাঁকে মেনে চলতে হবে যুগ্ম সচিবের নির্দেশ। বাংলাদেশে বেসামরিক আমলাদের কাছে বোধ হয় এখন তা স্বপ্ন। এ ধরনের সামরিকায়ন অব্যাহত থাকলে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন তরুণদের প্রশাসনিক চাকরিতে যাওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে উঠবে। এটা ঠিক বর্তমানে, এ ধরনের ভাগবাটোয়ারা নিয়ে গণ্ডগোল বাধলে দু'পক্ষই নিজেদের দ্বন্দ্ব মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করবে তবে একসময় হয়তো তা সংকটময় পরিস্থিতিরও সৃষ্টি করতে পারে।

বর্তমানে, বৃদ্ধি পেয়েছে নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য, ভূমিহীনের সংখ্যা, পরনির্ভরশীলতা। অন্য দিকে, বৃদ্ধি পেয়েছে উচ্চ পর্যায়ে দুর্নীতি, এবং গত পনেরো বছরে প্রকাশ্যে অর্থ লুটের এমন নজির দেখা যায়নি বললেই চলে। আমলাদের একটা বড় অংশ শিল্পপতি / ইনডেনটারদের সঙ্গে আঁতাতে আবদ্ধ [তাদের ভাষায়, 'পেরোলে' রেখেছি]। সামরিক-বেসামরিক আমলারা এত বেশি অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে আগে কখনও জড়িয়ে পড়েননি, এমনকি পাকিস্তান আমলেও নয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, গত কয়েক বছরে ব্যাঙ্ক ঋণ থেকে যে কোটি কোটি টাকা ব্যবসায়ীশিল্পপতিরা নিয়ে আত্মসাৎ করেছেন তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বরং যাঁরা এতে বাধা দিয়েছেন তাঁরা হারিয়েছেন চাকুরি। এবং এ ধারা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অধ্যাপক জয়ন্তকুমার রায় 'দেশ—কংগ্রেস সংখ্যা'য় 'স্বাধীন ভারতে কংগ্রেস : রাজনীতিক প্রশাসক ও সাধারণ নাগরিক' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে উপমহাদেশের আমলাতন্ত্র সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, 'কংগ্রেস দল রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা কলহ ও প্রশাসনিক ব্যর্থতাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যায়নি, যেখানে সামরিক সরকার স্থাপিত হবার সুযোগ আসে এবং গণতন্ত্র অবলুপ্ত হয় যেমন হয়েছিল পাকিস্তানে। দ্বিতীয়ত অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে বা তাড়াহুড়ো করে এমন কোন প্রশাসনিক সংস্কার কংগ্রেস দল প্রবর্তন করেনি যার ফলে সাধারণ প্রশাসন বিধ্বস্ত হয় যেমন হয়েছে বাংলাদেশে।'

উপরে আমরা যে আলোচনা করেছি, আমাদের সংগৃহীত নকশাগুলিতে কম-বেশি সেই বক্তব্যই ফুটে উঠেছে। কিন্তু, আবার এও লক্ষণীয় যে, এত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধেও কিছু আমলা আছেন যাঁরা সৎ, আন্তরিক, কাজ করে যাচ্ছেন এবং আক্ষরিক অর্থেই নিজেদের মনে করেন সিভিল সার্ভেন্ট। তাঁরা যে দেশের মানুষের ভাগ্য বদলাতে ব্যস্ত তা নয় বরং বলতে পারি সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ কমাতে তাঁরা সাহায্য করছেন। আমরা জানি, সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন না হলে এর কিছুই বদলাবে না। অথবা এদের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হতে হলে প্রয়োজন আবার উনসত্তরের মতো গণ আন্দোলন, পার্লামেণ্ট প্রতিষ্ঠা, বাক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। হয়তো বাংলাদেশ এগোচ্ছে আবার সেদিকেই। কিন্তু ততদিন, এই সংখ্যালঘু আমলাদের সহযোগিতাই হয়তো আমাদের প্রয়োজন। যাঁরা ভবিষ্যতে যোগ দেবেন সিভিল সার্ভিসে. বা যাঁরা আছেন সিভিল সার্ভিসে, এবং এ চক্রে থেকেই কাজ করতে চান, এ নকশার কিছু যদি [বা পূর্বসূরীদের অভিজ্ঞতা] তাদের উদ্বুদ্ধ করে প্রতিকূলতা এড়াতে এবং নিজেদের বুঝতে তা হলেই আমরা আমাদেব শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

তথ্যপঞ্জী :

১. Gerald E. Caiden, *The Dynamics of Public Administration*, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1971, p. vii.

২. On the importance of 'trivial, personal examples', see Badruddin Tyabji, *Indian Policies and Practice*, Oriental Publishers, Delhi, 1972, pp. 124-5.

৩. In memoirs, 'the public is not told specific stories about the way people actually believed, though such things are often anonymously leaked to Journalists.' See Michael J. Hill, *The Sociology of Public Administration*, Weidenfeld and Nicolson, London, 1972. p. 208.

৪. উদাহরণস্বরূপ দেখুন, C. D. Deshmukh, *The Course of My Life*; Orient Longman, Delhi, 1974, p. 182.

৫. Dharma Vira rightly stresses the problem of 'eliminating the writers ego'. See Dharma Vira, *Memoirs of a Civil Servant*, Vikas, Delhi, 1975, preface, p. vi.

৬. দ্রষ্টব্য ভূমিকা, *Report from a Chinese Village*, Pelican Books, Harmonds worth, 1967.

৭. A. N. Bose, *Calcutta and Rural Bengal*, Minerva, Calcutta, 1978, pp. 5-6.

৮. Michael Polanyi, *Personal Knowledge*, Harper Torchbook, New York, 1964, p. 208.

৯. Khalid B. Sayeed, *The Political System of Pakistan*, Houghton Mifflin, Boston, 1967, p. 62.

১০. Mohammad Ayub Khan, *Friends Not Masters*, Oxford University Press, London, 1967, p. 40.

১১. Chaudhri Muhammad Ali, *The Emergence of Pakistan*, Columbia Uuiversity Press, New York, 1967, p. 357.

১২. Kalim Siddiqui, *Conflict, Crisis, and War in Pakistan*, Macmillan, London, 1972 ; Khalid Bin Sayeed, *Pakistan. The Formative Phase*, Oxford University Press, 1968, p.299.

১৩. কমরুদ্দীন আহমদ, বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মপ্রকাশ, দ্বিতীয়খণ্ড, ইনসাইড লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ: ১৪৭।

১৪. তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর, বাংলাদেশ বুকস ইণ্টারন্যাশনাল, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৩৮-৪২ এবং জহুর হোসেন চৌধুরী, দরবার-ই-জহুর, লালন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ১০৩-৪।

১৫. Chaudhri Muhammad Ali, *op. cit.*, p.359.

১৬. Ralph Braibanti, 'Public Bureaucracy and Judiciary in Pakistan,' in La Palombara, ed. *Bureaucracy and Political Development*, Princeton University Press, Princeton. 1963. p. 380.

১৭. Chaudhri Muhammad Ali, *op. cit.*, pp. 373-74.

১৮. *Ibid.*, p. 242.

১৯. *Ibid.*, p. 243.

২০. Sayeed, *op. cit.*, pp. 75-76.

২১. *Ibid*, p. 76.

২২. Cf. Khalid Bin Sayeed, 'The Role of the Military in Pakistan.' in Jacques Van Doorn, ed. *Armed Forces and Society*, Mouton, The Hague, 1968, p. 276 ; Gunnar Myrdal, *Asian Drama*, Allen Lane, London, 1968, Vol I, p. 317.

২৩. *Constituent Assembly of Pakistan Debates* (*CAP Debates* for short), 22 October, 1953, Vol XV, No. 11, pp. 300-01.

২৪. Jayanta Kumar Ray, *Democracy and Nationalism on Trial: A Study of East Pakistan,* Indian Institute of Advanced study, Simla, 1968, pp. 16-22.

২৫. Chaudhri Muhammad Ali, *op. cit.*, pp. 366-67 ; এ ছাড়া ভাষা আন্দোলনের ওপর বাংলাদেশ থেকে বেশ-কিছু গবেষণামূলক বই প্রকাশিত হয়েছে যার অন্যতম বদরুদ্দিন উমর, পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ১ম ও ২য় খণ্ড, মাওলা ব্রাদার্স, ৩য় খণ্ড, বইঘর, ঢাকা, ১৯৭০, ১৯৭৪, ১৯৮৫ ।

২৬. Jayanta Kumar Ray, 'Political Development in Pakistan 1947-71 : Role of the Bureaucracy,' *IDSA Journal*, New Delhi, September, 1973. pp. 92-124, especially, p 96.

২৭. Mohammad Ahmed, *My Chief*, Longman, Lahore, 1968, p. 8.

২৮. Ayub Khan, *op. cit.*, pp. 25-27.

২৯. *Ibid.*, p. 102.

৩০. Cf. Myrdal, *op. cit.*, p. 321

৩১. Sayeed, *Pakistan*, p. 64.

৩২. Fred W. Riggs, 'Bureaucrats and Political Development : A Paradoxical View,' in La Palombara, *op. cit.*, p. 1-8.

৩৩. Anthony Mascarenhas, *The Rape of Bangladesh*, Vikas, Delhi, 1971, p. 49 ; Herbert Feldman, *From Crisis to Crisis : Pakistan 1962-1969*, Oxford University Press, London, 1972, p. 328. জুলফিকার আলী ভুট্টো ১৩০০ আমলা ছাঁটাই করার পরও অবস্থা একই রয়ে গেছে। দেখুন, *Far Eastern Economic Review*, 6 September, 1974, p. 22.

৩৪. Anthony Mascarenhas, *op. cit.*, p. 30 ; Tariq Ali, *Pakistan Military Rule or People's Power*, Jonathan Cape, London, 1970, p. 89 ; Z. A.Bhutto, *Political Situation in Pakistan*, Karachi, 1968, pp. 43-44.

৩৫. Field Marshal Claude Auchinlek,'Interview',The Listener, cited in *The Times of India*, 15 July 1974.

৩৬. Ayub Khan, *op. cit.*, p. 35 ; Chaudhri Muhammad Ali, *op. cit.*, p. 295.

৩৭. Ayub Khan, *op. cit.*, p. 40.

৩৮. Chaudhri Muhammad Ali, *op. cit.*, p. 376.

৩৯. Ayub Khan, *op. cit.*, p. 40.

৪০. Kalim Siddiqui, *op. cit.*, p. 116.

৪১ *Dawn*, 2 May, 1954. Also see S. M. Burke, *Pakistan's Foreign Policy*, Oxford University Press, London, 1973, p. 149.

৪২. Chaudhri Muhammad Ali, *op. cit.*, pp. 382, 385. Khalid B. Sayeed, *Pakistan*, p. 408.

৪৩. Chaudhri Muhammad Ali, *op-cit.*, p. 384.

৪৪. Ray, *op. cit.*, pp. 101-113.

৪৫. Mascarenhas, *op. cit.*, p. 28.

৪৬. Ralph Braibanti,'Administrative Modernisation',in Myron Weiner, ed. *Modernisation : The Dynamics of Growth*, Voice of America, Forum Lectures, 1966, pp. 187-88 ; Braibanti, *op. cit.*, pp. 386-87.

৪৭. Ayub Khan, *op. cit.*, p. 38. জিন্নাহ মিসকনডাকটের জন্য আইয়ুব খানের কোর্ট মার্শাল করতে চেয়েছিলেন। পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন আইয়ুবকে রক্ষা করেন এবং পূর্ববাংলার জি ও সি হিসেবে তাঁর নিযুক্তির বন্দোবস্ত করেন। দেখুন, কামরুদ্দিন আহমদ, বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মপ্রকাশ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৪৭।

৪৮. Mascarenhas, *op. cit.*, p. 31 ; Ray, *op. cit.*, pp. 53-54.

৪৯ Ayub Khan, *op. cit.*, p. 41.

৫০. *Ibid.*, p. 49. আইয়ুব খান নিজে লিয়াকত এবং নাজিমুদ্দিনের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন, যে কারণে তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল অনেক সিনিয়র সহকর্মীকে ডিঙিয়ে পাকিস্তানের সেনাধ্যক্ষ হওয়া। দেখুন, কামরুদ্দিন আহমদের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৪৮।

৫১. *Cf.* .Kalim Siddiqui, *op. cit.*, p. 78.

৫২. *CAP Debates*, 9 September 1955, vol I. No 20, p. 630.

৫৩. *Report of the Court of Inquiry Constituted under Punjab Act II of 1954 to Enquire into the Punjab Disturbances of 1953*, Lahore Government Printing Press, Punjab, 1955.

৫৪. Sayeed, *Pakistan*, 1960, p. 422. G. W. Choudhury, *Democracy in Pakistan*, Green Book House, Dhaka, 1963, pp. 74-75.

৫৫. Sayeed, *Pakistan*, 1967, pp. 76-79.

৫৬. *CAP Debates*, 10 September 1955, vol I, No 21, p. 656. Also see pp. 644-45, 654-63, 679-80, 683-84.

৫৭. Speech by Malik Firoj Khan Noon, *CAP Debates*, 25 August 1955, vol I, No. 11, pp. 317-18. Speech by Sardar Abdul Rashid Khan, *CAP Debatas*, 6 September 1955, vol I, No 17, p. 498. Speech by Iftikharuddin, *CAP Debates*, 9 September 1955, vol I, No-20, pp. 612-13.

৫৮. Ayub Khan, *op. cit.*, p. 52.

৫৯. Sir Ivor Jennings, *Constitutional Problems in Pakistan*, Cambridge University Press, 1956, p. 308.

৬০. Rais Ahmad Jafri,ed., *Ayub : Soldier and Statesman*, Speeches and Statements, Muhammad Ali Academy, Lahore, 1966, p.32.

৬১. Ayub Khan. *op. cit.*, p. 186.

৬২. *Ibid.*, p. 188.

৬৩. *Ibid.*, p.187 ; Sisir Gupta, 'From the Partition to Yahya Khan', in Pran Chopra, ed., *The Challenge of Bangladesh*, Popular Prakashan, Bombay, 1971, p. 33.

৬৪. Mascarenhas, *op. cit.*, p. 31.

৬৫. Ayub Khan, *op. cit.*, p. 54.

৬৬. *Ibid.*

৬৭. *Ibid.*, p. 55.

৬৮. L. F. Rushbrook Williams, *The State of Pakistan*, Faber, London, 1962, pp. 149, 152-153.

৬৯. Sayeed, *Pakistan*, 1967, p. 89 ; Siddiqui, *op. cit.*, pp. 96-97

৭০. Ayub Khan, *op. cit.*, p. 59.

৭১. *Ibid.*, pp. 56-57 ; Bhutto, *op. cit.*, p. 45 ; তোফজ্জল হোসেন, পৃ. ১০৭-০৮ ।

৭২. Ayub Khan, *op. cit.*, 189.

৭৩. *Ibid.*, p. 54.

৭৪. Tariq Ali, *op. cit.*, p. 107 ; Rehman Sobhan, *Works Programme, Basic Democracy and Rural Development in East Pakistan*, Bureau of Economic Research, University of Dhaka, 1968, p. 88.

৭৫. *Ibid.*, p. 257

৭৬. Sayeed, *Pakistan*, 1967, pp. 225-226. Ray, *op.cit.*, pp. 305-12. Tariq Ali, *op. cit.*, pp. 128-129.

৭৭. জনতা, ১১, ১১,১৯৬৪, ঢাকা ।

৭৮. তোফজ্জল হোসেনের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৬৯-৭০ ; Sayeed, *Pakistan*, 1967. p. 220.

৭৯. Jayanta Kumar Ray, Bangladesh : General Background; in Saral K. Chatterji, ed., *Profile of Bangladesh,* The Christian Institute for the Study of Religion and Society, Bangalore, 1972, p. 8.

৮০. Feldman, *op. cit.*, p. 327.

৮১. Mascarenhas. *op. cit.*, মুকিমখান লিখেছেন, 'The decisive decisions were the preserve of the military brass and a few trusted civil servants.' Fazal Muqeem Khan, *Pakistan's Crisis of Leadershid,* National Book Foundation, Islamabad, 1973, p. 20.

৮২ ইয়াহিয়া সরকার আশা করছিল, আওয়ামী লীগ বিরোধীরা কমপক্ষে 80% আসন পাবেন। জহুর হোসেন চৌধুরী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৫৮।

৮৩. Mascarenhas, *op.cit.*, p. 86 , জহুর হোসেন চৌধুরী পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৫৮।

৮৪. Fazal Muqeem Khan, *op. cit.*, pp. 258-259.

৮৫. Gustav F. Papenak, *Pakistan's Development : Social Goals and Private Incentives,* Harvard University Press, 1967, pp. 142-43. পাকিস্তানের আঞ্চলিক বৈষম্য সৃষ্টির পটভূমি, আন্ত প্রাদেশিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক, বিশেষ করে পূর্ববাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়নের বৈশিষ্ট্যের বিভিন্ন তথ্যের জন্য দেখুন : এস এস. বারানভ, 'পূর্ববাংলা : অর্থনৈতিক উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য (১৯৪৭-১৯৭১)' (অনুবাদ), জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৬।

৮৬. Papenak, *Ibid.*, pp. 140-141 ; Siddiqui, *op. cit.*, pp. 81-82, 105 ; Tariq Ali, *op. cit.*, p. 121 ; জহুর হোসেন চৌধুরী, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৭৫।

৮৭. Siddiqui, *op-cit.*, pp. 87-88 ; Papenak, *op cit.*, p. 149.

৮৮. Papenak, *op. cit.*, pp 147.

৮৯. Siddiqui, *op. cit.*, pp. 88-89.

৯০. Tariq Ali, *op. cit.*, pp. 119-20.

৯১. Inder Malhotra, *Times Weekly*, *Times of India,* 13 January, 1974. Italics in Original.

৯২. Tariq Ali, *op. cit.*, p. 122.

৯৩. Ayub Khan, *op. cit.*, pp. 76-82.

৯৪. Tariq Ali, *op. cit.*, p. 149.

৯৫. Tariq Ali, *Ibid.*, Feldman, *op. cit.*, pp. 305-306.

৯৬. Fazal Muqeem Khan, *op. cit.*, p. 30.

৯৭. *Ibid.*, p. 259.

৯৮. Ayub Khan, *op. cit.*, p. 96.

৯৯. Siddiqui, *op. cit.*, pp. 105-106.

১০০. *The New York Times*, 12. 10. 1958.

১০১. Tariq Ali, *op. cit.*, pp. 87-88.

১০২. *Ibid.*, p. 88.

১০৩. *Ibid.*, pp. 112-113.

১০৪. Siddiqui. *op. cit.*, p. 99.

১০৫. Mohammad Ahmed, *op. cit.*, pp. 74-75.

১০৬. *Budget in Brief 1971-72*, Government of Pakistan, Ministry of Finance, Islamabad, 1971, p. 201. *Budget in Brief 1972-73*, Government of Pakistan, Finance Division, Islamabad, 1972, pp. 80-83.

১০৭. Wayne A. Wilcox, 'India and Pakistan', in Steven L. Spiegel and Kenneth N. Waltz, eds., *Conflict in World Politics*, Winthrop, Cambridge, Mass, 1971, pp. 259-60.

১০৮. *The New York Times*, 29 August 1965.

১০৯. *The Hindustan Times*, 21 April 1972.

১১০. Amos A. Jordan, *Foreign Aid and the Defence of South-East Asia*, Praeger, New York, 1962, p. 214.

১১১. *The Military Balance 1962-63*, The International Institute for Strategic Studies, London, 1962, p. 21.

১১২. *The Military Balance 1963-1964*, The International Institute for Strategic Studies, London, 1963, p. 25.

১১৩. *United States Interest in Policies Toward South Asia.*

Hearing before the sub-committee on the Near East and South Asia of the Committee on Foreign Affairs, House of Representatives, 93rd Congress, Ist Session, Washington, D. C. G. P. O. 1973, p. 102. Joseph J. Sisco Assistant Secretary of State for Near Eastern and South Asian Affairs, testifying before the Sub-Committee on Foreign Affairs of the House of representatives in March 1973, put the grant military aid for Pakistan during 1954-65 at $ 674 million. See, *Ibid.*, p. 9. In course of the same hearings, James H. Noyes, Deputy Assistant Secretary of Defence (International Security Affairs) pointed to an additional gift of $ 700 million for Pakistan during the same period categorised as security support and defence-related grants. See *Ibid.*, p. 87.

১১৪. *Report of the Economic Appraisal Committee*, Government of Pakistan, Karachi, 1953, p. 153.

১১৫. Siddiqui., *op. cit.*, p. 96.

১১৬. A Publication run by some Pakistani Student in London has observed, 'In the long run, the worst aspect of military aid lies in the complete change it produces in the balance of social and political forces in favour of conservatism and established vested interests. The dragon seeds sown by military aid have produced a fearful crop of military officers, with their social roots in the most conservative sections of our Society, who have learnt to sit in Judgement on our people'. Quoted in Paul.A. Baran and Paul M. Sweezy, *Monopoly Capital*, Pelican Books, 1970, p. 203.

১১৭. Major General Fazal Muqeem Khan, *The Story of Pakistan Army*, Oxford University Press, Karachi, 1963, p. 158.

১১৮. *Ibid.*, p. 159.

১১৯. *Military Assistance Training Programmes of the US Governments*, Institute for International Education, 1964, p. 25.

১২০. Harold A. Hovey, *United States Military Assistance : A Study of Policies and Practices.*, Praeger, New York, 1966, pp. 174, 176.

১২১. Tariq Ali, *op. cit.*, p. 94.

১২২. *Ibid.*, p. 94.

১২৩. Kuldip Nayar, *Distant Neighbours*, Vikas, Delhi, 1972. p. 170.

১২৪. *The Statesman*, 2. 9. 1980.

১২৫. Fayezuddin Ahmed, 'Civil Service System in Bangladesh', *The Indian Journal of Public Administration (IJ PA)*, Jan-March 1980, pp. 220, 227. ঐ সময় ফয়েজউদ্দিন আহমদ ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের সংস্থাপন সচিব।

১২৬. Government of the Union of Burma, *Report of the Public Services Enquiry Commission, 1961*, Rangoon, 1961, p. 136.

১২৭. *Ibid.*, p. 138.

১২৮. Fayezudddin Ahmed, *IJ PA*, p. 230.

১২৯. *Ibid.*, p. 234.

১৩০. Government of the People Republic of Bangladesh, Cabinet Secretariat, Establisment Division, No. ED (lc) SII-6/78/5, dated Dhaka, 1 March 1979 and No ED (lc) SII-6/78/20, dated Dhaka, 9 April 1979.

১৩১. Syed Abdus Samad, 'Democratisation of Civil Services and the Question of Senior Policy Pool', cyclostyled paper, presented at a seminar organized in January 1980 by the Department of Public Administration, University of Dhaka, p.4. Dr Samad is an ex-C.S.P. offiicer.

১৩২. ED (Ic) S 11- 6/78/5, dated, Dhaka, 9 April 1979.

১৩৩. Syeda Firoza Begum, 'Senior Policy Pool', cyclostyled paper presented at a seminar organized in January 1980, by the Department of Public Administration, University of Dhaka, p. 3. Firoza was a professor of Gynaecology, President, Bangladesh Medical Association. Also see, M. F. A. Siddiqui, 'Democratisation of Civil Services and the Question of Senior Policy Pool,' cyclostyled paper presented at the aforesaid seminar, pp 10-11. Siddiqui was the President of the Institution of Engineer and a secretary to the Government.

১৩৪. Government of Pakistan, Cabinet Secretariat, Establishment Branch, Resolution No. F. 25/2/48 Ests. (S.F.I) dated 8 November 1950.

১৩৫. Government of Pakistan, Cabinet Secretariat, Establishment Branch, Resolution No 10/1/57, SE-III, dated 16 September 1959.

১৩৬. S. R. Pal, 'Which Way ?' cyclostyled paper presented at a seminar organized in January 1980 by the Department of Public Administration, University of Dhaka, p.1.

১৩৭. Article 29 (1), *The Constitution of the Peoples' Republic of Bangladesh*, Dhaka, 1979, p. 11.

১৩৮. Government of East Pakistan, Home (GA and Appointment) Department, Notification No 6766. GA dated 21 December 1957.

১৩৯. Cabinet Secretariat, Establishment Division, memo no. ED (J-2) /153/ 76-342, dated 14 June, 1976.

১৪০. Cabinet Secretariat, Establishment Division, No ED (Ic) S11-6/78—20,dated 9 April 1979, No ED (Ic) s11-9/78-110, dated 23 August 1979.

১৪১. মুজিবনগরে কর্মরত কর্মচারীদের পক্ষে সরকারী সিদ্ধান্তের জন্য দেখুন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিতর্ক : সরকারী বিবরণী, খণ্ড ২ সংখ্যা ২০, ২৭ জুন ১৯৭৩ পৃ. ৮২৭।

১৪২. Talukdar Maniruzzaman, 'Administrative Reforms and Politics within the Bureaucracy in Bangladesh', *The Journal of Commonwealth and Comparative Politics* (*JCCP*), March 1979, pp. 48-49.

Emajuddin Ahamed, 'Dominant Bureaucratic Elites in Pakistan and Bangladesh', *Politics and Administration in Bangladesh*, Department of Political Science, Dhaka University, 1980, p. 18.

আসাদুজ্জামান খানের বক্তব্য, বাংলাদেশ গণপরিষদের বিতর্ক : সরকারী বিবরণী, খণ্ড ২ সংখ্যা ৯, ২৫, অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ২৭৮। আবুল মনসুর আহমদ, বেশি দামে কেনা কম দামে বেচা আমাদের স্বাধীনতা, আহমেদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা ১৯৮২, পৃ. ২২৮।

১৪৩. পার্লামেন্টে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগের জন্য দেখুন, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিতর্ক : সরকারী বিবরণী, খণ্ড ২, সংখ্যা ২০, ২৭ জুন ১৯৭৩, পৃ, ৮২৬।

১৪৪. এ ধরনের কিছু অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে মন্ত্রীরা বলেছেন : ঐ, সংখ্যা ১৯, ২৬জুন ১৯৭৩, পৃ. ৭৭৫ ; এবং সংখ্যা ১৯, ২১, ২৮ জুন ১৯৭৩, পৃ. ৮৯৭।

১৪৫. ঐ, সংখ্যা ২০, ২৭ জুন ১৯৭৩, পৃ, ৮৯৭-৬ ; সংখ্যা ২১. ২৮ জুন ১৯৭৩, পৃ, ৮৯৫ ; এবং সংখ্যা ২৬, ৯ জুলাই ১৯৭৪, পৃ. ২০৮৭।

১৪৬. আবদুল মোহাইমেন তাঁর আত্মজীবনীতে এ ধরনের ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন বিশেষ করে খন্দকার আসাদুজ্জামানের কথা যিনি যুক্ত ছিলেন মুজিব নগর সরকারের সঙ্গে। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ সরকারের একজন সচিব। দেখুন, একটি আত্মার মৃত্যু (লেখক কর্তৃক প্রকাশিত), ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ২৪-২৫।

১৪৭. Maniruzzaman, *JCCP*, March 1979, p. 49.

১৪৮. Bangladesh Public Service (First) Commission, Notification No 4, 23. 6. 1972.

১৪৯. বাংলাদেশ পাবলিক, সার্ভিস কমিশন, বার্ষিক প্রতিবেদন, ঢাকা, ১৯৭৮, পৃ. ৩০-৩১।

১৫০. ঐ, ১৯৭৬, পৃ. ৪-৫, The *Bangladesh Gazette Extraordinary* 25.10. 1976.

১৫১. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদেব বিতর্ক : সবকাবী বিববণী, খণ্ড, ২ সংখ্যা ২০, ২৭ জুন ১৯৭৩, পৃ ৮৩৫। M. Anisuzzaman, *Bangladesh Public Administration and Society*, Bangladesh Books International, Dhaka, 1979, p. 7.

১৫২. ED (IC) SII-6/78/5, 1. 0. 1979.

১৫৩. Government of the Peoples Republic of Bangladesh, Ministry of Finance, Implementation Division, No. M F (ID)-1-3/77/522, 13. 5. 1978.

১৫৪. Government of Bengal, *Police Regulations Bengal 1943,* Calcutta, 1944, Rules 75A. p, 34.

১৫৫. Qazi Azher Ali, *District Administration in Bangladesh (DAB)*, National Institute of Public Administration, Dhaka, 1978, p. 20.

১৫৬. *DAB.*, p. 44.

১৫৭. *The Bangladesh Gazette Extraordinary*, 19. 12 1975.

১৫৮. Government of the Peoples Republic of Bangladesh, Cabinet Secretariat, Cabinet Division, No. CD/DA/73/ 75-170 (1000), 27. 2. 1976 নির্দেশনামাটি জাবি কবেছিলেন একজন প্রাক্তন সি এস পি শফিউল আজম। সামবিক শাসনকালে নিযুক্ত হয়েছিলেন মন্ত্রী।

১৫৯. এস ডি ও : সাব ডিভিশনাল অফিসাব , সি ও : সার্কেল অফিসাব।

১৬০. তৎকালীন কৃষি ও বন সচিব ওবাযদুল্লাহ খান। একজন প্রাক্তন সি এস পি যিনি সামবিক শাসনামলে নিযুক্ত হয়েছিলেন মন্ত্রী। Memo No. X/Agri/ Misc. 14/79/222 ; 26. 4. 79.

১৬১. Fayezuddin Ahmad, *IJPA*, Jan-March 1980, p. 236.

১৬২. Planning Commission, Government of the Peoples Re-

public of Bangladesh, *The Second Five year Plan 1980-8*২ Draft, Dhaka, 1980, Chapter 1, p. 1.

১৬৩. After all, the industrial sector forms 'a very small fragment of the economy', and the fundamental economic issues 'have to be debated and resolved in the rural economy of Bangladesh', See Nurul Islam, *Development Planning in Bangladesh : A Study in Political Economy*, Universities Press Ltd, Dhaka, 1979, p. 262.

১৬৪. Government of Bengal, *Report of the Bengal Administration Enquiry Committee 1944-45*. N I P A (reprint), Dhaka, 1962.

১৬৫. *Ibid.*, pp. 26-27.

১৬৬ ঐ, পৃ. ৩০। বাংলার লেঃ গভর্নর স্যার জর্জ ক্যাম্পবেলের ১৮৭২ সালে করা একটি মন্তব্য। তিনি চেয়েছিলেন, প্রতি জেলায় সব বিভাগের নিয়ন্ত্রক হবেন জেলা-প্রশাসক।

১৬৭. *JCCP*, pp. 55-56.

১৬৮. David Lilienthal, 'Tennesse Valley Authority', cited in *Rowlands Committee Report*, p. 28 ; David Lilienthal, *TVA : Democracy on the March*, Harper, New York, 1953, Chapter 8.

এ বিতর্ক আবার অন্যরূপ নিতে পারে, যদি উদাহরণস্বরূপ আমরা গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প আলোচনার বদলে বিরাট জাতীয়করণকৃত শিল্প নিয়ে আলোচনা শুরু করি। দেখুন, John Garrett, *The Management of Government*, Penguin Books, Harmonds-worth, 1972, pp. 26-28, 38-39.

১৬৯. *DAB.*, p. 76.

১৭০. *Ibid.*, p. 32.

১৭১. ED/SA IV-57/80-112, 23. 4. 1980.

১৭২. Statement by Deputy Prime Minister Jamaluddin Ahmed, *The Bangladesh Observer*, 5. 6. 1980.

১৭৩. Statement by Prime Minister Shah Azizur Rahman, *The Bangladesh Observer*, 3. 6. 19৪0.

১৭৪. অরিয়েণ্টেশান প্রোগ্রামের উদ্বোধন উপলক্ষে বাংলাদেশের ভাইস প্রেসিডেণ্টের বক্তৃতা ২৬ মে, ১৯৮০, পৃ. ১-২।

১৭৫. এ পরিপ্রেক্ষিতে দেখুন, *Rowlands Committee Report,* pp. 23-33 ; Ishwar Dyal and others, *District Administration* Macmillan, Delhi, 1976, pp. 19-22, 27, 49-50, 60.

১৭৬. District Administration Act, 1975 ; Act No VI of 1975 ; *The Bangladesh Gazette Extraordinary,* 10. 7. 1975. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিতর্ক : সরকাবী বিববণী খণ্ড ২. সংখ্যা ১৩, ৯ জুলাই ১৯৭৫, পৃ. ৪৭৭-৮০।

১৭৭. The District Administration (Report) Ordinance, 1975. Ordinance No XLV of 1975, *The Bangladesh Gazette Extraordinary*, 27. 8. 1975.

১৭৮. গ্রামীণ উন্নয়ন ত্বরান্বিত এবং সে কারণে ঐ পর্যায়ে সমন্বয় সাধনেব জন্য জেনাবেল এবশাদ সৃষ্টি কবেছেন উপজেলার (আগের মহকুমা বিলুপ্ত করে, ও থানাকে উন্নীত করে। বর্তমানে উপজেলার সংখ্যা সাড়ে চারশো, জেলার সংখ্যা ষাট)। এটি নতুন প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস। উপজেলার প্রধান সরকাবী আমলা পরিচিত উপজেলা নির্বাহী অফিসাব বা ইউ এন ও নামে। তাব ওপরে থাকবেন নির্বাচিত চেয়ারম্যান। বিকেন্দ্রীকরণেব নামে উপজেলায় আইন-আদালত থেকে শুরু কবে সরকারী অফিস পর্যন্ত স্থাপন করা হয়েছে। বিতর্কিত এই বিন্যাস সরকারী মতে, পল্লী উন্নয়ন ত্বরান্বিত করবে। কিন্তু শুধু দালান কোঠা নির্মাণ করতেই যে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে তা দিয়ে গ্রামীন শিল্প শিক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থা করলে পল্লী উন্নয়ন আরো ত্বরান্বিত হতো। উপজেলা করার প্রধান উদ্দেশ্য গ্রাম পর্যায়ে সবকাবী [সামরিক] শাসন দৃঢ করা এবং ঐ পর্যায়ে পৃষ্ঠপোষকতা বিতরণ কবা। উপজেলা সম্পর্কে আলোচনার জন্য দেখুন—

এমাজউদ্দিন আহমদ, 'নতুন উপজেলা প্রশাসন : একটি পর্যালোচনা,' *The Journal of Political Science,* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, vol 1, Issue 1, 1984, p. II. এ প্রসঙ্গে আরো দেখুন, বদরুদ্দিন উমর,

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কয়েকটি দিক, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৭৬-৭৭ ; সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আশির দশকে বাংলাদেশের সমাজ, ডানা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৩৮, ৪০ ; Q. K. Ahmad and Hiroshi Sato, *Aid and Development Administration in Bangladesh*, Institute of Developing Economics, Tokyo, 1985, pp 49-56.

১৭৯. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, Azizur Rahman Khan, 'Poverty and Inequality in Rural Bangladesh' in *Poverty and Landlessness in Rural Asia*, ILO, Geneva, 1977, pp. 155-59.

১৮০. বাংলাদেশ লেখক শিবির সম্পাদিত বাংলাদেশের সামাজিক অগ্রগতির সমস্যা (মহিউদ্দিন আলমগীরের প্রবন্ধ), মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ. ৫৫-৫৭। বদরুদ্দিন উমর, যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ. ২।

১৮১. এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়েছে, ভূমি সংস্কার কমিটির প্রতিবেদন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ১৪-১৯, ৩১-৫১। কাজী খলকুজ্জামান আহমদ, বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক বিকাশ : পথের সন্ধান, বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৩৬-৪৭।
M. A. Jabbar, 'Land Reform in Bangladesh', in *Agrarian Structure and Change : Rural Development Experience and Policies in Bangladesh*, Ministry of Agriculture and Forests, Government of Bangladesh, 1978 ; Atiur Rahman, 'The Debate over Land Reform in Bangladesh : Some Issues Reconsidered', *Asian Affairs*, Dhaka, Jan-June 1980.

১৮২. শোষণের বিভিন্ন বিবরণের জন্য দেখুন, বদরুদ্দিন উমর, 'আইয়ুবী আমলে বাংলাদেশের কৃষক', বিচিত্রা, ৫, ৯, ১৯৭৮ ; মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, 'দুর্নীতির বিষবাষ্প : শহর থেকে গ্রামে', ঐ, ২৯. ২. ১৯৮০ ; এবং বাংলাদেশ জাতীর সংসদের বিতর্ক : সরকারী বিবরণী, খণ্ড ২, সংখ্যা ২১, ২৮ জুন ১৯৭৩, পৃ. ৯৩৩-৩৪, ৯৫৪।

১৮৩. আনু মুহাম্মদ, 'বাংলাদেশের গ্রাম', বিচিত্রা, ১৫. ৯. ১৯৭৮। আরো দেখুন, বদরুদ্দিন উমর, যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ, পৃ. ১২৩।

১৮৪. দুর্নীতির বিভিন্ন মাত্রা অনুধাবনের জন্য সামান্য কিছু উৎস উল্লেখ করা হল— রমণীমোহন দেবনাথ, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সংকট, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ. ২-৩, ১৪, ২৩। বদরুদ্দিন উমর, ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৯৮০, পৃ. ১১। বাংলাদেশ গণপরিষদের বিতর্ক : সরকারী বিবরণী, খণ্ড ২, সংখ্যা ৪, ১৯ অক্টোবর ১৯৭২, পৃ. ১১১।

১৮৫. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিতর্ক : সরকারী বিবরণী, খণ্ড ২, সংখ্যা ২০, ২৭ জুন ১৯৭৩, পৃ. ৮৫৩-৪ ; খণ্ড ২, সংখ্যা ২৬, ৯ জুলাই ১৯৭৪, পৃ. ২০৮১।

১৮৬. বার্মা সরকারের একটি রিপোর্টের কিছু অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি যা বাংলাদেশের মতো অনেক এল ডি সি'র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সরকারী দুর্নীতির পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত কমিটি রিপোর্টে উল্লেখ করেছে— 'If Justice were done, a very large proportion of all the public servants in the country would be in Jail.' Government of the Union of Burma, *The Final Report of the Administration Reorganisation Committee 1951,* Rangoon, 1954 (reprint) p. 7.

১৮৭. বার্মার সেই রিপোর্ট থেকেই আবার উদ্ধৃতি দিতে হচ্ছে এ কারণে যে, ঐ সরকারের রিপোর্ট সমূহে এমন সব সাহসী বক্তব্য আছে যা খুব কম এল ডি সি'র রিপোর্টে থাকে—

'In respect of discipline and diligence, the secretariat is not a model of what to do but an example of what to avoid.' ঐ, পৃ. ৮।

১৮৮. বাংলাদেশী আমলাদের কর্তব্যে অবহেলা ও দুর্নীতির নজিরের জন্য দেখুন, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের বিতর্ক : সরকারী বিবরণী, খণ্ড ২, সংখ্যা ২০, ২৭ জুন ১৯৭৩, পৃ. ৮৪৪, ৮৫৫-৫৭, ৮৬২ ; খণ্ড ২, সংখ্যা ১৬, ২৬ জুন ১৯৭৪, পৃ. ১২১০ ; খণ্ড ২, সংখ্যা ২৫, ৮ জুলাই ১৯৭৪, পৃ. ২০১৮-১৯।

১৮৯. এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, Rehman Sobhan and Muzaffar Ahmad, *Public Enterprise in an Intermediate Regime : A Study in the Political Economy of Bangladesh,* Bangladesh Institute of Development Studies, Dhaka, 1980, chapter 13.

১৯০. 'Perhaps more deplorable even than the low standard of discipline and diligence in the public service is that far too many men see in the new welfare activities of government not new opportunities of service but new opportunities of making money.' Burma, *The Final Report of the Administration Reorganisation Committee*, p. 8. Government of the Union of Burma, *The First Interim Report of the Administration Reorganisation Committee*, Rangoon, 1949, p. 29 : 'Finally we think it desirable to place on record our conviction that the promotion of welfare is no easy matter, to be achieved merely by the multiplication of rules and officials it has frequently happened that officers designed for the promotion of welfare have in fact been little more than additional police officers.'

আরো দেখুন, বাংলাদেশের সামাজিক অগ্রগতির সমস্যা গ্রন্থে মোহাম্মদ আনিসুর রহমানের বক্তব্য, পৃ. ৪৫।

১৯১. Rene Dumont, *False Start in Africa*, Andre Deutsch, London, p. 78. One is tempted to recall the description of the state bureaucracy in France as 'an appalling parasitic body', See Karl Marx, *The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte*, Progress Publishers, Moscow, 1972. p. 104.

১৯২. মোহাম্মদ আনিসুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫।

১৯৩. এ বিষয়ে বার্মা সরকারের কিছু রিপোর্টে যথাযথ মন্তব্য করা হয়েছে। যেমন, কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে—

'the frequent transfer of officers from one place of appointment to another, merely to suit the convenience of the Central Government in such matters as leave or promotion.... If a man with an interest in agriculture remains in a place for little longer than a single harvest, and is

followed by some one keen on education who hardly stays long enough to build a school and this man in turn succeeded by some one who for a few months tries to improve public health, any transient interest they may arouse among the people will not long out last their departure. The frequency of transfer killed initiative and fostered apathy, so that even public spirited officials deteriorated into mechanical drudges.' See, *the Final Report of the Administration Reorganisation Committee 1951*, p. 10.

আরেকটি রিপোর্টে বলা হয়েছে-

'We would, however, like to bring to the attention of Government that the structure of the service and the wide interchangeability between the districts and the centre and also between the various Ministries would need some careful examination and reappraisal. For instance, though it can easily be maintained that an experienced Deputy Commissioner could acquit himself efficiently as a Secretary to the Government in the Ministries which are concerned with Social Welfare, Local Government, Agriculture and Land Nationalisation, it is open to question whether district experience alone would render him fully competent to be the administrative head in such Ministries as Trade Development, Industry, National Planning, or Finance and Revenue, *Report of the Public Services Enquiry Commission, 1961.* p. 138. Also see Iswar Dayal & others, *District Administration*, p. 61.

১৯৪. Nurul Islam, *Development Planning in Bangladesh.* p. 3. কাজী জাওয়াদ, 'অদৃশ্য শাসক', বিচিত্রা, ২১. ৩. ১৯৮০।

১৯৫. Nurul Islam, *op. cit.*, p. 261.

১৯৬. For some insightful comments on how this extraction of surplus has created a crisis of the bourgeois state in

Bangladesh, see Rehman Sobhan and Muzaffer Ahamad, *op. cit.*, pp. 562-70. বাংলাদেশের সামাজিক অগ্রগতির সমস্যা গ্রন্থে মহিউদ্দিন আলমগীরের বক্তব্য, পৃ. ৫৪-৫৫।

১৯৭. বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন, হায়াৎ মামুদ, বাংলাদেশে মাতৃভাষার অধিকার, সাহিত্য সমবায়, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ ১৫।

১৯৮. ঐ, পৃ. ৫৯।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পূর্ব পাকিস্তান : পার্লামেণ্টারি শাসন

১ পূর্ব পাকিস্তান বনাম পশ্চিম পাকিস্তান

আলাপ-আশ্রয়ী ইতিহাস (ওবাল হিস্ট্রি) কখনো কখনো তুলে ধবে বিভিন্ন সামাজিক শক্তিব মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কে গভীব অন্তর্দৃষ্টি। অন্য কোন ঐতিহাসিক উপাদান সম্পর্কে একথা সমভাবে প্রযোজ্য নয। অন্যান্য সব উপাদানে পাওযা যাবে না হযতো ব্যক্তিত্ব / ইচ্ছাব অনববত সংঘাত যা প্রতিযোগী বিভিন্ন সামাজিক গ্রুপেব ক্রমবর্ধমান ফাটলেব প্রতিচ্ছাযা। আধিপত্য বিস্তাবকাবী গ্রুপ, যেমন, অবাঙালী আমলাবা শুধু কথায নয, কাজেও তাদেব প্রতিপক্ষ বাঙালী আমলাদেব দেখাতে কসুব কবত না যে তাবা উচ্চমার্গেব।[১] বাঙালী আমলাবা [ও বাজনীতিবিদবা] অবাঙালী আমলাদেব তুলনায সাধাবণত এসেছেন কম ক্ষমতাশালী সামাজিক বাজনৈতিক স্তব থেকে। এ কাবণে, প্রথমোক্তদেব মনে সৃষ্টি হযেছে খানিকটা জাতিগত উচ্চ ধাবণা [নক্শা ১]। ক্ষমতা প্রদর্শনেব জন্য, অবাঙালী আমলাবা যা খুশি তা কবতে দ্বিধা কবতেন না। নিজেদেব জন্য ববাদ্দ কবতেন তাঁবা ভালো পোস্টিং ও অপেক্ষাকৃত উচ্চ পদ [নক্শা ২]।[২] একটি উদাহবণ দিলেই বিষযটি স্পষ্ট হবে। পাকিস্তান হওযাব পব মাত্র যুগ্ম-সচিবেব পদমর্যাদায যাওযাব জ্যেষ্ঠতা নিযে আজিজ আহমদ নিযুক্ত হযেছিলেন পূর্ববাংলা সবকাবেব মুখ্য সচিব।[৩] যখন কোন বাঙালী আমলা অবিচাবেব বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেন, [মৌখিকভাবে হলেও] তখন তাঁব বিরুদ্ধে নেওয়া হতো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা [নক্শা ৩], যেমন, ঝামেলাপূর্ণ বদলি। হযতো, অবৈধ ক্ষমতায নিজেকে বক্ষাব এক অদ্ভুত উপায় আছে : অসহিষ্ণুতা। এবং সে কাবণে, একজন অবাঙালী আমলা তাঁব চেযেও উচ্চতব পদে নিযোজিত বাঙালী আমলাব সঙ্গে খাবাপ ব্যবহাব কবতে পাবতেন, এবং অবাঙালী মুখ্য সচিব [আজিজ আহমদ] সাহস বাখতেন পূর্ববাংলা সবকাবের মন্ত্রী পবিষদেব সিদ্ধান্ত নাকচ কবাব [নক্শা ৪]।[৪] এমনকি অবাঙালী পুলিশ কনস্টেবলও তাঁদেব বাঙালী সহকর্মীব তুলনায় ভোগ কবতেন বেশি সুযোগসুবিধা [নক্শা ৫]।[৫] শুধু প্রমোশনেব ব্যাপাবেই নয়, সবকার সরববাহকৃত উপকবণাদির ক্ষেত্রেও ছিল' একথা প্রযোজ্য। একজন

অবাঙালী আমলা তার অধস্তন বাঙালী সহকর্মীর সঙ্গে ভাড়াখাটা কুলির মতো আচরণ করতে দ্বিধা করতেন না [নকৃশা ৬]।[৬] একবার তো বাঙালী একজন অফিসারকে বলা হয়েছিল নদী সাঁতরে অন্য পারে যেতে যেহেতু নদী পারাপারের নৌকো ছিল না। অবাঙালী আমলাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ এই আচরণ হয়তো সাহসী করে তুলেছিল অধস্তনদের, যার একটি উদাহরণ ১৯৪৮-এর দিকে যশোরে বাঙালীদের বিরুদ্ধে অবাঙালীদের রায়ট [নকৃশা ৭]। [১৯৭১-এ ও এমনটি ঘটেছিল, অবশ্য অনেক ব্যাপক আকারে]।

কিন্তু, সবক্ষেত্রে বাঙালী আমলারা যে তা মেনে নিয়েছিলেন তা নয়। অবাঙালী আধিপত্যের বিরুদ্ধে নানা ভাবে তারা প্রতিবাদ করেছেন— যা বিশ্বের অন্যান্য দেশের পণ্ডিতদের আমলাতন্ত্র সম্পর্কে ছাঁচে ঢালা দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এমনকি, প্রশিক্ষণকালে চাকরি হারাবার ঝুঁকি নিয়েও তরুণ বাঙালী আমলা প্রতিবাদ করেন। বাংলা ভাষাকে হেয় করার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে— [নকৃশা ৮]।[৭] যেহেতু, অবাঙালী আমলাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ছিল বাঙালী আমলাদের, তাই তাঁরা বিভিন্নভাবে সহায়তা করার চেষ্টা করতেন বাঙালী রাজনীতিবিদদের। একজন রাজনীতিবিদ-এর স্ত্রীকে জেলে স্বামীর শুশ্রূষা করার জন্য সারারাত থাকার মতো ঝুঁকিপূর্ণ অনুমতি দিতেও তাঁরা দ্বিধা করেননি [নকৃশা ৯] এবং একই কারণে, প্রাক্তন একজন বাঙালী প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে খবর যোগাড় করার জন্য অবাঙালী গোয়েন্দা প্রধানের নির্দেশ বাঙালী অফিসার গেছেন এড়িয়ে [নকৃশা ১০]।[৮]

ন কৃ শা

১. অনেকেই জানিয়েছেন, তাঁদের চাকুরী জীবনের শুরুতে [পঞ্চাশের দশকে] লক্ষ্য করেছেন, পশ্চিম পাকিস্তানীরা প্রায় ক্ষেত্রে, তাঁরা যে জাতিগতভাবে বাঙালীর ওপরে, বিভিন্নভাবে তা প্রকাশের চেষ্টা করতেন। ঐ সময়, পূর্ব পাকিস্তানে যেসব পশ্চিমা আমলা কর্মরত ছিলেন তাদের সমাজও ছিল আলাদা। পূর্ব পাকিস্তানের আমলা ও রাজনীতিবিদদের তাঁরা কী চোখে দেখতেন তার একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

গুরমানী ছিলেন পাঞ্জাবের গভর্নর। তিনি একবার একজন উচ্চপদস্থ বাঙালী আমলার সহকর্মীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আচ্ছা, পূর্ব পাকিস্তানে যেসব রাজনীতিবিদ ও আমলা শাসন করছেন তাঁরা সমাজের কোন্ স্তর থেকে এসেছেন ?' ভদ্রলোক উত্তর দিয়েছিলেন, 'সাধারণ স্তর থেকে।' গুরমানী তখন বলেছিলেন,

'ইফ উই হ্যাভ টু লিভ উইথ পিপল অফ ডাস্ট ফ্রম ঈস্ট পাকিস্তান, তা'হলে তো চলবে না।'

২. 'আমাদের কে সব সময় দমিয়ে রাখার চেষ্টা করত কেন্দ্রীয় সরকার', বললেন এক অবসরপ্রাপ্ত সচিব [সি এস পি] 'আমাদের নিয়োগ করা হতো গুরুত্বহীন পদে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পঞ্চাশের দশকে যখন আমাদের মহকুমা প্রশাসক নিয়োগ করা হলো তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাঙালী সি এস পি-দেব নিয়োগ করা হলো সীমান্তবর্তী মহকুমাগুলিতে।' তিনি আবো জানালেন যে, প্রমোশনেব সময়ও ছিল একই নীতি। সবচেয়ে বড় উদাহরণ, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের চিফ সেক্রেটারি আজিজ আহমদ। যে সময় মাত্র তাঁর যুগ্ম-সচিব হওয়ার কথা সে সময় হয়ে গেলেন তিনি চীফ সেক্রেটারি।

৩. পঞ্চাশের দশকে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান থেকে সিভিল সার্ভিস পেয়েছিলেন ক। কিন্তু তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছিল পাঞ্জাবে। বছর পাঁচেক পাঞ্জাবে কাজ করার পর, তাঁকে বদলি করা হয়েছিল আবার ঢাকায়। এখানে তাঁকে হোম পলিটিকাল বিভাগে ডেপুটি সেক্রেটারি নিযুক্ত করা হয়েছিল। পাঞ্জাব থেকে ফেরার পব ক-এব কাছে যেটা আশ্চর্য লেগেছিল তা হল, তাঁর সমসাময়িক বন্ধুরা তখনো এ ডি এম অথচ, পাঞ্জাবে থাকার সুবাদে তিনি প্রমোশন পেয়ে হয়ে গেছেন ডি এম। সি এস পি অফিসারদের এক সভায় এ কথাটি তিনি উঠিয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য পশ্চিমা কর্তাব্যক্তিদের পছন্দ হয়নি এবং এর ফলও পেয়েছিলেন তিনি হাতে হাতে।

ঐ ঘটনার কয়েকদিন পর অফিসে গিয়ে তিনি দেখলেন, তাঁকে ডি এম হিসেবে বদলি করা হয়েছে এক জেলায়। অথচ মাস কয়েকের মধ্যেই বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্য তাঁর বিদেশ যাওয়ার কথা। বদলির আদেশ হাতে নিয়ে তিনি গেলেন অবাঙালী চীফ সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করতে। চীফ সেক্রেটারি তাঁকে দেখে বললেন, 'তুমি কি ট্রান্সফার অর্ডারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে এসেছ?' 'ক' বললেন, 'না. আমি শুধু জানাতে এসেছিলাম যে, একজন ডি এম-এর কার্যকাল সাধারণত তিন বছব। আমি বিদেশ যাব তিন-চারমাস পর। সুতরাং এই অল্পসময়ের জন্য একটি জেলায় আমাকে পাঠিয়ে কী লাভ?'

চীফ সেক্রেটারি এ প্রসঙ্গে আর কথা বলতে চাইলেন না। শুধু ক-কে বললেন, এ ট্রান্সফার অর্ডার না মানলে তাকে সাসপেণ্ড করা হবে। ক কিছু না বলে চলে গেলেন।

তখন আবুহোসেন সরকার মুখ্যমন্ত্রী। মন্ত্রীসভার বেশ কয়েকজন সদস্য চাইলেন প্রসঙ্গটি কেবিনেট মিটিংয়ে আলোচনা করার জন্য। তাঁরা ব্যাপারটিকে দেখছিলেন একজন পশ্চিমা আমলা কর্তৃক বিনা কারণে একজন বাঙালী আমলার অপমান হিসেবে। কিন্তু ক তাতে রাজী হননি। তিনি সিভিল সার্ভিসের শৃংখলা ভাঙতে চাননি। তা ছাড়া রাজনীতিবিদদের সঙ্গেও নিজেকে জড়াতে চান নি। কারণ, তাঁরাও যে ভবিষ্যতে সেই চীফ সেক্রেটারির মতো ব্যবহার করবে না তার নিশ্চয়তা কোথায় ?

৪. পঞ্চাশের দশকে, পশ্চিম পাকিস্তানী বিশেষ করে পাঞ্জাবী আমলাদের দাপট ছিল অসম্ভব। উদাহরণস্বরূপ আলতাফ গওহরের কথা উল্লেখ করা যায়। ঐ সময় তিনি ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের হোম-পলিটিকাল বিভাগের সামান্য উপ-সচিব। কিন্তু দেখা গেছে, এস পি বা সমপদমর্যাদার এমনকি ডি আইজিদের রিপোর্টও তাঁর মনোমত না হলে ছুঁড়ে ফেলে দিতেন এবং ধমক দিতেন। এর একটি কারণ ছিল, যা আগেই উল্লেখ করেছি, জাতিগত বিদ্বেষ। এ ছাড়া, বিরোধীদলগুলি সম্পর্কে সবসময় তিনি চাইতেন, পুলিশ যেন বিদ্বেষমূলক রিপোর্ট দেয়। প্রশাসনে তাদের প্রভাব এমনই ছিল যে মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত তাদের সমঝে চলতেন। এর একটি উদাহরণ তুলে ধরছি নীচে।

পঞ্চাশের দশকে পূর্ব-পাকিস্তানের চীফ সেক্রেটারি ছিলেন আজিজ আহমদ। প্রাদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রী ছিলেন হামিদুল হক চৌধুরী। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে প্রস্তাব করা হয়েছিল ভারতে ঢোল রপ্তানি করা যেতে পারে। প্রাদেশিক কেবিনেট এ প্রস্তাব অনুমোদন করে। সিদ্ধান্তটি পছন্দ করেননি আজিজ আহমদ। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে তিনি ঢোল রপ্তানী বিষয়ক ফাইলটি চেয়ে পাঠান এবং তাতে লিখে দেন যে, ভারতে ঢোল রপ্তানি করা যাবে না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী বা স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীও সরকারী কর্মচারীর এই ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেননি। এর প্রধান কারণ, সবাই জানতেন যে, আজিজ আহমদ জিন্নাহের মনোনীত লোক। আজিজ আহমদকে চটালে জিন্নাহও চটে যেতে পারেন। এবং কেন্দ্র হয়তো প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা ভেঙে দিতে পারে।

৫. একজন অবসরপ্রাপ্ত আই জি তাঁর চাকুরিজীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে জানিয়েছেন, ১৯৪৮ সালে ঢাকায় যে পুলিশ ধর্মঘট হয়েছিল তার প্রধান কারণ ছিল, বিহারী বা পাঠান পুলিশদের প্রতি কর্তৃপক্ষের পক্ষপাতিত্ব।

১৯৪৭ সালের আগে পুলিশ বাহিনীর অধিকাংশ ছিল বিহারী হিন্দু। ১৯৪৬ সালে শাহীদ সোহরাওয়ার্দী বাংলার প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন বেশ-কিছু পাঠানকে নিয়েছিলেন পুলিশ বাহিনীতে। ১৯৪৭ সালের পর এরা ঢাকায় চলে আসে। উপরের দিকে পুলিশ অফিসাররা তখন ছিলেন অবাঙালী। তাই স্বাভাবিক ভাবেই এঁরা অবাঙালী সিপাহীদের ক্ষেত্রে প্রমোশান, এমনকি রেশন বিতরণের ব্যাপারেও পক্ষপাতমূলক আচরণ করতেন। ১৯৪৮ সালের ঢাকার পুলিশ ধর্মঘটের এটি ছিল একটি বড় কারণ।

৬. পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি ক তখন নারায়ণগঞ্জের এস ডি পি ও। বিভাগীয় ডি আই জি ছিলেন একজন মাদ্রাজী।

নারায়ণগঞ্জে আভ্যন্তরীণ জল পরিবহন সংস্থার অফিস। সেই অফিসে একদিন ইউনিয়ন সংক্রান্ত এক ঝামেলা হলো যাতে জড়িত ছিলেন স্থানীয় ফায়ার বিগ্রেডের একজন অফিসার। এই অফিসারের সঙ্গে আবার খাতির ছিল মাদ্রাজী ডি আই জি-র। তিনি তখুনি তাঁর বন্ধু ডি আই জি-কে অভিযোগ জানিয়ে বললেন, এস ডি পি-ও তৎপর হলে ইউনিয়নের ঝামেলা হতো না।

বন্ধুর আহ্বানে ডি আই জি ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ থানায় এসে উপস্থিত। থানায় পৌঁছে ডেকে পাঠালেন তিনি ক-কে। ক তখনো ইউনিয়ন সংক্রান্ত ঘটনাটি পুরোপুরি জানতেন না।

যা হোক, তলব পেয়ে তিনি থানায় এলেন। ডি আই জি তাঁর কাছে কৈফিয়ৎ দাবি করে বললেন, কেন সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণগঞ্জ থানা যথাযথ ব্যবস্থা নেয়নি। ক জানালেন, ঘটনাটা ঘটেছিল নদীর ওপারে। সময়মতো খবর পেলেও তিনি পৌঁছতে পারতেন না ঘটনাস্থলে। কারণ, নদী পেরুবার তেমন বন্দোবস্তও নেই। নৌকো যোগাড় করে, পেরুবার বন্দোবস্ত করতে সময় লাগে। ডি আই জি বললেন, 'নৌকো নেই তো সাঁতার দিয়ে পেরুলেন না কেন?'

ক এ কথায় অপমানিত বোধ করলেন। যদিও তাঁর চাকুরি তখন নতুন, তবুও তিনি ডি আই জি-কে বিনীতভাবে অনুরোধ জানিয়ে বললেন, যেন তিনি সংযত ভাবে কথা বলেন। ডি আই জিও চটেমটে চলে গেলেন ঢাকায়।

ক তখন তাঁর ওপরওয়ালা এস পি-কে ঘটনাটি জানালেন। তিনি ভেবে-ছিলেন, পরে কোনো ঝামেলা হলে এস পি নিশ্চয় তার অধস্তন অফিসারকে সাহায্য করবেন।

ডি আই জি কিন্তু ক-র প্রতিবাদ ভোলেননি। অধস্তন অফিসারের সঙ্গত

প্রতিবাদকেও তিনি ধরে নিয়েছিলেন অপমান হিসেবে। ঢাকায় ফিরেই তিনি আই জি-কে অনুরোধ জানালেন ক-কে যেন তখুনি নারায়ণগঞ্জ থেকে বদলি করে দেওয়া হয়। আই জি মেনে নিলেন ডি আই জি-র কথা। এখানে উল্লেখ্য যে, এস পি যাঁর ওপর ক নির্ভর করেছিলেন অনেকটা তখন নিশ্চুপ থাকাই শ্রেয় মনে করেছিলেন।

৭. ১৯৪৮ সালে যশোরে বিহারী ও বাঙালীদের মধ্যে ছোটখাটো একটি দাঙ্গা বেঁধেছিল। যশোরের ডি এম এবং এস পি দু'জনেই ছিলেন অবাঙালী। ফলে যশোরের বাঙালীরা সন্ত্রস্ত হয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন। তাঁরা আশঙ্কা করছিলেন অবাঙালী ডি এম এবং এস পি বিহারীদের পক্ষাবলম্বন করবেন। ক ছিলেন তখন অন্য এক জেলার সহকারী পুলিশ সুপার। তাঁকে তখন যশোরে বদলি করা হয়েছিল। যশোরের বাঙালীরা, পুলিশ বাহিনীতে একজন বাঙালী অফিসারের উপস্থিতি দেখে খানিকটা আশ্বস্ত হয়েছিলেন এবং তা সাহায্য করেছিল জেলার টেনশন কমানোয়।

৮. ক পাকিস্তান পুলিশ সার্ভিসে যোগ দিয়েছিলেন পঞ্চাশের দশকে। তিনি যখন ট্রেনিংয়ের জন্য সারদা পুলিশ একাডেমীতে তখন ভাষা আন্দোলন শুরু হয়েছে। ভাষা আন্দোলনের আঁচ সঞ্চারিত হয়েছিল আরো অনেকের মতো তাঁর মধ্যেও।

পুলিশ একাডেমীতে শিক্ষানবীশ অবাঙালী অফিসারদের তখন শিখতে হতো বাংলা এবং বাঙালীদের উর্দু। ক এবং তাঁর কয়েকজন বাঙালী সহকর্মী উর্দু পরীক্ষা দিতে রাজী হলেন না। ভাষা আন্দোলন তখন আরো তীব্র আকার ধারণ করেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ তখন ভাষা পরীক্ষাই উঠিয়ে দিয়েছিলেন।

৯. বাঙালী সিভিল সার্ভেন্টরা মনে মনে অবাঙালী সিভিল সার্ভেন্টদের আধিপত্যে ছিলেন অখুশি। তাই বাঙালী রাজনীতিবিদদের সঙ্গে এক ধরনের আঁতাতে সব সময় তাদের ঝোঁক ছিল। বন্দী বাঙালী রাজনীতিবিদদের সাহায্য করতে তাঁরা সবসময় ছিলেন তাই সচেষ্ট। এ প্রসঙ্গে একজন যুগ্ম-সচিব একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন।

পঞ্চাশের দশকে, শেখ মুজিব জেলে। সেখানে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলেন। এ কথা জানতে পেরে বাঙালী পুলিশ অফিসাররা গোপনে বেগম মুজিবকে জেলে নিয়ে এসেছিলেন। এবং স্বামীর সঙ্গে জেলের ভিতরে এক রাত থাকতে দিয়েছিলেন।

১০ ক যখন ছাত্র তখন তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল সোহরাওয়ার্দীর। তারপর ক যখন এস ডি পি ও, সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে তখন তাঁর আবার দেখা হয়েছিল এবং সোহরাওয়ার্দী তাঁকে চিনেছিলেন। এরপর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সোহরাওয়ার্দী সফরে এলেন পূর্ব পাকিস্তানে। ক তখন একটি জেলার এস পি। প্রধানমন্ত্রী এবারও তাঁকে চিনলেন এবং জেলা সফরের সময় সঙ্গে নিলেন তাঁকে। ফলে ক-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় আরো গাঢ় হয়েছিল।

কিছুদিনের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীত্ব হারালেন সোহরাওয়ার্দী। নাগরিক সোহরা-ওয়ার্দী এবার এসেছেন ঢাকায়। উঠেছেন হোটেল শাহবাগে। বিকেলে বেড়াতে আসেন রেসকোর্সে [সোহরাওয়ার্দী উদ্যান]। কিছুদূর থেকে পুলিশের চররা নজর রাখে তাঁর ওপর। ক তখন ঢাকায় সি আই ডি বিভাগে কর্মরত। তিনিও রোজ বিকেলে, ভ্রমণের জন্য আসেন রেসকোর্সে।

এমনি একদিন বিকেলে, ক এসেছেন রেসকোর্সে। গাড়ি থেকে নেমে হাঁটছেন তিনি। হঠাৎ দেখলেন, সোহরাওয়ার্দীর মতন দেখতে একজন হেঁটে আসছেন। কাছে আসতেই বোঝা গেল আসলেই তিনি সোহরাওয়ার্দী। এবারও সোহরাওয়ার্দী চিনলেন ক-কে। কুশল বিনিময় করলেন দু'জনে। একসঙ্গে হাঁটলেন দু'জন কিছুক্ষণ। একসময় ভ্রমণশেষে দু'জন এসে দাঁড়ালেন ক-এর গাড়ির সামনে। সোহরাওয়ার্দী বললেন, তাঁর একটু বনানী যাবার দরকার [বনানী তখন ঢাকার বাইরের অঞ্চল হিসেবে পরিগণিত] কিন্তু গাড়িঘোড়া নেই সঙ্গে। ক বললেন, তাঁর যদি আপত্তি না থাকে তবে ক নিজের গাড়িতে তাঁকে পৌঁছে দিতে পারেন। রাজী হলেন সোহরাওয়ার্দী।

কিছুদিন পর, সি আই ডি প্রধান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এলেন ঢাকায়। ক-এর ডাক পড়ল তাঁর অফিসে। একথা-সেকথার পর সোহরাওয়ার্দী প্রসঙ্গ উঠল। ক এ সুযোগে কয়েকদিন আগে সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের পুরো বিবরণ দিলেন, কারণ রিপোর্টে তিনি তা উল্লেখ করেননি।

পরের দিন। নানা কথার পর সি আই ডি প্রধান বললেন ক-কে, 'তোমার সঙ্গে তো সোহরাওয়ার্দীর বেশ ভালো পরিচয় আছে। একটা কাজ করতে হবে তোমাকে। তাঁর স্যুটকেসে একটা বই আছে, আমেরিকা থেকে প্রকাশিত। ওটা আমাদের দরকার। বইটা তোমার হাতিয়ে আনতে হবে স্যুটকেস থেকে।'

সি আই ডি বিভাগে কর্মরত থাকা সত্ত্বেও এ প্রস্তাবে বিস্মিত হলেন ক। থ্রিলারে তিনি এ ধরনের উপাখ্যান পড়েছেন বটে কিন্তু বাস্তবে যে তাঁকে এ কাজ

করতে হবে তা ভাবেননি। স্বাভাবিক ভাবেই তিনি এ প্রস্তাবে রাজী হলেন না। নানা অজুহাত তুলে ক সেদিন অব্যাহতি পেয়েছিলেন সি আই ডি প্রধানের হাত থেকে।

২ সাধারণ প্রশাসন

আমলারা জনস্বার্থ এবং পেশাগত দক্ষতা তুলে ধরতে পারে যদি তাঁদের থাকে সাধুতা, সহানুভূতি, সাহস, ধৈর্য এবং বিচক্ষণতা। একটি পরিস্থিতিতে, যেখানে উচ্চ ও নিম্নপদস্থ কর্মচারীরা ব্যর্থ হয়েছে, সে ক্ষেত্রে একজন পুলিশ অফিসার [নকৃশা ১১] হয়তো দেখাতে পারেন এ ধরনের গুণাবলী, এবং সহানুভূতিশীল হয়ে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবির কথা শুনে মেটাতে পারেন বন্দর ধর্মঘট।[৯] একই ভাবে [নকৃশা ১২] একজন পুলিশ অফিসার স্টিমার কোম্পানির শ্রমিক ধর্মঘটিদের বুঝিয়ে প্রত্যাহার করিয়ে নেন ধর্মঘট।[১০] অথচ এ কাজেব দায়িত্ব কোম্পানির ম্যানেজারের। শক্তি প্রয়োগ না করে, কোম্পানির ধর্মঘট প্রত্যাহারের ব্যাপাবে পুলিশ অফিসারের সাফল্য শুধু কোম্পানি ম্যানেজারের ব্যর্থতাই তুলে ধবে না, সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নও তুলে ধরে যে, বিত্তবানদের হয়ে কাজ করায় পুলিশের যে ঝোঁক তা কি ঠিক ? অনেক সময়, একজন পুলিশ অফিসার শক্তি প্রয়োগ করতে চান না— যেমন, ছাত্র ধর্মঘটের বেলায় [নকৃশা ১৩]— যেখানে কলেজের অধ্যক্ষ [একজন ইউরোপীয় অবসরপ্রাপ্ত আই-সি-এস অফিসার] চাচ্ছেন পুলিশের হস্তক্ষেপ। এ ক্ষেত্রে কিন্তু তিনি ঝুঁকি নিচ্ছেন খানিকটা। কারণ, হঠাৎ করে অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে, হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে যেতে পারে, এবং তার সংযমকে হয়তো সমালোচকরা তখন ব্যাখ্যা করতেন 'বিচার বিবেচনাহীন' বলে। কিন্তু ঝুঁকি নেওয়া তাঁর পক্ষে সহজ হয়, যখন তাঁর ওপরওয়ালা সমর্থন জানান তাঁকে [নকৃশা ১৩]।

সহকর্মীদের নিগ্রহ থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করার জন্য আমলাদের সতর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। উদাহরণস্বরূপ নিম্নপদস্থ পুলিশ কর্মচারীদের উপদ্রব মনে আসে [নকৃশা ১৪ ও ১৫]। নিম্নপদস্থ অনেক সরকারী কর্মচারী সাধারণ মানুষকে ঝামেলায় ফেলার জন্য মিথ্যা মামলা তৈরি করতে পারে। একজন জনস্বার্থ রক্ষাকারী প্রশাসককে সহকর্মীদের এ ধরনের আইনের অপব্যবহার থেকে বিরত রাখতে হবে [নকৃশা ১৫], যাতে পরবর্তীকালে এ থেকে উদ্ভূত বেদনাদায়ক পরিস্থিতি হতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।[১১]

একজন প্রশাসক সামান্য অসাবধানতার জন্যও সম্মুখীন হতে পারেন অত্যন্ত বিব্রতকর অবস্থার। এমনও হতে পারে যে কোনো কিছুর সঙ্গে না থেকেও তিনি হারাতে পারেন সুনাম। এমনকি একটি কারখানায় নিছক পরিদর্শনও প্রতিদ্বন্দ্বী অপর এক কারখানার মালিককে সুযোগ দিতে পাবে কুৎসা রটনার। সুতরাং একজন প্রশাসককে কৌশলী হয়ে, একই এলাকাব প্রতিদ্বন্দ্বী দু'জন মিল মালিকের মিল পরিদর্শন করতে হয় [নক্শা ১৬], যাতে বজায় থাকে ভারসাম্য। এখানে প্রশাসক তুলে ধরেন তাঁব নিবপেক্ষতার দৃষ্টান্ত, এবং এটিও গুরুত্বপূর্ণ কারণ তা অকারণ সমালোচনার উৎস বিনাশ করে।

কোন কোন লেখকের মধ্যে একটি ঝোঁক দেখা যায়, রাজনীতিবিদদের দোষারোপ করার, কারণ, তাঁদেব মতে, রাজনীতিবিদরা জনস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে প্রাধান্য দেন সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থের ওপব। কিন্তু, এটা হয়তো অনেকের চোখ এড়িয়ে যায় যে বেশ-কিছু উর্ধ্বতন অফিসার [যেমন, এখানে উল্লিখিত নক্শাসমূহে : আই জি-র ঘটনা] নিজেই শাসক রাজনীতিবিদদের পক্ষপাত সমর্থন কবে তাদের অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপে আমন্ত্রণ জানান। এসব অফিসাররা নিশ্চয় পেশাগত নীতি উর্ধ্বে রাখার ব্যাপাবে আগ্রহী নন। অবসর গ্রহণের আগের ও পবের কথা ভেবে নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তাঁরা এটি করেন। সাধারণ মানুষবা জেনে হয়তো আশ্বস্ত হবেন যে, উর্ধ্বতন অফিসাবদের এ ধবনেব মনোভাব অধস্তনদের সবক্ষেত্রে প্রভাবিত করে না। অনেকে মনে করতে পাবেন, ন্যায্য কাজ কবতে গিয়ে তাঁরা বহুবার অপদস্থ হয়েছেন, সুতরাং ঐ সব ঝুট ঝামেলায় না গিয়ে সুবিধাবাদী পথে থাকাই ভালো। কিন্তু, তাঁরা এটাও জেনে রাখুন যে, এ অজুহাত কোন কাজের কথা নয়। এখানে উল্লিখিত নক্শাসমূহে দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রে, অধস্তন অফিসাররা স্বার্থান্বেষী উর্ধ্বতন অফিসারদের রাজনীতি সম্পৃক্ত নির্দেশ প্রতিরোধ করেছেন। অথবা তা এড়িয়ে গেছেন, কিন্তু সে কারণে বিপাকে পড়েননি। অতএব আমরা বলতে পারি, রাজনীতিবিদদের প্রত্যক্ষ এবং উর্ধ্বতন অফিসারদের পরোক্ষ রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের ভয়, একজন আমলার পেশাগত দক্ষতা বা জনস্বার্থ সমুন্নত রাখার ক্ষেত্রে অকাট্য অজুহাত বা অলঙ্ঘনীয় প্রতিবন্ধক হতে পারে না।[১২]

১৭ নম্বর নক্শায় একজন তরুণ এস পি উপেক্ষা করেন আই-জির বেআইনী নির্দেশ যা আই জি জারি করেছেন শাসক রাজনীতিবিদকে খুশি করার জন্য। এই এস পি নতি তো স্বীকার কবেন-ই না, বরং জনৈক 'নেতা'কে অনুরোধ জানান সেই ও সি-র বিরুদ্ধে প্রমাণপত্র দাখিলের জন্য যাকে 'নেতা' অপছন্দ

করেন। পিছু হটেন 'নেতা'। এস পি-র কিন্তু কোন ঝামেলা পোহাতে হয় না চাকরি ক্ষেত্রে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের সময়, একজন আই জি ক'মিশনার, এমনকি স্বরাষ্ট্র সচিবও বিভিন্ন এলাকা সফর করে অফিসারদের প্ররোচিত করার চেষ্টা করেন মুসলিম লীগকে সমর্থন প্রদানের জন্য। নক্শা ১৮ এবং ১৯-এ দেখা যায় অফিসাররা প্রতিহত করেছেন এ ধরনের নির্লজ্জ কৌশল। কিন্তু এ জন্য তাঁদের কোন শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়নি। ১৯-নম্বর নক্শায় দেখি একজন বিবেকবান অফিসার ওপরওয়ালার সুনির্দিষ্ট নির্দেশ পেলেন একজন রাজনীতিবিদকে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করার, কিন্তু বিবেকবান বিধায় কৌশলে তিনি রাজনীতিবিদকে ক্ষুব্ধ না করে পালন করলেন ওপরওয়ালার নির্দেশ।[১০]

কম উন্নত দেশের (L. D. C.) ওপর পাশ্চাত্যের কিছু লেখায়. প্রশাসক (আমলা)দের বিশেষ করে সামরিক ব্যক্তিদের দেখানো হয়েছে ত্রাণকর্তা হিসেবে। এবং বিপরীতে ছাঁচে ঢালা রাজনীতিবিদকে দেখানো হয় একজন যুক্তিহীন ব্যক্তি হিসেবে। শুধু তাই নয় তাকে চিত্রিত করা হয় কর্মে আগ্রহী প্রশাসকদের প্রতিবন্ধক হিসেবেও। পাশ্চাত্যের এই ধরনের লেখকরা প্রায় ক্ষেত্রেই অনুধাবন করতে পারেন না যে, এল ডি সি'র একজন রাজনীতিকের ওপর কত ধরনের চাপ থাকে। একজন রাজনীতিবিদ, যাঁর হাতে সম্পদ সীমিত. তাঁর ওপর বিভিন্ন স্বার্থের চাপ এমন ভাবে থাকে যে, প্রায় ক্ষেত্রেই পরিণত হন তিনি একজন বিপর্যস্ত ব্যক্তিত্ব হিসেবে। তাই পার্লামেণ্টারি আমলে, একজন মন্ত্রীর সুপারিশ অনেক ক্ষেত্রে একজন আমলার কাছে বাড়াবাড়ি বা মজার মনে হতে পারে। একজন মন্ত্রী যদি সঠিক সিদ্ধান্ত না নিয়ে থাকেন তা'হলে একজন অফিসারের পক্ষে তাঁকে বোঝানো সম্ভব। এমনকি তিনি উপেক্ষা করতে পারেন বিশ্বরাজনীতির বাধ্যবাধকতা, শ্রমিক আন্দোলনের ওপর সরকারী রিপোর্টে কমিউনিস্ট অনুপ্রবেশের উল্লেখ করার নির্দেশও। যখন শ্রম বিভাগের একজন পদস্থ কর্মকর্তা [নক্শা ২০] এ ধরনের অভিযোগ তাঁর রিপোর্টে যোগ করতে অনীহা প্রকাশ করেন তখন প্রাদেশিক মন্ত্রী শেখ মুজিব তাঁকে তা করতে বাধ্য করেননি। ঐ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে [মধ্য পঞ্চাশ দশকে] ঘটনাটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ পাকিস্তান সরকার তখন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে নতজানু। আর যুক্তরাষ্ট্র তখন ভিত্তিহীন এ ধরনের অভিযোগ শুনলেই রিপোর্টকারী মিত্র দেশকে টাকার থলে খুলে দেওয়ার জন্য ছিল প্রস্তুত। অবাক হওয়ার কিছু নেই যে একই ব্যক্তি তাঁর সেই মন্ত্রীকে [নক্শা ২১] সফল অনুরোধ করেন মন্ত্রীবন্ধুকে ক্ষমা না করার জন্য, যিনি ভেঙেছেন শ্রম

আইন।[১৪] একজন মন্ত্রী যাঁর মাথার ওপর প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ব, তাঁর পক্ষে খোঁজ রাখা সম্ভব নয় কোথায় কোন এক অসাধু আমলা নিজেকে রক্ষা করেছে মন্ত্রীর বন্ধু সেজে ও মন্ত্রীর নাম অন্যায়ভাবে ব্যবহার করে। যখন একজন বিবেকবান অফিসার দৃষ্টি আকর্ষণ [ও তথ্য সরবরাহ] করেন এ বিষয়ে মন্ত্রী তখন ঐ অসৎ ব্যক্তি সম্পর্কে নিজস্ব মতামত পরিবর্তন করেন [নক্শা ২২]।

বোঝা যাচ্ছে, প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা গ্রহণ করলে একজন সরকারী কর্মচারী কার্যকর হতে পারেন একজন মন্ত্রীকে জনস্বার্থ সংরক্ষণের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে [ব্যক্তিস্বার্থ, পার্টি স্বার্থের বিপরীতে]। অবশ্য এ ক্ষেত্রে তাঁর সদিচ্ছার ওপর বিশ্বাস থাকতে হবে জনপ্রতিনিধির। উদাহরণস্বরূপ, তিনি ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন একজন অসৎ ও নিপীড়নকারী অধস্তনের প্রতি যাঁর বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ অভিযোগ তুলেছেন সাধারণ জনসভায় [নক্শা ২৩]। এবং তার রেকর্ড যদি নিষ্কলঙ্ক হয়ে থাকে, তা হলে সেটা হয়ে ওঠে তাঁর সহায়। তখন বিরুদ্ধ-বাদীদের অভিযোগ ধোপে টেকে না, হতাশ তাদের হতেই হয় [নক্শা ২৪]। ওপরওয়ালার আস্থা অর্জন করলে বা সমর্থন পেলে একজন সরকারী কর্মচারীর পক্ষে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সহজতর [নক্শা ২৫]। এমনকি, একজন যদি অন্যায় নির্দেশ বোধ করতে গিয়ে নিঃসঙ্গবোধ করেন প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক অধিকর্তা থেকে, তা হলেও তিনি সফল হতে পারেন যদি তাঁর সাহস ও আত্মবিশ্বাস থাকে। উদাহরণস্বরূপ এখানে উল্লিখিত একটি ঘটনার কথা বলা যেতে পারে, যেখানে [নক্শা ২৬] এ ধরনের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে একজন প্রশাসক বলেছিলেন, প্রয়োজনে তিনি চাকুরি ত্যাগ করবেন, কারণ, সমমানের চাকুরি পেতে তাঁর কোন অসুবিধা হবে না।

অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য যুক্তি মানতে চাইবেন না রাজনীতিবিদ। কোন কর্মচারী যদি পোস্টিং বা বদলির ক্ষেত্রে কোন রাজনীতিবিদের অনুরোধ শুনতে নারাজ হন, তা হলে কোন কোন রাজনীতিবিদ নিজেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পিছপা হবেন না [নক্শা ২৭]। তাছাড়া রাজনীতিবিদ হয়তো আবিষ্কার করবেন একজন কর্মচারী, যে তাঁর রাজনৈতিক প্রভুকে খুশি করার জন্য নির্লজ্জ কাজও করতে পারেন। যেমন, একজন প্রাদেশিক গভর্নর[১৫] মেয়েদের স্কুলের জন্য দান করা দালান আবার ফিরিয়ে নিয়েছিলেন সরকারী এক আমলার সহায়তায় [নক্শা ২৮]। সাধারণ লোক কিন্তু আশ্বস্ত হয়, যখন দেখে যে একজন সাহসী, সৎ ও আত্মবিশ্বাসী সরকারী কর্মকর্তার পক্ষে সম্ভব হয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশও উপেক্ষা করা

যিনি রক্ষা করতে চান একজন দুর্নীতিবাজ কর্মচারীকে, যেমন একজন অসৎ পুলিশ কনস্টেবলকে [নক্শা ২৯]।

জনস্বার্থ ও পেশাগত দক্ষতা রক্ষার জন্য বিবেকবান কর্মচারীর সম্ভাব্য ক্ষমতা বিশাল। আবার প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত পদক্ষেপ সময়মত নিয়ে বা না নিয়ে পেশাগত নীতি ও জনস্বার্থ বিনষ্ট করার ক্ষমতাও সরকারী কর্মচারীর প্রভূত। তাঁরা পারেন দায়িত্বহীনের মতো সিদ্ধান্ত নিতে বা এড়াতে। সব-কিছু মিলে এমন ধারণায় পেঁাছানো যায় যে, অনেক প্রশাসক চাকুরিতে থাকাকালীন যাবতীয় সুযোগসুবিধা গ্রহণ করেন কোন কিছুর দায়িত্ব না নিয়েই। একজন মহকুমা প্রশাসক অবিবেচকের মতো গোরুর গাড়ি চলাচল বন্ধের নির্দেশ দেন এমন এক অঞ্চলে যেখানে যান-বাহনের প্রধান মাধ্যমই হল গোরুর গাড়ি। এ নির্দেশ দিয়ে তিনি নববিবাহিতা স্ত্রীকে নিজের ক্ষমতা দেখাতে চেয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, স্ত্রী বাসার সামনে দিয়ে গোরুর গাড়ি চলাচল পছন্দ করছিলেন না [নক্শা ৩০]। একজন এস পি-কে সন্তুষ্ট করার জন্য একজন ও সি এস পি-র শ্যালিকার পক্ষে বানানো রিপোর্ট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন [নক্শা ৩১]।

অনেক ক্ষেত্রে ঔদাসীন্য, নিষ্ঠুরতা, এমনকি বিশ্বাসঘাতকতাও প্রশাসকদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার সঙ্গে মিশে থাকতে পারে। একজন সহকারী সচিব নতুন এক নিয়োগের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ একটি ফাইল লুকিয়ে রাখেন পাপোষের নিচে [নক্শা ৩২] কারণ, তিনি পক্ষপাত দেখাতে চান আরেকজন প্রার্থীর প্রতি। বালুচিস্তানে নিযুক্ত একজন পলিটিকাল এজেন্ট [আই সি এস] প্রতিদ্বন্দ্বী উপজাতিদের মধ্যে পানি সরবরাহ [গলে যাওয়া বরফ সৃষ্ট] করা থেকে নিজেকে বিরত রাখেন। অথচ, উপজাতিদের মধ্যে পানির অভাব তখন প্রচণ্ড। তথাকথিত স্বর্গজাত চাকুরির সদস্য তখন সমস্যা সমাধানের পথ আবিষ্কার করেন[১৬] : পানি বাষ্প হয়ে উবে যাওয়া পর্যন্ত সিদ্ধান্ত দেওয়া থেকে বিরত থাকেন (নক্শা ৩৩)। এই অফিসারই একজন ইনফর্মারকে তুলে দেন সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাতে, যে পাকিস্তান সরকার থেকে নিয়মিত টাকা পেত। আফগানিস্তানের রাস্তাঘাট, সাঁকো ধ্বংস করার জন্য ব্যবহার করা হতো তাকে। অফিসারের বিরাগের কারণ ইনফর্মারটি দাবি করেছিল অর্থ বৃদ্ধির [নক্শা ৩৪]।

অনেক সময় নিজের দায়িত্বহীনতার ফল আমলাকে নিজেই ভোগ করতে হয় [নক্শা ৩৫]। গণবিক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারেন তিনি।[১৭]

নক্শা

১১. পঞ্চাশ দশকের শেষ ভাগ, ক চট্টগ্রামের এস পি নিযুক্ত হয়েছেন। ট্রেনে করে পৌঁছলেন চট্টগ্রাম। স্টেশনে নেমেই শুনলেন চট্টগ্রাম বন্দরের ডক শ্রমিকরা ধর্মঘট করেছেন। চার্জ বুঝে নিয়ে গেলেন তিনি বন্দর ভবনে। সেখানে তখন কমিশনার, ডি সি বন্দর কর্মকর্তাদের বৈঠক চলছে। অন্যদিকে চলছে অবস্থান ধর্মঘট। কোন ব্যাপারেই কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে না। তখন একজন কর্মকর্তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ধর্মঘটিরা কী চায় বা কতটুকু পেলে তারা সন্তুষ্ট সে ব্যাপারে কোন খোঁজ নেওয়া হয়েছে কিনা। উত্তরে তিনি জানালেন, না। ক আরো খোঁজ নিয়ে জানলেন, ধর্মঘটিদের দাবিদাওয়া নিয়ে একবার আলাপ হয়েছিল নিম্ন পর্যায়ে, কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত কর্মকর্তারা নেননি। ধর্মঘটিরাও নিম্নপর্যায়ের কর্মকর্তাদের কথায় আস্থা আনতে পারেননি। সেসব অফিসাররা বরং এসে জানিয়েছেন, শ্রমিকরা খুব মারমুখো। ক তখন নিজেই উদ্যোগ নিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে আলাপ করলেন। শুনলেন তাঁদের অভিযোগ। মিষ্টি কথায় আশ্বস্ত করলেন তাঁদের। শ্রমিকরাও আশ্বাস পেয়ে প্রত্যাহার করে নিলেন অবস্থান ধর্মঘট।

১২. পঞ্চাশ দশকের মধ্যভাগ। ক তখন বরিশালের এস পি। ঐ সময় বরিশালের জয়েন্ট স্টিমার কোম্পানির মজুররা কিছু দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে ধর্মঘট করেছিলেন। কোম্পানির ম্যানেজার ছিলেন একজন ইংরেজ। তিনি মজুরদের দাবিদাওয়া গ্রাহ্যের মধ্যে আনতে চাচ্ছিলেন না। মজুররাও অটল। ইংরেজ ম্যানেজার তখন মজুরদের বিরুদ্ধে ক-এর কাছে অভিযোগ জানালেন। ক সমস্ত শুনে, গেলেন শ্রমিকদের কাছে। জানতে চাইলেন তাদের অভিযোগ। শ্রমিকদের অভিযোগ শোনার পর তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি যদি আপনাদের দাবিদাওয়ার ব্যাপারে মধ্যস্থতা করি তা'হলে আপনাদের আপত্তি আছে?' শ্রমিকরা জানালেন, বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। ক তখন ইংরেজ ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ করলেন এবং ইঙ্গিত জানিয়ে বললেন, সামান্য এসব দাবিদাওয়া না মেনে নিলে শ্রমিকদের মধ্যে চরমপন্থীদের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাবে। ম্যানেজার তখন শ্রমিকদের দাবিদাওয়া মেনে নিলেন।

১৩ পঞ্চাশের দশক। ক এস পি বরিশালের। ব্রজমোহন কলেজের ছাত্ররা সে সময় কিছু দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে ধর্মঘট করেছিল। কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন একজন ইংরেজ, প্রাক্তন আই সি এস কর্মকর্তা। তিনি ছাত্রদের কথাও শুনতে চাইলে না। বরং, ছাত্রদের দমানোর জন্য এস পি-র কাছে পুলিশ

সাহায্য চাইলেন। এস পি ফোন করলেন, ডি এম-কে বললেন, 'কলেজে তো পুলিশ নেওয়া ঠিক হবে না। আর ছাত্ররাও তো ভায়োলেণ্ট কিছু করছে না।' ডি এম একমত হলেন ক-এর সঙ্গে। ক তখন আবার বললেন, 'প্রিন্সিপাল ফোন করে বলছেন পুলিশ নিয়ে যেতে। এখন যদি পুলিশ না নিয়ে যাই, তাহলে আমি আবার ঝামেলায় পড়ব না তো?' কারণ, হঠাৎ যদি কিছু ঘটে যায় তা'হলে তো সবাই আমাকে দায়ী করবে।' ডি এম ছিলেন আবাঙালী। হেসে বললেন, 'যদি কিছু ঘটে, তা হলে তার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য আমার কাঁধ কি যথেষ্ট চওড়া নয়?'

ক আর পুলিশ পাঠাননি। ছাত্ররাও পরে শান্ত হয়ে গিয়েছিল। হিংসাত্মক ব্যাপার ঘটে নি। বরং, পুলিশ দেখলে হয়তো অপ্রীতিকর কিছু ঘটত।

১৪. পঞ্চাশের দশক। ক সীমান্তবর্তী একটি মহকুমার এস ডি ও। ঐ সীমান্তে বর্ডার পোস্টের সংখ্যাই ছিল উনত্রিশটি। চোরাকারবার স্বাভাবিক ভাবেই চলত। পুলিশ কাজ দেখানোর জন্য মহা উৎসাহে মাঝে মাঝে 'চোরা-কারবারী'দের গ্রেফতার করত। কিন্তু, এদের অধিকাংশই ছিলেন গ্রামের সাধারণ মানুষ, সীমান্তের ব্যাপারটা তখনো তাদের কাছে স্পষ্ট ছিল না। যা হোক, গ্রেফতার করার পর তাদের নিয়ে আসা হতো ক-এর আদালতে। এবং ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে ক তাদের হুঁশিয়ার করে যেতে দিতেন। কারণ, পুলিশদের এ ধরনের আচরণ তিনি পছন্দ করতেন না।

১৫. পঞ্চাশ দশকের মধ্যভাগ। ক বরিশালের এস পি। একদিন সকালে, কোতোয়ালীর ও সি ফোন করে তাঁকে জানালেন, রাতে দু'জন টহল পুলিশ 'কুকীর্তি' করায় তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে। ক সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলেন থানায়, সেখানে গিয়ে শুনলেন পুরো ঘটনাটা।

গ্রাম থেকে এক তরুণ হিন্দু দম্পতি সন্ধ্যার শোতে সিনেমা দেখার জন্য এসে-ছিলেন শহরে। সিনেমা দেখে রাতে তাঁরা ফিরে যাচ্ছিলেন। এমন সময় দু'জন টহল পুলিশ 'সন্দেহজনক গতিবিধি'র দায়ে স্বামী-স্ত্রীকে গ্রেফতার করে। একজন স্বামীকে, আরেকজন স্ত্রীকে আলাদাভাবে ধরে এগোতে থাকে। স্বামিটিকে যে ধরেছিল খানিকটা এগিয়ে সে 'আসামী'-কে ছেড়ে দেয়। স্বামী বেচারা ছুটে গিয়ে কোতোয়ালীর ও সি-কে ঘটনাটা জানায়। ও সি তখুনি ব্যাপারটা আঁচ করে নেন। তিনি বুঝেছিলেন, মেয়েটিকে পুলিশ দু'জন ধর্ষণ করার উদ্দেশ্যে ধরেছে। কিন্তু কোথায় তারা মেয়েটিকে নিয়ে যেতে পারে? আন্দাজ করে

পুলিশ ফোর্স নিয়ে তিনি গেলেন পতিতালয়ে। এবং কোন ক্ষতি হওয়ার আগেই পুলিশ দু'জনকে গ্রেফতার করে মেয়েটিকে উদ্ধার করেন।

ক দেখলেন, তখুনি কোন ব্যবস্থা না নিলে ঘটনাটি চিহ্নিত হয়ে পুলিশের জুলুম হিসেবে, এমনকি তা সাম্প্রদায়িক রূপও নিতে পাবে। তাছাড়া, আদালতের বিচারে অনেক ঝামেলা হবে, এবং পুলিশ হিসেবে তারা ধূম্রজালের সৃষ্টি করতে পারে। ন্যায় বিচার নাও পাওয়া যেতে পারে। তাই, তখুনি তিনি প্রয়োজনীয় সাক্ষী-সাবুদ সংগ্রহ করে পুলিশ দু'জনকে বরখাস্ত করলেন, যাতে আদালতে তারা পুলিশ হিসেবে না যেতে পারে।

এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায়, সাধারণ মানুষ ক-এর প্রশংসা করেছিলেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধানরাও এসে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন ক-কে।

১৬. ক তখন বগুড়ার ডেপুটি কমিশনার। বগুড়ায় প্রভাবশালী ও বিখ্যাত ব্যবসায়ী ছিলেন দু'জন খ এবং গ। খ একদিন ক-কে আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর কারখানা পরিদর্শনের জন্য যা এড়াবার কোন উপায় ছিল না। ক গেলেন কারখানা পরিদর্শনে। তাঁকে আপ্যায়নও করা হলো যথাযথভাবে।

বাসায় ফিরে এসে ক তাঁর এক বন্ধুকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, তিনি গিয়ে যেন গ-কে বলেন, ক-কে তাঁর ওখানেও যাতে আমন্ত্রণ জানানো হয়। কারণ, ক জানতেন জেলার প্রধান হিসেবে প্রভাবশালী একজনের কারখানায় আপ্যায়িত হলে ব্যাবসার ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া হতে পারে। হতে পারে তাঁর দুর্নামও।

এদিকে ক-এর বন্ধুর অনুরোধে গ খুশি হয়ে ক-কে আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর কারখানা পরিদর্শনে। ক, গ-এর অনুরোধ রাখলেন। এবং এভাবে সক্ষম হলেন উভয় পক্ষের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে।

১৭. পঞ্চাশ দশক। ফরিদপুরের এস পি নিযুক্ত হয়েছেন ক। আই জি জাকির হোসেন ফরিদপুর যাওয়ার আগে ক-কে ডেকে বলেছিলেন, চার্জ বুঝে নিয়ে তিনি যেন প্রথমেই মোহন মিয়ার সঙ্গে দেখা করেন। ফরিদপুরে মোহন মিয়া তখন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। তাঁকে বলা হতো মুসলিম লীগের 'কিং মেকার'।

ক ফরিদপুর এলেন, চার্জ বুঝে নিলেন। কিন্তু মোহন মিয়ার সঙ্গে গিয়ে আর দেখা করলেন না। কয়েকদিন পর, মোহন মিয়া নিজে এসেই তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। কও তাঁকে সম্মানের সঙ্গে আপ্যায়ন করলেন।

এর কয়েকদিন পর, মোহন মিয়া ক-কে ফোন করে জানালেন, জনৈক ও সি-র নামে অনেক অভিযোগ আছে, সুতরাং তাকে বদলি করলে ভালো হয়। ক

বললেন, ঠিক আছে তবে অভিযোগগুলি তিনি তদন্ত করে দেখতে চান। এবং অভিযোগের প্রমাণাদি [কাগজপত্র] কিছু পেলে ভালো হয়। যোগাড় করে দেবেন নাকি মোহন মিয়া সেসব কিছু ?

মোহন মিয়া এরপর, ক-কে এ ধরণের কোন অনুরোধ আর করেন নি।

১৮. ১৯৫৪ সালের নির্বাচন। ক তখন সীমান্তবর্তী একটি জেলার অতিরিক্ত এস পি। মুসলিম লীগ সে সময় জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে। নির্বাচনের প্রাক্‌কালে, হঠাৎ একদিন আই জি দোহা ও বিভাগীয় কমিশনার সেই জেলায় এসে হাজির। জেলার সরকারী কর্মচারীদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। বক্তৃতা দিলেন আই জি ও কমিশনার। বক্তৃতার মূল কথা ছিল— মুসলিম লীগ ভোটে না জিতলে পাকিস্তান টিকবে না। সুতরাং সরকারী কর্মচারীদের একথা বোঝাতে হবে লোকজনকে। আসল ইঙ্গিত ছিল, ভোটের দিন, প্রয়োজনে সরকারী কর্মচারীরা যেন মুসলিম লীগের পক্ষে কারচুপি করেন।

নির্বাচনের দিন। ক হঠাৎ খবর পেলেন তাঁর অধীনস্থ, মুসলিম লীগ সমর্থনকারী একজন অফিসার ভোট কেন্দ্রে প্রকাশ্যে লীগের পক্ষে প্রচার করছে। খবর পেয়ে ক সোজা চলে গেলেন সেই কেন্দ্রে এবং সাসপেণ্ড করলেন অফিসারটিকে, যদিও কার্যত তিনি তা পারেন না।

১৯. ১৯৫৪ সালের নির্বাচন। ক তখন ফরিদপুরের একজন পুলিশ কর্মকর্তা। ফরিদপুরের প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা মোহন মিয়া সে সময় মুসলিম লীগ ত্যাগ করে যোগ দিয়েছেন কৃষক প্রজা পার্টিতে। তাঁর পক্ষে নির্বাচনী প্রচার চালাচ্ছিলেন তাঁর ছোট ভাই, সমাজকর্মী তারা মিয়া। ব্যক্তি হিসেবে তারা মিয়া খুব জনপ্রিয় ছিলেন ফরিদপুরে। তারা মিয়ার নির্বাচনী প্রচার কিন্তু কর্তৃপক্ষ সুনজরে দেখছিল না। কিন্তু ফরিদপুরের ডি এম বা পুলিশ কর্তৃপক্ষ সরকারের হয়ে তারা মিয়ার নির্বাচনী প্রচারে কোন বাধা সৃষ্টি করছিলেন না। প্রবল প্রতাপান্বিত আই জি দোহা খুবই অসন্তুষ্ট হলেন এতে। একদিন স্বরাষ্ট্র সচিব জনাব আফজার-কে নিয়ে হাজির হলেন তিনি ফরিদপুরে। ক-কে বললেন, গ্রেফতার করতে তারা মিয়াকে। ক বললেন, 'শুধু শুধু তাঁকে গ্রেফতার করি কি ভাবে ? কোন দোষ তো করেননি তিনি।'

'সে এন্টি-স্টেট' [অর্থাৎ মুসলিম লীগ বিরোধী], বললেন দোহা।

ক তবুও না দমে বললেন, 'তারা মিয়া খুব জনপ্রিয় এখানে। তাঁকে গ্রেফতার করলে, মুসলিম লীগের যাও কিছু ভোট পাওয়ার আশা ছিল তাও পাওয়া যাবে না।' 'না, না, আমি অরাজনৈতিক লোক' বললেন দোহা, 'কে জিতল, কে

হারলো, তাতে আমার কিছু আসে যায় না। আপনাকে বলছি তারা মিয়াকে গ্রেফতার করতে, আপনি তা-ই করুন।'

ফরিদপুরে আসার পর, তারা মিয়া ক-এর অনেকটা বন্ধুর মতো হয়ে গিয়েছিলেন। ক তাই ফোন করে তারা মিয়াকে আমন্ত্রণ জানালেন তাঁর বাসায়। তারা মিয়া বাসায় এলে খুলে বললেন সব। তারা মিয়া সব শুনে শুধু বললেন, 'ঠিক আছে। কী আর করা যাবে। গ্রেফতার করুন।' ক নিজের জীপে করে তারা মিয়াকে সম্মানের সঙ্গে গ্রেফতার করে নিয়ে গেলেন জেলে।

নির্বাচনে হেরে গেল মুসলিম লীগ। মুক্তি পেলেন তারা মিয়া। কিন্তু ক-এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হয়নি কারণ, ক মন্দ সময়েও তাঁকে সম্মান দেখিয়েছিলেন।

২০. ১৯৫৬ সাল। শেখ মুজিবর রহমান পূর্ব-বাংলার শ্রমমন্ত্রী। ক শ্রমমন্ত্রণালয়ের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। শেখ মুজিব তাঁকে নির্দেশ দিলেন বিদ্যমান শ্রমিক পরিস্থিতি নিয়ে একটি রিপোর্ট প্রণয়ন করতে যা দেওয়া হবে প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীকে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক রিপোর্ট তৈরি করে পেশ করলেন শ্রমমন্ত্রীর কাছে। শেখ মুজিব, ক-কে সামনে বসিয়েই রিপোর্ট পড়লেন। তারপর বললেন : 'এখানে একটা প্যারাগ্রাফ যোগ করে দিন। শ্রমিক ফ্রণ্টে যে মাঝে মাঝে ঝামেলা হচ্ছে তার কারণ, কমিউনিস্টদের অনুপ্রবেশ।' ক বললেন, 'আমার ফাইনডিং-য়ে কিন্তু তা নেই। তবে মন্ত্রী হিসেবে আপনি ইচ্ছে করলে এটা যোগ করে সই করে দিতে পারেন।' শেখ মুজিব অবশ্য নিজে আর তা যোগ করেননি। ক যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন তাই দাখিল করেছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে।

২১. ঐ একই সময়ের কথা [দ্রষ্টব্য : ২০]। শেখ মুজিবের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু শ্রমবিষয়ক এক আইনগত ঝামেলায় পড়েছেন। শেখ সাহেব ক-কে ডেকে বললেন, ব্যাপারটার একটা সুরাহা করে দিতে। ক বললেন, 'স্যার, এ ব্যাপারে তো আমার করার কিছু নেই, কারণ, এ আইন আপনি নিজেই তৈরি করেছেন।' শেখ মুজিব এরপর এ ব্যাপারে আর কোন কিছু করেন নি।

২২. পঞ্চাশ দশকের মধ্যভাগ। পূর্ব-পাকিস্তান-এর মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান। তাঁর মন্ত্রীসভার একজন সদস্য-ক। ক যে জেলা থেকে এসেছেন সে জেলায় এস পি ছিলেন তখন খ। মন্ত্রীসভার একজন প্রভাবশালী সদস্য ক। তাঁর এলাকার যে ও সি তিনি ছিলেন তাঁর ডান হাত। ঐ এলাকায় তাঁর নামে অনেক অভিযোগ ছিল। খ ও সি-র কার্যকলাপ খতিয়ে দেখে নিশ্চিত হলেন যে, অভিযোগগুলি

সত্য। ও সি-কে তিনি ঐ অঞ্চল থেকে সরিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এ খবর পৌঁছে গেল মন্ত্রীর কাছে।

পরদিন মন্ত্রী চলে এলেন তাঁর এলাকায়। রাত বারোটায় খ সার্কিট হাউস থেকে ফোন পেলেন মন্ত্রীর। ক তাঁকে অনুরোধ জানালেন যেন ও সি-র বদলির আদেশ রদ্ করা হয়। শুধু তাই নয়, খ-কে অনুরোধ জানালেন, তিনি যেন সকালে সার্কিট হাউসে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন।

খ পরদিন সকালে গেলেন সার্কিট হাউসে। মন্ত্রী তখন নাস্তা করছিলেন। খ-কে সাদরে বসিয়ে চা খাওয়ালেন, তারপর নিয়ে গেলেন বেডরুমে। একথা সে কথার পর মূল প্রসঙ্গ অর্থাৎ ও সি-র প্রসঙ্গ উঠল। খ বললেন মন্ত্রীকে, 'স্যার, সে ঐ জায়গায় থাকলে আপনার তো বটেই, পার্টিরও বদনাম হবে। আপনার নাম করে সে বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে পয়সা খাচ্ছে। আর এভাবে আপনার রাজনৈতিক জীবন প্রায় শেষ করে দিচ্ছে।' এ প্রসঙ্গে খ কয়েকটি উদাহরণও দিলেন। মন্ত্রী খ-এর যুক্তি শুনে সম্পূর্ণ কনভিনস্‌ড হয়ে বললেন, 'আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন। হারামজাদাকে শায়েস্তা করুন।'

এ পরিপ্রেক্ষিতে খ-এর মন্তব্য—রাজনৈতিক দলের নেতা বা মন্ত্রীদের কোন ঘটনা প্রশাসনিক দিক থেকে বোঝাতে চাইলে তারা বোঝেন। 'কিন্তু আমরা সব সময়ে তা করি না।'

২৩. পঞ্চাশ দশকের মধ্যভাগ। বরিশালের মঠবাড়িতে সোহরাওয়ার্দী গেছেন বক্তৃতা করতে। তিনি তখন পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী।

মঠবাড়িতে, সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে গেছেন বরিশালের অতিরিক্ত এস পি। বক্তৃতা তখনো শুরু হয়নি। এমন সময় দর্শকদের মধ্যে থেকে একজন মঞ্চে উঠে তীব্র ভাষায় স্থানীয় দারোগার জুলুমের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেওয়া শুরু করলেন। অভিযোগের প্রতিকার দাবি করে বক্তা তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন।

সোহরাওয়ার্দী বাংলা খানিকটা বুঝতেন। ভাঙা ভাঙা বাংলা বলতেও পারতেন। অনির্ধারিত বক্তার বক্তৃতা শেষ হবার পর তিনি বক্তৃতা দিতে উঠে দাঁড়ালেন। বক্তৃতার শুরুতে অতিরিক্ত এস পি-কে দেখিয়ে বললেন, 'আমি সব শুনেছি। এস পি সাব হ্যায়। আমি ওনাকে বলে যাচ্ছে। উনি অ্যাকশন নেবেন।'

অতিরিক্ত এস পি বরিশাল ফিরে এসে ঘটনাটি জানালেন ডি সি ও এস পি-কে। তদন্তের নির্দেশ দিলেন ডি সি, তদন্তে দোষী সাব্যস্ত হল দারোগা। বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করা হল তাকে।

২৪. পঞ্চাশের দশক। ক তখন একটি জেলার ডি এম। জেলার কার্যভার গ্রহণের পর তিনি সেখানে এমন একজনকে পেলেন যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন তাঁর সহকর্মী। ধরা যাক তাঁর নাম খ।

খ অনেক আগেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে দিয়ে রাজনীতিতে নেমেছেন। ক যখন জেলার কার্যভার গ্রহণ করেছেন খ তখন ঐ জেলার আওয়ামী লীগের একজন নাম করা নেতা। খ ধরে নিয়েছিলেন ক যেহেতু তাঁর পূর্বপরিচিত এবং তিনি যখন জেলার একজন রাজনৈতিক নেতা, সেহেতু, ক অনেক ক্ষেত্রে তাঁর পরামর্শমতো কাজ করবেন। কিন্তু, ক কার্যক্ষেত্রে তা করলেন না। ডি এম-কে খ অনেক 'রাজনৈতিক কথাবার্তা' শোনালেন, নরম গরম কথাও বললেন। কিন্তু তাতেও খুব একটা ফল হল না। তখন, হঠাৎ একদিন খবর এল, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ক-এর বিরুদ্ধে একটি দরখাস্ত গেছে।

দরখাস্তে নবনিযুক্ত ডি এম-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল অনেক। যেমন, শিলাইদহে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ি থেকে অনেক আসবাবপত্র নিজের ব্যবহারের জন্য তিনি নিয়ে এসেছেন। শুধু দরখাস্তই নয়, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাঁর বিরুদ্ধে তদ্‌বিরও করা হল।

মুখ্যমন্ত্রী ব্যক্তিগত ভাবে চিনতেন ক-কে। তাই তিনি জানতেন, অভিযোগগুলি বানোয়াট। কোন ব্যবস্থাই তিনি নেননি তাঁর বিরুদ্ধে বরং ক-কে ডেকে বলেছিলেন এরপর থেকে যেন তিনি 'ট্যাক্টফুলি' কাজ করেন।

২৫. পঞ্চাশের দশক। ক নিযুক্ত হয়েছেন একটি মহকুমার এস ডি পি ও হিসেবে। বয়স তখন কম। সব বিষয়ে উৎসাহ। দেশ সেবা করছেন— এ স্পিরিটে মাঝে মাঝে গোরুর গাড়ি করে সীমান্ত এলাকা পরিদর্শনে যেতেন চোরাচালানী রোধ করার জন্য।

সে সময়, র‍্যালি ব্রাদার্সের হেড পারচেজারের বিরুদ্ধে মামলা হলো দুর্নীতি দমন বিভাগে। স্থানীয় এম এল এ ক-এর কাছে তদ্‌বির করলেন হেড পারচেজারকে রেহাই দেওয়ার জন্য। ঘুষের ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীনের কথা বলেও চাপ দেওয়া হয়েছিল। ক তাঁর ওপরওয়ালা এস পি-কে অবহিত করেছিলেন ঘটনাটি। এস পি বলেছিলেন, ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। তিনি যেন নিজের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করে যান। ক সুতরাং কারো অনুরোধই রাখেননি। ওপর থেকেও তাঁকে আর চাপ দেওয়া হয়নি। অন্যতম কারণ, তাঁর প্রতি এস পি-র সমর্থন।

২৬. ক তখন কাজ করেন উদ্ভিদ সংরক্ষণ বিভাগে। সরকারী এক দোতলা বাড়ির একতলা বরাদ্দ করা হয়েছে তাঁর জন্য। ক-এর এক সহকর্মী খানিকটা দূরে এমনি ধরনের আরেক বাড়ির একতলায় থাকেন। ধরা যাক তাঁর নাম খ। খ-এর সঙ্গে বাড়ির দোতলায় যে পরিবার থাকে তাদের সম্পর্ক ভালো নয়। এখানে উল্লেখ্য যে খ-এর শ্বশুর ছিলেন জেলাবোর্ডের প্রেসিডেণ্ট এবং প্রাদেশিক কৃষিমন্ত্রীর বন্ধু। উদ্ভিদ সংরক্ষণ বিভাগ কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন।

ক-এর বাসার ওপর তলা খালি হলো। ক দরখাস্ত করলেন কর্তৃপক্ষের কাছে ওপরে [দোতলা] যাবার জন্য। অনুমোদন করলেন কর্তৃপক্ষ এবং ক উঠে গেলেন দোতলায়। তারপর তিনি জানতে পারলেন, খ-এর শ্বশুর মন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়েছেন যেন ঐ দোতলাটা [যেখানে ক উঠে গেছেন] তাঁর জামাইকে বরাদ্দ করা হয়। ক বিভাগীয় সচিবকে অনুরোধ জানালেন, তাঁর ফ্ল্যাটটি যেন খ-কে বরাদ্দ না করা হয় কারণ, তা হলে দু'সহকর্মীর মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হবে। বরং, অনুরোধ জানালেন তিনি, খানিকটা দূরে একতলা খালি একটি বাংলো আছে, সেটি ক-কে বরাদ্দ করলে তিনি সেখানে উঠে যাবেন। বিভাগীয় সচিব ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'আপনার কাছ থেকে এ ব্যাপারে সাজেশান নিতে হবে না'কি ?'

ইতিমধ্যে মন্ত্রী তাঁর বন্ধু জামাইকে ক-এর ফ্ল্যাট বরাদ্দ করে দিয়েছেন। ক-কে নির্দেশ দেওয়া হলো আবার একতলায় চলে যেতে। নির্দেশ পেয়ে ক রিপ্রেজেন-টেশন দিলেন। ফ্ল্যাট ছাড়লেন না। বিভাগীয় সচিবও এর মাঝে বদলি হয়ে গেলেন।

নতুন সচিব কাজে যোগ দেওয়ার পর আবার ফ্ল্যাট ছাড়ার নির্দেশ পেলেন ক। আবারও রিপ্রেজেনটেশন দিলেন তিনি। মন্ত্রী ক্রুদ্ধ হয়ে চাপ দিতে লাগলেন সচিবকে, একটা হেস্তনেস্ত করার জন্য।

সচিব পড়লেন নাজুক অবস্থায়। ক-এর এক সহকর্মী গ-এর সঙ্গে তাঁর খাতির ছিল। গ-র কাছে তিনি পুরো ব্যাপারটা জানতে চাইলেন। গ খুলে বললেন তাঁকে সব-কিছু। এর কয়েকদিন পর সচিব বেড়াতে এলেন গ-এর বাসায়। গল্প করার জন্য ক-কেও ডেকে পাঠালেন। কুশল বিনিময়ের পর সচিব জিজ্ঞেস করলেন ক-কে, 'বাসা ছাড়ছেন কবে ?'

'বাসা তো ছাড়ব না।' উত্তর দিলেন ক।

'কেন ছাড়বেন না ? অর্ডার পাননি ?'

'পেয়েছি, কিন্তু আমি তো রিপ্রেজেনটেশন দিয়েছি।'

'কিন্তু, তা দিয়ে কি পার পাবেন ?'

'পার পাব কিনা জানি না,' বললেন ক, 'কিন্তু আপনাদের স্বজনপ্রীতির ভিত্তিতে তো পাকিস্তান চলতে পারে না। আর-একজন তরুণ পাকিস্তানী হিসেবে এই নির্দেশ মানতে আমি রাজী নই।' [তখন পাকিস্তানী আমল]

'বুঝলাম। কিন্তু এর পরিণাম জানেন ?'

'জানি। বেশি হলে চাকরি যাবে। কিন্তু ধানচাল দিয়ে তো আর পড়াশোনা করিনি। চাকরি গেলে এরকম চাকরি অনেক পাব।' উত্তর দিলেন ক, 'তবে এর পরের বারের উত্তর শুধু আপনাকেই না, গভর্নর জেনারেলকেও তার প্রতিলিপি পাঠাব।'

এ কথা শুনে সচিব তাকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, 'আপনার মতো আরো অফিসার থাকলে তো আর কথাই ছিল না।' সেখান থেকে সচিব গেলেন ডিরেক্টরের বাসায়। তাঁকে বললেন, এক ডি ও দিতে 'এ বলে যে, সচিব ঘটনাটি সরেজমিনে দেখে গেছেন এবং ক-এর সঙ্গে কথা বলেছেন।' এ আলাপের ভিত্তিতে ক আলাদা বাংলোতে যেতে রাজী হয়েছেন।

কয়েক দিন পর ক নতুন বাড়িতে যাওয়ার নির্দেশ পেলেন এবং সানন্দে তিনি সে নির্দেশ পালন করেছিলেন।

২৭. পূর্ববাংলার শাসন ক্ষমতায় তখন যুক্তফ্রণ্ট। ক নিযুক্ত হয়েছেন ঢাকার এ ডি সি হিসেবে। একদিন, মন্ত্রণালয় থেকে বিভিন্ন রাজস্ব অফিসারের পোস্টিং সংক্রান্ত একটি তালিকা পাঠানো হল তাঁর কাছে। পুরো তালিকাটি ভালোভাবে নিরীক্ষণ করার পর ক দেখলেন, অনেক পোস্টিং প্রশাসনিক কারণে যুক্তিসঙ্গত নয়। তাই তিনি এ ব্যাপারে কিছু করা থেকে বিরত থাকলেন কিন্তু মন্ত্রণালয় থেকে আবার চাপ দেওয়া হল, তাদের নির্দেশ কার্যকর করতে। ক তখন রাজস্ব বোর্ডের সদস্যের সঙ্গে দেখা করে নিজের আপত্তির কথা খুলে বললেন। সদস্য সব শুনে বললেন, 'যা পারো করে দাও।' ক তখন তরুণ। তাই বললেন, 'সব যদি মন্ত্রীই করেন তবে আমাদের আর দরকার কি ?' সদস্য বললেন, 'ক্ষুব্ধ হয়ে লাভ নেই। তুমি যদি না কর তা' হলে তাঁরাই করে দেবে।'

২৮. পুত্রসন্তান জন্মাবার পূর্বে, এ. কে. ফজলুল হক বরিশালে তাঁর একটি অট্টালিকা দান করেছিলেন মেয়েদের স্কুল করার জন্য। পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি, ফজলুল হক কিছুদিনের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। তখন তাঁর উত্তরাধিকারী হয়েছে। ৭২ বছরের হক সাহেব তখন চাইলেন, বরিশালের

বাড়িটি উত্তরাধিকার সূত্রে যেন তাঁর পুত্র লাভ করেন। এর অর্থ পুরনো দানপত্র বাতিল করা। তিনি জানতেন, বরিশালের তখন যিনি ডি এম তাঁর দ্বারা ঐ দানপত্র বাতিল করা যাবে না। তাই প্রভাব খাটিয়ে তিনি ডি এম-কে সুন্দরবনের বিশেষ অফিসার নিযুক্ত করলেন। বাঙালী ডি এমের স্থলাভিষিক্ত হলেন ফজলুল হকের অনুগত একজন অবাঙালী অফিসার। তিনি গভর্নরের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করলেন। কাজ শেষ হলে পুরনো ডি এম-কে আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছিল বরিশালে।

২৯. পঞ্চাশ দশকের মধ্যভাগ। চাঁটগার এস পি হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন ক। কার্যভার গ্রহণের পর একদিন পরিদর্শনের জন্য গেলেন পুলিশ লাইনে। পরিদর্শন শেষে, আর ও [পুলিশ লাইনের ও সি] তাঁর কাছে পৌঁছে দিলেন একটি চিঠি। চিঠিটি ঢাকার আর ও পাঠিয়েছেন চট্টগ্রামের আর ও-কে। চিঠির বিষয়বস্তু, চাঁটগার একজন কনস্টেবলকে সাসপেণ্ড করা হয়েছিল, এখন তাঁকে পুনর্বহাল করতে হবে।

ক ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছিলেন না। তিনি জানতে চাইলেন, ঢাকার আর. ও কেন এ ধরনের চিঠি লিখেছেন ? চাঁটগার আর ও সসংকোচে জানালেন, কারণ, কনস্টেবলটি মুখ্যমন্ত্রীর পরিচিত।

‘তাকে সাসপেণ্ড করা হয়েছিল কেন ?’ জানতে চাইলেন ক। ‘তার কাছে চোরাই মাল পাওয়া গিয়েছিল স্যার’, জানালেন আর ও ‘আদালতে সে দোষী প্রমাণিত হয়েছে। তারপর সে আপিল করেছিল হাইকোর্টে কিন্তু সেখানেও সে হেরে গেছে। এখন মুখ্যমন্ত্রী তাকে ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন।’

ক হাইকোর্টের রায় দেখতে চাইলেন। হাইকোর্টের রায় দেখে নিঃসন্দেহ হয়ে তখনই তিনি চাকরি থেকে ডিসমিস করে দিলেন কনস্টেবলটিকে।

৩০. পঞ্চাশ দশকের শুরুতে, ক নিযুক্ত হলেন সীমান্তবর্তী অঞ্চলের একটি মহকুমার এস ডি ও হিসেবে। সিভিল সার্ভিসের নতুন সদস্য, বিদেশফেরত, সদ্য-বিবাহিত তরুণ এস ডি ও র কাছে তখন জগৎটাই ছিল অন্যরকম।

যে মহকুমার তিনি এস ডি ও সেই মহকুমার রাস্তাঘাটের কোন বালাই ছিল না। প্রধান বাহন ছিল গোরুর গাড়ি, সারাদিন এস ডি ও-র বাসার সামনে দিয়ে ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করে চলে গোরুর গাড়ি আর চারদিক ধুলোয় হয়ে থাকে আচ্ছন্ন। নবপরিণীতা শহুরে স্ত্রীর এটা সহ্য হচ্ছিল না। তরুণ এস ডি ও গোরুর গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তাই জারি করলেন ১৪৪ ধারা। জেলার ডি এমের চোখে

পড়ল এই হাস্যকর নির্দেশ। মৃদু ভর্ৎসনা করলেন তিনি এস ডি ও-কে, ক নিজের ভুল বুঝতে পেরে, লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি প্রত্যাহার করে নিলেন সেই বে-আইনী নির্দেশ [১৪৪ ধারা]।

৩১ পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি। ক তখন নারায়ণগঞ্জের এস ডি পি ও। তাঁর এস পি-র শ্যালিকাও থাকতেন নারায়ণগঞ্জে। তাঁর স্বামী ছিলেন ডাক্তার। তবে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে বনিবনা ছিল না মোটেই, প্রায়ই ঝগড়া হতো এবং তা মাঝে মাঝে গড়াত হাতাহাতিতে। এর ধকল সামলাতে হতো ক এবং থানার ও সি-কে। ও সি ছিলেন এম এ পাস এবং প্রায় বলতেন ক-কে, 'স্যার একটা এসপার ওসপার করে দিন।'

একদিন স্বামীস্ত্রীর কলহ এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে, স্বামী এসে থানায় নালিশ করলেন স্ত্রীর বিরুদ্ধে। ও সি-ও সঙ্গে সঙ্গে নালিশ গ্রহণ করলেন এবং ঘটনাটি জানিয়ে রাখলেন ক-কে।

থানায় স্বামীর নালিশের কথা শুনে শ্যালিকা ঘটনাটা জানাল এস পি দুলাভাইকে। এস পি সঙ্গে সঙ্গে চলে এলেন নারায়ণগঞ্জ। ক-কে নিয়ে গেলেন থানায়। ও সি-কে ডেকে বললেন. 'কেউ কখনো শুনেছে যে. থানাতে এস পি-র শ্যালিকার বিরুদ্ধে নালিশ গ্রহণ করা হয়।' ও সি তখনই স্বর পাল্টে বলল, 'তাতে কী হয়েছে স্যার। একটা তদন্ত করে বলে দেব মামলাটা ভুয়ো।'

৩২. ক বিলেত থেকে দরখাস্ত করেছিলেন কৃষিবিভাগের একটি চাকরির জন্য। কৃষি বিভাগের পরিচালকও আগ্রহী ছিলেন ক-এর ব্যাপারে। সুতরাং তাঁর বিশেষ অনুরোধে পাবলিক সার্ভিস কমিশন অনুমোদন করে ক-এর চাকরি।

ইতিমধ্যে ক ফিরে এসেছেন বিলেত থেকে। ফাইল চালাচালিও শুরু হয়েছে। নজর রাখছেন তিনি নিয়মিত। মুখ্যমন্ত্রী ফাইলে [নিয়োগের] স্বাক্ষর করেছেন। ফাইল আবার ফেরত আসছে। কিন্তু, সহকারী সচিব পর্যন্ত আসার পর ফাইলের আর পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। এক দুই করে তিনদিন চলে গেল। তারপর অফিসের ঝাড়ুদার ফাইলটি আবিষ্কার করল সহকারী সচিবের ঘরের পাপোষের নিচে থেকে। ফাইলটি সেখানে তিনি লুকিয়ে রেখেছিলেন।

চাকুরিতে জয়েন করার পর, ক-এর কারণ জানতে পেরেছিলেন। ক নিয়োগ-পত্র পাওয়ার কয়েকদিন পর আরেকজন একই পদমর্যাদায় নিয়োগপত্র পেয়েছিলেন কৃষি বিভাগে। ক আগে জয়েন করলে সিনিয়র হয়ে যাবেন। তাই ঐ ভদ্রলোক গিয়ে তদ্‌বির করেছিলেন সহকারী সচিবের কাছে, যাতে দু'জন একই সঙ্গে জয়েন

করতে পারেন। ভদ্রলোকের নিয়োগপত্র স্বাক্ষরিত হয়ে আসার পূর্ব পর্যন্ত সহকারী সচিব তাই ক-এর ফাইলটি লুকিয়ে রেখেছিলেন।

৩৩. পঞ্চাশের দশক। ক-কে নিযুক্ত করা হয়েছে বেলুচিস্তানের সহকারী পলিটিকাল এজেন্ট হিসেবে। যে অঞ্চলে তিনি থাকতেন, সেখানে বরফগলা শুরু হলে বাঁধ দিয়ে এক জায়গায় পানি আটকে রাখা হতো। পানি ছিল ঐ অঞ্চলে বসবাসরত বিভিন্ন উপজাতির কাছে স্বর্গের মতো।

জমিয়ে রাখা বরফগলা পানির ওপর বিভিন্ন উপজাতির হিস্যা ছিল। ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে তাই প্রায়ই গণ্ডগোল বাধত। গুলিগোলা চলত। সদ্য সিভিল সার্ভিস পাস করা, তরুণ বাঙালী সহকারী পলিটিকাল এজেন্ট বুঝতে পারছিলেন না, এ পরিস্থিতিতে তিনি কী করবেন।

একদিন, এ ব্যাপারে পরামর্শের জন্য সদরে গেলেন তিনি পলিটিকাল এজেন্টের কাছে। পলিটিকাল এজেন্ট পুরনো আই সি এস। সহকারীর সব কথা শুনে তিনি তাঁকে বললেন দু'সপ্তাহ পরে আসতে। ক নিজ এলাকায় ফিরে গিয়ে উপজাতি সর্দারদের বললেন, এজেন্টের সঙ্গে কথা হয়েছে। বলেছেন তিনি, দু' সপ্তাহ পর একটা মীমাংসা করে দেবেন।

দু'সপ্তাহ পর ক আবার গেলেন সদরে। এজেন্ট জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হে, সমস্যা মেটাতে পারো নি ?' ক বললেন, 'না।'

'আচ্ছা ভেবে দেখি। তুমি আবার এসো দু'সপ্তাহ পর।' বললেন পলিটিকাল এজেন্ট।

এদিকে, একমাসে সূর্যের তাপে পানি শুকিয়ে বা বাষ্প হয়ে উবে গেছে। সমস্যা আর নেই। ক তবুও দু'সপ্তাহ পর গেলেন এজেন্টের সঙ্গে দেখা করতে। তাঁকে দেখে হাসিমুখে এজেন্ট বললেন, 'কী সমস্যা এবার মিটছে তো ?' তারপর তরুণ সহকারীকে উপদেশ দিলেন এভাবে যে, কোন্ সমস্যা তাড়াতাড়ি, কোন্‌টা আবার দেরি করে সমাধান করতে হবে তা জানতে হবে।

সমস্যার এ ধরনের সমাধানে কিন্তু ক খুশি হন নি। কারণ, স্থায়ী সমাধান না হলেও প্রতি বছর এ সমস্যার সৃষ্টি হবেই। তা ছাড়া পানি ব্যবহার করতে পারলে উপজাতিরা ফলের উৎপাদন বাড়াতে পারত, দু'টি পয়সা আসত তাদের হাতে। কিন্তু এ ভাবে সমস্যার মোকাবিলা করে উপজাতিদের ক্ষতিই করা হল শুধু ; যদিও প্রশাসনের দায়-দায়িত্ব থাকল না কিছু।

৩৪. পঞ্চাশ দশকের ঘটনা। বেলুচিস্তানের সহকারী পলিটিক্যাল এজেন্ট

হিসেবে ক-কে ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্বও পালন করতে হত। ঐ সময় তাঁর কাছে একটি মামলা এল। মামলার আসামী দাগী, অনেকেই তাকে চেনে। কিন্তু এতদিন তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কেউ মামলা করলেও তা ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে। কারণ, প্রশাসন এতদিন তাকে নানা কাজে ব্যবহার করেছিল। কিন্তু, কিছুদিন ধরে প্রশাসনের কাছে ব্যক্তিটির দাবি-দাওয়া বৃদ্ধি পাওয়ায় কর্তৃপক্ষ তার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য একটি পুরনো মামলা পুনরুজ্জীবিত করে। গ্রেফতার করা হয় ব্যক্তিটিকে। মামলা শুরু হয় ক-এর আদালতে। ক কিন্তু এই পটভূমি জানতেন না।

আদালতে, জবানবন্দীর এক পর্যায়ে আসামী বলল, 'হুজুর, হুকুমতের জন্য এতদিন আমি এত কিছু করলাম আর এখন তার প্রতিদান এই।' 'কী করেছ হুকুমতের জন্যে ?' জিজ্ঞেস করলেন ক। 'হুকুমতের নির্দেশে', জবাব দিল আসামী 'আমি আফগানিস্তানে গিয়ে পুল উড়িয়েছি, ক্ষেতে আগ দিয়েছি'···ইত্যাদি। এখানে উল্লেখ্য যে, আফগানিস্তানের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক তখন ভালো ছিল না।

যা হোক, ক এই আমলার কী রায় দিয়েছিলেন খেয়াল নেই, তবে মনে আছে মামলাটি এরপর স্থানান্তর করা হয়েছিল পলিটিক্যাল এজেন্টের আদালতে। এজেন্ট তাঁর রায়ে বললেন, আসামী পাকিস্তানের নাগরিক নয়, সুতরাং তাকে বর্ডারের ওপাশে ছেড়ে দেওয়া হবে।

কর্তৃপক্ষের নির্দেশে, নির্দিষ্ট সময়ে আসামীকে বর্ডারের ওপারে ছেড়ে দেওয়া হলো। সঙ্গে সঙ্গে গোপনে আফগান কর্তৃপক্ষকেও ঘটনাটা জানানো হলো। ফলে, আফগান কর্তৃপক্ষ সহজেই আসামীকে গ্রেফতার করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিয়েছিল।

৩৫. বর্তমানের একজন প্রবীণ রাজনীতিবিদ তখন পূর্ব-বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর ছেলেরা পড়াশোনা করে ভারতের শিলং-এ। সীমান্তবর্তী জেলার ডি এম তাদের সহায়তা করতেন যাতায়াতের ব্যাপারে। ডি এম-এর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর পরিচয় ছিল, সম্পর্ক ছিল ভালো।

ঐ সময়, জেলার জনৈক ম্যাজিস্ট্রেট একদিন বাসায় ফিরে দেখলেন তাঁর ছোট মেয়ে কাঁদছে। কারণ জিজ্ঞেস করে জানলেন, স্কুলের এক শিক্ষকের সাইকেলের সঙ্গে তার ধাক্কা লেগেছিল। ম্যাজিস্ট্রেট ক্ষিপ্ত হয়ে তখুনি সেই শিক্ষককে বাসায় ডেকে এনে কান ধরে ওঠ-বস করালেন। তীব্র প্রতিক্রিয়া হল শহরে। প্রশাসনের বিরুদ্ধে শহরে গড়ে উঠল ছাত্র-শিক্ষক-জনতার প্রচণ্ড আন্দোলন।

আন্দোলন চলাকালীন ছাত্র-জনতার এক জমায়েতের ওপর গুলি চালাল পুলিশ। প্রাদেশিক সরকার তখনই আদেশ দিলেন বিচার বিভাগীয় তদন্তের। এবং সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে, মুখ্যমন্ত্রী টেলিগ্রামের মাধ্যমে বদলি করলেন ডি এম ও এস পি কে।

তদন্তে ডি এম ও এস পি নির্দোষ প্রমাণিত হলেন। ডি এম কে, ঢাকায় নিয়োগ করা হল একটি প্রভাবশালী পদে।

৩ উন্নয়ন ও প্রশাসন

বিভিন্ন প্রভাবশালী মহল, যেমন, একজন পারিবারিক বন্ধু (নকৃশা ৩৬), মুখ্যমন্ত্রীসহ ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল [নকৃশা ৩৭,৩৮] বা প্রশাসনের শীর্ষে অবস্থানকারী মুখ্যসচিবের [নকৃশা ৩৯] চাপের মুখে, জাতীয় উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে [যেমন, ভূমি. শিল্প, যোগাযোগ, বাণিজ্য] নিয়োজিত একজন আমলা বিপর্যস্ত বোধ করতে পারেন, কারণ, তখন পেশাগত নীতি ও জনস্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখা দুরূহ হয়ে ওঠে। ভাগ্যগুণে, অনেক সময় জনস্বার্থ ক্ষুণ্ণ না করেও হয়তো একজন সরকারী কর্মচারী প্রভাবশালী কোন মহলকে সন্তুষ্ট রাখতে পারেন [নকৃশা ৩৬]। অন্য অবস্থায় একজন যুগ্ম-সচিব যখন বাধা দেন মুখ্য সচিবকে একটি চুক্তিনামা লঙ্ঘন করে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি পক্ষপাত দেখানোর জন্য [কারণ, ইতিমধ্যে একটি বড় কোম্পানির সঙ্গে সরকার আবদ্ধ হয়েছিল চুক্তিতে] তখন তিনি হুমকির সম্মুখীন হন [নকৃশা ৩৯], যদিও শেষ পর্যন্ত এ হুমকি বাস্তবে রূপায়িত হয় না। আবার ভূমি সংক্রান্ত একজন অফিসার যখন শাসকদলের সদস্য কর্তৃক অবৈধভাবে দখলিকৃত জমি উদ্ধার করেন, তখন তাঁকে সম্মুখীন হতে হয় মুখ্যমন্ত্রীর রোষের এবং পরিণামে বদলির [নকৃশা ৩৭]।[১৮] সাধারণ মানুষ আশ্বস্ত হতে পারেন অন্তত এ ভেবে যে, আই জি এবং মুখ্যমন্ত্রীর [ও তাঁর দলের সদস্যদের] চালের বিরুদ্ধেও একজন সৎ পুলিশ অফিসারকে রক্ষার জন্য একজন এস পি সফল ব্যবস্থা নিতে পারেন [নকৃশা ৩৮]।

নকৃশা

৩৬. পঞ্চাশের দশক। ক তখন 'ল্যাণ্ড অ্যাক্যুজিশন'-এর দায়িত্বে। ঐ সময় ভাওয়াল এস্টেট ও এস্টেটের ম্যানেজারের বিরুদ্ধে নানারকম অভিযোগ উঠছিল। সরকার ঠিক করলেন এস্টেটটি সরকারের অধীনে নিয়ে আসা হবে। সরকারী নির্দেশে ক সে অনুযায়ী কাজ শুরু করলেন।

এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন ক-এর বাবার বন্ধু। তিনি দেখা করলেন ক-এর সঙ্গে। অনুরোধ জানিয়ে বললেন, কোন একটা ফাঁক দেখিয়ে এস্টেটটিকে সরকারের আওতার বাইরে রাখা যায় কিনা। ক বললেন, তা সম্ভব নয়। ম্যানেজার তখন বললেন, এ সামান্য কাজটুকু করে দিলে ক-কে তিনি সেগুন-বাগিচায় বেশ-কিছু জমি দেবেন। বাবার বন্ধু, তাই ক তাঁর সঙ্গে রূঢ় হতে পারছিলেন না। ব্যাপারটি তাড়াতাড়ি নিষ্পত্তির জন্য ক বললেন, এস্টেট সরকারী অধীনে আনা হবেই তবে এস্টেটের ম্যানেজারের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ তিনি আনবেন না। কারণ ক ভেবে দেখেছিলেন, ম্যানেজারের বিরুদ্ধে অভিযোগ না আনলে সরকারের কোন ক্ষতি হবে না।

৩৭. নুরুল আমীন তখন পূর্ব-বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। ক 'ল্যাণ্ড অ্যাকুজিশন'-এর দায়িত্বে। ঢাকা-ময়মনসিংহে তখন অনেক বন ছিল ব্যক্তিগত মালিকানায়। আইনমতে, সরকার কিন্তু এগুলি দখল করে নিতে পারে। তবে, ঐ বনে যদি মালিক পত্তনী দিয়ে থাকেন তা'হলে সরকার তা দখল করতে পারেন না। এ কথা জেনে, অনেক মালিক পুরনো তারিখ দিয়ে পত্তনীর ভুয়ো কাগজপত্র তৈরি করলেন। ক জানতেন এসব কাগজ পত্রজাল, তিনি নিজে সরেজমিনে তদন্ত করে দেখেছেন ঐসব বনে কোন পত্তনী নেই। তাই আইন অনুযায়ী বনগুলি খাস করে নিলেন।

ক-এর কার্যকলাপে, মুসলিম লীগের কিছু প্রভাবশালী সদস্য ও মুখ্যমন্ত্রীর কয়েকজন বন্ধুবান্ধবও জমি হারালেন। তাঁরা এসে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রীকে। তিনি ক-কে ডেকে পাঠিয়ে তাঁদের জমি ছেড়ে দিতে বললেন। ক বললেন, 'স্যার, সরকারী আইন অনুযায়ী আমি তা পারি না।'

মুখ্যমন্ত্রী বললেন, 'তা ঠিক, কিন্তু রাজনৈতিক কারণে মাঝে মাঝে এসব করতে হয়।'

'কিন্তু স্যার আমি তো রাজনীতি করি না,' বললেন ক, 'আমি করি সরকারী চাকুরি। সুতরাং, সরকারী আইন তো আমাকে মানতে হবে।'

এর এক সপ্তাহ পর ঐ পদ থেকে বদলি করে দেওয়া হয়েছিল ক-কে।

৩৮. পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি। ক চাঁটগার এস পি। উখিয়ার ও সি তখন একজন তরুণ গ্র্যাজুয়েট। আদর্শবাদী এই তরুণ ও সি পুলিশে চাকরি করেও আদর্শ বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। ক পছন্দ করতেন এই যুবককে।

উখিয়ায় আওয়ামী লীগের কর্মীরা ছিল বেশ প্রভাবশালী। কয়েকজন কর্মীর

আবার বেশ ক'টি বাস ছিল। বাসের ব্যাবসা তাঁরা করতেন বটে কিন্তু ইনকাম-ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জন্য বাসের কাগজপত্রে উল্লেখ থাকত 'অফ দি রোড'। ও সি-র নজরে পড়লে তিনি বাসগুলি আটক করে, মালিকদের চালান দিয়ে দেন।

এ ঘটনার পর, জনৈক আওয়ামী নেতা দেখা করলেন ক-এর সঙ্গে, চাঁটগায়। অভিযোগ জানিয়ে তিনি বললেন, উখিয়ার ও সি চোরাকারবারীদের বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করছে, স্থতরাং জনস্বার্থের খাতিরে তাকে বদলি করা উচিত।

ক বললেন, 'বলেন কি, এত গুরুতর অভিযোগ! তাকে বদলি কি, বরখাস্ত করা উচিত। আপনি কি আপনার অভিযোগগুলি একটু লিখে দেবেন।'

আওয়ামী নেতা ক-এর এই প্রস্তাবে রাজী হলেন না। ক তখন জানালেন, ঠিক আছে, তবে তাঁর এবং নেতার মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছে তা তিনি লিখে নিয়েছেন এবং এটাই গৃহীত হবে অভিযোগ হিসেবে।

এরপর ক তদন্ত করতে গেলেন উখিয়ায়। সাধারণ লোকেদের সঙ্গে আলাপ করলেন ও সি-র কার্যকলাপ সম্পর্কে। সাধারণ মানুষ ও সি সম্পর্কে কোন অভিযোগ জানালেন না। ক তারপর আলাপ করলেন ও সি-র সঙ্গে। ও সি তখন বাস আটকের ঘটনাটি জানালেন তাঁকে।

এদিকে তদন্তের গতি-প্রকৃতি স্থানীয় নেতারা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীকে। তিনি আই জি-কে নির্দেশ দিলেন এ ব্যাপারে কিছু করার জন্য।

আই জি লিখলেন ক-কে। তিনি আই জি-কে জানালেন যে, ও সি-র বিরুদ্ধে অভিযোগ মিথ্যা। আই জি সেখানেই ব্যাপারটার ইতি করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে, ক-এর রিপোর্টটি পাঠালেন মুখ্যমন্ত্রীকে। মুখ্যমন্ত্রী ফাইলে লিখলেন, ক-এর রিপোর্ট সন্তোষজনক নয়।

এ পরিপ্রেক্ষিতে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর দু'জন ইন্সপেক্টরকে পাঠানো হলো তদন্ত করতে। তারা এমন এক রিপোর্ট দিল যাতে ও সি-কে নির্দোষও বলা যায় আবার দোষীও বলা যায়। মুখ্যমন্ত্রী সেই রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে ও সি-কে সাসপেণ্ড করে বিভাগীয় প্রসিডিংস নিতে বললেন।

ক-এর কাছে এই নির্দেশ এলে, তিনি ঠিক করলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ তিনি পালন করবেন ঠিকই, তবে সঙ্গে সঙ্গে ও সি যে নির্দোষ সেটা যাতে সবাই জানে সে ব্যবস্থাও করবেন। তাই 'ডিস্ট্রিক্ট বুকে' তিনি লিখলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে উখিয়ার ও সি-কে সাসপেণ্ড করা হল। ক-এর ঠিক ওপরওয়ালা ডি আই জি এটা দেখে বললেন ক-কে, 'করেছেন কি? এরকম কেউ লেখে? শুধু লিখুন, তাকে

[ও সি-কে] সাসপেণ্ড করা হয়েছে।' ক যা করতে চেয়েছিলেন তাই হয়েছে। সুতরাং তিনি ডি আই জি-র নির্দেশ মেনে নিলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত এস. পি-কে নির্দেশ দিলেন আবার তদন্তের। তিনিও তদন্ত করে বললেন, ও সি নির্দোষ। ক সঙ্গে সঙ্গে ও সি-র ওপর থেকে সাসপেনশন অর্ডার প্রত্যাহার করে তাঁকে বদলি করে দিলেন অন্য থানায়। এভাবে তিনি রক্ষা করেছিলেন একজন সহকর্মীর সুনাম।

৩৯ পঞ্চাশ দশকের মধ্যভাগ। ক প্রাদেশিক শ্রম শিল্প বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব। তিনি ঐ পদে যোগ দেওয়ার আগে সরকারের সঙ্গে লুকাস কোম্পানি [ব্যাটারি প্রস্তুতকারক] একটি লিখিত চুক্তি করেছিল যাতে বলা হয়েছিল, যদি কোম্পানি বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় মেশিনপত্র আনে তা হলে সরকার তাদের কারখানা নির্মাণ করতে দেবে। লুকাস মেশিনপত্র আমদানি করে কারখানা নির্মাণের জন্য চুক্তি মোতাবেক অনুমতি চাইল। এদিকে স্থানীয় একটি কোম্পানিও একই দাবি জানাল [এর মালিক ছিলেন বিত্তশালী মুসলিম লীগের]। মুখ্য সচিব ক-কে ডেকে বললেন, স্থানীয় কোম্পানির মালিক শরীফ আদমি, মুসলমান, সুতরাং কারখানা নির্মাণের অনুমতিটা যেন তাকেই দেওয়া হয়। ক জানালেন, সরকারী আদেশ আগেই দেওয়া হয়েছে লুকাসের পক্ষে সুতরাং তাঁর আর করার কিছু নেই।

মুখ্যসচিব বললেন, 'দূর, বাদ দেন ওসব। ওরা আংরেজ, ইনি মুসলমান।'

'আমি পারব না', ক জানালেন, 'তবে আমার সিদ্ধান্ত ইচ্ছা করলে আপনি ওভারাইড করতে পারেন।' এ বলে তিনি যখন চলে এসেছেন তখন সচিব বললেন, 'ইউ আর এ টাফ গাই, বাট আই লাইক ইট।'

কয়েকদিন পর নতুন লেবার কমিশনার হলেন ইংরেজ ডি. কে. পাওয়ার। তিনিও ক-কে মুখ্যসচিবের মতো একই জিনিস বোঝাতে চাইলেন। রাজী হলেন না ক।

বছর অনেক পর মুখ্যসচিব ক-কে বলেছিলেন এ প্রসঙ্গ তুলে--- 'ইউ লেট মি ডাউন ভেরী ব্যাডলি। আই ওণ্ট ফরগেট ইট।'

বাস্তবে অবশ্য ক-কে কোন হয়রানি ভোগ করতে হয়নি।

৪ সংকট ও প্রশাসন

বন্যা, মহামারী, দাঙ্গা বা দুর্ভিক্ষ প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সংকটের সময় বেশি প্রয়োজন সরকারী কর্মচারীদের ন্যায়পরায়ণতার। কিন্তু, একটি সংকটের সময়

সাধারণ তথ্যও বিভ্রান্ত করতে পারে সর্বোচ্চ পদে আসীন একজন প্রশাসককে [নক্শা ৪০]। যেমন, একজন গভর্নরকে [প্রাক্তন মেজর জেনারেল]।[১৯] বন্যার সময় সাধারণ মানুষের কী প্রয়োজন তা তিনি জানতেন না, এবং সংকট-কালে অবাস্তব নির্দেশ পাঠিয়ে অধস্তনদের কাছে তিনি যে তথ্য পেয়েছিলেন তা ছিল বানোয়াট। কারণ, ঐ সময় অধস্তন কর্মচারীর পক্ষেও সম্ভব ছিল না কর্মকর্তা চাওয়ামাত্র যে-কোন বিষয়ে সঠিক তথ্য প্রদানের। একজন এস ডি ও একটি দাঙ্গা থামাতে আপ্রাণ চেষ্টা করতে পারেন, কিন্তু দাঙ্গা সৃষ্টি ও পূর্ববাংলার নির্বাচিত মন্ত্রীসভাকে [নক্শা ৪১] হেয় করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানীদের উচ্চ পর্যায়ের ষড়যন্ত্র রোধ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।[২০] তবে তাঁর কৃতিত্ব ও সান্ত্বনা এই যে তাঁর বিরুদ্ধে, এ পরিপ্রেক্ষিতে একজন আই জি ও তাঁর আত্মীয় ডি আই জি-র বানোয়াট অভিযোগ বিচার বিভাগীয় কমিশন নাকচ করে দিয়েছিল। দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সাহায্যের জন্য পুরনো এক বন্ধুর সঙ্গে [যিনি রাজনীতিক] সাহায্য সংগ্রহে যেতে ওঠেন তরুণ এক এস ডি পি ও [নক্শা ৪২]। এটা জেনে তাঁর উচ্চপদস্থ এক আমলা আত্মীয় সতর্ক করে দেন তাঁকে। কারণ এ উৎসাহ, তরুণ এস ডি পি ও-কে সন্দেহভাজন করে তুলতে পারে, বিপদে ফেলতে পারে সরকারী চাকুরির নিয়ম বিধির জটাজালে আবদ্ধ ক'রে।[২১] এরপর এই অফিসার সংকটে পতিত জনগণের জন্য নিজে কখনো এরকম উদ্যোগ গ্রহণ করেন নি।

ভাষা আন্দোলনের মতো পরিস্থিতি, যা সৃষ্টি করতে পারে সংকট ও ভায়োলেন্স, এবং যার ভিত্তি বহুদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, তাও মোকাবেলা করা যেতে পারে যদি দীর্ঘদিন ধৈর্যের সঙ্গে জনগণের সাথে যোগাযোগ রাখা যায়। এখানে [নক্শা ৪৩] এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন একজন এস পি-র কথা বলা হয়েছে যিনি শক্তি প্রয়োগ না করে আয়ত্তে এনেছিলেন সংকটজনক পরিস্থিতি।[২২]

নক্শা

৪০. পঞ্চাশ দশকে, পূর্বপাকিস্তানের ভয়াবহ বন্যার সময় নারায়ণগঞ্জ পরিদর্শনে এলেন গভর্নর ইসকান্দার মীর্জা, যিনি ছিলেন একজন প্রাক্তন সামরিক অফিসার।

নারায়ণগঞ্জের এস ডি ও-র সঙ্গে লঞ্চে করে যাচ্ছেন মীর্জা। ডুবন্ত গ্রাম, ফসলের ক্ষেত দেখতে দেখতে এক পর্যায়ে তিনি বললেন, বন্যা থেকে বাঁচার জন্য তো প্রচুর বাঁশের ভেলা তৈরি করা যেতে পারে। এস ডি ও বললেন, 'এত

বাঁশ পাব কোথায় ?' মীর্জা ডুবন্ত গাছপালা দেখিয়ে বললেন, 'ঐ তো কত বাঁশ আর তোমরা নাকি বাঁশ পাও না ?' পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে পশ্চিম পাকিস্তানীদের জ্ঞানের বহর ছিল এরকমই।

যা হোক, মীর্জা ঢাকা ফিরে গিয়ে, এস ডি ও-কে জানালেন, বন্যায় শিবপুর থানায় কয়েকটি কাঁঠালের গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, অবিলম্বে সে বিষয়ে রিপোর্ট পাঠাতে। এস ডি ও পড়লেন বিপাকে। এ হিসাব তিনি দেবেন কিভাবে ? খবর পাঠালেন তিনি নরসিংদীর সার্কেল অফিসার চটপটে এক বিজ্ঞান গ্রাজুয়েটকে। সে বলল, 'চিন্তা করবেন না স্যার, এ আর এমন কী ঝামেলার কাজ ? কয়েক-ঘণ্টার মধ্যেই আপনি রিপোর্ট পেয়ে যাবেন।'

তখনকার এস ডি ও, বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত সচিব, সেই স্মৃতি রোমন্থন করে মন্তব্য করলেন— 'প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সরকারী যেসব রিপোর্ট দেওয়া হয় তার অধিকাংশই বানানো।'

৪১. একজন অবসর প্রাপ্ত সচিব [পঞ্চাশের দশকে আদমজী পাটকলে বাঙালী-অবাঙালী শ্রমিকদের রায়টের পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন, আদমজী রায়ট ছিল পূর্বপরিকল্পিত, পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাকে হেয় করে তোলার একটি অপকৌশল মাত্র। এর প্রধান নায়ক ছিলেন ইসকান্দার মীর্জার ঘনিষ্ঠ সহযোগী, আদমজীর জেনারেল ম্যানেজার কারিম।

দাঙ্গার সময় এস ডি ও ব্যস্ত ছিলেন সারাক্ষণ দাঙ্গা থামানোর ব্যাপারে। দাঙ্গাবাজদের সে সময় দমন করেছিলেন কঠোর হস্তে যা কারিম পছন্দ করেনি। দাঙ্গা খানিকটা প্রশমিত হলে ইসকান্দার মীর্জা এলেন আদমজী পরিদর্শনে। সঙ্গে কারিম। পরিদর্শন শেষে দু'জনেই একসঙ্গে লঞ্চে উঠলেন এস ডি ও-র বাসা থেকে। লঞ্চে ওঠার সময় আগে, এস ডি ও-র কাঁধে মৃদু চাপড় মেরে গেলেন কারিম। বোঝাতে চাইলেন, দেখতেই পাচ্ছ, ক্ষমতার কেন্দ্রের সঙ্গে আমার সংস্পর্শ। ফিরে আসি, তারপর দেখা যাবে তোমার কারিকুরি।

আদমজীর দাঙ্গা নিয়ে তারপর শুরু হয়েছিল বিচার বিভাগীয় তদন্ত। এস ডি ও-কে ডাকা হয়েছিল কমিশানের সামনে, ডাকা হয়েছিল পুলিশের ডি আই জি-কে। আই জি দোহার বোনের জামাই ছিলেন ডি আই জি। তাঁর জবান-বন্দীতে, সম্পূর্ণ দোষ তিনি চাপিয়ে দিলেন এস ডি ও-র ওপর। কমিশান কিন্তু সে জবানবন্দী গ্রাহ্য করে নি। এস ডি ও-কে সমস্ত অভিযোগ থেকে মুক্তি দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, বিচারক এ মন্তব্যও করেছিলেন যে, ডি আই জি

যখন এস ডি ও-র ওপর দোষারোপ করেছিলেন তখন তার বিবেক ছিল মলিন।

৪২. পঞ্চাশের দশক। ক তখন কক্সবাজারের এস ডি পি ও। ঐ সময় দেখা দিয়েছিল দুর্ভিক্ষ। কক্সবাজারের স্থানীয় এলিটরা মিলে ঠিক করলেন, তাঁরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে চাঁদা তুলবেন। কক্সবাজারের তরুণ প্রভাবশালী নেতা ফরিদ আহমদ গ্রহণ করেছিলেন এ উদ্যোগ। তিনি ছিলেন ক-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সুতরাং এসব কর্মকাণ্ডে ক-ও জড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা দু'জনে চাঁদা তুলতে বেরিয়ে প্রচুর টাকা চাঁদা তুলেছিলেন। দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধকল্পে তিনি নিজেও কিছু করতে পারছেন— এই ছিল ক-এর তৃপ্তি।

এর কিছুদিন পর ক ঢাকায় গেলে, তাঁর এক আত্মীয়, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী তাঁকে বললেন চাঁদা তুলতে গিয়ে সরকারী কর্মচারী হিসেবে তিনি গর্হিত কাজ করেছেন। কারণ, যাঁরা চাঁদা দিয়েছেন তাঁরা পরে এর বিনিময়ে কিছু দাবি করতে পারেন। চাঁদা তোলার সময় কিন্তু ক-এর একথা কখনো মনে হয়নি। আন্তরিক ভাবেই তিনি ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য চাঁদা তুলেছিলেন।

এ ঘটনার পর, চাকুরি জীবনে তিনি আর কখনো এ ধরনের কাজে অংশ নেননি।

৪৩. ভাষা আন্দোলনের সময় ক ছিলেন একটি জেলার এস পি। কার্যভার বুঝে নেওয়ার সময় থেকেই ছাত্রদের সঙ্গে মিশতেন তিনি বন্ধুর মতন। তাদের সভাসমিতিতে আমন্ত্রণ জানালে যেতেন। এক ধরনের বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল তাঁর সঙ্গে স্থানীয় ছাত্রদের।

ছাত্র আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন একদিন সারাদেশে আহ্বান করা হয়েছিল হরতাল। সরকারী নির্দেশ, হরতাল রোধ করতে হবে।

হরতালের দিন ছাত্ররা আদালতে পিকেটিং করছে। প্রশাসন কী করবে বুঝতে পারছে না। ডি এম তাঁকে ডেকে বললেন, 'আমি কিছু জানি না, আপনি যা পারেন করেন।'

ক দেখলেন, পুলিশ নিয়ে আদালত প্রাঙ্গণে গেলে পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠবে। অথচ সরকারী কর্মচারী হিসেবে সরকারী নির্দেশও মানতে হয়। তাই অনেক ভেবে-চিন্তে তিনি একলাই গেলেন আদালতে। পিকেটিংরত ছাত্রদের সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ করলেন। আলোচনা শেষে ঠিক হল, সরকারী কর্মচারী হিসেবে ম্যাজিস্ট্রেটরা আদালতে যাবেন, কিন্তু আর-কেউ যাবেন না।

এ ভাবে, সরকারী নির্দেশ অক্ষুণ্ণ রেখে ক অপ্রীতিকর অবস্থা এড়িয়েছিলেন।

৫ সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক

১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনের অনেক আগেই ১৯৫০-এর দিকে উচ্চপদে বহাল অবাঙালী আমলারা মেনে নিয়েছিলেন সামরিক আধিপত্য। বাঙালী একজন এস ডি ও বে-আইনী কাজ করার জন্য গ্রেফতার করেছিলেন অবাঙালী এক সৈনিককে। সৈনিকটি ধর্ষণ করেছিল একটি বাঙালী মেয়েকে [নকৃশা ৪৪] এস ডি ও-কে এ কারণে ভৎর্সনা করা হয়েছিল। সৎ ও দক্ষ বাঙালী আমলারা তখনই হয়তো আসন্ন সামরিক শাসনের আলামত পেয়েছিলেন। যেমন, একজন ডি এম একবার তদন্ত করে দেখতে পেলেন [নকৃশা ৪৫] একজন সামরিক অফিসার চোরাকারবারী দমনের নামে ক্ষমতার অপব্যবহার করছে।[২৩] উচ্চতর কর্তৃপক্ষ এ তদন্ত রিপোর্টের দিকে কোন দৃকপাত করেন নি, বরং সামরিক অফিসারটির যাতে সাজা না হয় সে উপায় করে দিয়েছিলেন।

নকৃশা

৪৪. পঞ্চাশের দশকে আদমজীতে যখন বাঙালী-অবাঙালী শ্রমিকদের মধ্যে ভয়াবহ দাঙ্গা হয়েছিল, ক তখন ছিলেন নারায়ণগঞ্জের এস ডি ও।

দাঙ্গা চলাকালীন, পাকিস্তানী এক সৈন্য ধর্ষণ করেছিল এক বাঙালী মেয়েকে। ক তাকে গ্রেফতার করেছিলেন। এ কথা জানার পর তাঁকে ডেকে পাঠানো হল সচিবালয়ে।

'তুমি কি লেখাপড়া করেছ? আইন-কানুন জান কিছু?' প্রশ্ন করলেন তাঁকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব।

'জানি।' জবাব দিলেন ক।

'জানোই যদি, তা'হলে সেনাবাহিনীর সদস্যকে গ্রেফতার করলে কিভাবে?'

'আমি জানি,' উত্তর দিলেন ক, 'পিনাল কোড অনুযায়ী যে-কাউকে গ্রেফতার করা যায়।'

'পিনাল কোড কোন কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে।' বললেন উপ-সচিব।

এ ঘটনার জন্য তাকে সরকারী ভাবে ভৎর্সনা করা হয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, উপ-সচিব ছিলেন অবাঙালী।

৪৫. পঞ্চাশের দশক। ক তখন সীমান্তবর্তী একটি জেলার ডি এম। চোরা-চালানী বন্ধের নামে সেনাবাহিনী সে সময় 'ক্লোজ ডোর অপারেশন' নামে একটি

অভিযান চালিয়েছিল। যদিও বাইরে বলা হয়েছিল চোরাচালানী দমন, আসলে সেই প্রথম দেশের চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল সেনাবাহিনী, ১৯৫৮ সালের সামরিক আইন জারীর প্রস্তুতি হিসেবে।

ঐ জেলার, একটি মহকুমায় চোরাচালানী দমন নিয়ে সেনাবাহিনী এবং পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। উভয় পক্ষেই দোষারোপ করে অপর পক্ষকে।

ডি এম, এ ব্যাপারে তদন্ত করে দেখলেন, দোষ সেনাবাহিনীর। তাদের এক লেফটেনাণ্টের উদ্ধত ব্যবহারের জন্যই ঘটেছে সংঘর্ষ। তিনি ও এস পি এই পরিপ্রেক্ষিতে কড়া চিঠি লিখলেন কর্তৃপক্ষকে। কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত লেফটেনাণ্টকে বদলি করে দিল কিন্তু তার কোন শাস্তি হল না।

বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত সচিব, তখনকার ডি এম মন্তব্য করেছেন, 'তখনই অনুধাবন করলাম যেহেতু দোষী সেনাবাহিনীর সদস্য, সেহেতু সে বিশেষ সুবিধা পেল, এবং এটাই ছিল ফার্স্ট টেস্ট অফ মিলিটারি ইনটারফেয়ারেন্স ইন এ্যাডমিনিস-ট্রেশন।'

তথ্যপঞ্জী :

১. অবাঙালীরা এতই ক্ষমতা-ক্ষুধার্ত ছিল যে, লালমণিরহাট রেলওয়ে ইনস-টিটিউটের নির্বাচনে বাঙালীরা জিতলে, ক্রুদ্ধ হয়ে পুলিশ দিয়ে গ্রেফতার করিয়েছিল একজন প্রভাবশালী বাঙালীকে। দেখুন :
East Bengal Legislative Assembly Proceedings [এরপর থেকে *EBLAP*], Third Session, Dhaka, 1949, pp. 99-100.

২. জহুর হোসের চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫।

৩. আজিজ আহমদের মর্যাদা ও বেতন সংক্রান্ত বিতর্কের জন্য *EBLAP*, Third Session. 1949, pp. 129, 196. বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যাপারে অবাঙালী আমলারা কিভাবে বঞ্চিত করতেন বাঙালী আমলাদের সে বিবরণের জন্য দেখুন, আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর [এরপর শুধু উল্লিখিত হবে পঞ্চাশ বছর], নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ. ৪৮২-৮৫।

৪. কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ এজেন্ট হিসেবে আজিজ আহমদের কর্মক্লান্ত, অহং,

প্রভাব প্রতিপত্তি ও হঠকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ— এ-সব বিষয়ের জন্য দেখুন, বদরুদ্দীন উমর, পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৭২-৭৩ ; পঞ্চাশ বছর ; *EBLAP*, Fifth Session 1951 pp. 135-36.

৫. এস এম হায়দার, 'আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিতে প্রশাসনিক সমস্যা' নীলুফার বেগম সম্পাদিত, স্মৃতিচারণ [এরপর শুধু এ নামই উল্লিখিত হবে], সিভিল সার্ভিস ট্রেনিং একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৫৫। জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বাঙালী-অবাঙালীর দ্বন্দ্বের কারণের জন্য, বি এম আব্বাস, কিছু স্মৃতি [এরপর শুধু কিছু স্মৃতি] খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৪৪।

৬. অবাঙালী আমলাদের রূঢ় ব্যবহার প্রসঙ্গে, কিছু স্মৃতি, পৃ. ৪৫ ; তফাজ্জল হোসেন, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৪৩-৪৪। সি এস পি দের উদ্ধত ব্যবহারের জন্য, আতাউর রহমান খান, ও জারতির দুই, বছর, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ১৩৩ [এরপর উল্লেখ করা হবে দুই বছর] ; *East Pakistan Legislative Assembly Proceedings* [উল্লিখিত হবে *EPLAP*], Dhaka, Fisst Session, 1957, pp. 205-6.

৭. বাংলা ভাষাকে হেয় করার প্রতিবাদে বাঙালী আমলাদের প্রতিবাদ— সৈয়দ মুর্তাজা আলী, আমাদের কালের কথা, বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৯৬৮, পৃ. ২৬৬ ; দুই বছর, পৃ. ৫৭-৫৮।

৮. ইনি হলেন সোহরাওয়ার্দী যাঁকে ১৯৪৭ এর পর শাসকচক্র নানাভাবে হেনস্থার চেষ্টা করেছে। একটি উদাহরণের জন্য, আবুল মনসুর আহমদ, আত্মকথা, খোশারোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৭৮, পৃ. ৩৮২-৬।

৯. এই পুলিশ অফিসারের ভালো কাজের ব্যাখ্যা এ ভাবেও দেওয়া যেতে পারে যে, তিনি বিদ্যমান ব্যবস্থা বজায় রাখার প্রচেষ্টাই করেছিলেন এস্টাবলিশমেন্টের পক্ষ হয়ে। পর্যালোচনার জন্য, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, নিরাশ্রয়ী গৃহী ও অন্যান্য প্রবন্ধ, বর্ণমিছিল, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ৭৬।

১০. কোন কোন ক্ষেত্রে আমলারা সাহায্য করেছেন ধর্মঘটিদের। আবদুল মোহাইমেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪। এ পরিপ্রেক্ষিতে মনে রাখা দরকার যে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন পাকিস্তানে ছিল দুর্বল এবং মাত্র ১৯৬০ সালে স্বীকৃত হয়েছিল ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার। দেখুন, **Stanely A. Kochanek, *Interest Groups and Development*:**

Business and Politics in Pakistan, Oxford University Press, Delhi, 1983, p. 69.

১১. পুলিশ রক্ষক না হয়ে পালন করছে ভক্ষকের ভূমিকা— উদাহরণের জন্য, *EBLAP*, Tenth Session, 1953, p. 101 ; স্বার্থের কারণে উচ্চপর্যায়ের আমলাদের নিপীড়নের জন্য, ঐ, Ninth Session. 1952, p. 29.

১২. বি এম আব্বাস যখন ফরিদপুরের নির্বাহী প্রকৌশলী তখন মোহন মিয়া একটি টেণ্ডার খোলার তারিখ পিছিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন যা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন আব্বাস। এবং মোহন মিয়াও আর তাতে হস্তক্ষেপ করেন নি। কিছু স্মৃতি, পৃ. ৩৩।

১৩. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের আগে বিরোধীদলের প্রতি নির্যাতন ও মুসলিম লীগের ভূমিকা সম্পর্কে দেখুন, তোফাজ্জল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০ ; কোচানেক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯ ; সৈয়দ আবুল মকসুদ, ভাসানী, লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ১২৩ [এরপর থেকে উল্লেখ করা হবে ভাসানী]।

১৪. বি এম আব্বাসের মতে, শেখ মুজিব যদি কখনও কোন অনুরোধ করতেনও, পরে তা করে দেওয়ার জন্য চাপ দিতেন না, কিছু স্মৃতি, পৃ. ৩৩।

১৫. এ প্রাদেশিক গভর্নর ছিলেন ফজলুল হক, যিনি বিখ্যাত ছিলেন, জানিয়েছেন একজন গবেষক, পক্ষপাতিত্বের জন্য, ভাসানী, পৃ. ১২৬।

১৬. এ ধরনের ঘটনার আরেকটি উদাহরণ পাওয়া যাবে, কিছু স্মৃতি, পৃ. ৫৩।

১৭. সরকারী কর্মচারীদের প্রতি সাধারণ মানুষের বহুদিনের পুঞ্জীভূত ক্রোধ, ঘৃণা ও অবিশ্বাসের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন আবুল মনসুর আহমদ। বেশী দামে কেনা, কম দামে বেচা, আমাদের স্বাধীনতা, পৃ. ২২৪।

১৮. এ ধরনের ঘটনার জন্য দেখুন, চৌধুরী কুদরতে গনি, 'উন্নয়ন ও আমলাতান্ত্রিক রাজনীতি' স্মৃতিচারণ, পৃ. ৩৩। আমলাদের বদলির ব্যাপারে রাজনীতিবিদদের অত্যধিক মনোযোগ দেওয়ার ব্যাপারে দেখুন, দুইবছর, পৃ. ১৫৭-৯।

১৯. একই ধরনের মনোভাব ছিল পূর্ব-পাকিস্তানের আরেকজন গভর্নর ফিরোজ খান নুনের। কিছু স্মৃতি, পৃ. ৫৭।

২০. ঐ সময়ের দাঙ্গা, মুসলিম লীগ ও বড় ব্যবসায়ীদের আঁতাত, যুক্তফ্রণ্টের পতনের ব্যাপারে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে দেখুন, তোফাজ্জল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮, ৫৬-৮ ; ভাসানী, পৃ. ১২৭-৮। দাঙ্গা সম্পর্কে পরিষদে প্রশ্নোত্তর *EPLAP*, First Session, 1956, p. 21.

২১. আবার চাঁদা সংগ্রহের খাতিরে একজন আমলা ক্ষমতার অপব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে হেনস্থাও করতে পারেন। দেখুন, *EBLAP*, Sixth Session, 1951, p. 169.

২২. প্রশাসনিক সংযমের এ ধরনের ঘটনার বিবরণের জন্য, এস এম হায়দারের প্রবন্ধ, স্মৃতিচারণ। বিপরীত ধরনের ঘটনার জন্য, ভাষা আন্দোলন···, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২৪১-২।

২৩. পশ্চিম পাকিস্তান যা ছিল চোরাচালানের স্বর্গভূমি সেখানে এ ধরনের 'অপারেশন' চালানো হয়নি। পূর্বাঞ্চলে এমন ঘটনাও ঘটেছে যে আমলারা সাধারণ মানুষকে রক্ষা করতে গিয়ে নাজেহাল হয়েছেন সামরিক বাহিনীর হাতে। আইন পরিষদে আলোচিত হয়েছিল এ সব ঘটনা। দেখুন, *EPLAP*, First Session, 1958, pp. 29-31.

পার্লামেন্টারি প্রথা কিভাবে আমলারা বিনষ্ট করে সামরিক আধিপত্যের দিন শুরু করছিল তার একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন আবুল মনসুর আহমেদ। প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী একবার বিদেশে গেলে, ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন আবুল মনসুর আহমেদ। ঐ সময় তিনি একটি অস্ত্র কারখানা পরিদর্শনে যান এবং এর উৎপাদন সম্পর্কে জানতে চান। সামরিক অফিসাররা এর উত্তর দেয়নি বরং সোহরাওয়ার্দী ফিরে এলে এ ব্যাপারে তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করা হয়। সোহরাওয়ার্দী মনসুরকে মৃদু ভৎর্সনা করে বলেন সামরিক ব্যাপারে কৌতূহল না দেখালেই ভালো। আবুল মনসুর আশ্চর্য হয়ে দেখলেন যে, সোহরাওয়ার্দীর মতো রাজনীতিবিদও তখন সামরিক আমলাদের সঙ্গে সমঝোতা করে চলছেন যদিও দেশে পার্লামেন্টারি প্রথা বলবৎ। দেখুন; আবুল মনসুর আহমেদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, পৃ. ৪৯৭-৯৯।

তৃতীয় অধ্যায়

পূর্ব পাকিস্তান : সামরিক শাসন

৬ পূর্ব পাকিস্তান বনাম পশ্চিম পাকিস্তান

১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারী পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অসম নীতি গ্রহণের পথ অপেক্ষাকৃত ভাবে সহজ করে দিয়েছিল। পার্লামেণ্টারি রাজনীতি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল বাঙালীদের ; তাদের অর্থনীতি, সিভিল সার্ভিস এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অবাধ হয়ে উঠেছিল পশ্চিম পাকিস্তানীদের অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ আর এসব মিলে বাঙালীদের মনে সৃষ্টি হয়েছিল অসন্তোষের। বাঙালী আমলাদের সামনেই, পশ্চিম পাকিস্তানের কর্তারা, অর্থনৈতিক ভাগবাটোয়ারার ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি নির্লজ্জ আচরণ করতেন। উদাহরণস্বরূপ একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ইসলামাবাদে পরিকল্পনা কমিশনের একটি মিটিঙে [নকৃশা ৪৬] পশ্চিম পাকিস্তানী চেয়ারম্যান, মিটিঙের শেষ পর্যায়ে আলোচনা ব্যতিরিকে লাহোর ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের একটি বড় প্রকল্প গ্রহণ করলেন।[১] অন্যদিকে, মিটিং চলাকালীন কোন-না-কোন অজুহাত দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের পেশকৃত প্রকল্পগুলি মুলতবী রাখলেন।[২] এ পরিপ্রেক্ষিতে, একজন বাঙালী কর্মকর্তা প্রশ্ন করলে তিনি তা উপেক্ষা করেন। দুঃখের বিষয় এই যে, ঐ সভায় পরিকল্পনা কমিশনের দু'জন বাঙালী সদস্য উপস্থিত ছিলেন যাদের একজন ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। নীরব দর্শকের মতো সভায় উপস্থিত ছিলেন তাঁরা।[৩] তাঁদের চাকরির প্রতি কোন হুমকি ছিল না, যে হুমকি ছিল সরকারী চাকুরিরত বাঙালী অফিসারের যিনি প্রতিবাদ করেছিলেন। কেননা, তিনি আপত্তি তুলেছিলেন উঁচু পর্যায়ের একজন আমলার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। এমনকি একজন বাঙালী আমলা যখন পূর্ব অনুমতি নিয়ে করাচী থেকে একটি সংস্থা [ডিরেক্টরেট] বদলি করেন চট্টগ্রামে [নকৃশা ৪৭], তখনও তাঁকে অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত করা হয় এ বলে যে তিনি অন্যায়ভাবে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সম্পদ পাচার করছেন পূর্ব পাকিস্তানে। পূর্ব পাকিস্তানে যেসব ব্যাঙ্কের মালিকরা ছিলেন অবাঙালী তারা যতটা সম্ভব বাঙালী ব্যবসায়ীদের ব্যাঙ্ক মারফত সুবিধা দেওয়া থেকে বিরত রাখতেন নিজেদের,

কিন্তু গোপনে আবার সহায়তা করতেন বাঙালী রাজনীতিবিদদের [নকশা ৪৮]। কোন বাঙালী কর্মচারী যদি যথেষ্ট দক্ষ হতেন এবং তার প্রমোশন আটকানো একেবারে অসম্ভব হত তখন সমমর্যাদার একজন পশ্চিম পাকিস্তানীকে যুক্ত করা হত তার সঙ্গে তার ওপর নজর রাখার জন্য।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত যেমন, তেমনি ১৯৫৮ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত, প্রায় ক্ষেত্রে বাঙালী আমলারা শিকার হয়েছেন নানাবিধ বঞ্চনা ও অপকৌশলের। এটি প্রকট হয়ে উঠত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার সময়। পশ্চিম পাকিস্তানী আমলা-শাসিত কেন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল সিভিল সার্ভিসে বাঙালীদের সংখ্যা যাতে বৃদ্ধি না পায়। সেজন্য লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় বাঙালী পরীক্ষার্থীদের মূল্যায়নে আচরিত হত শঠতা। এটা বোঝা যেত তখন যখন সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় সফল কিন্তু নিম্নস্থান অধিকারী বাঙালী ট্রেনিং একাডেমিতে হতেন উচ্চতম স্থানের অধিকারী। কারণ, একাডেমিতে পরীক্ষার্থী কম থাকায় সম্ভব হত না অপকৌশল অবলম্বন করার। তা ছাড়া, সংখ্যার স্বল্পতার জন্য স্থাপিত হত শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে এক ধরনের মনোরম সম্পর্ক। এসব অভিজ্ঞতা বাঙালী আমলাদের ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সময় সহানুভূতিশীল করে তুলেছিল আওয়ামী লীগের প্রতি [নক্শা ৫০] এবং মনে মনে তারা জয় কামনা করছিলেন আওয়ামী লীগের। আর কিছু না হোক, আওয়ামী লীগ দাবি করেছিল স্বায়ত্তশাসনের যা হয়তো অন্তিমে বাঙালীদের বিরুদ্ধে অবিচার বন্ধ করবে, যার সুফল পাবেন বাঙালী আমলারাও।

১৯৬১ সালে, ফয়েজ আহমদ ফয়েজের মতো প্রগতিশীল কবির কাছ থেকেও রবীন্দ্রশতবার্ষিকী পালন উপলক্ষে একজন বাঙালী আমলা তেমন সাড়া পাননি [নক্শা ৫১]। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রবাসী এক মার্কিন অধ্যাপকের বাসায় তাঁকে আয়োজন করতে হয়েছিল এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানের। বাঙালী সংস্কৃতির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিভক্তি সৃষ্টির প্রয়াস— এসব কিছু বাঙালী আমলাদের অসন্তোষ আরো বৃদ্ধি করেছিল।[৪] এ দৃষ্টিভঙ্গীর কারণেই দেখা যায়, রেলওয়ের অবাঙালী কর্মচারীদের জন্য স্থাপিত হয়েছে আলাদা স্কুল ও আবাসিক এলাকা [নক্শা ৫২]। এ ধরনের প্রবণতা বিচ্ছিন্ন করে তুলেছিল অবাঙালীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালী থেকে, এবং তার পরিণাম আমরা লক্ষ্য করি ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের অসহযোগ আন্দোলনের সময়। এই বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেছিল দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সহিংস সংঘাতের।

নক্‌শা

৪৬. ষাট দশকের মাঝামাঝি। ক পূর্ব পাকিস্তান সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। ইসলামাবাদে পরিকল্পনা কমিশনের বৈঠক শুরু হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে দু'জন— মোল্লা মজিদ এবং ড. এম এন হুদা ছিলেন কমিশনের সদস্য। বৈঠকে যোগ দিতে তাঁদের সঙ্গে গেলেন আরো কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও ক। এখানে উল্লেখ্য যে, ড. হুদা ছিলেন ক-এর কলেজ জীবনের বন্ধু।

নির্দিষ্ট দিনে বৈঠক শুরু হল কমিশনের চেয়ারম্যান মমতাজ উদ্দিনের সভাপতিত্বে। বৈঠকের প্রায় শেষ পর্যায়ে পশ্চিম পাকিস্তানী একজন জুনিয়র অফিসার এসে বললেন চেয়ারম্যানকে, 'স্যার, লাহোর ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের আট কোটি টাকার একটি প্রকল্প পাওয়া গেছে এখন। সেটা পাস করাতে হবে।' চেয়ারম্যান বললেন, 'হ্যাঁ, চীফ সেক্রেটারি আমাকে বলেছিলেন প্রকল্পটির কথা। যাক, ওটা করে দিলাম।'

ক তখন হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'স্যার, একটি কথা, আমরা দশ-বারো জন অফিসার এতদূর থেকে এসেছি কয়েকটি প্রকল্প নিয়ে যার অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে না, প্রত্যেকটিরই কোন-না-কোন খুঁত ধরা হচ্ছে। আর এই প্রকল্প [লাহোর ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট] মাত্র পাওয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে পাস হয়ে গেল। এটা কেমন কথা ? আর মাননীয় চেয়ারম্যানই যদি এসব ব্যাপারে উদ্যোগ নেন তা'হলে অন্য সব কাজ আর হবে কিভাবে ?'

তারপর, বৈঠক শেষ হয়ে গেল। চেয়ারম্যান ক-কে ডেকে বললেন, 'তুমি খুব অবান্তর কথা বলো।' ক বললেন, 'অবান্তর কিনা জানি না তবে আমার বক্তব্য রেকর্ড হওয়া দরকার।' চেরারম্যান বললেন, 'সেটা আমার ব্যাপার।'

পুরো ঘটনাটা ক-কে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। তাই এরপর পূর্ব পাকিস্তানের সদস্য দু'জনকে বললেন, 'আপনারা ঐ সময় চুপ করে ছিলেন কেন ? আপনাদের-তো চাকরি যাবার ভয় নেই।'

তাঁরা এ কথার কোন জবাব দেননি।

৪৭. সত্তরের দশক। ক পাকিস্তান সরকারের একজন সচিব। তাঁর মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন একজন পশ্চিম পাকিস্তানী মন্ত্রী। নতুন মন্ত্রী দায়িত্ব নেওয়ার পর ক তাঁকে বলেছিলেন, মন্ত্রণালয় বা তাঁর সম্পর্কে কোন অভিযোগ তাঁর কানে এলে, তিনি যেন ক-কে ডেকে জিজ্ঞেস ক'রে তারপর সিদ্ধান্ত নেন।

একবার, মন্ত্রী গেছেন করাচী। ক সেসময় একটি পরিদপ্তর করাচী থেকে

স্থানান্তরের নির্দেশ দিলেন চাঁটগায়। করাচীর কিছু লোকজন এ খবর শুনে সফররত মন্ত্রীকে বলল, ক করাচীর সমস্ত সম্পদ পাঠিয়ে দিচ্ছেন চাঁটগায়। মন্ত্রী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর ধারণা হল, তাঁর অনুপস্থিতিতে সচিব হিসেবে ক নিশ্চয় গর্হিত কিছু কাজ করেছেন।

ইসলামাবাদ ফিরে মন্ত্রী প্রথমেই ডেকে পাঠালেন ক-কে। বললেন, 'শুনলাম, আপনি করাচীর পরিদপ্তরের সমস্ত গ্র্যাণ্ট পাঠিয়ে দিচ্ছেন চাঁটগায়। এ কেমন কথা?' ক তাঁকে শান্ত হতে অনুরোধ করে সংশ্লিষ্ট ফাইল এনে সব দেখালেন। সমস্ত ব্যাপারটা অতিরঞ্জন করে তাঁকে বলা হয়েছে। তখন ক-কে তিনি বললেন, 'আমার ভুল হয়েছে। সেজন্য আমি ক্ষমা চাচ্ছি।'

৪৮. পূর্ব পাবিস্তানে, পশ্চিম পাকিস্তানী মালিকদের যেসব ব্যাংক ছিল, তার প্রত্যেকটিতে ব্যবসা থেকে চাকুরিক্ষেত্রে বাঙালীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হত [যেমন, হাবিব ব্যাংক]। এ মন্তব্য করেছেন একজন প্রবীণ ব্যাংকার, যিনি ১৯৭১ সালের আগে কর্মরত ছিলেন ঐ ধরনের একটি ব্যাংকে। ধরা যাক তাঁর নাম ক। ব্যাংকে যোগদানের পর তিনি দেখলেন, উচ্চপদগুলি অধিকার করে আছেন মালিকের আত্মীয়রা। ঋণ দেওয়া হচ্ছে অবাঙালীদের এবং সেক্ষেত্রেও অগ্রাধিকার পাচ্ছে মালিকের আত্মীয়-স্বজনরা। বাঙালী ব্যবসায়ীদের বিশ্বাস করা হত না। এক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তন এসেছিল ষাট দশকের মধ্য-ভাগে, গণআন্দোলনের পর। ঐ সময় বাঙালী ব্যবসায়ীরা ঋণ পেতেন যদি তাঁদের পশ্চিম পাকিস্তানী অংশীদার থাকতেন।

এই সব ব্যাংকগুলিতে প্রমোশনের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন নীতি ছিল না। অবশ্য ক ছিলেন ভাগ্যবান। তাঁর কর্মদক্ষতার কারণে, পশ্চিম পাকিস্তানী মালিক তাঁকে [একটি ব্যাংকের] সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেণ্ট পদে উন্নীত করেছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পর ক টের পেলেন আরেকজন পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইস-প্রেসিডেণ্টকে রাখা হয়েছে তাঁর ওপর নজর রাখার জন্য।

তবে একটি বিষয়ে পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যাংক মালিকরা ছিলেন খুব সতর্ক। তা হল, পূর্ব পাকিস্তানের কয়েকজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদকে তারা সব সময় খুশী রাখতেন। নিয়মিত তাঁদের বাসায় পাঠানো হত নগদ টাকা। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন বিরোধী দলের গণ্যমান্য নেতা। আরেকজন পরবর্তীকালে অলংকৃত করেছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পদ।

৪৯. সিভিল সার্ভিসে নিয়োগের সময় বৈষম্যমূলক আচরণ করা হত পূর্ব-

পাকিস্তানীদের ক্ষেত্রে। এ মন্তব্য করেছেন বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। [বর্তমানে] বাংলাদেশ সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিব বলেছেন, পূর্ব-পাকিস্তানের এক ছেলে লিখিত পরীক্ষায় একবার প্রথম হল কিন্তু মৌখিক পরীক্ষায় এক নম্বর কম দিয়ে তাকে ফেল করিয়ে দেওয়া হল। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ৭০।৮০তম হয়ে যেসব বাঙালীরা সিভিল সার্ভিস পেতেন, দেখা যেত সিভিল একাডেমীর পরীক্ষায় তাঁরাই সর্বোচ্চ নম্বর পাচ্ছেন।

একজন অবসরপ্রাপ্ত বাঙালী সচিব জানিয়েছেন, বাংলাদেশের চৌকশ এক সাংবাদিক সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়েছিলেন কিন্তু মৌখিক পরীক্ষায় তাঁকে ফেল করিয়ে দেওয়া হল। আর যাই হোক. মৌখিক পরীক্ষায় তিনি ফেল করবেন একথা তার শত্রুরাও বিশ্বাস করতেন না।

আরেকজনের কথা তিনি বললেন, যিনি পঞ্চাশের দশকে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকশ ছাত্র হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। হকি ও ফুটবল দলের নিয়মিত খেলোয়াড় ছিলেন। যে বিষয়ে এম. এ.-তে তিনি সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছিলেন, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সে বিষয়ে পেলেন সবচেয়ে কম নম্বর। তা সত্ত্বেও পেয়েছিলেন অডিট অ্যাণ্ড অ্যাকাউন্টস সার্ভিস। কিন্তু স্বাস্থ্য পরীক্ষায় তাঁকে আটকে দেওয়া হলো। দু'বার মেডিকেল বোর্ড পরীক্ষা করে তাঁকে অযোগ্য ঘোষণা করল। কারণ, তাঁর হার্টবিট নাকি একটু বেশি। অবসরপ্রাপ্ত সচিব মন্তব্য করেছেন, 'গত তিরিশ বছরে তাঁর হার্টের অসুখ হয়েছে বলে আমি শুনিনি।'

আরেকজন সচিব জানিয়েছেন, সেনাবাহিনী থেকে কোন কোন সময় নমিনেশন দেওয়া হত সিভিল সার্ভিসে। এই সব নমিনেশন প্রাপ্ত সবাই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানী।

৫০. প্রবীণ বাঙালী রাজনীতিবিদ ও প্রবীণ বাঙালী আমলারা প্রায় ক্ষেত্রে ছিলেন পরস্পরের মিত্র। এর কারণ ছিল, দু পক্ষই পশ্চিম পাকিস্তানীদের অধস্তন [বা এ হিসেবেই কেন্দ্রীয় সরকার গণ্য করত তাদের]। বাঙালী কোন আমলার পক্ষে কোন বাঙালী রাজনীতিবিদকে যদি প্রকাশ্যে সহায়তা করা সম্ভব না হত, মনস্তাত্ত্বিক সমর্থন সে ক্ষেত্রে দিতে তিনি পিছপা হতেন না, জানিয়েছেন একজন প্রবীণ উচ্চপদস্থ কর্মচারী। উদাহরণস্বরূপ ১৯৭০ সালের নির্বাচনের কথা জানালেন তিনি। বাঙালী কর্মচারীরা সবাই আশা করছিলেন

আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জিতবে। এবং টেলিভিশনে নির্বাচনী ফলাফল দেখার সময় তারা নিশ্চুপ থাকলেও, চোখ ছিল তাদের উজ্জ্বল।

৫১. ১৯৬১ সাল। লাহোরে প্রশিক্ষণরত একজন নবীন বাঙালী 'সিভিল সার্ভেণ্ট' ঠিক করলেন 'রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী' ঘটা করে পালন করতে হবে। উদ্যোগী হয়ে তিনি বিখ্যাত কবি ফয়েজ আহমদ ফয়েজ এবং বিচারপতি এস এ রহমানের [একজন আই সি এস] সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। দু'জনেই বললেন রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী পালন করা উচিত। কিন্তু উন্মুক্ত স্থানে শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান করার ব্যাপারে তাঁদের রাজী করানো গেল না। দু'জনেই চান, ঘরোয়া ভাবে, কারো বৈঠকখানায় অনুষ্ঠানটি হোক। অবশেষে হতাশ হয়ে, সেই বাঙালী ভদ্রলোককে, রবীন্দ্রভক্ত মার্কিন অধ্যাপক র্যালফ ব্রিয়াবান্তির বাসায় অনুষ্ঠানটি করতে হয়েছিল।

৫২. কিছু কিছু সংস্থায়, যেমন রেলওয়েতে, অবাঙালীরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। পশ্চিম-পাকিস্তানী ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এসব সংস্থায় 'বিভক্ত করে শাসনের নীতি' গ্রহণ করতেন। যেখানে সম্ভব হত সেখানেই বাঙালী-অবাঙালীদের জন্য আলাদা আবাসিক এলাকা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি গড়ে তুলতেন। এ ধরনের নীতি দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্বিধা দ্বন্দ্ব অবিশ্বাসের সৃষ্টি করেছিল যা বিস্ফোরিত হয়েছিল ১৯৭১ সালে। চট্টগ্রামে রেলওয়ের সদর দফতর বিধায় সেখানে প্রচুর বাঙালী ও অবাঙালী [অধিকাংশই ভারত থেকে আগত বাস্তুত্যাগী] ছিলেন। ১৯৭১ সালের মার্চে, পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলে বাঙালী কর্মচারীরা কর্মবিরতি ঘোষণা করেন, ফলে দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে শুরু হয় সংঘর্ষ।

৭ সাধারণ প্রশাসন

পার্লামেণ্টারি বা সামরিক— যে শাসনই থাকুক-না-কেন, একজন বিবেকবান আমলার সবসময় সুযোগ থাকে জনস্বার্থ ঊর্ধ্বে তুলে রাখার ও পেশাগত দক্ষতা প্রদর্শনের। একজন আমলার তখন সামরিক শাসনকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার না করলেও চলে। একটি ঘটনায় দেখি [নকশা ৫৩], এক তরুণ এ ডি সি, ডি সি-এর অবর্তমানে কাজ চালাচ্ছেন। একটি কলেজের প্রিন্সিপাল সে সময়, কলেজে এক গণ্ডগোলের পরিপ্রেক্ষিতে ঠিক করতে পারছিলেন না, ডি সি-র অবর্তমানে, তরুণ এই এ ডি সি-এর ওপর তিনি নির্ভর করতে পারেন কিনা।

ভেবেচিন্তে প্রিন্সিপাল তখন জানালেন বয়োজ্যেষ্ঠ এস পি-কে, তিনি আবার সতর্ক করে দিলেন ই পি আর-কে। এস পি কিন্তু তরুণ এ ডি সি-কে ভারপ্রাপ্ত ডি সি-র মর্যাদা দিতে কুন্ঠিত কারণ তিনি এ ডি সি-এর অনেক সিনিয়র। এ ডি সি গণ্ডগোলের এই খবর শুনে, নিজেই চলে গেলেন কলেজে, বাতিল করে দিলেন পুলিশী হস্তক্ষেপ। শিক্ষক ও ছাত্রদের এক সমাবেশে বক্তৃতা দিলেন। গণ্ডগোল সৃষ্টিকারী ছাত্রদের হুমকি দিলেন যে তাদের বহিষ্কার করা হতে পারে। এক কথায়, সাহস, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও কৌশলে আয়ত্তে আনলেন পরিস্থিতি।

অনেক সময়, একজন আমলা মুখোমুখি হন একদিকে আইন / বিধির প্রতি অন্ধ সমর্থন এবং অন্যদিকে বিবেক ও সামাজিক বিচারের দ্বন্দ্বের। জনস্বার্থের খাতিরে তাকে আইন / বিধির প্রয়োগে দেখাতে হয় নমনীয়তা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আইন / বিধি ও সামাজিক বিচারে বিরাট ফাঁক থাকে। এই ফাঁক মেটানোর জন্য একজন আমলাকে তার বিবেক অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হয়।[৫] একটি ঘটনায় দেখি [নক্শা ৫৪] একজন সহকারী কমিশনার এ ধরনের পরিস্থিতিতে ডি সি-এর আদেশ অমান্য করছেন। ডি সি শহর সৌন্দর্যকরণের খাতিরে আদেশ দিয়েছিলেন জমাদারদের বসতি উৎখাত করতে। ডি সি-র আদেশ অমান্য করার অর্থ অবাধ্যতা, সরকারী আইন অনুযারী তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কিন্তু ডি সি এ ব্যাপারে কিছু করার আগেই জেলা পরিদর্শনে আসেন কমিশনার, সম্মুখীন হন মিছিলকারী জমাদারদের। সব ঘটনা শুনে বাতিল করে দেন তিনি ডি সি-র আদেশ। সমর্থন জানান সহকারী কমিশনারের মতামতকে।

আরেকটি ঘটনায় দেখি [নক্শা ৫৫], একজন এস ডি ও বেদম প্রহার করছেন তার খাস বেহারাকে অর্থ সংক্রান্ত কারচুপির ঘটনা জানতে পেরে। প্রহারের ফলে সে স্বীকার করে, থানা পরিদর্শনকালে এস ডিও তাকে মধ্যাহ্নের খাবারের জন্য যে অর্থ প্রদান করেছিলেন তা সে আত্মসাৎ করেছে। অন্যদিকে খুশি হয়ে খাবারের আয়োজন সম্পন্ন করেছে থানার দারোগা। এস ডিও থানা অফিসারকে ডেকে তার খরচ করা অর্থ ফিরিয়ে দেন। যদিও সরকারী আইন / বিধি অনুসারে এস ডি ও প্রহার করতে পারেন না তার অধস্তন কর্মচারীকে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে এ ক্ষেত্রে বিধি-বহির্ভূত আচরণের ফলে তাঁর সময়কালে এ ধরনের অর্থ আত্মসাতের ঘটনা তার ঘটেনি। ৫৬ নম্বর নক্শায় দেখি, সাম্প্রদায়িক এক সরকারী মুসলমান উকিল, এক বালিকা বিদ্যালয়ের হিন্দু বিধবার বেতন আটকে দিয়েছেন। স্কুল কমিটির সচিব হিসেবে তিনি ক্ষমতা প্রয়োগ করছিলেন। এস ডি ও-র

অনুরোধ মানতেও যখন সেই উকিল অপরাগ হলেন তখন এস ডি ও উকিলের সরকারী ফিস বন্ধ করে দিলেন। পরে, সেই উকিল বাধ্য হন বিধবার প্রাপ্য পরিশোধ করতে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বেনামী এক দরখাস্তও ঠুকে দেন এস ডি ও-র বিরুদ্ধে। তাতে অবশ্য কোন কাজ হয়নি।

একটি ঘটনায় দেখি [নকৃশা ৫৭], আইনগত কোন ভিত্তি ছাড়াই এস ডি ও মেতে ওঠেন সমাজ সেবায়। তাঁর অঞ্চলে, এক লোক অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে এক বিধবার সঙ্গে এবং মহিলা সন্তানসম্ভবা হলে তাকে বিয়ে করতে অস্বীকৃতি জানায়। অভিযোগের সত্যতা নিরূপণের পর এস. ডি. ও অপরাধীকে ডেকে এনে প্রহার করেন, প্রদান করেন হুমকি যার পরিণতিতে লোকটি বিয়ে করে সেই মহিলাকে। ৫৮ নম্বর নকৃশায় দেখি, সরকারী বিধি নিষেধ ভঙ্গ করে জনৈক এস ডি ও স্টেট রিলিফের গম বিক্রি করে দেন খোলাবাজারে এবং বিক্রির টাকা দিয়ে সংস্কার করে দেন বালিকা বিদ্যালয়, যার জন্য সরকারী খাতে কোন অর্থ বরাদ্দ করা ছিল না। নক্শা ৫৯-এ দেখি, ১৯৭০ সালে দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনের সময় অনপনেয় কালি উবে গেলে নির্বাচন স্থগিত না রেখে সাধারণ কালি ব্যবহার করে বরং তিনি নির্বাচনের কাজ চালিয়ে যান।

যখন কোন আমলা ন্যায় বিচারের স্বার্থে অপ্রচলিত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তখন তাকে নিয়তির ওপর খানিকটা নির্ভরশীল থাকতেই হয়। কারণ, এসব ক্ষেত্রে উচ্চতর মহলে কেউ অভিযোগ করলে তিনি বিপদে পড়তে পারেন। তবে ভাগ্য ভালো হলে দেখা যায়, উচ্চতর মহল সমর্থন জানাচ্ছেন তাকে [নকৃশা ৫৪]। একজন আমলা হয়তো সাধুতা ও যোগ্যতার এমন পর্যায়ে পৌঁছে যেতে পারেন যে, সরকারী বিধি ভঙ্গ করেছেন, এ অজুহাতে কেউ তার বিরুদ্ধে [নকৃশা ৫৮] অভিযোগ করবে না। হয়তো জনস্বার্থে যিনি ঝুঁকি নিয়ে সৎকর্মে প্রবৃত্ত হন, সৌভাগ্য তাঁকেই বরণ করে।

এমন কিছু প্রশাসনিক পদ আছে যার ফলে একজন আমলা, প্রভাবশালী একজন রাজনীতিকের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসতে পারেন এবং রাজনৈতিক প্রভাবেরও তিনি ভিত্তি হয়ে উঠতে পারেন। কিন্তু এরকম পদে নিয়োজিত একজন লেবার কমিশনার সে সুযোগ নেন না [নকৃশা ৬০], হয়তো রাজনীতির মারপ্যাচের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি ও উদ্বেগ থেকে তিনি দূরে থাকতে চান। কিন্তু এমন আমলাও থাকতে পারেন [নকৃশা ৬১] যিনি একটি পর্যায় পর্যন্ত রাজনৈতিক মারপ্যাঁচ প্রতিরোধ করেন তারপর ইচ্ছে করেই পিছিয়ে যান। উপরোক্ত নকশার উল্লিখিত

জনৈক সচিব নিজে রাজনৈতিক চাপের নিকট মাথা নীচু করেন না এবং সংবাদপত্রের ওপরও অনভিপ্রেত প্রভাব বিস্তার করতে চান না। কিন্তু গভর্নর যখন সচিবের পরিবর্তে একজন অধস্তন আমলার মারফত সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলেন সচিব তাতে বাধা দেননি। এর বিপরীত চিত্র পাই অন্য এক ঘটনায় [নকশা ৬২] যেখানে একজন ডি সি মন্ত্রীর প্রতিদ্বন্দ্বীকে (যদিও মন্ত্রী আর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন একই দলে— মুসলিম লীগে) ঘায়েল করার জন্য বিধি নিষেধের সমস্ত অস্ত্র প্রয়োগ করেন কারণ তিনি মন্ত্রীকে তুষ্ট রাখতে চান।[৬] কিন্তু অন্যদিকে এস ডি ও, ডি সি-র এই চাল ভেঙে দেন এবং মন্ত্রীর প্রতিদ্বন্দ্বীকে জেলে যাওয়া থেকে রক্ষা করেন। ঐ ব্যক্তিটি ছিলেন নিজ অঞ্চলে খুব জনপ্রিয় এবং নিজ সম্পত্তি দান করেছিলেন একটি প্রাইমারি স্কুল গড়ে তোলার জন্য।

একজন আমলা যিনি উঁচু পর্যায়ের প্রশাসক ও রাজনীতিবিদদের অন্যায্য চাপ প্রতিরোধ করেন জনস্বার্থ রক্ষার খাতিরে, তিনিই হয়তো দেখবেন তাঁর এই সাহস ও সততা অপ্রত্যাশিত ভাবে সমর্থন পাচ্ছে একেবারে উচ্চতম পর্যায় থেকে। নকশা ৬৩-তে দেখা যায় মাঝারী পর্যায়ের একজন আমলা উঁচু পর্যায়ের একজন আমলা ও মন্ত্রীর অন্যায় ও পক্ষপাতমূলক আদেশ রোধ করছেন এবং এ ব্যাপারে গভর্নর তাঁকে সমর্থন দিচ্ছেন।[৭] এর ফলে, সরকারের যে আর্থিক ক্ষতি হওয়ার কথা ছিল তা হয়নি। একটি ঘটনায় দেখি [নকশা ৬৪], এক তরুণ এস ডি ও জনৈক আইন পরিষদের সদস্যকে গ্রেফতার করেন খুনের দায়ে। কিন্তু গ্রেফতারের খবর সরকারীভাবে তিনি জানাতে ভুলে গিয়েছিলেন পরিষদের স্পীকারকে। এ ক্ষেত্রে এ ধরনের ভুল অস্বাভাবিক নয় কারণ তাঁকে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চাপের মুখে কাজ করতে হচ্ছিল। এইসব পর্যায় থেকে চাপ দেওয়া হচ্ছিল বন্দীকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। স্পীকার তখন একজনের মারফত ইঙ্গিত পৌঁছে দিয়েছিলেন এস ডি ও-কে, যাতে তিনি পুরনো তারিখ দিয়ে স্পীকারকে একটি চিঠি পাঠান যাতে আইনগত ও বিবেকগত দিক ঠিক থাকে।

সরকারী কর্মচারী থেকে অন্যায় কোন সুবিধা আদায় বা রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঘায়েলের উদ্দেশ্যে[৮] রাজনীতিবিদরা প্রায় ক্ষেত্রে সমর্থন চান উঁচু পর্যায়ের নেতা [গভর্নরও হতে পারেন] থেকে বা ব্যবহার করেন তাদের নাম। ক্ষমতাসীন দলের সদস্যদের এটি একটি সাধারণ কৌশল। এ ধরনের রাজনীতি-বিদদের ধোকা একজন সৎ কর্মচারী সহজেই ধরতে পারেন। নকশা ৬৫-র ঘটনায় দেখি একজন এস ডি পি ও শুনলেন তার নামে গভর্নরের কাছে অভিযোগ

জানিয়েছেন ক্ষমতাসীন দলের সদস্যরা। এখবর শুনেও বিচলিত হননি তিনি। বিরোধীদলের সদস্যদের বিরুদ্ধে আনা মিথ্যা অভিযোগে তিনি কান দিলেন না। এ কারণে, তাকে কোন শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়নি। একবার একজন এস. পি. [নকশা ৬৬] জানালেন গভর্নরকে যে তাঁর সহযোগী রাজনীতিবিদরা অন্যায় সুবিধা আদায়ের জন্য গভর্নরের নাম ব্যবহার করেন কিন্তু এস পি তাদের কোন সুযোগ দেননি। গভর্নর মৃদু হেসে তাঁকে সমর্থন জানান। আরেকবার ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের আঞ্চলিক শাখার সহকারী সভাপতি গভর্নরকে অনুরোধ করলেন স্থানীয় এস ডি ও-কে বদলি করতে কারণ এস ডি ও ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতাদের মন রেখে কাজ করেন না [নকশা ৬৭]। গভর্নর জানতেন এই এস ডি ও জনস্বার্থের খাতিরে গভর্নরের আদেশও অমান্য করতে পারেন, এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করতেন এস ডি ও-র কর্মক্ষমতা ও সততা সম্পর্কে। যে কারণে, তিনি স্থানীয় রাজনীতিবিদের কথায় গুরুত্ব তো দিলেনই না বরং তাকে উপদেশ দিলেন এস ডি ও-র কাজ এস ডি ও-কে করতে দিতে। এরকম আরেকটি ঘটনায় [নকশা ৬৮] জনস্বার্থ ক্ষুন্ন না করে একজন আমলা একজন রাজনীতিবিদের অনুরোধ রক্ষা করেন। মধ্যশ্রেণীর রাজনীতিবিদ, যাঁদের নৈতিকতার প্রশংসা খুব একটা করা যায় না, তাঁরাও অনেক সময় আমলাদের মধ্যে এ গুণ দেখলে তাঁদের প্রশংসা করতে বাধ্য হন।

এটা ঠিক, প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অনেক আমলা সততার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে প্রশ্নটির সম্মুখীন হন গবেষকরা তা হল অধিকাংশ আমলাই কি নিজ দায়িত্ব পালন করেন সঠিকভাবে? পরিবর্তনশীল এই পৃথিবীতে, আমলা বা রাজনীতিবিদ, পুরনো আইন কানুন বিধি বদল করে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাকল্পে নতুন আইন কানুন বিধি তৈরির প্রচেষ্টা নেননি। আমলারা প্রায় ক্ষেত্রে অজুহাত দিয়ে বলেন, ত্রুটিপূর্ণ আইন-কানুনের জন্য তারা ন্যায় বিচারের পক্ষে কাজ করতে পারেন না। তা সত্ত্বেও এই ত্রুটিপূর্ণ আইনের সাহায্যে তাঁরা রক্ষা করেন[৯] দুর্নীতিবাজ সহকর্মীকে [নকশা ৬৯], কিন্তু ব্যর্থ হন আইনের থাবা থেকে রক্ষা করতে নিরপরাধ গরিব এক বিধবাকে [নকশা ৭০]। একজন এস ডি ও আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করেন সেই বিধবার পুনর্বাসনে। কিন্তু ব্যর্থ হন। এর কারণ কি এই যে তিনি সংখ্যা লঘিষ্ঠ বিবেকবান আমলা গোষ্ঠীর একজন?

অনেক আমলা দক্ষ হয়ে উঠেছেন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনকে, মুখ বাঁচানোর রিচ্যুয়ালে পরিণত করার ক্ষেত্রে। যেমন, একজন চিন্তা ভাবনা করেই আদালতে

প্রক্সি হিসেবে হাজির করেন ভিখিরীদের [নকশা ৭১]। আসল আসামীদের আদালতে হাজির করা হয় না এ ভয়ে যে তারা আরো গণ্ডগোল সৃষ্টি করতে পারে এবং তার ফলে, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দোষারোপ করবেন উল্লিখিত আমলাকে। একটি সংস্থা গরীব শ্রমিকদের জন্য আবাস ভবন তৈরি করতে পারে বটে [নকশা ৭২] কিন্তু শ্রমিকরা যাতে আবাস ভবনে উঠে যেতে পারে সে বন্দোবস্ত করতে পারে না। নকশা ৭৩-এ, আমরা প্রশাসকদের দায়িত্বহীনতার[১০] এক চরম নিদর্শন লক্ষ্য করি। একজন বিবেকবান তরুণ এস ডি ও দেখেন পুলিশ কর্তৃক ধর্ষিতা এক তরুণীকে দীর্ঘদিন বিনা বিচারে বিনা অপরাধে আটকে রাখা হয়েছে। উর্ধ্বতন বা অধস্তন কেউই তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। এস ডি ও নিজ চেষ্টায় অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে মেয়েটির মুক্তির ব্যবস্থা করেন। কিন্তু মেয়েটির পুনর্বাসনে কেউ এগিয়ে আসে না, সমাজও না। এ ধরনের অনেক ঘটনা দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে অহরহ নিশ্চয় ঘটছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে একজন প্রশাসকের সংজ্ঞা কী হবে ? প্রশাসকরা (ব্যতিক্রম থাকতে পারে) কি সেই শ্রেণীর মানুষ যারা কোন কিছুর জন্যই দায়ী নন ? একজন ডি সি তাঁর দফতরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দলিল— 'গান রেজিস্টার'---পর্যন্ত পরীক্ষা করেন না। করলে দেখতে পেতেন কেউ সেখানে দরখাস্ত দিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যে বন্দুকের লাইসেন্স পায়, কাউকে আবার অপেক্ষা করতে হয় ছাব্বিশ মাস [নকশা ৭৪]। এক থানায় সব অফিসারই অনুপস্থিত থাকেন সন্তোষজনক কোন কারণ না দেখিয়ে। শুধু তাই নয়, প্রয়োজনীয় ওয়ারেণ্ট রেজিস্টার পর্যন্ত রাখেন না তারা [নকশা ৭৫]। একজন ডি সি নির্লজ্জ ভাবে আত্মপ্রসাদ বোধ করেন এ ভেবে যে, বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করার তার দরকার নেই কারণ, তার জেলার রাস্তাঘাট ভালো। প্রয়োজনে লোকজনই আসতে পারে তার অফিসে [নকশা ৭৬]।

ন ক্ শা

৫৩. ষাট দশকের মাঝামাঝি। ক একটি জেলার এ ডি সি। একবার ডি সি জেলার বাইরে গেছেন। ডি সি-র চার্জে ছিলেন ক। জেলার এস পি, চাকুরি ক্ষেত্রে ছিলেন ক-এর অনেক সিনিয়র।

ডি সি যখন জেলার বাইরে তখন স্থানীয় পলিটেকনিক কলেজের ছাত্ররা কিছু দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য ঘেরাও করল প্রিন্সিপালকে। এ ব্যাপারে কলেজের তরুণ কিছু প্রভাষকেরও ভূমিকা ছিল। যাহোক, এস পি ফোন করলেন ক-কে। বললেন, 'আপনাকে মনে হয় আমার জানানো উচিত যে, পলিটেকনিকে গণ্ডগোল

হচ্ছে। এখন পুলিশ যাবে কিনা বলুন।' চাকরি ক্ষেত্রে অনেক সিনিয়র হওয়ার কারণে, তিনি ক-কে ঠিক ডি সি হিসেবে মেনে নিতে পারছিলেন না। কিন্তু ক ডি সি হিসেবে কার্যকর ভূমিকা নিতে চান। তাই জবাবে তিনি বললেন, 'মনে হয় টয় নয়। যা ঘটেছে ডি সি হিসেবে আমার জানা উচিত। আসলে কী ঘটেছে বলুন।' এস পি ভাসা ভাসা যা শুনেছেন তাই জানালেন। তারপর ই বি আর (সীমান্তরক্ষী বাহিনী) থেকে ফোন। সাহায্যের জন্য কোন ফোর্স লাগবে কিনা কমাণ্ডার তা জানতে চান। হয়তো এস পি ই তাদের জানিয়েছিলেন ফোনে।

ক একাই গেলেন পলিটেকনিকে। দেখলেন, সদর দরজায় তালা ঝোলানো। ছাত্ররা জটলা করছে সেখানে। ক শান্ত ভাবে জিজ্ঞেস করলেন উত্তেজিত ছাত্র-দের, 'দরজায় তালা ঝুলিয়েছ কেন?' ছাত্ররা বলল, 'তালা আপনার জন্য নয়।' বলে তারা দরজা খুলে দিল।

ক গেলেন প্রিন্সিপালের ঘরে। বললেন, 'আমাকে সরাসরি খবর দেননি কেন?' প্রিন্সিপাল বললেন, 'ডি সি-কে ফোন করেছিলাম, তিনি নেই।' ক বললেন, 'তাতে কী, আমি তো ছিলাম। এ ব্যাপার আরো কিছুক্ষণ গড়ালে তো রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে যেত। যা হোক, আমি ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

ছাত্রদের জানানো হল তাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে ক আলোচনা করবেন। সবাই জমা হল হলঘরে। নেতারা তাদের দাবি জানাল। ক তাদের বোঝাতে চাইলেন। কিন্তু সব মিলে বেশ উত্তপ্ত পরিবেশের সৃষ্টি হল। ক তখন হঠাৎ রুদ্র-মূর্তি ধারণ করলেন। বেছে বেছে নেতা গোছের কয়েকজনকে বকাবকি করলেন। বললেন, তারা দাবি নিয়ে যত খুশি হৈচৈ করতে পারে, কিন্তু কলেজ থেকে তাদের নাম কেটে দেওয়া হচ্ছে এবং তাদের অভিভাবকদের খবর দেওয়া হবে।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনা কমে গেল। ছাত্ররা এরপর নরম হয়ে মাপ চাইতে লাগল। ক বললেন, প্রিন্সিপালের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। ছাত্ররা তাই করল। ব্যাপারটা আপসে মিটে গেল। কিন্তু প্রথমেই পুলিশ নিয়ে গেলে হয়তো পুরো ব্যাপারটা জটিল আকার ধারণ করত।

৫৪. সদ্য প্রশিক্ষণ শেষ করার পর ক-কে একটি জেলার সহকারী কমিশনার নিযুক্ত করা হয়েছে। কাজে যোগ দিয়েছেন তিনি। ডি সি তাঁকে পছন্দ করেন। অবিবাহিত হওয়ায় ডি সি তাঁকে প্রায়ই নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন।

একদিন, ডি সি তাঁকে নির্দেশ দিলেন, অফিস পাড়ার কাছে যে ধাঙ্গর বস্তি আছে তা উৎখাত করতে হবে।

ক বললেন, 'স্যার, এটা আমার পক্ষে সম্ভব না।'

'কেন, তুমি কি অসুস্থ?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন ডি সি।

'না স্যার, তা নয়। নৈতিক কারণে আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়।'

'মানে?'

'এখানে তো স্যার আরো অনেক ধনী আছে যারা বেআইনীভাবে জায়গা দখল করে আছে, তাদের কি স্যার উৎখাত করা গেছে? তা'হলে গরিবদের ওপর এই ঝামেলা কেন?'

'বুঝলাম, কিন্তু এটা আমার নির্দেশ।' বললেন ডি সি। ক তখনও তাঁর অপারগতা জানালেন। ডি সি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'বেরিয়ে যাও আমার ঘর থেকে।'

ডি সি স্নেহ করতেন ক-কে। ধাঙ্গরদের প্রতিও তাঁর কোন বিতৃষ্ণা ছিল না। এলাকার সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য তাঁর এ ডি সি অনুরোধ জানিয়েছিলেন ধাঙ্গরদের উৎখাত করতে। এবং তিনি চেয়েছিলেন শুধু সহকর্মী অফিসারদের অনুরোধ রাখতে। ক-এর প্রতি তাঁর ক্রুদ্ধ হওয়ার কারণ— ঊর্ধ্বতন অফিসারের আদেশ পালনে ক অপারগতা জানিয়েছিলেন।

এরই মধ্যে একদিন কমিশনার এলেন জেলা পরিদর্শনে। দুপুরে ডি সি-র বাসায় খাওয়া-দাওয়ার পর সার্কিট হাউসে চললেন তিনি। সঙ্গে ক ও সেই এ ডি সি। ঐ দিনই অন্য এক অফিসার উৎখাত করেছে ধাঙ্গরদের এবং তারা তখন মিছিল করে আসছিল ডি সি-র বাসার দিকে। কমিশনারের গাড়িকে ডি সি-র গাড়ি ভেবে তারা ঘিরে ধরল এবং কমিশনারকে ডি সি মনে করে তার পায়ের ওপর পড়ে বলল, আপনি আমাদের বাঁচান। 'আপ হামারা রাজা হ্যায়।'

কমিশনার তখন পুরো ঘটনাটা জানতে চাইলেন। এ ডি সি তাঁকে ব্যাপারটা খুলে বললেন— যে এরা এই পাড়ায় থাকলে পাড়াটা নোংরা হয়, সৌন্দর্য হানি ঘটে ইত্যাদি। কমিশনার সব শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন এ ডি সি-কে, 'শাট আপ। আমি কিছু বুঝি না। ওরা যেখানে ছিল সেখানেই থাকবে। ঊনসত্তরের আন্দোলন দেখেও তোমাদের শিক্ষা হয়নি। জান না, এভাবে চললে মুণ্ডটা একদিন আলাদা হয়ে যাবে ধড় থেকে।' তারপর এ ডি সি-কে নির্দেশ দিয়ে বললেন, 'যাও, যেখানে তারা ছিল সেখানেই তারা থাকবে। দিয়ে এসো তাদের সেখানে। যদি বিকল্প ব্যবস্থা করা যায় তা'হলেই তারা যাবে, নয়তো নয়।'

৫৫. ষাটের দশক। ক একটি মহকুমার এস ডি ও। একদিন এক গ্রামে

গেলেন তিনি স্কুল পরিদর্শনে। পরিদর্শনে যাবার আগে সংশ্লিষ্ট সবাইকে তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন তার জন্য যেন কোন রকম খাবারদাবারের আয়োজন না করা হয়।

স্কুল পরিদর্শন শেষে তিনি যখন ফিরবেন তখন স্কুলের শিক্ষক, স্কুলের প্রেসিডেণ্ট [যিনি স্থানীয় ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানও বটে] —সবাই তাঁকে অনুরোধ জানালেন, অন্তত এক পেয়ালা চা মুখে দিতে। ক দেখলেন, তাঁর জন্য বিপুল আয়োজন করা হয়েছে। চমৎকার সব খাবার আর তার চারপাশে ঘোরাফেরা করছে ক্ষুধার্ত বালকেরা। ক এসব দেখে বললেন, তাঁর নির্দেশ সত্ত্বেও এসব করা হয়েছে দেখে তিনি খুব ক্ষুণ্ণ। তিনি খুশি হবেন, যদি খাবারগুলি স্কুলের ছাত্রদের দেওয়া হয়। এ বলে তিনি চলে গেলেন। কিন্তু এতজনের সামনে এস ডি ও ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের অনুরোধ রাখলেন না— এতে চেয়ারম্যান খুব অপমানিত বোধ করলেন।

ক এদিকে দুপুরের খাবারের জন্য বেয়ারাকে টাকা দিয়েছিলেন। বাজার থেকে ফিরে বেয়ারা তাঁকে কিছু টাকা ফেরতও দিয়েছিল। এবং খুশি হয়ে তিনি বখশিশও দিয়েছিলেন বেয়ারাকে।

সদরে ফিরে আসার কয়েকদিন পর তিনি একটি পোস্টকার্ড পেলেন সেই স্কুলের প্রেসিডেণ্টের কাছ থেকে। চিঠির মূল বক্তব্য ছিল— আপনি তো স্কুলে গিয়ে দারুণ মহানুভবতা দেখালেন। কিন্তু সেদিন আপনার দুপুরের বাজার কে করে দিয়েছিল? থানার ছোট দারোগা।

এ চিঠি পড়ে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেন ক, ক্রুদ্ধও হলেন। ডেকে পাঠালেন সেই বেয়ারাকে যে সেদিন দুপুরে বাজার করেছিল। বেয়ারা অভিযোগ অস্বীকার করল। তখন তিনি একটি হাণ্টার দিয়ে বেয়ারাকে পেটাতে লাগলেন। মার সহ্য করতে না পেরে বেয়ারা সব স্বীকার করল। তখন তিনি ডেকে পাঠালেন সেই থানার ছোট দারোগাকে। সেও সব স্বীকার করল। ক দারোগাকে বাজারের টাকা ফেরত দিলেন এবং বললেন, ভবিষ্যতে যেন এর পুনরাবৃত্তি না হয়।

ক এরপর যতদিন ছিলেন সেই মহকুমায় ততদিন আর এ ধরনের কোন ঘটনা ঘটেনি।

৫৬. ক তখন একটি মহকুমার এস ডি ও। তাঁর মহকুমার একটি বেসরকারী স্কুলের ভার সরকার একসময় গ্রহণ করল। শিক্ষকরা যারা সরকারী আইন অনুযায়ী যোগ্য তাদের চাকুরিতে রাখা হল। এক হিন্দু বিধবাও ছিলেন

শিক্ষিকা, গুরু ট্রেনিং পাস। কিন্তু সরকারী আইনের আওতায় না পড়ায় তাঁর চাকুরি গেল। এতে তিনি আপত্তি করেননি। স্কুলের কাছে তাঁর দু'মাসের বেতন বাকি ছিল, তিনি তাই শুধু দাবি করলেন। কিন্তু স্কুলের সেক্রেটারি বকেয়া দিয়ে রাজি হলেন না। তিনি ছিলেন জামাতপন্থী এক উকিল। শত্রু সম্পত্তির ব্যাপারে সরকারী পক্ষেরও উকিল ছিলেন তিনি। এবং এ কারণে, মাসে একটি নির্দিষ্ট ফিসও পেতেন সরকারের কাছ থেকে।

বিধবা শিক্ষিকা তখন ক-কে সব জানালেন। ক-ডেকে পাঠালেন উকিলকে। জিজ্ঞাসা করলেন ঘটনাটা। উকিল বললেন. 'এসব হিন্দুদের টাকা দিয়ে কী লাভ ? তারা তো সব টাকা পাঠিয়ে দেবে ভারতে।'

ক জানতে চাইলেন, স্কুলের কাছে মহিলার টাকা পাওনা আছে কিনা ? উকিল জানালেন, 'হ্যাঁ, তা তো আছে।' ক তখন বললেন, 'আমার সামনে এসব সাম্প্রদায়িক কথা একবার বলেছেন, আর বলবেন না। আমি চাই, তাঁর টাকা যেন এখুনি দিয়ে দেওয়া হয়।'

'যদি না দিই কী করবেন ?' জানতে চাইলেন সেক্রেটারি।

এ কথা শোনা মাত্র ক চেয়ার ছেড়ে উঠে, তার দাড়ি ধরে কয়েকটা থাপ্পর লাগালেন তাকে। বললেন, 'সরকারী উকিল হিসেবে আর কোন টাকা পাবেন না। শুধু তাই নয়, আপনার জান আমি খারাপ করে দেব।'

উকিলও অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে বলল, 'টাকা আমি দেব না।' ক নিজের পকেট থেকে তখন বিধবা শিক্ষিকাকে বেতনের টাকা দিয়ে দিলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে সরকার থেকে উকিল প্রতি মাসে যে নির্দিষ্ট ফিস পেতেন তা বন্ধ করে দিলেন।

দু'মাস পর, উকিল এসে জানালেন যে, শিক্ষিকার পাওনা তিনি মিটিয়ে দেবেন। ক তাঁকে বললেন, শিক্ষিকার হাতে টাকাটা দিয়ে আসতে। উকিল বললেন, 'না তার হাতে না, আপনার হাতেই দিতে চাই টাকাটা।' ক বললেন, 'না ঐ মহিলার হাতেই দিতে হবে টাকা।' ডেকে পাঠানো হল মহিলাকে। সেক্রেটারি তাঁর পাওনা বুঝিয়ে দিলেন তাঁকে। ক-ও উকিলের ফিসের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নিলেন। কিন্তু তিনি যতদিন এস ডি ও হিসেবে ছিলেন সেখানে, সেই উকিল ছিলেন তাঁর প্রধান শত্রু। কয়েকদিন পর পরই কর্তৃপক্ষের কাছে ক-এর বিরুদ্ধে বেনামা চিঠি পাঠাতেন তিনি। অবশ্য এতে ক-এর কিছু হয়নি।

৫৭. ষাট দশকের শেষ ভাগ। ক তখন একটি মহকুমার এস ডি ও। একদিন, এক অল্পবয়সী সুন্দরী বিধবা মহিলা সরাসরি তাঁর কাছে এসে অভিযোগ জানিয়ে বলল, গ্রামের এক যুবক তাকে বিয়ে করবে বলে এতদিন তার সঙ্গে মেলামেশা করেছে। এখন সে অন্তঃসত্ত্বা। কিন্তু যুবকটি এ কথা জেনে আর তাকে বিয়ে করতে চাইছে না। ক দেখলেন, আদালতে প্রতিকার চাইতে গেলে দেরি হবে এবং ন্যায্য বিচার যে পাওয়া যাবে তাও বলা যায় না। কিন্তু এর একটি প্রতিকারও হওয়া উচিত। মহিলাটিকে তিনি বললেন, কয়েকদিন পর আবার তার কাছে আসতে।

ইতিমধ্যে, ঐ গ্রামের [অর্থাৎ মহিলার] স্কুলের হেডমাস্টারকে ক খবর দিলেন। ভদ্রলোক ধার্মিক। তাঁকে তিনি এ ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে সত্য ঘটনা জানাতে বললেন। হেডমাস্টার খোঁজ নিয়ে জানালেন, ঘটনাটা সত্য।

ক তখন যুবকটিকে খবর পাঠালেন। সে এলে তাকে তিনি মহিলার অভিযোগের কথা জানালেন। যুবকটি সব অস্বীকার করল, বলল, মেয়েটির চরিত্র মন্দ ইত্যাদি। ক তখন তাকে নিয়ে এলেন নিজের ঘরে। তারপর একটি হান্টার যোগাড় করে তাকে পেটাতে লাগলেন। যুবকটি তখন সব স্বীকার করল। ক তাকে বললেন, 'দেখ, এখন আমি যে কাজটা করলাম তা বে-আইনি। এ নিয়ে তুমি আমার ওপরঅলার কাছে অভিযোগ করলে আমি বিপদে পড়ব। কিন্তু তোমাকে এও জানিয়ে রাখি, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে যদি তুমি মেয়েটিকে বিয়ে না কর, তাহলে তোমাকে আমি খুন করব।'

এক সপ্তাহ পর যুবকটি মেয়েটিকে বিয়ে ক'রে, সদরে এসে ক-এর সঙ্গে দেখা করে গেল।

৫৮. ষাট দশকের শেষ ভাগ। এস ডি ও হিসেবে ক প্রথম একটি মহকুমার ভার পেয়েছেন। কাজে যোগ দেওয়ার পর নিজের এলাকা ঘুরে দেখছেন। এক গ্রামে গিয়ে দেখলেন, মেয়েদের একমাত্র স্কুলটির অবস্থা শোচনীয়। কিন্তু, সরকারী ফাণ্ডে তখন টাকাও নেই যে তিনি সাহায্য করেন। মন খারাপ হয়ে গেল তাঁর। এমন সময় তাঁর মহকুমায় রিলিফের কিছু গম এলো। স্টেট রিলিফের গম বিক্রি করা নিষিদ্ধ। সরকারী নিয়ম অনুযায়ী তা দিয়ে শুধু কাঁচা কাজ করা যাবে। ক স্থানীয় লোকদের ডেকে বললেন, 'দেখেন, স্টেট রিলিফের গম বিক্রি করা নিষিদ্ধ। কিন্তু স্কুলটির জন্য এখনি কিছু টাকা দরকার। তাই আমি ঠিক করেছি খোলা বাজারে কিছু গম বিক্রি করে টাকা ওঠাব। তবে, এ ব্যাপারে যদি আপনারা কেউ রিপোর্ট করেন তাহলে আমি বিপদে পড়ব।'

তারপর, ক খোলাবাজারে কিছু গম বিক্রি করে টাকা ওঠালেন। স্কুলটির সংস্কার করা হল। কিন্তু এ ব্যাপার নিয়ে কখনও কেউ অভিযোগ করেনি।

৫৯. সত্তরের সাধারণ নির্বাচন। ক একটি মহকুমার এস ডি ও হিসেবে ঐ এলাকার রিটার্নিং অফিসারও। ভোটের আগের দিনে রাত্রে খবর পেলেন অনপেনয় কালি বাতাসে উড়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফোন করলেন নির্বাচন কমিশনে। সেখান থেকে তাঁকে জানানো হলো, সাধারণ কালি ব্যবহার করতে, কারণ ভোটাররা এ পার্থক্য বুঝতে পারবেন না। ক জানালেন, টেলিগ্রামে তাঁকে এ নির্দেশ জানাতে হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর এলাকায় নির্দেশ দিয়ে দিলেন সাধারণ কালি ব্যবহারের জন্য। কারণ, ভোট শুরু হলে তো আর অপেক্ষা করা যাবে না। পরের দিন অবশ্য নির্বাচন কমিশন থেকে টেলিগ্রামটি তিনি পেয়েছিলেন।

৬০. ৫৮ সালের সামরিক শাসন। জাকির হোসেন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর। ক তখন একটি পরিদপ্তরের কমিশনার। দক্ষ অফিসার হিসেবে খ্যাত। গভর্নর তাঁকে একদিন ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'আমি তোমার কাগজপত্র ঘেঁটে দেখেছি। আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসেবে তুমি বছর দুয়েক কাজ করো। আমার মনে হয় কালে তুমি একজন ভালো অফিসার হবে।' কিন্তু ঐ কাজে ক-এর আগ্রহ ছিল না কারণ রাজনীতির মধ্যে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়া ও রাজনৈতিক প্রভাব অর্জন করা ক-এর লক্ষ্য ছিল না।

ক বললেন, 'কিন্তু স্যার, বর্তমানে আমি এখানে একমাত্র সরকারী কর্মচারী যার··· বিষয়ে বিশেষ ট্রেনিং আছে। কিছুদিনের মধ্যে এই দপ্তর থেকে এ বিষয়ে নীতি ঘোষণা করা হবে। সুতরাং আমি ঐ দপ্তরের কমিশনার হিসেবে কাজ করতে চাই। প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসাবে নয়।'

গভর্নর এর জবাবে আর কিছু বলেননি।

৬১. মোনেম খান তখন গভর্নর। ক একটি মন্ত্রণালয়ের সচিব। গভর্নর তাঁকে একদিন ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'আপনি 'সংবাদ' ও 'অবজার্ভার' [বিরোধী-দলের দুটি পত্রিকা] কনট্রোল করতে পারেন না কেন?'

'স্যার', বললেন সচিব, 'পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের কাগজের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। পশ্চিমারা পুরো ব্যবসায়ী, টাকা দিলে সেখানে সব-কিছু করা যায়, কিন্তু এখানে তা সম্ভব নয়।'

'কিন্তু সালাম সাহেব তো ['অবজার্ভার'-সম্পাদক] আপনার আত্মীয়। তাঁকে কনট্রোল করেন।' বললেন মোনেম খান।

'আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে স্যার কিছু করা যাবে না।' জবাব দিলেন সচিব।

গভর্নর যখন দেখলেন সচিবকে দিয়ে পত্রিকাগুলিকে ব্যতিব্যস্ত করা যাবে না তখন তিনি কাজ করতে লাগলেন ঐ বিভাগের ডিরেকটরের মাধ্যমে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ক-এর মন্তব্য 'যদিও আমি এটা রেজিস্ট করতে পারতাম কিন্তু করিনি। আমি জানি, কাজটি তা' হলে সিভিল সার্ভেন্টজনোচিত হত না।'

৬২. ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়েছে। জারী করা হয়েছে ডিফেন্স অফ পাকিস্তান রুল। ক তখন একটি মহকুমার এস ডি ও।

সে এলাকার ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ছিলেন খুব জনপ্রিয়। ধরা যাক তাঁর নাম খ। খ তাঁর সম্পত্তির অধিকাংশ দান করেছিলেন স্থানীয় প্রাইমারি স্কুল এবং ইউনিয়ন কাউন্সিলকে।

আবদুস সবুর খান তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। খ ও তিনি একই দল [মুসলীম লীগ] করেন। কিন্তু মন্ত্রীর এলাকায় আরেকজন জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা থাকবেন এটা সবুর খান মেনে নিতে পারছিলেন না। খুব সম্ভব ডি সি-কে তিনি বলেছিলেন, এর একটা বিহিত করতে। অর্থাৎ কোন-না-কোন অজুহাতে খ-কে গ্রেফতার করতে। ডি সি ছিলেন ই পি সি এস। বয়সী। তিনি চাচ্ছিলেন মন্ত্রীকে খুশি করতে।

এদিকে সবুর খানের চেলারা খ-এর বিরুদ্ধে নানারকম প্রচার চালাতে লাগল। অভিযোগ এল ক-এর দপ্তরে যে, খ সাম্প্রদায়িক। এর একটা বিহিত হওয়া প্রয়োজন।

ক সরেজমিনে তদন্ত করতে গেলেন খ-এর ইউনিয়নে। সেখানে প্রধান প্রধান হিন্দু পরিবারের সঙ্গে আলাপ করলেন। খ সাম্প্রদায়িক এ কথা তাঁরা বললেন না, কিন্তু তাঁরা যে খ-এর ওপর খুশি নন তা বোঝা গেল। এঁরা ছিলেন আবার সবুর খানের ভক্ত।

ফিরে এলেন ক, ফলাফল জানালেন ডি সি কে। তিনি বললেন, 'এস ডি ও সাহেব, আপনি তো ছেলেমানুষ, তাই পরিস্থিতি হয়তো বুঝতে পারছেন না। ওকে গ্রেফতার করুন।' শুধু তাই নয়, এস পি-কে আড়ালে ডেকে বললেন, খ-কে একটু শিক্ষা দিতে।

কয়েকদিন পর এস পি জানালেন ক-কে, যে তিনি খ-এর ইউনিয়ন ঘুরে এসেছেন এবং তাঁর মনে হয়েছে সেখানে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। ক

বললেন, 'আপনি খ-কে গ্রেফতার করতে চান, করুন। কিন্তু এস ডি ও হিসেবে আমি তা সমর্থন করব না।' এস পি আর কিছু বললেন না।

ডি সি তারপর ক-কে ফোনে জানালেন, ডিফেন্স অফ পাকিস্তান আইন প্রয়োগ করে খ-কে গ্রেফতার করতে। ক বললেন উত্তরে, 'খ এমন কিছু করেনি যে তাকে আমি গ্রেফতার করতে পারি।'

এরপর ক ভাবলেন, ব্যাপারটার বুঝি ইতি হল। কিন্তু, একদিন সকালে, তিনি শুনলেন জেলা সদর থেকে এ ডি সি এসে খ-কে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছেন। খুব অবাক হলেন তিনি। কিছুক্ষণ পর ফোন পেলেন এ ডি সি র। বললেন তিনি, 'এস ডি ও সাহেব, একটা অন্যায় করেছি, কিছু মনে করবেন না। আমি নিজে এসে খ-কে গ্রেফতার করে নিয়ে গেছি।'

খ তখন হাইকোর্টে তাঁর গ্রেফতারের বিরুদ্ধে আপীল করে জিতলেন। ডি সি তখন আবার নির্দেশ দিলেন, ১০৭ ধারা প্রয়োগ করে খ-কে গ্রেফতার করতে। কিন্তু নির্দেশটি পাঠালেন তিনি সেকেণ্ড অফিসারকে। এস ডি ও-কে নয়। শুধু তাই নয়, সেকেণ্ড অফিসারকে আরো বললেন, কোর্টে চালান দেওয়ার পর কেউ যেন তার সিওরিটি না দেয়। সিওরিটি না দিলে খ-এর জামিন হবে না। সেকেণ্ড অফিসার জানালেন ঘটনাটা ক-কে।

খ-কে ঠিকই গ্রেফতার করা হল। তখন ক ডি সি-কে ফোন করে বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি না স্যার আপনি কোন আইনে খ-র পক্ষে কোন সিওবিটি দিতে বারণ করছেন।' ডি সি বললেন, 'এরকম করলে তো দেশ চলে না।' ক তখন ফোনেই বি বি বোসের আইনের বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন ডি সি যা বলছেন তা বে-আইনি। ক্রুদ্ধ হয়ে ডি সি ফোন ছেড়ে দিলেন।

খ-কে জেলে নেওয়া গেল না। তাঁকে ছেড়ে দিতে হল।

৬৩. তৎকালীন পুর্ব-পাকিস্তানের একজন নাম করা মুসলিম লীগার [যিনি ১৯৭১ সালের পর রাজাকার হিসেবে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশে রাজনীতিবিদ হিসেবে পুনর্বাসিত হয়েছেন] তখন প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী। আইয়ুব খানের প্রিয়পাত্র বিধায় ছিলেন খুব ক্ষমতাশালী।

সরকারী বনের কাঠ বিক্রি করা হয় তিনভাবে— নিলাম, আলোচনা ও রেট। সুন্দরবন অঞ্চলে কয়েকটি নিলাম হবে। মন্ত্রী তখন নির্দেশ দিলেন, টেণ্ডার না করে কাঠ রেটে দিতে এবং তা দিতে হবে তাঁর এক আত্মীয়কেই। চীফ সেক্রেটারিও সে নির্দেশ অনুমোদন করে দিলেন।

বন বিভাগের প্রধান তখন ক। তিনি দেখলেন, রেটে কাঠ দিলে সরকারের আট-দশ লাখ টাকা ক্ষতি হবে। তিনি পড়লেন উভয় সংকটে। কারণ মন্ত্রী এবং তারপর চীফ সেক্রেটারি— কারো নির্দেশই তিনি অমান্য করতে পারেন না। অন্যদিকে নির্দেশ মেনে নিলে সরকারের ক্ষতি। সরকারী চাকুরে হিসেবে এ বিষয়টিও তাঁর দেখা উচিত। অনেক ভেবে, তিনি কৌশলের আশ্রয় নিলেন। ফাইলটি পাঠালেন অর্থমন্ত্রণালয়ে। তখন নিয়ম ছিল তিনপক্ষ [যেমন সচিব, বিভাগীয় প্রধান ও অর্থ মন্ত্রণালয়] একমত না হলে ফাইল যাবে গভর্নরের কাছে।

স্থতরাং ফাইল গেল গভর্নর মোনেম খানের কাছে। তিনি ডেকে পাঠালেন ক-কে। শুনলেন তাঁর বক্তব্য। তারপর বললেন, 'খবরদার এসব কাজ হতে দেবেন না।' বলে, চিফ সেক্রেটারির নির্দেশ তিনি নাকচ করে দিলেন।

৬৪. ষাটের দশকের শেষভাগে ক ছিলেন একটি মহকুমার এস ডি ও। তাঁর এলাকায় সরকারী মুসলিম লীগ ও বিরোধী দলের দু'জন প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন। খ ছিলেন প্রাদেশিক পরিষদে মুসলিম লীগের সদস্য। গ ছিলেন কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রাক্তন বিরোধী দলীয় সদস্য। খ ও গ-এর মধ্যে খানিকটা আত্মীয়তাও ছিল। পারিবারিক কলহের সূত্র ধরে, একদিন গভীর রাতে খ গুলি করে হত্যা করলেন গ-কে। ক-এর কাছে এ খবর পৌঁছানো মাত্র তিনি পুলিশ বাহিনী নিয়ে গ্রেফতার করলেন খ-কে। পরদিন খ-এর জামিনের জন্য আবেদন করা হলে ক তা প্রত্যাখ্যান করলেন।

জামিন প্রত্যাখ্যান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন মহল থেকে টেলিগ্রাম, টেলিফোন আসতে লাগল। অনুরোধ একটিই, খ-কে জামিন দিতে হবে। এ সবের উত্তরে ক একটি কথাই বললেন, ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে তিনি হাইকোর্টের অধীন। স্থতরাং হাইকোর্টের আদেশ ছাড়া তিনি কিছুই করতে পারবেন না। এরপর প্রশ্ন উঠল, এস ডি ও সংসদ সদস্যকে গ্রেফতার করতে পারেন কিনা। ক একটিই বাঁধা উত্তর দিতে লাগলেন, 'সংসদ সদস্যের কাজ তো খুন করা নয়।'

কিন্তু, নতুন এস ডি ও হিসেবে ক একটি ভুল করেছিলেন। কোন সংসদ সদস্যকে গ্রেফতার করলে চব্বিশ-ঘণ্টার মধ্যে তা পরিষদের স্পীকারকে জানাতে হয়। না জানালে, স্পীকার তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারেন। ক সরকারী ভাবে স্পীকারকে গ্রেফতারের কথা জানাতে ভুলে গিয়েছিলেন। তবে এ কথা সরকারী দলের কেউ জানতেন না।

স্পীকার ছিলেন তখন আবদুল হাকিম। তিনি কথাচ্ছলে তাঁর ঘনিষ্ঠ

একজনকে বললেন, 'এস ডি ও কাজটা ঠিকই করেছে। তবে ছেলেমানুষ তো, তাই একটা ভুল করে ফেলেছে। সে যদি এখনও পুরনো তারিখ দিয়ে আমাকে চিঠি লেখে তা হলেই আর ঝামেলা হবে না।' যাকে স্পীকার কথাটি বলেছিলেন তিনি বুঝলেন ইঙ্গিতটি। সঙ্গে সঙ্গে গোপনে জানানো হল ক-কে। তিনি পুরনো তারিখ দিয়ে চিঠি পাঠিয়ে দিলেন স্পীকারকে। ফলে, এ ব্যাপারেও প্রশ্ন করে বা চাপ প্রয়োগ করে স্বার্থান্বেষী মহল কিছুই করতে পারল না।

৬৫. ষাট দশকের শেষ ভাগ। ক একটি মহকুমার এস ডি পি ও। একদিন খবর পেলেন, সরকার সমর্থক স্থানীয় পার্লামেণ্ট সদস্যের বাসায় আওয়ামী লীগ সমর্থকরা ইট পাটকেল ছুঁড়েছে এবং এক পর্যায়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। ক তদন্ত করতে গিয়ে দেখলেন, বাসার জানালার কাঁচ কিছু ভেঙেছে কিন্তু কাঁচের টুকরো সব বাইরের দিকে পড়েছে। আগুন লেগেছে কিন্তু পুড়েছে ভিতরের দিকের লাইনিংয়ের অংশ। ক-এর কাছে মনে হল পুরো ব্যাপারটা সাজানো। স্থানীয় আওয়ামী লীগ কর্মীদের নাজেহাল করার জন্য এ কাজ করা হয়েছে। তাই তিনি রিপোর্টও দিলেন ওভাবে। একথা জানার পর এস পি অভিযোগ জানালেন গভর্নর মোনেম খানকে। কয়েকদিন পর ক ফোন পেলেন ডি আই জি-র।

'তুমি নাকি বলেছ, আইন সভার সদস্যের বাড়ি পুড়ে গেলেও কিছু করবে না?' জিজ্ঞেস করলেন ডি আই জি। ক তখন পুরো ঘটনাটা খুলে বললেন তাঁকে। ডি আই জি আর কিছু বললেন না। ব্যাপারটি কয়েকদিন পর ধামা-চাপা পড়ে গেল।

৬৬. আবদুল মোনেম খান তখন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর। মফস্বল সফরে গেলে যদি কোথাও তিনি রাত্রি যাপন করতেন তাহলে সকালে নাস্তার টেবিলে স্থানীয় ডি সি এবং এস পি-কেও আমন্ত্রণ জানাতেন।

একবার এক জেলায় এমনি এক সফরে গেছেন গভর্নর। সকালে, তাঁর সঙ্গে নাস্তা খাবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন, স্থানীয় ডি সি আর এস পি-কে। ক তখন ঐ জেলার এস পি।

নানাবিধ বিষয় আলাপের ফাঁকে, ক বললেন গভর্নরকে, 'স্যার, আমি তো আপনার অনুমতি না নিয়ে কোন কোন ক্ষেত্রে আপনার নাম ব্যবহার করছি।' গভর্নর জানতে চাইলেন, কিভাবে? ক বললেন, 'প্রায়ই কেউ-না-কেউ নানারকম ফেভার নিতে আসে আমার কাছে। এসেই আপনার নাম করে বলে আপনি পাঠিয়েছেন। আমি তখন বলি, 'গভর্নর সাহেব আমাকে বলেছেন, আমি নিজে

থেকে তোমাকে কোন ব্যাপারে না বললে কিছু করবে না। তা আপনার ব্যাপারে তো গভর্নর সাহেব কিছু বলেন নি।' এ কথা শোনার পর তদবিরকারী সেই যে যায় আর আসে না।'

গভর্নর একথা শুনে শুধু মুচকি হাসলেন, কোন মন্তব্য করলেন না।

৬৭. ষাটের দশকের শেষ ভাগ। ক একটি মহকুমার এস ডি ও। খুনের দায়ে গ্রেফতার করেছেন তিনি মুসলিম লীগের প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য খ-কে [দ্রষ্টব্য : নক্‌শা ৬৪]। নামঞ্জুর করেছেন তাঁর জামিনের আবেদন। খ-কে ছেড়ে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন মহল চাপ দিচ্ছে। এমনকি স্বয়ং গভর্নর মোনেম খান ফোন করলেন এস ডি ও-কে। বললেন, 'আপনি আমার লোককে অ্যারেস্ট করেছেন ?'

'সব লোকই তো আপনার স্যার। আপনি কার কথা বলছেন ?'

'খ। গভর্নর হিসেবে আমি আদেশ দিচ্ছি তাকে মুক্তি দিতে।'

'কিন্তু স্যার, খুনের আসামীকে তো এভাবে ছাড়া সম্ভব নয়।' বিনীত ভাবে জানালেন ক। ফোন ছেড়ে দিলেন গভর্নর। কিন্তু তরুণ এস ডি ও সন্ত্রস্ত হয়ে রইলেন।

এর কয়েকদিন পর গভর্নর ঐ জেলায় এলেন এক নির্বাচনী সফরে। পাশাপাশি দুটি জেলার ডি সি এবং এস ডি ও হিসাবে ক গেছেন রেল জংশনে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে। ট্রেন থেকে নেমে গভর্নর, ডি সি একজনকে যা তা বললেন। তারপর চারদিকে চেয়ে বললেন, 'এস ডি ও কই ?' এগিয়ে গেলেন ক। এস ডি ও-কে নিরীক্ষণ করে গভর্নর বললেন, 'আপনি তো সি এস পি মানুষ। গাড়ি চালাতে পারেন তো। চলেন দেখি আপনার গাড়িতে।'

এস ডি ও তাঁর জীপ চালিয়ে গভর্নরকে নিয়ে এলেন রেস্ট হাউসে। তখন দুপুরের খাবারের সময়। আয়োজন করা হয়েছে মধ্যাহ্ন ভোজের। গভর্নর ক-কে বললেন তাঁর সঙ্গে খেতে। ক বললেন, 'স্যার, আমি খেয়ে এসেছি।' উত্তর দিলেন গভর্নর : 'ও, আমি বলছি দেখে খাবেন না। ঠিক আছে, বসেন আমার সঙ্গে।' তারপর খেতে খেতে তিনি ক-এর সঙ্গে নানা বিষয়ে [পারিবারিক বিবরণ সহ] আলাপ করলেন। কিন্তু খ-এর ব্যাপারে কোন আলোচনাই করলেন না।

খাবারের পর মোনেম খান যাবেন নির্বাচনী সভায়। এস ডি ও-র জীপেই উঠলেন। গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেলেন এস ডি ও। ফেরার সময়ও সেই একই ব্যাপার। তবে, তখন বিকেল। গভর্নর একসময় পিছনের সীটে বসে থাকা তাঁর

এক অনুচরকে বললেন, 'দেখতো, টিফিন ক্যারিয়ারে আপেল আছে। এস ডি ও সাহেবকে দাও।'

এরপর গভর্নর যাবেন রাজশাহী। ক-কে বললেন, 'চলেন আমার সঙ্গে।' ক বললেন, 'স্যার, ডি সি সাহেবের অনুমতি ছাড়া তো আমি যেতে পারব না।' গভর্নর বললেন, 'তাই নাকি, কই ডি সি সাহেব, চলেন আপনারা দু'জনেই আমার সঙ্গে।'

পথে একটি এলাকায় মুসলিম লীগের সভা। সভার শুরুতে ক শুনলেন, স্থানীয় মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি বলছেন গভর্নরকে, 'স্যার, ঐ এস ডি ও থাকলে, এখানে মুসলিম লীগ থাকবে না। দেখেন না খ-এর ব্যাপারটা।'

'দেখেন,' বললেন মোনেম খান তাকে, 'আমার প্রেসিডেণ্ট [আইয়ুব খান] আমার ওপর এখানকার মুসলিম লীগের ভার দিয়েছেন। এখানকার কাজ চালাবার জন্য আমি আবার আপনাকে ভার দিয়েছি। আপনার কাজ আপনি করবেন, এস ডি ও-র কাজ এস ডি ও করবেন। নিজের কাজ যদি না পারেন তো বলেন, অন্য লোক দেখব।'

৬৮. মোনেম খান তখন পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর। ক দুর্নীতি দমন বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা।

একবার, এক সাব-রেজিস্ট্রার ঘুষ নিতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ল। দুর্নীতি দমন বিভাগ তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করার প্রস্তুতি নিতে লাগল। গভর্নর ও সাব-রেজিস্ট্রার একই এলাকার লোক। তাই নিশ্চয় সাব-রেজিস্ট্রারের হয়ে কেউ তদ্‌বির করেছিল গভর্নরের কাছে। কারণ, গভর্নর ডেকে পাঠালেন ক-কে। নমিত ভাবে বললেন, সাব-রেজিস্ট্রারকে যদি সরাসরি চাকুরিচ্যুত করা হয় তা হলে কি ক মামলা না করে সন্তুষ্ট থাকবেন। ক-রাজী হয়ে গেলেন। কারণ, ঘুষের পরিমাণ ছিল খুবই কম। ঐ কারণে, আদালতের ঝামেলা থেকে যদি বিভাগীয় ব্যবস্থায় কাজ হয় তা হলে সেটাই ভালো। সাব-রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধে আর মামলা করা হলো না। বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে তাঁকে চাকুরিচ্যুত করা হল।

৬৯. ১৯৬৬। একটি জেলার ডি সি-র বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন বিভাগে অভিযোগ এলো। বলা হল, ডি সি শস্তায় কিছু সরকারী জমি বিক্রি করে নিজের জন্য কয়েক লক্ষ টাকার আর্থিক সুবিধা নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তার আয়ব্যয়ের কোন সামঞ্জস্য নেই। তদন্তে প্রমাণিত হল, ডি সি দোষী। চাকুরি গেল ডি

সি-র। প্রাদেশিক দুর্নীতি দমন কাউন্সিল আদালতে মামলা দায়ের করার জন্য অনুমতি চাইল। কিন্তু কেন্দ্র থেকে অনুমতি এলো না। কেন্দ্র যাতে অনুমতি না দেয় সে চেষ্টা করেছে তার সতীর্থ সি এস পি অফিসাররা। কারণ, চাকরি চলে যাওয়া এক ধরনের নিস্তার পাওয়া কিন্তু, আদালতে গেলে হয়তো ডি সি জড়িয়ে পড়বে আরো ঝামেলায়।

৭০. ষাটের দশকের মাঝামাঝি। ক একটি মহকুমার এস ডি ও। এক মুসলমান ভদ্রলোক এ সময় কলকাতা থেকে স্থায়ী ভাবে বসবাস করার জন্য চলে এলেন তাঁর মহকুমায়। আসার আগে, তিনি পশ্চিমবঙ্গে নিজের বাড়ির সঙ্গে ঐ মহকুমার এক ভদ্রলোকের বাড়ি বদল করেছিলেন। নতুন জায়গায় আসার পর, মূল দলিল করার আগে মৃত্যু হল তাঁর। মুসলিম আইন অনুযায়ী, দলিল সম্পন্ন হলে, উত্তরাধিকার সূত্রে বাড়িটি পাবেন ভদ্রলোকের বাবা বা ভাই। কারণ, তাঁর নিজের কোন পুত্র সন্তান নেই। আছেন বিধবা স্ত্রী আর দুই মেয়ে। আর দলিল সম্পন্ন না হলে সরকার নিয়ে নেবেন বাড়িটি, ভদ্রলোকের বিধবা স্ত্রী চান না দলিলটি সম্পন্ন হোক। কারণ, নতুন উত্তরাধিকারী তাঁদের বাড়ি থেকে তাড়িয়েও দিতে পারে। ক-এর সহানুভূতি মহিলার দিকে। কিন্তু তাঁর করার কিছু নেই, আইন অনুযায়ী সরকার নিয়ে নিল বাড়িটি। ক বাড়িটি বরাদ্দ করলেন একটি সমাজসেবী সংস্থাকে। কিন্তু, এর দুটি কামরায় থাকার বন্দোবস্ত করে দিলেন বিধবা মহিলা আর তাঁর দুই মেয়েকে। দশ বছর পর, ক আবার সরকারী কাজে গিয়েছিলেন ঐ মহকুমায়। খোঁজ করেছিলেন মা ও মেয়ে দুটির। কিন্তু, তাঁদের কোন খোঁজ পান নি।

৭১. উনসত্তরের গণ-আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে আদমজীতে হরতাল হল একদিন। কয়েক জায়গায় আগুনও লাগানো হল। দেশে তখন সামরিক আইন। সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছিল, এসব ক্ষেত্রে জড়িত লোকজনকে সরাসরি বিচারের জন্য প্রেরণ করতে হবে সামরিক আদালতে।

ক তখন ঐ এলাকার এস ডি পি ও। কয়েক জায়গায় আগুন লাগানোর খবর পেয়ে তিনি গেলেন স্থানীয় থানায়। এডিশনাল এস পি একজন অবাঙালী, তিনিও ছিলেন সেখানে। ঢাকা থেকে এসেছেন তিনি ঘটনা নিজ চোখে দেখার জন্য। এডিশনাল এস পি থানার ও সি-কে বললেন, 'ছাখো রাস্তায় কিছু ফকির টকির পাও কিনা। কয়েকজনকে পেলে, চালান করে দাও কোর্টে, ফকিরদের শুধু বলবে, কোর্টে গিয়ে মাপ চাইতে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আবার তাদের ছেড়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত করব।'

ক অবাক হয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, 'এ ধরনের পরিস্থিতিতে জেনুইন লোক ধরলে পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। তখন কিন্তু কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে সবাই আমাদের দোষ দেবে। আবার এ পরিস্থিতিতে, কিছু 'আসামী' না ধরলে সামরিক কর্তারা আমাদের দায়ী করবে। তাই সবচেয়ে ভালো উপায়, এদের পাঠানো। আদালতে এরা মাপ চাওয়া মাত্র আমি জানি এদের ছেড়ে দেবে। আর আমাদের এখন এ ভাবেই সব কূল রক্ষা করতে হবে।'

৭২. কয়েক যুগ ধরে চট্টগ্রামের দুটি প্রভাবশালী পরিবারের স্টিভেডররা বন্দরে কাজ করার জন্য কয়েকহাজার শ্রমিক নিযুক্ত করছে। শ্রমিকদের তারা সংগ্রহ ও নিয়োগ করে তাদের পাণ্ডা বা সর্দারদের মাধ্যমে। সর্দারদের কাজ হচ্ছে দুঃস্থ এলাকা থেকে বেকার লোকজন সংগ্রহ করে বন্দরে নিয়ে আসা। শহরে আসার পর তারা সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে সর্দারদের ওপর। কারণ, বন্দরে কাজ দেওয়ার মালিক সর্দাররা। যতদিন তারা কাজ না পাচ্ছে ততদিন সামান্য অর্থ দিয়ে সর্দাররা তাদের বাঁচিয়ে রাখে। তারপর ধরা যাক, একজন শ্রমিক কাজ পেলেন। তাঁর বেতন সংগ্রহ করে সর্দার। এবং তার থেকে সামান্য কিছু টাকা দেয় সে শ্রমিককে। বাকিটা কেটে রাখে এ অজুহাতে যে, যতদিন কাজ ছিল না ততদিন ঋণ দিয়ে সে প্রাণ বাঁচিয়েছে শ্রমিকের। সেই ঋণের ওপর আবার সরল ও চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ ধরা হয়। ফলে, একজন শ্রমিক কখনও তাঁর ঋণ শোধ করতে পারেন না এবং অন্তিমে সে হয়ে যায় সর্দারের দাস।

একজন শ্রমিককে সাধারণত সর্দাররা মাসে পাঁচ দিনের বেশি কাজ দিত না। এমনও হয়েছে যে, একজন শ্রমিক মাসে একদিন কাজ পেয়েছে। যদিও কাজের সপ্তাহ ছিল সাতদিনই। কাজ না থাকলে কোন রোজগার ছিল না। ফলে, শ্রমিককে আবার ধার নিতে হতো সর্দারের কাছ থেকে। এটি ছিল একটি বিষাক্ত চক্র।

ষাট দশকের মাঝামাঝি শ্রমিক অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠলে ১৯৬৬-৬৭ সালের দিকে সর্দারদের উদ্যোগে গঠিত হয় একটি শ্রমিক ইউনিয়ন। এই ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রণ করত সর্দার ও স্টিভেডররা। ১৯৬৭ সালে শ্রম আদালতে এক বার ঘোষণা করে যে, শ্রমিকদের রেজিস্ট্রেশন হওয়া ও তাদের মধ্যে কাজের দিন সমভাবে ভাগ করে দেওয়া উচিত। কিন্তু তার কিছুই হয়নি। কর্তৃপক্ষও এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।

১৯৫৮ সালের সামরিক সরকার ১৯৬৮ সালে অনুভব করল, নির্যাতিত শ্রমিকদের জন্য কিছু করা দরকার। নিয়ম করা হল, শ্রমিক-নিয়োগকারী ব্যক্তি বা সংস্থা এরপর থেকে শ্রমিকদের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বাড়ি ভাড়া দেবে এবং সে অর্থ জমা দিতে হবে বন্দর কর্তৃপক্ষের কাছে। শ্রমিকদের বাসস্থান নির্মাণের জন্য বন্দর কর্তৃপক্ষ বাসস্থান তৈরিরও একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। এজন্য, দশ একর জমিও সংগ্রহ করা হয়। নির্মিত হয় চারতলা একটি বাসস্থান। কিন্তু শ্রমিকরা সেখানে থাকতে এলো না। কারণ, সর্দাররা তাদের নানারকম ভয় ভীতি দেখিয়েছিল। সর্দারদের ইচ্ছে ছিল, শ্রমিকদের বাসস্থানে ঢুকতে না দিয়ে ভবনটি নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করা। তা ছাড়া বাসস্থান ব্যবহার না করলে বাড়ি ভাড়া হিসেবে সর্দারদের কাছ থেকে তারা ঋণ নেবে। এ প্রক্রিয়া এখনও মোটামুটি চালু। এবং এ অবস্থা থেকে শ্রমিকদের উদ্ধার করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তেমন কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করেনি। কোন কোন কর্মকর্তা শ্রমিকদের সাহায্য করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সফল হননি।

৭৩. ষাট দশকের শেষ ভাগ। ক একটি মহকুমার এস ডি ও। আইন অনুযায়ী তিনি উপ কারাগারের তত্বাবধায়কও। সে হিসেবে একদিন গেলেন তিনি জেল পরিদর্শনে। বিভিন্ন ওয়ার্ড পরিদর্শন করে গেলেন মেয়েদের ওয়ার্ডে। সেখানে পা রাখা মাত্র, সুন্দরী, কালো ছিপছিপে এক তরুণী প্রহরীদের সরিয়ে তাঁর পায়ে এসে আছড়ে পড়ল। ভাবলেন ক, বোধ হয় জেলে ওর ওপর শারীরিক কোন অত্যাচার হয়েছে। তাই, আলাদাভাবে সে কথা বলতে চায়। সরিয়ে দিলেন তিনি প্রহরীদের, যাতে মেয়েটি একলা নির্ভয়ে তার অভিযোগ জানাতে পারে, মেয়েটি সাঁওতাল, নাম কুন্তি।

কুন্তির বাড়ি সীমান্ত এলাকায়। বিয়ে করেছিল প্রেম করে। বিয়ের দিন অন্যান্য অনেকের সঙ্গে তারা আমন্ত্রণ জানিয়েছিল সীমান্ত ফাঁড়ির লোকজনকেও। কারণ, একই এলাকায় থাকার জন্য সাঁওতালদের সঙ্গে তাদের বেশ জানাশোনা ছিল। ফাঁড়ির লোকেরা নেমন্তন্ন খেতে এলো এবং যাবার সময় দেখে গেল কুন্তিকে।

কয়েকমাস পর, ধান কাটার জন্য কুন্তির স্বামী রওয়ানা দিল অন্য গ্রামের দিকে। পথে ফাঁড়ির প্রহরীদের সঙ্গে দেখা। কুশল বিনিময় হল। তারা জানলো, কুন্তির স্বামী কয়েকদিন ঘরে থাকবে না।

সেদিন রাতেই, কয়েকজন প্রহরী কুন্তিকে ধর্ষণ করার জন্য এলো তার বাসায়। কুন্তি তাদের বাধা দিয়ে চিৎকার করে ওঠে। তার চিৎকারে ছুটে আসে অন্য

সাঁওতালরা। পালিয়ে গেল তারা কিন্তু যাবার আগে উঠোনে ফেলে গেল কয়েকটি তাজা কার্তুজ।

সকালে, ফাঁড়ির দারোগা এলো কুন্তির বাসায়। 'খুঁজে পেল' তাজা কার্তুজ। এবং অস্ত্র পাওয়া গেছে এই আইনে কুন্তিকে গ্রেফতার করে চালান দিল জেলে। সেই থেকে বিনা বিচারে দু'বছর ধরে জেলে আছে কুন্তি।

ক এই অবিচারের প্রতিকার করতে চাইলেন। দেখলেন, আইনে আছে, 'আর্মস এ্যাক্টে' প্রসিকিউট করতে হলে অনুমতি লাগে ডি সি-র। দারোগাও অনুমতি চেয়েছিল এবং ডি সিও রুটিন মাফিক দিয়েছিলেন সে অনুমতি। কার্তুজ-গুলো পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল অস্ত্র বিশেষজ্ঞের কাছে। দু'বছর পেরিয়ে গেছে। কিন্তু কোন রিপোর্ট আসেনি। ফলে, দু'বছর জেলে আটকে আছে কুন্তি।

ক অনেক আইনের বই পড়েটড়ে, একটা ফাঁক খুঁজে মুক্তি দিয়ে দিলেন কুন্তিকে। অবশ্য, সরকার যদি এর বিরুদ্ধে আপীল করত তা'হলে জিতে যেত।

জেল থেকে মুক্তি পেল কুন্তি। জেলের আইনে আছে, কয়েদী ছাড়া পাওয়ার পর তার যাতায়তের জন্য কিছু অর্থ দেওয়া হয়। কিন্তু, ক জানতেন, জেল রক্ষীরা অধিকাংশ সময় তা আত্মসাৎ করে। তাই তিনি খোঁজ রেখে পুরো টাকাটা দেওয়ালেন কুন্তিকে এবং নিজের পকেট থেকেও দিলেন পঞ্চাশ টাকা। কিন্তু কুন্তি পায়ে পড়ে বলল, 'হুজুর, যাব কোথায় ? সমাজ তো আমাকে নেবে না।'

মুশকিলে পড়লেন ক। নিয়ে গেলেন কুন্তিকে বাসায়। বিকেলে শহরের সম্ভ্রান্ত লোকদের ডেকে বললেন পুরো ঘটনাটি। অনুরোধ জানালেন, কেউ যদি তাকে বাসার কাজ দেয় তবে ভালো হয় ; অথবা স্থানীয় স্কুলে আয়ার চাকরি। সবাই বলল, জানাব। কিন্তু, কেউ জানাল না। তিনি আবার খবর পাঠালেন তাদের। তারা জানাল, দুটির কোনটিই সম্ভব নয়।

ক অবিবাহিত। তিনি দেখলেন, মেয়েটিকে বাসায় রাখলে 'দুশ্চরিত্র' হিসেবে তাঁকে অপবাদ দেওয়া হবে। বিশেষ করে মুসলিম লীগ এ সুযোগ ছাড়বে না। তাই বাধ্য হয়ে, কুন্তিকে আরো দুশো টাকা দিয়ে অনুরোধ করলেন, নিজ গ্রামে গিয়ে একবার চেষ্টা করতে।

গেল কুন্তি নিজ গ্রামে। কিন্তু, তার বাবা-মা, স্বামী, সমাজ কেউ তাকে গ্রহণ করল না। কুন্তি আর কি করে ? বাধ্য হয়ে পতিতা হয়ে গেল সে।

৭৪. একজন অবসরপ্রাপ্ত সচিব জানিয়েছেন, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে

পশ্চিম পাকিস্তান, বিশেষ করে পাঞ্জাবে প্রশাসন ছিল সুদৃঢ় এবং কার্যক্ষম। অন্যদিকে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসন ছিল শিথিল।

পাঞ্জাবে, ডি সি-র জন্য সফর (ট্যুর) ছিল প্রায় বাধ্যতামূলক। এবং ডি সি তাঁর কার্য পালন করছেন কিনা, সেদিকে কমিশনারও সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। এ কারণে, পাঞ্জাবে একজন ডি সি-কে দিন শুরু করতে হতো ভোর সাড়ে চারটায়। কারণ, খুব সকালে, ঘোড়ায় চড়ে না বেরুলে, দুপুরে রোদে কষ্ট হত।

অন্যদিকে, পূর্ব পাকিস্তানে, ডি সি নিয়মিত সফরের ব্যাপারে মনোযোগী ছিলেন না এবং কমিশনারও সেদিকে তেমন দৃষ্টি রাখতেন না। এ প্রসঙ্গে তিনি একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন।

ষাটের দশকে তিনি ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানে একটি বিভাগের কমিশনার। সে সময়, একবার তিনি একটি জেলা সদর পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। ডি সি-র সঙ্গে প্রাথমিক আলাপের পর তিনি 'গান লাইসেন্স রেজিস্টার' দেখতে চাইলেন। খানিক খোঁজার পর, রেজিস্টারটি পাওয়া গেল। রেজিস্টার পরীক্ষা করে তিনি দেখলেন কারও বন্দুকের লাইসেন্স পাবার দরখাস্ত এক ঘণ্টায় মঞ্জুর হয়, আবার কাউকে অপেক্ষা করতে হয় ছাব্বিশ মাস। শুধু তাই নয়, তিনি আরো জানলেন, জেলার ইউনিয়ন এবং গ্রাম সফর করার কোন সফর সূচীও ডি সি-র নেই।

৭৫. ষাটের দশক। ক একটি বিভাগের কমিশনার। একবার, জেলা সফরে বেরিয়ে, একটি জেলার থানা পরিদর্শনে গেলেন হঠাৎ করে। থানায় গিয়ে দেখলেন, থানার তিনজন অফিসারই অনুপস্থিত, এবং তারা কোথায় গেছে তাও কেউ বলতে পারল না। থানায় উপস্থিত ছিল মাত্র একজন কেরাণী।

কিছুক্ষণ পর, থানার সবচেয়ে জুনিয়র অফিসারটি ফেরত এলেন। ক থানার কাগজপত্র দেখতে চাইলেন। দেখলেন, থানায় যেসব কাগজপত্র থাকা অত্যাবশ্যকীয়—যেমন, গান লাইসেন্স রেজিস্টার, ওয়ারেন্ট রেজিস্টার, সামন রেজিস্টার—কিছুই নেই। এর কারণ, এর আগে কখনও কোন উচ্চপদস্থ অফিসার এই থানা পরিদর্শন করেননি।

৭৬. ষাটের দশকে, ক বিভাগীয় কমিশনার হিসেবে গেছেন একটি জেলা পরিদর্শনে। জেলাটি অপেক্ষাকৃত উন্নত, রাস্তাঘাটের অবস্থা ভালো। তাই তিনি ডি সি-কে জিজ্ঞেস করলেন, ইতিমধ্যে ডি সি জেলার কোন এলাকা সফর করেছেন কিনা। ডি সি-র উত্তরে বোঝা গেল, এলাকা সফরও যে ডি সি-র কার্যক্রমের অন্তর্গত এবং গুরুত্বপূর্ণ তা কখনও তাঁর মনে হয়নি। ক তাঁকে কর্তব্যে অবহেলার

জন্য ভৎর্সনা করলেন। উত্তরে ডি সি বললেন, 'স্যার, রাস্তাঘাটের অবস্থা তো ভালো। যে কেউ অসুবিধা হলে সরাসরি আমার কাছে চলে আসতে পারবে।'

৮ উন্নয়ণ প্রশাসন

প্রশাসনের প্রতিটি ক্ষেত্রে [উন্নয়ন প্রশাসন সহ], অনেক আমলা সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁদের দায়িত্ব এড়িয়ে যান এই অজুহাতে যে, বিদ্যমান আইন-কানুনের ফলে তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না প্রায় ক্ষেত্রেই কাজ করা। এমনকী সরকারী ম্যানুয়েলেও যখন নির্দিষ্ট নির্দেশ থাকে সাধারণ মানুষের অসুবিধা দূরীকরণে সেক্ষেত্রেও তাঁরা থাকেন নিশ্চেষ্ট। এর উদাহরণ [নকশা ৭৭] এর ঘটনা। গরিব মানুষের ভূমি দখলের কারণে উচ্ছেদ হওয়ার পর ও ন্যায্য পাওনা আদায়ে হয়রান হতে হয়। এর বিপরীতে নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় কর্পোরেশনের আমলারা সৃষ্টি করে নিতে পারেন নতুন বিধি নিয়ম [নকশা ৭৮], নিযুক্ত করতে পারেন বাধ্য অডিটর যিনি সত্য মিথ্যা মিশ্রিত করে তৈরি করেন সুবিধাজনক প্রতিবেদন। উন্নয়নের প্রধান মাধ্যম এ ধরনের কর্পোরেশন সমূহ। আর উল্লিখিত আমলা যাঁরা নিয়োজিত এ ধরনের সংস্থায় তাঁরা অহরহ সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করেন মন্ত্রণালয়ের পদস্থ কর্মচারীদের বা নিজের ওপরওয়ালাকে। নিজের দুর্নীতিবাজ সহকর্মীর শাস্তির জন্য তাঁরা কোন বিধি নিষেধ তৈরি করেন না বরং সেই সহকর্মী যথেষ্ট টাকা করে ফেললে বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণ বা স্বেচ্ছাকৃত পদত্যাগ মারফত যে কঠিন শাস্তি তাঁর প্রাপ্র্য সেটি এড়িয়ে যান [নকশা ৭৯]।[১১]

এখানে একজন তরুণ ব্যাঙ্ক অফিসারের কথা বলা হয়েছে [নকশা ৮০] যিনি বুঝেছিলেন বাঙালী ক্ষুদ্র শিল্প মালিকদের ঋণ দিলে উন্নতি হবে তাদের ব্যবসার। তখন, অধিকাংশ ব্যাঙ্ক মালিকরা ছিলেন অবাঙালী এবং তাঁরা বাঙালী রাজনীতি-বিদদের অর্থ সাহায্য করতেন কিন্তু বাঙালী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের নয় (প্রচলিত একটি ধারণা ছিল, গরিবরা অর্থ ফেরত দেবেন না)। অলিখিত এই নীতি অমান্য করেছিলেন সেই অফিসার এবং প্রমাণ করেছিলেন, গরিবরাই ঋণ নিলে ফেরত দেন, বড়লোকরা নয়। পরবর্তীকালে তিনি আরো প্রমাণ করেছেন, জাতীয়করণ-কৃত ব্যাঙ্কের অফিসাররা (যাঁদের অচিরাচরিত সিভিল সার্ভিসের সদস্য হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে) ইচ্ছে করলে এ ভূমিকা নিতে পারেন।

অনেক পরিস্থিতি আছে, যেখানে সৎ ও সতর্ক একজন আমলা উদ্যোগ নিয়ে, পরিবেশন দূষণ রোধ করে সহায়তা করতে পারেন শিল্পোন্নয়নে। একজন বিভাগীয়

কমিশনার একজন ট্যানারি মালিক কর্তৃক পরিবেশ দূষণ রোধ করেন। ঐ মালিক ছিলেন আবার গভর্নরের ভাই [নকশা ৮১]। কিন্তু, আবার যখন গরিব তাঁতিদের স্বার্থরক্ষার্থে নির্ভর করেন তিনি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ওপর তখন তিনি ব্যর্থ হন [নকশা ৮২]। ধনীদের সাহায্য না করে গরিবদের সাহায্য করার কথা বলছেন যে কমিশনার সে কমিশনারের কথায় কেউ তেমন গুরুত্ব দেয় না। অথচ সরকার ক্ষুদ্র কুটির শিল্প পরিসেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গরিবদের স্বার্থরক্ষার্থে। আমলাতন্ত্রের উপরের পর্যায়ের অবহেলার [ধনীদের সঙ্গে যোগসাজশের কথা যদি উল্লেখ নাও করি] কারণে এভাবে সরকারী লক্ষ্য পূরণ হয় না।

উন্নয়ন প্রশাসনের সাফল্য নির্ভর করে, জেনারেলিস্ট ও বিশেষজ্ঞদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার উপর।[১২] নির্ভর করে মহার্ঘ সম্পদ বণ্টনে উঁচু পর্যায়ের আমলারা যথেষ্ট সতর্ক কিনা— তার ওপর। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় [নকশা ৮৩] উঁচু পর্যায়ের কিছু জেনারিলিস্ট [যেমন সচিব, মুখ্য সচিব] রাজনীতিবিদদের থেকে দু'একটি কৌশল ধার করে তা প্রয়োগ করেন— শাসন করার জন্য বিশেষজ্ঞ-জেনারিলিস্টদের মধ্যে সৃষ্টি করেন বিভেদ। এ ধরনের প্রচেষ্টা আমলাদের মধ্যে সহ-যোগিতার ভাব বিনষ্ট করে।[১৩] পরিণামে ক্ষতিগ্রস্ত হয় উন্নয়ন প্রশাসন। তার ওপর যদি, উঁচু পর্যায়ের আমলা, সম্পদ এমনভাবে বণ্টন করেন যাতে লাভজনক চাকুরি পায় তার ভাতিজা [নকশা ৮৪] তা হলে উন্নয়ন প্রশাসনের অবস্থা কী দাঁড়ায় তা সহজেই অনুমেয়। একই প্রশাসক যখন বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও জনস্বার্থ বিস্মৃত হয়ে আত্মস্বার্থ পোষণে ব্যস্ত থাকেন তখন বাংলাদেশের উন্নয়ন-প্রশাসনের কর্মদক্ষতা কী হতে পারে তা অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না।

নকশা

৭৭. ষাট দশকের মাঝামাঝি। কমিশনার হিসাবে ক গেছেন একটি জেলা সদর পরিদর্শনে। পরিদর্শনকালে একটি অফিসে গিয়ে দেখেন অফিসের সামনে বেশ-কিছু লোক বসে অপেক্ষা করছেন। তিনি জানতে পারলেন, এঁরা সব প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এসেছেন। কেউ হেঁটে, গোরুর গাড়িতে, কেউ বা ট্রেনে। রাত্রি-যাপন করেছেন অনেকে রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। উদ্দেশ্য তাঁদের একটিই। ওয়াপদা তাঁদের জমি দখল করে নিয়েছে। এখন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। তাঁরা সেই ক্ষতিপূরণ নিতে এসেছেন। ক সংশ্লিষ্ট অফিসার-কে জিজ্ঞেস করলেন, এ সংক্রান্ত সরকারী ম্যানুয়েলটি তিনি পড়েছেন কিনা। না, অফিসারটি পড়েননি। ম্যানুয়েলে লেখা আছে, গ্রামবাসীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার স্থানটি এমন কোন স্থানে

হবে না যেখানে প্রত্যন্ত অঞ্চলের লোকদের যেতে অসুবিধা হবে। এবং সে জায়গা নিকটতম থানা সদরের চেয়ে দূরবর্তী কখনোই হবে না। সংশ্লিষ্ট অফিসার তাঁর চাকুরি জীবনে বোধহয় এ ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হননি।

৭৮. ষাট দশকে ক ছিলেন একটি কর্পোরেশনের প্রধান। মাঝে মাঝে তাঁর মনে প্রশ্ন জাগত, নিজের কাজের জন্য তিনি দায়ী কার কাছে? যেমন কর্পোরেশনের বাৎসরিক আয়ব্যয় পরীক্ষার জন্য উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কোন কর্তৃপক্ষ ছিল না। অডিটর নিয়োগ করত কর্পোরেশন এবং অডিটররাও রুটিন মাফিক কাজ করত। প্রায় ক্ষেত্রে তারা 'ভ্যালু অফ স্টক' অতিরঞ্জিত করত। অবশ্য, সঙ্গে সঙ্গে ছোট অক্ষরে তারা একটি নোটও দিত এ মর্মে যে, সম্পূর্ণ স্টক দেখা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কর্পোরেশনের কাগজপত্র দেখেই তারা কাজ করেছে। অর্থাৎ একই সঙ্গে তারা সত্য ও মিথ্যা দুটিই বলত।

ক-এর মনে হয়েছিল, ব্যক্তিগত ভাবে তিনি এবং তাঁর কর্পোরেশন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী / সচিবের কাছে দায়ী। কিন্তু সেটাও সম্ভব ছিল না। প্রায় ক্ষেত্রে মন্ত্রী / সচিব কর্পোরেশন থেকে নিজের ও পরিবারের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য গাড়ি নিয়ে যেতেন। এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন করা সম্ভব ছিল না। এবং গাড়ি যোগাতে পারলেই অন্যান্য দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনীয়তা লুপ্ত হতো। আবার ক হয়তো প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কাউকে বদলি বা দুর্নীতিবাজ কাউকে বরখাস্ত করতে চান। কিন্তু ঐ সময় মন্ত্রী / সচিব টেলিফোনে তাকে তা না করতে অনুরোধ জানাতেন। ফলে দেখা যেত, একাউণ্টেবল করারও কোন উপায় ছিল না।

৭৯. আধা সরকারী সংস্থাগুলিতে, সৎ অফিসাররা সাধারণত হতাশায় ভোগেন। কারণ, প্রায়ই তাঁরা দেখেন, অসৎ অফিসার ধরা পড়লে হয় পদত্যাগ করেন নয়তো তাকে অবসর প্রদান করা হয়। শাস্তি হয় না। বরং সে ব্যবসা করে লক্ষপতি হয়ে যায়। এ অভিজ্ঞতা ক-এরও, যিনি ষাট দশকে ছিলেন একটি কর্পোরেশনের প্রধান। ঐ আমলের দু-একটি উদাহরণ দিয়েছেন ক।

সরকারী একটি সার-কারখানার প্রধান দুর্নীতি করে এত বেশি টাকা করে ফেলেছিলেন যে সরকার বাধ্য হলেন তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত করতে। কিন্তু তদন্ত শুরু হওয়ার আগের মুহূর্তে তিনি খবর পেয়ে পদত্যাগ করলেন। সরকার তাঁর কিছুই করতে পারলেন না। বরং, দেখা গেল, পদত্যাগের পর ব্যবসা করে তিনি অগাধ ধনসম্পত্তির মালিক হয়েছেন।

সরকারী মৎস্য কর্পোরেশনের আরেকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী, ট্রলার কেনার

বরাদ্দ টাকা থেকে প্রচুর টাকা সরিয়ে পদত্যাগ করেছিলেন। এবং তারপর শুরু করেছিলেন নিজের ব্যবসা। পরবর্তীকালে, এ ভদ্রলোক সিনেমা হল, বস্ত্র কারখানা প্রভৃতির মালিক হয়েছিলেন।

ক-এর মতে, এ ধরনের ঘটনার আঁচ পেলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পদত্যাগ করতে দেওয়া উচিত নয়। শুধু তাই নয়, সরকারের এমন নিয়ম থাকা উচিত যে, অবসর-গ্রহণকারী বা পদত্যাগকারী ব্যক্তি অবসর বা পদত্যাগের পরও কয়েক বছর নিজ নিজ কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী থাকবেন সরকারের কাছে।

৮০. ষাট দশক। ক তখন পশ্চিম পাকিস্তানীদের পরিচালিত একটি প্রভাব-শালী ব্যাংকের সবচেয়ে তরুণতম শাখা [ঢাকার] ম্যানেজার। ব্যাংকটি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ঋণ দিত নিজেদের গোষ্ঠী [অর্থাৎ পরিবার, আত্মীয়স্বজন] বা অন্যান্য অবাঙালীদের। বাঙালীদেব প্রায় ক্ষেত্রে ঋণ দেওয়া হতো না কারণ, বাঙালীদের তারা বিশ্বাস করতো না।

পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা তখন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ছোট ছোট পার্শেলে নানারকম মাল আনত ব্যবসার জন্য। মাল এসে পৌঁছলে ঐ ব্যাংকে টাকা জমা দিয়ে মাল খালাস করে নিতে হতো।

বাঙালী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা এত ক্ষুদ্র ছিলেন যে, অনেক সময় সামান্য টাকার মালও তাঁরা ছাড়িয়ে নিতে পারতেন না। ক ঠিক করলেন, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সহায়তা করতে হবে। নতুন এক প্রকল্প গ্রহণ করে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কোনরকম 'কোলেটারাল' ছাড়াই ঋণ দেওয়া শুরু কবলেন। শর্ত ছিল, প্রতি দিনের বিক্রি থেকে টাকা জমা দিয়ে ঋণ শোধ করতে হবে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা পুরোপুরি এ সুযোগ নিয়েছিল। শুধু তাই নয় ঋণের টাকাও পুরোপুরি শোধ করেছিল।

৮১. ষাট দশকের মাঝামাঝি। কমিশনার হিসাবে ক বিভাগ সফরে বেরিয়ে-ছেন। দুপুর বেলা, এক নদী পেরুচ্ছেন ফেরী দিয়ে। হঠাৎ মনে হলো তাঁর, নদীতে কাউকে তো স্নান করতে দেখছেন না। সাধারণত এই সময় গ্রামের বউ-ঝিরা স্নান করতে আসে নদীতে। খোঁজ নিয়ে জানলেন,' নদীতে স্নান করার ফলে অনেকের চর্মরোগ হচ্ছে। এর কারণ, কিছুদূরে নদীর তীরেই বসানো হয়েছে একটি ট্যানারি। কারখানার মালিক, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আজম খানের ভাই। ক নদী পেরিয়ে দেখা করলেন তাঁর সঙ্গে। বললেন, নদীর দূষণ প্রতিরোধ করার জন্য একমাসের মধ্যে তাঁকে ব্যবস্থা নিতে হবে। ঠিক

একমাস পর ক আবার পরিদর্শন করলেন সেই কারখানা। এবং দেখলেন, মালিক দূষণ প্রতিরোধের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছেন।

৮২. ষাট দশকের মধ্যভাগে, বিভাগীয় কমিশনার হিসেবে ক গেছেন ক্ষুদ্র একটি শিল্প 'সার্ভিস সেণ্টার' পরিদর্শন করতে। প্রতিষ্ঠানটি ছিল সরকারী। দরিদ্র তাঁতীদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করা হয়েছিল। পরিদর্শন-কালে ক দেখলেন, দরিদ্র তাঁতীদেব সাহায্য কবা দূরে থাকুক, বরং কয়েকজন ধনী তাঁতী এবং তাঁতকারখানাব মালিকই বিভিন্ন উপায়ে সাহায্য লাভ করছে এবং প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হচ্ছে তাদেরই স্বার্থে। সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ঘটনাটি জানালেন ক। কর্তৃপক্ষ চিঠির যে উত্তর দিলেন তাব সুবটা ছিল এরকম : কমি-শনার কি এসব ব্যাপারে উৎসাহ কম দেখালে ভালো হয় না ?

৮৩. ষাটের দশকে একবার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল 'টেকনিকাল মন্ত্রণালয়' (যেমন, কৃষি বা সেচ)-এর সচিবেব পদ পূবণ কবা হবে 'টেকনিকাল' লোক দিয়ে। বা ঐসব পরিদপ্তরের (বা কর্পোবেশনেব) কাজে যাদেব অভিজ্ঞতা আছে দীর্ঘ দিনের তাদের বিবেচনা কবা হবে। সি এস পি অফিসাররা প্রস্তাবটি পছন্দ করেন নি। কৃষি বিভাগের দুটি পরিদপ্তরের প্রধান ছিলেন দু'জন— ক এবং খ।

মন্ত্রণালয়ের সচিব, একজন সি এস পি, একদিন ক-কে ডেকে বললেন, 'সচিবের পদ তো আপনারই পাওয়া উচিত কারণ আপনার পবিদপ্তরের বাজস্ব বেশি। তবে খ-তো আপনার সিনিয়র তাঁরই বোধহয় চান্স বেশি।'

তারপর সচিব ডেকে পাঠালেন খ-কে। বললেন, 'আপনি তো সিনিয়র, সচিব তো আপনারই হওয়া উচিত। কিন্তু ক-এর পবিদপ্তবেব আয় তো বেশি। সুতরাং সেই হয়তো চাইবে সচিব হতে।'

সি এস পি সচিব তারপর দু'জনকেই আলাদা ভাবে পরামর্শ দিলেন, বিষয়টি চীফ সেক্রেটারির সঙ্গে আলোচনা করার জন্য। ক এবং খ দু'জনেই চীফ সেক্রে-টারির সঙ্গে দেখা করে জানালেন, একজন যদি সচিব হয় তা'-হলে অপরজনেব পক্ষে কাজ করা অসম্ভব হয়ে উঠবে।

চীফ সেক্রেটারি নিজেও সি এস পি। এ সুযোগে তাই তিনি কেন্দ্রকে জানালেন, 'টেকনিকাল' লোক দিয়ে প্রাদেশিক সচিবের পদ পূরণ করা অসম্ভব কারণ, এখানে একজন বিভাগীয় প্রধান আরেকজন বিভাগীয় প্রধানকে দেখতে পারে না। এবং এভাবে, প্রাদেশিক সচিবের পদ আর 'টেকনিকাল' লোক দিয়ে পূরণ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

৮৪. স্বাধীনতার আগে, ক নিযুক্ত ছিলেন কৃষি দফতরে। ঐ সময় ইউ এস এইড কৃষি গবেষণার জন্য কিছু অনুদান দিল। অনুদানের শর্ত ছিল ৬৬% টাকা খরচ করতে হবে পূর্ব পাকিস্তানে এবং তা খরচ করতে হবে একটি কৃষি গবেষণা বোর্ডের অধীনে।

ক-এর এক সহকর্মী খ ছিলেন কৃষি বিভাগের উচ্চ পদস্থ কর্তার ভাগ্নে। খ এবিষয়ে একটি পরিকল্পনা তৈরি করলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল, প্রকল্পে একটি বড় পদ তৈরি ক'রে সেখানে নিযুক্তি নেওয়া। ইতিমধ্যে ক নিযুক্ত হলেন কৃষি বিভাগের পরিচালক হিসেবে।

একদিন প্রকল্পের ব্যাপারে বৈঠক ডাকা হলো : ক এবং খ দু'জনই ছিলেন সেখানে। প্রকল্প বিশ্লেষণ করে দেখা গেল বরাদ্দের আশিভাগ অর্থ খরচ হবে কর্মচারীর পিছে। ইউ এস এইড এতে রাজী হলো না বরং তারা ক-কে অনুরোধ জানান নতুন আরেকটি প্রকল্প তৈরির জন্য। রাজী হলেন ক।

কিন্তু মন্ত্রণালয়ের সেই কর্তা আর এ সম্পর্কে কিছু বলেন না। এরই মধ্যে দেশ স্বাধীন হল। ঢাকায় এলেন জাতিসংঘের একজন বিশেষজ্ঞ। তিনি ক-কে বোঝাতে চাইলেন, খ-এর সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী B A R C স্থাপন করা উচিত। রাজী হলেন না ক। কয়েকদিন পর মন্ত্রণালয়ের সেই কর্তা এ ব্যাপারে একটি বৈঠক ডাকলেন। বৈঠকে ক-র মতামত জানতে চাওয়া হল। তিনি তাঁর পূর্বের সিদ্ধান্তই জানালেন, অর্থাৎ গবেষণা খাতে আশি ভাগ ও অন্যান্য খাতে খরচ করতে হবে বিশ ভাগ অর্থ।

কিন্তু B A R C হলো। ক সেই মন্ত্রণালয়ের কর্তার কাছে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষোভ জানিয়ে বলেছিলেন, 'বাংলাদেশ কি এজন্য হল? আর আপনি যদি সেরা বিজ্ঞানীদের দফতরেই বসান তবে মাঠে কাজ করবে কে?'

৯ সংকট ও প্রশাসন

সংকটকালীন অবস্থার সম্মুখীন কিভাবে হতে হবে সে বিষয়ে একজন নবীন সহকর্মীকে প্রস্তুত করার ব্যাপারে একজন সিনিয়র আমলাকে বেশ কঠোর হতে হয়। সংকটময় পরিস্থিতির উদাহরণস্বরূপ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা বন্যার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। একবার একজন ডি সি তার তরুণ সহকারী কমিশনারকে বন্যাকবলিত অঞ্চলে একলা রেখে যান যেখানে সহকারী কমিশনারকে কাটাতে হবে একমাস [নকশা ৮৫]। রাতে তরুণ সহকারী কমিশনার আশ্রয় হিসেবে খুঁজে পান এক

ভাঙা ঘর এবং সেখানে একটি ছাগল ও একটি কুকুরের সঙ্গে রাত্রি যাপন করেন। সকালে, গ্রামের প্রভাবশালীদের খুঁজে বের করে ত্রাণকাজের জন্য তিনি প্রস্তুত হন। তার তখন মনে হয়েছিল ডি সি তাঁর সঙ্গে নির্দয় আচরণ করেছেন। কিন্তু পরে ধাতস্থ হলে তিনি অনুভব করেন একজন তরুণ আমলাকে প্রস্তুত করার জন্য ডি সি ঠিক কাজটিই করেছিলেন।[১৪] আরেকবার এক তরুণ সহকারী কমিশনার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় কমিশনারের কাছে একটি 'মিথ্যা' রিপোর্ট পেশ করেন। কমিশনার তা বুঝতে পেরে তার কঠোর সমালোচনা করেন এবং আবার তাকে পাঠানো হয় দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকায়। এবার সহকারী কমিশনার মোটামুটি সঠিক রিপোর্ট প্রেরণ করেন [নকৃশা ৮৬]। দাঙ্গা নিরসনের ক্ষেত্রে একজন অফিসারকে নিজের অভিজ্ঞতা ও বিচারবুদ্ধি ব্যবহার করতে হতে পারে। এ ক্ষেত্রে তিনি অপ্রচলিত মাধ্যমও কৌশল হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি সরকারী নিয়ম-বিধির অবাধ প্রয়োগের ওপর বেশি আস্থা রাখেন তা'হলে সংকট আরো ঘনীভূত হতে পাবে, দাঙ্গাকারীরা আরো সুযোগ নিতে পারে। দাঙ্গাকারী একজন স্থানীয় রাজনীতিবিদকে যখন শারীরিক ভাবে শাস্তি দেওয়া হয় [নকশা ৮৭] তখন তা সরকারী নিয়ম-বিধি-বহির্ভূত হতে পারে কিন্তু দেখা যায় দাঙ্গা রোধ হয় এবং প্রশাসনও সংকটময় পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পায়। দূরদর্শী রাজনীতিবিদ তিনি, যিনি একজন সৎ অফিসারের অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণ ও বিচারবুদ্ধির ওপর আস্থা রেখে তা ব্যবহার করেন। নকশা ৮৮-তে দেখি, একজন উচ্চপর্যায়ের রাজনীতিবিদ তার উল্টোটা করেন। ফলে, সাম্প্রদায়িক কারণে উপজাতীয়রা পার্শ্ববর্তী দেশে চলে যায়। অধৈর্য ও অজ্ঞতার ফলে সৃষ্টি হয় এক সংকটময় পরিস্থিতির।

সরকারের বিরুদ্ধে যখন গণজাগরণ দেখা দেয় তখন একজন সৎ আমলা উভয় সংকটে পড়েন। এ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তখন যখন সরকার তাকে এক রকম ভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলার নির্দেশ দেন অথচ জনস্বার্থের খাতিরে তিনি অনুভব করেন তার উল্টোটা করা উচিত। এক্ষেত্রে হয়তো তিনি দায়সারা ভাবে কর্তব্য পালন করতে পারেন, যেমন, একটি ছাত্রাবাস[১৫] রেইড করার ভান করা [নকৃশা ৮৯]। আবার এর ফলে তিনি শৃংখলাভঙ্গের দায়েও অভিযুক্ত হতে পারেন। যেমন, [নকৃশা ৯০]-তে দেখি, সরকার সমর্থক গুণ্ডাদের একজনকে অনেক সৎ অফিসার গ্রেফতার করেছিলেন যদিও আই জি, কমিশনার এমনকী গভর্নর তা চাননি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ঐ সৎ কর্মকর্তার কোন ক্ষতি হয়নি।

এ ধরনের পরিস্থিতি বা 'রোল কনফ্লিকট' এর চরম পর্যায় হল তখন যখন একটি দেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের সম্মুখীন হয়। দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী এবং পেশাদার আমলার দায়িত্ব— এ দুয়ের মাঝে তাকে একটি অস্বস্তিকর সমঝোতার পথ খুঁজে নিতে হয়। প্রজাতন্ত্রী দিবসের মতো একটি দিনে তখন তাকে একই সঙ্গে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করতে হয় [নক্শা ৯১], মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য তাকে প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করতে হয় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিরত করতে হয় ব্যাংক[১৬] থেকে সরকারী টাকা লুট করা থেকে [নক্শা ৯২]। উর্দু ভাষায় কথা ব'লে তাকে অবাঙালী আমলাদের থেকে তথ্য জেনে নিয়ে তা পাচার করতে হয় মুক্তি যোদ্ধাদের কাছে [নকশা ৯৩]। স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে দেশপ্রেমিক একজন আমলাকে জাতীয় সম্পদ রক্ষার্থে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী যাতে পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করতে না পারে সে বিষয়ে সচেষ্ট থাকতে হয়।[১৭] এ ক্ষেত্রে হয়তো তিনি সফল হতে পারেন মুক্তিযোদ্ধাদের দুর্ধর্ষ চিত্র তুলে ধ'রে বা পাকিস্তানী বাহিনীর সাফল্যের মিথ্যা চিত্র তুলে ধ'রে, যে ক্ষেত্রে পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ না করে জাতীয় সম্পদ রক্ষা করা অনিবার্য হয়ে ওঠে [নকশা ৯৪]। অন্তিমে, একজন আমলা পাকিস্তানী ফায়ারিং স্কোয়াড থেকে রক্ষা পেতে পারেন শুধু এ কারণে নয় যে তিনি সরকারী নিয়ম মেনে চলেছিলেন [যেমন, সরকারী অর্থ রক্ষা করেছিলেন লুট হয়ে যাওয়া থেকে এবং আমলা হিসেবে কাগজপত্রে সে প্রমাণও রেখেছিলেন) বরং নিয়তিও তখন একটি ফ্যাকটর হয়ে ওঠে। যেমন, সামরিক ছাউনিতে জিজ্ঞাসাবাদের সময় দেখা যায় জিজ্ঞাসাবাদকারী অফিসার তার একজন পুরনো বন্ধু [নকশা ৯২]।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় একজন যোগ্য আমলা মহিমাসঞ্চারী অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে পারেন।[১৮] এক স্পীডবোট ড্রাইভার তার প্রাক্তন এস ডি ও-র দেখা পায় ভারতে যেখানে তিনি যুক্ত ছিলেন অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে। ড্রাইভারটি তার প্রাক্তন কর্তাকে তার সংকটের কথা জানায় এবং আকুল হয়ে এর সমাধান করে দিতে বলে। সংকটটি হল, ড্রাইভারটি ছিল হিন্দু, পাকিস্তানীরা তাকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করেছিল। এখন সমাজে ফিরে যেতে হলে তাকে আবার হিন্দু হতে হবে। এস ডি ও সে বন্দোবস্ত করে দেন [নকশা ৯৫]। একজন আমলা যিনি সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেন স্বাধীনতা যুদ্ধে,[১৯] তিনি নিজেই উৎসাহ পান গরিব গ্রামবাসীদের থেকে যারা বিনাবাক্যব্যয়ে খাবার সরবরাহ করে মুক্তিযোদ্ধাদের [নক্শা ৯২]।

নকশা

৮৫. সত্তরের ভয়াবহ বন্যার সময় ক ছিলেন একটি জেলার সহকারী কমিশনার। বন্যার সময়, একদিন ডি সি তাঁকে নিয়ে লঞ্চে উঠলেন, বললেন, রিলিফে যেতে হবে। লঞ্চ চলছে। চতুর্দিকে অথৈ পানি। বৃষ্টি। সন্ধ্যায় জলমগ্ন একটি থানায় ক-কে ডি সি নামিয়ে দিয়ে বললেন, 'এ অঞ্চলের ভার তোমাকে নিতে হবে। যদি কোন জরুরী সিদ্ধান্ত নিতে হয় তা' হলে যেন তা সঙ্গে সঙ্গে নিতে পার সে কারণে তোমাকে রেখে যাচ্ছি এখানে।' লঞ্চ চলে গেল।

আজীবন শহরবাসী ক-এর জন্য ছিল এ এক সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা। কোথায় থাকবেন, কী খাবেন কিছুই জানেন না। প্রায় জনশূন্য, জলমগ্ন এলাকায় সন্ধের দিকে খুঁজে পেলেন একটা চালাঘর। অভুক্ত অবস্থায় শুয়ে পড়লেন সেখানে। রাতে, একপাশে ছিল একটা কুকুর, অন্য পাশে একটা ছাগল।

পরদিন থেকে অবশ্য তিনি নিজে বন্দোবস্ত করে কাজ গুছিয়ে নিয়েছিলেন। একমাস ছিলেন তিনি সেখানে। দেখেছেন গ্রামের ক্ষমতাশালী বিত্তবান ও টাউটরা কিভাবে রিলিফ নিয়ে যাচ্ছে। ছিন্নমূলরা অসহায়। অনেক সময় তিনি এর প্রতিকার করতে পেরেছেন, অনেক সময় পারেননি, অসহায় বোধ করেছেন। কিন্তু এই একমাসে তিনি অর্জন করেছিলেন বিপুল অভিজ্ঞতা, পরবর্তী কালে যা তাঁকে সাহায্য করেছে প্রশাসন পরিচালনায়।

৮৬. ষাট দশকের মধ্যভাগে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় ক ছিলেন একটি বিভাগের কমিশনার। তাঁর বিভাগে একটি অঞ্চলে দাঙ্গায় খুব বেশি ক্ষতি গ্রস্ত হয়েছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন। ক তাদের জন্য জরুরী ভিত্তিতে কিছু করতে চাইলেন। তরুণ এক সহকারী কমিশনারকে ডেকে তিনি বললেন, তিন-দিনের মধ্যে তদন্ত করে ঐ এলাকার ওপর একটি রিপোর্ট দাখিল করতে। তরুণ কমিশনার একদিনের মধ্যে এলাকা ঘুরে এসে জানালেন দাঙ্গা-বিধ্বস্ত এলাকার লোকজন যা বলছে তার কোন সত্য ভিত্তি নেই। ক এতে ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বললেন, তিনদিনের মধ্যে সঠিকভাবে তদন্ত করে যদি রিপোর্ট না দেয় তবে তাকে চতুর্থদিনই বদলি করা হবে। এবার সহকারী কমিশনার ঠিকঠাকমতো তদন্ত করে এসে সত্য রিপোর্ট দাখিল করলেন যার ভিত্তিতে ক দ্রুত প্রচুর সাহায্য পাঠাতে পারলেন উপদ্রুত এলাকায়।

৮৭. ষাট দশকের মধ্য ভাগ। ক তখন একটি জেলার এস পি। এ সময় ঢাকায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা শুরু হলো। ক তাঁর জেলায় বিভিন্ন ব্যবস্থা নিতে

লাগলেন যাতে উস্কানি দিয়ে কেউ দাঙ্গা লাগাতে না পারে। একদিন, এক প্রত্যন্ত গ্রামে গেছেন তিনি পরিদর্শনে। শুনলেন স্থানীয় চেয়ারম্যানের উস্কানিতে এক হিন্দুর খড়ের গোলায় আগুন লাগানো হয়েছে। তাঁর মনে হল, এর কোন দৃষ্টান্ত-মূলক শাস্তি না দিলে, দাঙ্গাবাজরা প্রশ্রয় পেয়ে যাবে। তাই, স্থানীয় লোকদের তিনি শক্ত দেখে একগাছা দড়ি আনতে বললেন। তারপর সেই দড়ি দিয়ে চেয়ারম্যানকে বেঁধে গাছে ঝুলিয়ে একবার উচুঁতে ওঠাতে আরেকবার নীচুতে নামাতে লাগলেন। চেয়ারম্যান জীবনে কখনও সম্মুখীন হয়নি এ ধরনের পরিস্থিতিতে। তার ওপর স্থানীয় লোকজনের সামনে এরকম অপমান। তবুও, এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ক্ষমা চাইলেন তিনি। ক তখন তাকে আরেকবার সাবধান করে ছেড়ে দিলেন।

৮৮. সাট দশকের মধ্যভাগে দাঙ্গার সময়, ময়মনসিংহের গারোরা পালিয়ে যাচ্ছিলেন ভারতে। গভর্নর মোনেম খান চেয়েছিলেন এটা রোধ করতে। ময়মন-সিংহেব একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার ক-কে মোনেম খান নির্দেশ দিলেন এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে। কিন্তু, গারোদেব সঙ্গে কথা বলাই ছিল মুশকিল : পুলিশ দেখলেই তাঁরা ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতেন।

ক একদিন সাধারণ পোশাক পরে গেলেন গারোদের একটি গ্রামে। নিজেকে পরিচয় দিলেন ত্রাণ-বিষয়ক সার্কেল অফিসার হিসেবে। এবার গারোরা কথা বললেন। ক জানলেন, আসাম থেকে আগত বাঙালী বাস্তুত্যাগীরা আরো জটিল-তার সৃষ্টি করছেন। তারা প্রায় ক্ষেত্রে গারোদের জমিজমা কেড়ে নিচ্ছে। স্বল্প বসনা গারো রমণীদের দিকে তারা সবসময় কামনার চোখে তাকিয়ে থাকে। স্থানীয় ইউনিয়নের সদস্য ও চেয়ারম্যান— এসব স্থানীয় লোকদের সঙ্গে গারোদের কোন যোগাযোগ নেই। ঐ এলাকায় সরকারী কর্মচারীদের মধ্যেও কোন গারো নেই। ক বুঝলেন, গারোদের পলায়ন রোধ করতে হলে, তাদের মাঝে বিশ্বাস জাগাতে হবে। এবং এর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে [ইংরেজরা যা করেছিল] গারো এলাকার সরকারী কর্মচারীদের, গারোদের মধ্যে থেকে নিতে হবে। অর্থাৎ পুরো সমস্যাটা নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা উচিত। না হলে সমস্ত সরকারী ব্যবস্থাই ব্যর্থ হবে।

গভর্নরকে এ কথা জানাতেই তিনি ক-কে বললেন, এ সব নৃতাত্ত্বিক কচকচি তাঁর সামনে না আওড়াতে। ক এই এলাকায় আছেন মাত্র কয়েকমাস আর গভর্নর আছেন প্রায় ষাট বছর! তিনি জানেন না কোন্‌টা নৃতাত্ত্বিক আর কোনটা প্রশাসনিক সমস্যা।

৮৯. ১৯৬৯ সালেব গণআন্দোলনের সময় ক ছিলেন উচ্চপদস্থ একজন পুলিশ কর্মচারী। আন্দোলন চলাকালীন সেনাবাহিনী থেকে নির্দেশ দেওয়া হলো ঢাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলে [বর্তমানে জহুরুল হক হল] তল্লাশী করার জন্য শুধু তাই নয়, নির্দেশে আরো বলা হলো তল্লাশীর সময় ক-কেও থাকতে হবে উত্তরে তিনি জানালেন, তাঁর পক্ষে ঐ হল রেইড করা সম্ভব নয় কারণ তিনি ঐ হলের ছাত্র ছিলেন। তা'ছাড়া, একটি হলে তল্লাশী চালানো তাঁর মতো পদস্থ কর্মচারীর কাজও নয়।

কিন্তু হল তল্লাশী করা হল। এবং সেখানে শুধু ক নয়, স্বয়ং আই জি কেও থাকতে হল। ক হলেব বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলেন। অধস্তন অফিসারদের বললেন, 'ভাব দেখাও যে খুব বেইড কবছ।' নামমাত্র তল্লাশী করা হল। এবং কিছুই [অস্ত্রশস্ত্র] পাওয়া গেল না সেখানে।

৯০. ১৯৬৯ সালের গণ আন্দোলন শুরু হয়েছে। শাসনভার গ্রহণ কবেছেন ইয়াহিয়া খান। প্রত্যেক জেলায় ধবপাকড শুরু হয়েছে। ক তখন একটি জেলার এস পি। ধরপাকড়ের আগে সবসময় তিনি ডি সি-ব সঙ্গে আলাপ কবে নিতেন। একবার তিনি গ্রেফতাব কবেছিলেন সবকারী দলেব কিছু গুণ্ডাকে। সীজ কবে-ছিলেন গভর্নরের এক নিকট আত্মীয়ের বন্দুক।

এসব ঘটনা ঘটার পব, আই জি বিভাগীয় কমিশনাবকে নিয়ে হাজিব হলেন সেই জেলায়। ডি সি এস পি-কে ডেকে বললেন, 'আপনারা কবছেন কী? সরকাব সমর্থকদের গ্রেফতার করছেন, বন্দুক সীজ করছেন।' ক বললেন, 'আমবা আইন-মতো কাজ করছি।' আই জি বললেন, 'আমাব অনুমতি নাওনি কেন?' ক বললেন, 'স্যার, আইনত প্রয়োজন হয়নি।'

আই জি ফিরে গেলেন। এরপর গভর্নবের ফোন পেলেন এস পি। বললেন তিনি, 'কি, আওয়ামী লীগ আপনাকে প্রমোশন দেবে বলে কথা দিয়েছে নাকি?' কিন্তু, এ ধরনের কথা বলার পরও, গভর্নর গ্রেফতারকৃতদের ব্যাপারে কোন কথা বলেননি বা এস পি, ডি সি-র বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক কোন ব্যবস্থা নেননি।

৯১. ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ। পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবস। ক তখন একটি জেলার ডি সি। ছাত্ররা এসে তাঁকে বলল, 'আজ বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করতে হবে।' ক তখনও পাকিস্তান সরকারের কর্মচারী। ডি সি হিসেবে পড়লেন তিনি উভয় সংকটে। কারণ, তাঁর টান আন্দোলনকারীদের দিকে। এদিকে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন না করলে ছাত্ররা তাঁকে চিহ্নিত করবে

বিশ্বাসঘাতক হিসেবে। অনেকে ভেবে চিন্তে, দুটি পতাকাই তিনি উত্তোলন করলেন। অন্যদিকে, ওই দিন তাঁর পাশের জেলার ডি সি শুধু বাংলাদেশের পতাকাই উত্তোলন করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে ক-এর মন্তব্য, 'ঐ প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে আমি আজ বেঁচে আছি আর সে হয়েছে শহীদ।' [২৬ মার্চ বাংলাদেশের পতাকা-উত্তোলনকারী জেলা প্রশাসক শামসুল আলম-কে সেনাবাহিনী নিয়ে গিয়েছিল গ্রেফতার করে এবং খুব সম্ভব ৩০ মার্চের মধ্যে তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল।]

৯২. ১৯৭১ সালের মতো সংকটময় অবস্থায় বাঙালী সিভিল সার্ভেণ্টদের আর পড়তে হয়নি। মুক্তি বাহিনী ও পাঞ্জাবী শাসক— দু'পক্ষকেই সন্তুষ্ট রেখে তাঁকে কাজ করতে হতো। সেই সংকটময় দিনগুলির বর্ণনা দিয়েছেন বর্তমানে একজন পদস্থ সরকারী কর্মচারী, ঐ সময় যিনি ছিলেন একটি জেলার ডি সি। তাঁর ভাষায়— '১৯৭১ সালে, আমি এমন একটি এলাকায় ছিলাম যেটাকে বলা চলে প্রত্যন্ত অঞ্চল এবং প্রায় একমাস সেটা ছিল মুক্ত এলাকা, ডি সি ছিলেন যার 'গভর্নর'। পাকিস্তান সেনাবাহিনী আমার এলাকায় পৌঁছেছিল এপ্রিল মাসে। আমার ভেতরে যে বাঙালী সে বারবার আমাকে প্ররোচিত কবত সব কিছু নিয়ে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে আর আমাব ভেতরকার আমলা বলত সাবধানে কাজ করতে।

ঐ সময় মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিংয়ের একটি বন্দোবস্ত করেছিলাম আমি। তাঁদের খাদ্য সরবরাহের দায়িত্ব ছিল আমার। ইচ্ছে করলে, সরকারী গুদাম খুলে চাল সববরাহের জন্য বন্দোবস্ত করতে পারতাম। কিন্তু ঐ সময়ও সরকারী নিয়ম-কানুন আমি ভঙ্গ করলাম না। বরং রেশন দোকানের মালিকদের ডেকে বলে দিলাম, দোকান থেকে যেন তারা চাল সরবরাহটা ঠিক রাখে। আর শাক-সবজী ইত্যাদি গ্রামবাসীরাই ঝাঁকা ভরে দিয়ে যেতেন। তাঁর এ কার্যকলাপে এলাকা-বাসী সম্পূর্ণভাবে তাঁর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন।

অনেক জেলায়, সে সময় ব্যাংকে সরকারের কোটি কোটি টাকা ছিল। অনেক ক্ষেত্রে লুট করা হয়েছিল সে টাকা। কিন্তু, আমার জেলায় তা হতে দিলাম না। অনেকে চাপ দিচ্ছিলেন টাকাটা স্থানীয় মুক্তি বাহিনীর হাতে তুলে দিতে। আমি তা' না করে ব্যাঙ্ক থেকে গোপনে টাকাটা তুলে, লোহার সিন্দুকে ভরে ট্রেজারীতে রেখে দিলাম। সরকারী কাগজপত্র ঠিক রইল এ ব্যাপারে। আর কথাটাও পাঁচ-ছ'জনের বেশি কেউ জানল না। টাকার ব্যাপারে সতর্ক থাকার কারণ, যাতে ভবিষ্যতে কেউ বলতে না পরে আমি সরকারী টাকার অপব্যবহার করেছি [এ অভিযোগ দু'পক্ষই করতে পারত]।

এর আগে, মার্চের গোড়াতে শেখ মুজিবর রহমান সরকারী কর্মচারীদের অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। আমি তখন অফিস খোলা রেখেছি কিন্তু সরকারী কর আদায় করতে 'ভুলে' গেছি। তবে ১৯৭০-এর ঘূর্ণিঝড়-বিধ্বস্ত এলাকায় ত্রাণকার্য অব্যাহত রেখেছি।

যা'হোক, মুক্ত এলাকা শাসন করার সুযোগ বেশিদিন রইল না। ১৯৭১ সালের ২৬ এপ্রিল, পাকিস্তানী সেনাবাহিনী প্রবেশ করল আমার এলাকায় এবং আমাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যাওয়া হলো ক্যান্টনমেন্টে। একজন কর্নেল আমার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি পড়ে শোনালেন— আমি সরকারী অর্থ ও খাদ্য দিয়ে মুক্তি বাহিনী-কে সাহায্য করেছি, শেখ মুজিবের ডাকে অফিস বন্ধ রেখে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছি ইত্যাদি। আমি সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করলাম এবং তারাও তাদের অভিযোগের ভিত্তিতে কোন কাগজপত্রও দাখিল করতে পারল না। বরং আমার পক্ষের কাগজপত্র ঠিক ছিল। সুতরাং ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে আমাকে দাঁড়াতে হল না।

তবে যদি বলি, আমলা হিসেবে আমার সতর্কতাই আমাকে বাঁচিয়েছে তা'হলে ভুল হবে। এ সতর্কতা আমার হাতকে শক্তিশালী করেছিল মাত্র। অন্যান্য আরো কিছু কারণ আছে যা আমাকে রক্ষা করেছিল। প্রথমত : তারা একটি মূল্যবান চিঠি পায়নি। চিঠিতে আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম সরকারী অস্ত্রখানা থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অস্ত্র দিতে। চিঠিটি ছিল জনৈক পুলিশ সাব ইনসপেক্টরের কাছে এবং তিনি ওই সময় যোগ দিয়েছিলেন মুক্তি বাহিনীতে। দ্বিতীয়ত : যে কর্নেল আমায় জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন তিনি পাঞ্জাবী ছিলেন না, ছিলেন উত্তর প্রদেশবাসী, অমায়িক। তৃতীয়ত : ক্যান্টনমেন্টের অনেক অফিসার আমাকে চিনতো কারণ, মার্চ মাসের আগে, ক্লাবে আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হতো, সম্পর্কও তাঁদের সঙ্গে আমার ছিল ভালো।'

৯৩. ১৯৭১-এর শেষ দিকে ক-কে এমন এক জেলার ডি সি হিসেবে বদলি করা হলো যে জেলার ডি সি দু'হাত বাড়িয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছিলেন। পাকিস্তানী বাহিনী তাঁর ওপর এতই ক্ষিপ্ত হয়েছিল যে বিমান থেকে বোমাবর্ষণ করে ডি সি-র বাড়ি উড়িয়ে দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, ঐ এলাকায় বাস করতেন প্রচুর সংখ্যক বিহারী।

ক জেলার দায়িত্ব বুঝে নিলেন। মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করতে চান। কিন্তু কিছুতেই তা সম্ভব হচ্ছে না। একদিন আকস্মিক এক ঘটনায় যোগাযোগ হলো।

ডি সি-র বাড়ি যেহেতু ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, সেহেতু ক অন্য এক বাড়িতে থাকতেন। একজন মিস্ত্রী নিযুক্ত করা হয়েছিল আসবাবপত্র তৈরির জন্য। একদিন সেই মিস্ত্রী ক-এর কাছে অগ্রিম কিছু টাকা চাইলেন। ক অগ্রিমের প্রয়োজন জানতে চাইলে, অনিচ্ছুক ভঙ্গীতে তিনি জানালেন, কয়েকজনকে সাহায্য দিতে হবে। ক বুঝলেন যে, মিস্ত্রী মুক্তিবাহিনীর জন্যই টাকা চাচ্ছে। তারপর মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারটা সহজ হয়ে গেল। অন্যদিকে, পাকিস্তানী অফিসারদের আস্থাভাজন হওয়ার জন্য তিনি সবসময় উর্দু'তে কথা বলতেন। তাদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে গোপন কথাবার্তা শুনলে. সঙ্গে সঙ্গে তা মুক্তিযোদ্ধাদের জানিয়ে দিতেন।

৯৪. ১৯৭১ সালের ১১ ডিসেম্বর। সীমান্তবর্তী একটি জেলার ডি সি ছিলেন ক। ওই দিন, পাকিস্তানী বাহিনীর দু'জন মেজর এসে তাঁর কাছে শহরের একটি মানচিত্র চাইল্। তারা বুঝতে পারছিল ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে তাদের পরাজয় আসন্ন। তাই 'ডিনায়াল প্ল্যান' (Denial Plan) কার্যকর করার জন্য মানচিত্র দরকার। ক ভাবছিলেন, কিভাবে এই পরিকল্পনায় বাধা দেওয়া যায়। কারণ, বাংলাদেশ স্বাধীন হবে কয়েকদিনের মধ্যে। এর আগে যদি এরা সব ধ্বংস করে দিয়ে যায় তা'হলে বাঙালীর সম্পদেই টান পড়বে। মেজর দু'জন, ক এবং স্টেট ব্যাঙ্কের স্থানীয় শাখার ম্যানেজারকে নিয়ে প্রথমে গেল ব্যাঙ্কে। ইচ্ছা, অলংকার, সোনা গলিয়ে ফেলা, টাকা-পয়সা ভস্মীভূত করে দেওয়া। কিন্তু ভল্টের চাবি ম্যানেজারের কাছে নেই। চাবি আছে ক্যাশিয়ার এবং ট্রেজারারের কাছে।

পরদিন, ব্যাঙ্কের একজন গার্ড [জামাত সমর্থক] জানালেন তাদের, ক্যাশিয়ার ও ট্রেজারারের বাসা সে চেনে। ঐ দুই ভদ্রলোক ফিরে এসে জানাল, তারা দু'জন চলে গেছেন গ্রামে। মেজর দু'জন সে গ্রামে যেতে চাইলেন। ক বললেন, সেখানে যাওয়া বিপদজনক। কারণ, মুক্তিযোদ্ধাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পূর্ণ রাস্তায় মাইন পুঁতে রাখা হয়েছে। মেজর দু'জন তখন বলল, ব্যাঙ্কে এমনি যে টাকা আছে সেগুলি তারা পুড়িয়ে ফেলতে পারে রাতে। ক বললেন, ঐ আগুন ভারতীয় বোমারুদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে। তবে হ্যাঁ, ডিনামাইট দিয়ে স্ট্রংরুম উড়িয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু তারা জানাল, ডিনামাইট স্টিক আর তাদের স্টকে নেই। ক তখন সম্পদ হানির বিরুদ্ধে তাদের একটি জোরালো ও সেন্টিমেন্টাল বক্তৃতা দিলেন। ঐ বক্তৃতার মর্মার্থ ছিল, পাকিস্তান যুদ্ধে জিততে পারে, এবং জেতার পর সম্পদ প্রয়োজন। যেহেতু মেজর দু'জন অসহায় হয়ে

পড়েছিল তাই তারা ক-এর প্রস্তাবই মেনে নিল। অর্থাৎ 'ডিনাইল প্ল্যান' কার্যকর না করে ফিরে গেল।

৯৫. ১৯৭১ সালের জুলাই মাস। ক কলকাতায় আশ্রয় নিয়েছেন। এর কিছুদিন আগেও তিনি ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের একটি সীমান্তবর্তী মহকুমার এস ডি ও। একদিন হঠাৎ দেখলেন, তাঁর খোঁজে এসে হাজির হয়েছে তাঁর স্পীডবোট ড্রাইভার। নাম তার কালাচাঁদ। ক-কে খুঁজে পেয়ে কালাচাঁদের কান্না থামে না। ক জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে? পাকিস্তানীদের হাতে কেউ নিহত বা ধর্ষিত হয়েছে? ঘরবাড়ি ভস্মীভূত হয়েছে? কালাচাঁদ বলল, ও সব-কিছুই হারায়নি আবার সে সবই হারিয়েছে। জানাল কালাচাঁদ, ক-এর স্পীডবোটে করে সে একবার কিছু পাকিস্তানী সৈন্যকে নিয়ে যাচ্ছিল। কালাচাঁদ হিন্দু জেনে তারা তাকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করে মুসলমান করিয়ে দেয়। এখন ধর্ম খুইয়ে কালাচাঁদ বাঁচবে কি করে? এস ডি ও সাহেব তাকে যেন পথ বাৎলে দেন।

এ ধরনের সংকটে ক কখনও পড়েননি। তিনি টেলিফোন ডিরেক্টরী খুঁজে একটি সংস্থার নাম বের করে তার ঠিকানাটা কালাচাঁদকে দিয়ে বললেন, 'তুমি এদের সঙ্গে দেখা করো, ওরা সব ঝামেলা মিটিয়ে দেবে।'

কয়েক ঘণ্টা পর হাসিমুখে ফিরে এল কালাচাঁদ। সেই সংস্থা কিছু আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আবার তাকে হিন্দুতে রূপান্তরিত করে দিয়েছে। দূর হয়েছে কালাচাঁদের মানসিক যন্ত্রণা। কালাচাঁদের হাসিমুখ দেখে ক যে আত্মতৃপ্তি পেলেন তার প্রশাসনিক জীবনে আগে কখনও সেরকম পাননি।

১০ সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক

পাশ্চাত্যের অনেক লেখক, এল ডি সি-তে সামরিক শাসনের গুণাবলীর কথা উচ্ছাসভরে বলে থাকেন। তাদের ধারণা, এল ডি সি-তে সামরিক অফিসাররা অধুনিকায়ণের মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারেন।[২০] এ ধারণা যে ভিত্তিহীন, এবং দৈনন্দিন বাস্তবতার সঙ্গে যে এর কোন মিল নেই, তা প্রমাণিত হবে বর্তমান অনুবিভাগের নকশাগুলি থেকে। পূর্ব পাকিস্তানের সৎ এবং যোগ্য আমলারা সামরিক শাসকদের এতো ধরনের কর্মকাণ্ড দেখেছেন যে, তাদের পক্ষে কোন কিছুতে অবাক হওয়া কষ্টসাধ্য। যদিও কিছু রাজনীতিক ও আমলা সামরিক গভর্নরদের সহায়তা করেছিলেন তা সত্ত্বেও দেখা যায় সামরিক গভর্নদের অবিসৃষ্যকারিতা ও বোধশূন্যতা তাদেরকে পূর্ব পাকিস্তানের সমাজে বিবিক্ত করে তুলেছিল।

১৯৫৮ সালে, সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করে নিজেদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করে তুলেছিল আকাশচুম্বী অহং, বিশৃংখল প্রশাসন সৃষ্টির যোগ্যতা এবং অবিবেচক সিদ্ধান্ত দ্বারা। কিছু কিছু ক্ষেত্রে জনস্বার্থ ক্ষুণ্ণকরণ খানিকটা রক্ষা পেয়েছিল কোন কোন বেসামরিক অফিসারের সাহসী ও সময়োপযোগী পদক্ষেপে। সামরিক কর্তৃপক্ষ একজন উঁচু পর্যায়ের আমলাকে পদচ্যুত করে [নকৃশা ৯৬], যেহেতু তাঁর খ্যাতি ছিল সৎ ও লেখাপড়া জানা লোক হিসেবে এবং সামরিক শাসন যে তাঁর পছন্দসই ছিল না এটা তিনি কোনদিন লুকোবার চেষ্টা করেননি।[২১] স্বাভাবিক ভাবেই সামরিক কর্তৃপক্ষ গোয়েন্দা বাহিনীকে দায়িত্ব দেয় পেশাদার স্কাউণ্ড্রেল রাজনীতি-বিদদের[২২] খুঁজে বের করতে যাদের নিয়োগ করা যাবে মন্ত্রী হিসেবে [নকৃশা ৯৭]। একজন সামরিক শাসক যার প্রবল ইচ্ছা সাধারণের কাছে পৌঁছবার কিন্তু সে ক্ষমতা বা যোগ্যতা নেই এবং যিনি ভীত সবসময় আততায়ীর ষড়যন্ত্রে[২৩] তার অহংকে শান্ত করতে পারেন একজন আমলা [নকৃশা ৯৮]। একজন আমলা বীতশ্রদ্ধ হয়ে ডি সি-র বাসায় উত্তোলিত জাতীয় পতাকা পাঠিয়ে দিতে পারেন সামান্য এক মেজরের বাসায় [নকৃশা ৯৯], আরেকজন হয়তো সাহস করে সরকারী বৈঠকে অসামরিক আমলা ও রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনীর সামান্য অফিসারের অন্যায় অভিযোগপূর্ণ কথার প্রতিবাদ করতে পারেন, কিন্তু এ কারণে তাঁকে সেই অফিসারের হুমকির সম্মুখীন হতে হয় [নকৃশা ১০০]। সামরিক বাহিনীর অফিসার যার সামান্যতম প্রশাসনিক বা আইনবিষয়ক জ্ঞান নেই [সাধারণ জ্ঞানের কথা বাদই দিলাম], বা তিনি যখন সরকারী খরচে টিউবওয়েল বসানো [নকৃশা ১০১] বা দাম্পত্য সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের ক্ষেত্রে [নকৃশা ১০২] সিদ্ধান্ত দেন, তা শুধু তাকেই বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলে। এবং বেসামরিক আমলাকেই তখন এ পরিস্থিতি থেকে সামরিক অফিসারকে রক্ষা করতে হয়। আবার একজন ক্যাপ্টেন, জনৈক এস পি-র এ কথাও মেনে নিতে রাজী নন যে, পরিচ্ছন্নতার মানে এ নয় যে লাল ইটের ইমারতকেও চুনকাম করতে হবে [নকৃশা ১০৩]।

ক্ষমতা-ক্ষুধার্ত একজন সামরিক অফিসার সাধারণ একজন নাগরিকের ওপর অত্যাচার চালানোর সময় একজন বেসামরিক আমলা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে তিনি যদি ভাগ্যবান হন তবে সামরিক অফিসারটি তাঁকে এড়িয়ে চলবে [নকৃশা ১০৪]। আর ভাগ্যবান না হলে, তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা ঘুষের মামলা সাজানো হতে পারে [নকৃশা ১০৫], পুলিশ রেকর্ড বদলানো হতে পারে।[২৪] সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনে জড়িত থাকার অপরাধে একজন উপসচিব একজন

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষককে চাকুরিচ্যুতি থেকে রক্ষায় সচেষ্ট হতে পারেন [নকৃশা ১০৬] কিন্তু অবাঙালী মুখ্য সচিব তাতে বাদ সাধতে পারেন।[২৫] নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সামরিক শাসকরা স্বাভাবিক ভাবেই শত্রু ভাবেন, কারণ বন্দুকের জোরে জননেতাদের সরিয়েই তাঁরা ক্ষমতায় আসেন। এবং তারপর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের যখন বিভিন্ন মামলায় জড়িয়ে শাস্তি দিতে যান তখন এরজন্য যে আইনগত প্রশাসনিক আড়াল দেওয়ার দরকার তা প্রদানেও তাঁরা ব্যর্থ হন [নকৃশা ১০৭ ও ১০৮]।[২৬]

১৯৫০-এর দশকের মতো ১৯৬০-এর দশকেও সামরিক শাসনের কর্মকাণ্ডের ভিত্তি ছিল অহং, মেগালোম্যানিয়া, অযোগ্যতা।[২৭] অন্তিমে, এসব কারণেই ইসলামাবাদকে মূল্য দিতে হয়েছিল পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত ক'রে। জনৈক আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক নির্দেশ দেন তার সঙ্গে যাঁরা দেখা করতে আসবেন তাঁদের গাড়ি রেখে আসতে হবে ফটকের বাইরে। বিভাগীয় কমিশনার এ কথা জানতে পেরে ফটক থেকেই ফিরে আসেন মিটিংয়ে যোগ না দিয়ে এবং এভাবে অক্ষুণ্ন রাখেন নিজের আত্মসম্মান [নকৃশা ১০৯]। সামরিক শাসনের যৌক্তিকতা প্রমাণ করে স্বনামে একটি লেখা লিখতে রাজী না হওয়ায় তথ্যবিভাগে কর্মরত একজন খ্যাতিমান বাঙালী লেখককে পদত্যাগ করতে হয় [নকৃশা ১১০]।[২৮] একজন ছাত্রী [নকৃশা ১১১] ও একজন বৃদ্ধকে [নকৃশা ১১২] সেনা ছাউনির নির্যাতন থেকে রক্ষা করার জন্য ঝুঁকি নেন একজন এস ডি ও।[২৯] অত্যাচারী একটি সামরিক ইউনিট একজন ডি সি সরাতে সক্ষম হন তাঁর অঞ্চল থেকে [নকৃশা ১১৩]। যে এস ডি ও সামরিক বাহিনীর অযথা নির্যাতন থেকে সাধারণ লোককে বাঁচাবার জন্য তৎপর তাঁকে জব্দ করার জন্য বেনামী চিঠির ভিত্তিতে সামরিক কর্তৃপক্ষ তদন্তকারী অফিসার প্রেরণ করে। এস ডি ও বাধা দেন এ বলে যে, সরকারী বিধি অনুযায়ী বেনামী চিঠি ভিত্তি হতে পারে না তদন্তের [নকৃশা ১১৪]। সাহস ও ঝুঁকি নিয়ে তাঁর এ কথা বলার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল নিরপরাধ সংখ্যালঘুদের নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করা। এসব উদাহরণ কিছু কিছু বাঙালী আমলার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি সহানুভূতিই তুলে ধরে। এঁদের কেউ কেউ পশ্চিম পাকিস্তান আরোপকৃত সামরিক শাসনকে এত ঘৃণা করতেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানীদের উৎখাত করতে তাঁরা হাত মিলিয়েছিল বাঙালী সামরিক অফিসারদের সঙ্গে [নকৃশা ১১৫]।[৩০] সফল হয়নি এ পরিকল্পনা। কিন্তু, উল্লেখ্য যে, সামরিক শাসকরা এতই অযোগ্য ছিল যে, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে জোরালো দূরে থাক্

সাধারণ সাক্ষ্য প্রমাণেও তারা ভুল করেছিল [নক্‌শা ১১৬]।[৩১] পরে অবশ্য গণ-আন্দোলন ধুয়েমুছে ভাসিয়ে দিয়েছিল এসব কিছু।[৩২]

১৯৭০ সালে, তেইশ বছরের মধ্যে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ সুস্থ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আওয়ামী লীগ এতে লাভ করেছিল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানকে সরকার গঠন করার অধিকার না দেওয়া প্রমাণ করে পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক শাসকদের যেটুকু বিচারবুদ্ধি ছিল তাও লোপ পেয়েছিল। তারা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সুস্পষ্ট রাজনৈতিক কালচার বুঝতেও ব্যর্থ হয়েছিল। এ কারণে, তারা ভেবেছিল পূর্ব-পাকিস্তানের গণ-আন্দোলন তারা শক্তির সাহায্যে দমাতে পারবে। পশ্চিম পাকিস্তানীদের জেনারেলরা বুঝে উঠতে পারছিল না [নক্‌শা ১১৭] যার সাহায্যে পশ্চিম পাকিস্তানীদের দমানো যায় তার সাহায্যে পূর্ব-পাকিস্তানীদের কেন দমানো যায় না। এমনকি আওয়ামী লীগ-পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনেও[৩৩] বাঙালী আমলারা যোগ দিয়েছিলেন [নক্‌শা ১১৮]। আর অন্যদিকে, এসব সামরিক বাহিনীর অফিসাররা এতই নির্বোধ ছিল যে একজন গুণ্ডার সাহায্যে শেখ মুজিব-কে তারা হত্যার কথা ভেবেছিল [নক্‌শা ১১৯] যাঁর কয়েক দিনের মধ্যে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা।[৩৪] ইউনিফর্ম পরিহিত কাপুরুষদের বিপরীতে শেখ মুজিবের চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে যেখানে পুলিশ প্রহরা তিনি প্রত্যাখ্যান করে-ছিলেন। অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক আমলারা বাঙালী আমলাদের কথায় কর্ণপাত করেনি যার মূল বক্তব্য ছিল এ পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারের একমাত্র উপায় [নক্‌শা ১২০] গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। ক্ষমতার হস্তান্তর আর আকাশের চাঁদ চাওয়া একই মনে হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর কাছে, এবং এভাবেই পাকিস্তানের বিভক্তি তারা করে তুলেছিল অবশ্যম্ভাবী।[৩৫] এল ডি সি-র জন্য পাশ্চাত্যের যেসব পণ্ডিতরা সামরিক শাসনকে ব্যবস্থাপত্র হিসেবে অনুমোদন করেন তাঁরা বোধহয় যুক্তি দেবেন, আধুনিকায়নের জন্য দেশের খণ্ড-বিখণ্ডীকরণ তেমন কোন মূল্য নয়!

ন ক্‌ শা

৯৬. ১৯৫৮ সালের সামরিক আইন জারীর পর চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল পূর্ব পাকিস্তানের আই জি-কে। তিনি ছিলেন, লেখক, সৎ এবং নাস্তিক। সামরিক শাসনও পছন্দ ছিল না তাঁর। সুতরাং সামরিক সরকার এ ধরনের লোককে চাকরিতে না রাখাই মনে করেছিল শ্রেয়। বিশেষত, ঐ

কর্মকর্তা কোনদিন সামরিক শাসন সম্পর্কে তাঁর মনোভাব লুকিয়ে রাখার ভণ্ডামিও করেননি।

৯৭. আইয়ুব খানের শাসনকালের প্রথম দিকে ক যুক্ত ছিলেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দফতরের সঙ্গে। তাঁর কাজ ছিল, ঢাকা থেকে পূর্ব পাকিস্তানের খবরাখবর সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয় দফতরে পাঠানো। একদিন কেন্দ্র থেকে খবর এলো আইয়ুব খান ঠিক করেছেন পূর্ব পাকিস্তান থেকে কিছু মন্ত্রী নিয়োগ করবেন। সুতরাং, গোয়েন্দা দফতর কাদের মন্ত্রী করা যায় খোঁজখবর করে যেন একটি তালিকা পাঠায়।

কাজে নামলেন ক। ঠিক করলেন, প্রতিটি জেলায় তিনি খোঁজ করবেন। যাদের খোঁজ করবেন তাদের বৈশিষ্ট্য হবে ডানপন্থী, মুসলিম লীগার এবং সামরিক শাসনের ভক্ত।

এক সময় পৌঁছলেন তিনি ময়মনসিংহ, সেখানে বেশ ক'বছর আগে এস পি ছিলেন তিনি। বিকেলে, পুরনো কিছু লোকজনের খোঁজখবর করে গেলেন মোনেম খানের বাসায়। ময়মনসিংহে থাকার সময় মোনেম খানের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। মোনেম খানের বাসায় পৌঁছে 'উকিল সাহেব' বলে ডাকতেই বেরিয়ে এলেন মোনেম খান। কুশলাদি বিনিময়ের পর ভেতরে নিয়ে বসালেন। কয়েকজন মক্কেল বসেছিল সেখানে।

মোনেম খান জানতে চাইলেন, ক এখন কোথায়, কী করছেন, ময়মনসিংহে আসার কী কারণ ইত্যাদি। ক ইঙ্গিত দিলেন যে, তিনি সম্ভাব্য মন্ত্রীর খোঁজে বেরিয়েছেন। অবশ্য সব কথা খুলে বললেন না। মোনেম খান তাড়াতাড়ি মক্কেলদের বিদায় করে, আরো খাতির করে ক-কে একেবারে ভেতরের ঘরে নিয়ে বসালেন। এবং একথা-সেকথা বলার পর মোনেম খান জানতে চাইলেন ক তাঁর সম্পর্কে কী ভাবছেন? ক বললেন, এখনও কিছু ভাবেননি, তবে তাঁর কথা মনে ছিল দেখেই তিনি ময়মনসিংহ এসেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তবে, আরো অনেকের খোঁজখবর তাঁকে নিতে হবে। মোনেম খান বললেন, 'সারা-জীবন মুসলিম লীগের কাজ করে এখনও সামান্য উকিলই আছি অথচ আমার সমসাময়িক কতজন উপরে উঠে গেছে, মন্ত্রী হয়েছে।' অর্থাৎ, এখন তাঁর কিছু হওয়া উচিত। যাক, তারপর ক-কে উত্তমরূপে নৈশ আহারে আপ্যায়িত করে তিনি আবারও জানতে চাইলেন ক তাঁর সম্পর্কে কী ভাবছেন। জানালেন, অবশ্যই তিনি উকিল সাহেবকে সবচেয়ে যোগ্য মনে করেন। মোনেম খান

বললেন, 'কিন্তু পুলিশরা তো সত্য কথা বলে না।' তারপর গভীর রাতে পথ-প্রদর্শক দিয়ে মোনেম খান, পুলিশের 'বড় সাহেব'কে সার্কিট হাউসে পাঠিয়ে দিলেন।

ক ঢাকায় ফিরে একটি তালিকা করে তাঁর ওপরওয়ালার কাছে পাঠালেন। তালিকায় মোনেম খান সহ বেশ কয়েকজনের নামের পাশে তারকা চিহ্ন ছিল। ওপরওয়ালা তারকা চিহ্নের অর্থ জিজ্ঞেস করলে ক বললেন, এরা মার্শাল ল' ভক্ত, খাঁটি স্কাউণ্ড্রেল। ওপরওয়ালা একমত হয়ে বললেন যে, তালিকাটি সত্যিই স্কাউণ্ড্রেলদের সমাহার বিশেষ। তারপর সে তালিকা পাঠিয়ে দেওয়া হল কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে।

এক মাস পর, বেতারে হঠাৎ শোনা গেল, নতুন কয়েকজন মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়েছে যার মধ্যে মোনেম খানও একজন। শপথ গ্রহণ যেদিন শেষ হল সেদিন গভীর রাতে ক রাওয়ালপিণ্ডি থেকে একটি ফোন পেলেন। ফোন করেছেন মোনেম খান. ক-কে ধন্যবাদ জানাতে। বললেন তিনি, 'আপনার জন্যই মন্ত্রী হলাম।' ক তাড়াতাড়ি বললেন, 'না স্যার কী যে বলেন, আপনার যোগ্যতার কারণেই আপনি মন্ত্রী হয়েছেন।' সবশেষে মোনেম খান বললেন, 'না, পুলিশও সত্য কথা বলে।'

৯৮. সামরিক শাসন জারীর পর. আইয়ুব খান এসেছেন পূর্ব পাকিস্তান সফরে। জনগণের সঙ্গে তিনি মেলামেশা করবেন! তাই ট্রেনে চড়েই সফর করবেন বলে ঠিক হলো। ক তখন গোয়েন্দা বিভাগে। আইয়ুব খানের ট্রেন সফরে, তাঁর ডিউটি পড়ল।

ঈশ্বরদিতে ট্রেন থেমেছে। আইয়ুব কামরার বাইরে পা রেখেছেন। প্রচণ্ড ভিড়, ধাক্কাধাক্কি। ক আইয়ুবকে একরকম ঠেলে আবার ঢুকিয়ে দিলেন কামরায়। আইয়ুব ঠিক বুঝতে পারছিলেন না কী হয়েছে। ট্রেন ছাড়ার পর ডাকলেন তিনি ক-কে। জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কী? কী হয়েছিল? সঙ্গে গভর্নর ছিলেন, কিন্তু নিশ্চুপ।

ক বললেন, 'আসলে স্যার এখানকার লোক মার্শাল ল' কী জিনিস তা তো জীবনে দেখেনি। তাই মার্শাল ল' কে করেছেন সবাই অবাক হয়ে তাঁকে দেখতে চাইছিল। তা'ছাড়া স্যার, আপনি হচ্ছেন পাকিস্তানের সবচেয়ে হ্যাণ্ডসাম পুরুষ। স্থানীয় প্রশাসনও, স্যার, লোকজনদের বলেছিল আপনাকে দেখতে আসতে। সব মিলে স্যার এত ভিড়, ধাক্কাধাক্কি।'

গভর্নর এ কথায় বেশ চটে গিয়েছিলেন। কিন্তু আইয়ুব খান আর কিছুই বলেননি।

৯৯. ১৯৫৮। এক পাঞ্জাবী মেজরকে নিযুক্ত করা হয়েছে একটি জেলার সামরিক কর্তা হিসেবে। প্রথম দিন এসেই মেজর হুকুম করল, 'ফ্ল্যাগ এখন আমার অফিসের সামনে উড়বে, ডি সি-র অফিসের সামনে নয়। কারণ, এখানকার কর্তা এখন আমি।' ডি সি কোন আপত্তি না করে তাঁর অফিসের সামনে থেকে পতাকা নামিয়ে পাঠিয়ে দিলেন মেজরের কাছে।

১০০. ১৯৫৮ সালের সামরিক আইন জারীর পর পর ক বদলি হলেন এস পি হিসাবে এক জেলায়। ঐ জেলার পূর্ববর্তী এস পি-কে একটি অভিযোগের ভিত্তিতে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ ছিল এস পি-র বাসায় ছিল কয়েক শিশি জবাকুসুম তেল [কলকাতার]। সামরিক শাসন জারীর পর তিনি তা ফেলে দিয়েছিলেন সামনের পুকুরে। কেউ হয়তো ব্যাপারটি দেখে ফেলে জানিয়েছিল স্থানীয় সামরিক কর্তৃপক্ষকে। খবর পেয়ে তাঁরা পুকুর থেকে জবাকুসুমের কয়েকটি শিশি উদ্ধার করেছিলেন, এই ছিল সাবেক এস পি-র অপরাধ।

ক যেদিন নতুন কর্মস্থলে জয়েন করলেন সেদিন গভর্নর এলেন পরিদর্শনে। সঙ্গে এক ব্রিগেডিয়ার। উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের এক বৈঠক ডাকা হল। সেখানে ব্রিগেডিয়ার সবাইকে বললেন, (যা সামরিক শাসনের পর সামরিক বাহিনীর লেফটেনাণ্টও ব'লে থাকে) সরকারী কর্মচারীরা দুর্নীতিবাজ, মন্ত্রীরা অযোগ্য, দুর্নীতিবাজ ইত্যাদি। তারপরে উপদেশ— এখন থেকে দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে ইত্যাদি। ভাষণ শেষে ব্রিগেডিয়ার জিজ্ঞেস করল, কারো কিছু বলার আছে কি না ? ক উঠে বেশ বিনীতভাবে এবং ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বললেন, সব সরকারী কর্মচারীকে কি এভাবে প্রকাশ্যে দোষারোপ করা ঠিক ? ব্রিগেডিয়ার খুব বিরক্ত হয়ে বলল, 'কতদিন চাকরিতে আছ ?' ইত্যাদি। এবং যাবার সময় ক-কে ইঙ্গিত দিয়ে গেল, বাড়াবাড়ি বেশি না করাই ভালো।

১০১. ১৯৫৮ সালে, সামরিক আইন জারীর সময় ক ছিলেন একটি জেলার ডি সি। এক মেজর তখন সেখানে এলেন সামরিক অধিকর্তা হিসেবে। এসেই তিনি একটি অভিযোগ কেন্দ্র খুললেন। যেখানে 'জনগণ' অভিযোগ জানাবেন। এবং তিনি তার প্রতিকারের চেষ্টা করবেন।

এক গ্রামের বৃদ্ধ এক ভদ্রলোক সেই মেজরের কাছে একটি আবেদনপত্র পেশ করলেন। তিনি জানালেন, তাঁর বাড়িতে টিউবওয়েল নেই সুতরাং মেজর সাহেব যদি সেখানে একটি 'টিউকল' বসিয়ে দেন তা'হলে খুব ভালো হয়। মেজর সঙ্গে সঙ্গে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে হুকুম দিলেন যেন সেই বৃদ্ধের বাসায় টিউবওয়েল

বসিয়ে দেওয়া হয়। অভিযোগ কেন্দ্রের কেরানী দরখাস্তসহ মেজরের হুকুমনামা পাঠিয়ে দিল জেলা সদরে পূর্ত বিভাগের প্রকৌশলীর কাছে। প্রকৌশলী সে চিঠি পেয়ে ডি সি-র কাছে এসে জানতে চাইলেন এখন তিনি কী করবেন ? ডি সি জানালেন তিনি ব্যাপারটা দেখবেন।

দু-একদিন পর মেজর তার অফিসে এলে ক তাঁকে সেই দরখাস্ত ও হুকুমনামা দেখিয়ে বললেন, 'এটা কী করেছেন ? এ বিষয় তো দেখবে পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ।' মেজর বলল, 'ঠিক আছে। তা'হলে ওখানেই পাঠিয়ে দিন।' ক বললেন, 'তাতেও হবে না। কারণ, দরখাস্তটা যাবে মহকুমা পানি সরবরাহ কমিটির কাছে, এস ডি ও যার প্রধান।' মেজর বলল, 'তা হলে এস ডি ও-কে পাঠিয়ে দিন।' ক বললেন, 'তাতেও হবে না। ঐ কমিটির কাছে এ দরখাস্ত গেলে তারা সরেজমিনে খোঁজ নেবে। তা' ছাড়া প্রতি মহকুমার জনসংখ্যা ও টিউবওয়েলের একটা অনুপাত আছে। সেটাও দেখতে হবে। তা, ছাড়া আপনি কি খোঁজ নিয়ে দেখেছেন যে ভদ্রলোক 'প্রেস্টিজের' কারণে না অন্য কোন কারণে টিউবওয়েল চাচ্ছেন ?'

মেজর বলল, 'ঠিক আছে। ঠিক আছে। এরপর থেকে এসব ব্যাপার ডি সি-ই দেখবেন।'

১০২. ১৯৫৮। একটি জেলার অধিকর্তা হয়ে এসেছেন একজন মেজর। এসেই তিনি ঘোষণা করলেন, যেহেতু তিনিই এখন জেলার কর্তা সেহেতু সমস্ত অভিযোগ আসবে তাঁর কাছে এবং তিনি সেসবের প্রতিকার করবেন।

এক গ্রামের এক লোক এসে অভিযোগ জানাল, বিয়ে করেছিল সে আট বছর আগে। বউ ছিল শ্বশুরবাড়িতে। এখন সে বউ নিয়ে আসতে চায়। কিন্তু বউ তো আসছেই না বরং শ্বশুরবাড়ি থেকে নানারকম হুমকি দেওয়া হচ্ছে। অভিযোগ শুনে মেজর তখনই ঐ এলাকার ও সি-কে হুকুম দিলেন, 'রেসটোর দ্য উইমেন টু হিম।' ও সি হুকুম পেয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে এলেন এস পি-র কাছে, এস পি গেলেন ডি সি-র কাছে। ডি সি মেজরকে ফোন করে বললেন, এ ধরনের আদেশ দেওয়া ঠিক নয়। কারণ, অভিযোগকারীর স্ত্রী এখন প্রাপ্তবয়স্কা। অভিযোগকারী খুব বেশি হলে স্ত্রী নিয়ে যাওয়ার জন্য আদালতে মামলা করতে পারেন তার বেশি কিছু নয়। আর মেজরের হুকুমে যদি তাকে জোর করে নিয়ে আসা হয় তা'হলে তা হবে 'ক্রিমিনাল অফেন্স', মেজর নিজেও হবেন যার এক 'পার্টি'। ডি সি-র কথা শোনার পর মেজর আগের নির্দেশ বাতিল করে দিয়ে

বলল, এ ধরনের অভিযোগ প্রতিকারের জন্য যেন তাঁর কাছে আর পাঠানো না হয়।

১০৩. ১৯৫৮। জারী করা হয়েছে সামরিক আইন। ক একটি জেলার এস পি। জেলার সামরিক শাসনের দায়িত্ব বর্তেছে এক অবাঙালী ক্যাপটেনের ওপর। জেলা সদরে এসে সে এস পি ও অন্যান্য পদস্থ কর্মচারীদের ডেকে পাঠাল। ক-কে ক্যাপটেন প্রথম যে কথা বলল তা হল— 'ডি সি র বাসায় দেখলাম ফ্ল্যাগ উড়ছে। ওটা নামিয়ে এখন সার্কিট হাউসে ওড়াবার বন্দোবস্ত করুন।' কারণ, ক্যাপটেন অবস্থান করছে সার্কিট হাউসে। ক বললেন, 'ডি সি নেই। তাছাড়া সরকারী নির্দেশ ছাড়া ফ্ল্যাগ নামানো যাবে না।' ডি সি ছিলেন ট্যুরে। ক্যাপটেন বলল, ডি সি-কে খবর পাঠাতে। যা হোক, ডি সি-র বাসার ফ্ল্যাগ আর নামাতে হয়নি।

পরের দিন ক-কে, ক্যাপটেন হুকুম করল, পুলিশ ফোর্সকে তার অধীনে ন্যস্ত করতে। ক কোন জবাব না দিয়ে চলে গেলেন।

এর পরের দিন হুকুম জারী করা হল, সব বাড়ি চুনকাম করতে হবে। একজন এসে ক-কে জানালেন তাঁর বাড়ি লাল ইটের। এটা তিনি চুনকাম করবেন কিভাবে? ক বললেন, চুনকামের অর্থ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা। চলে গেলেন বাড়ির মালিক। কিন্তু কয়েক দিন পর ক্যাপটেন সেই বাড়ির মালিককে ধরে জিজ্ঞেস করল, বাড়ি কেন চুনকাম করা হয়নি। বাড়ির মালিক এস পি-র ব্যাখ্যা জানালেন। ক্যাপটেন তখনই ক-কে ফোন করে বললো, 'আপনি সামরিক আইন ভঙ্গ করেছেন।'

ক সেদিন রাতে বাধ্য হয়ে আই জি-কে ফোন করে সব জানালেন এবং বললেন, সামরিক সদর দফতর থেকে সব-কিছুর ব্যাখ্যা জানাতে। কারণ, পরিস্থিতি এরকম চললে প্রতিক্রিয়া খারাপ হবে।

পরের দিন ক্যাপটেন ক-কে ডেকে বলল, 'আপনি ঢাকায় চুনকামের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করেছেন।' ক বললেন, 'না, ব্যাখ্যা চেয়েছি।'

কয়েকদিন পর ক্যাপটেনকে ঐ জেলা থেকে বদলি করে সেখানে একজন বাঙালী মেজরকে পাঠানো হল।

১০৪. বেশ কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত সচিব পর্যায়ের অফিসার আমাদের জানিয়েছেন, জনপ্রতিনিধি ক্ষমতায় থাকলে যে-কোন বিষয়ে তাঁর সঙ্গে স্বচ্ছন্দে আলাপ করা যায়। মতদ্বৈধ দেখা দিলে অপর পক্ষের যুক্তি তিনি অনুধাবনের চেষ্টা

করেন। সামরিক / বেসামরিক আমলারা ক্ষমতায় এলে একেবারেই তারা তা বোঝে না। সমস্যা অনুধাবনের দৃষ্টিভঙ্গীই নেই তাদের। এ প্রসঙ্গে দুটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—

ক. ১৯৫৮ সালের সামরিক আইনের সময় ক ছিলেন একটি জেলার এস পি। জেলা শাসনের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে একজন মেজরকে। একদিন সন্ধ্যায় মেজর ক-কে ফোন করে জানাল, সে একজন শুল্ক বিভাগীয় অফিসারকে গ্রেফতার করতে চায়। কারণ, অফিসারটি ঘুষখোর। শুল্ক অফিসারটির অফিসের লেজারখাতার মধ্যে নাকি কিছু টাকা পাওয়া গেছে। মেজর জানাল, আগামীকালই অফিসার-টির বিচার হবে এবং ইতিমধ্যে তাকে গ্রেফতারের জন্য লোক পাঠানো হয়েছে। ক যুক্তি দিয়ে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে, লেজারের মধ্যে টাকা পেলেই যে সে ঘুষখোর তা প্রমাণিত হয় না। তা'ছাড়া সব-কিছুর একটি পদ্ধতি আছে। এবং এসব কাজে তড়িঘড়ি না করে পদ্ধতিমত চলা ভালো। উত্তরে মেজর জানাল, এজন্যই সিভিলিয়ানদের দিয়ে কোন কাজ হয় না।

পরদিন আধঘণ্টার মধ্যেই বিচার করে অফিসারটিকে শাস্তি দেওয়া হল— বেত্রদণ্ড ও জেল।

খ. সেই একই সময় ক ছিলেন দুর্নীতিদমন বিভাগের ডিরেক্টর। ব্যুরো প্রধান ছিলেন আবার কর্তৃপক্ষের প্রিয়পাত্র। এ সময়, নৌ-বাহিনীর জনৈক পশ্চিমা লেফটেনাণ্ট, ব্যুরো প্রধানকে এসে জানাল, বরিশালের প্রাক্তন জমিদার পাল-চৌধুরীদের বিরুদ্ধে সে একটি কেস এনেছে। সে শুনেছে, পালচৌধুরীরা নাকি ভারতে টাকা পাচার করে দেয়। ব্যুরো প্রধান ক-কে তদন্তের আদেশ দিয়ে বললেন লেফটেনাণ্টের সঙ্গে বরিশাল যেতে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে লেফটেনাণ্ট বেদম অত্যাচার চালাল পালচৌধুরীর ওপর। ফেরার পথে ক জানালেন অফিসারটিকে, এ ধরনের অমানবিক পদ্ধতি তাঁর পছন্দ নয়। উত্তরে লেফটেনাণ্ট জানাল, 'আপ রহমদিল হ্যায়। এসবকো এ্যায়সে বানানে হোগা।' এবং পরদিন লেফটেনাণ্ট যখন বেরুলো আবার পালচৌধুরীর বাসার দিকে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তখন আর সে ক-কে সঙ্গে নেয়নি।

১০৫. ১৯৫৮। একটি মহকুমার এস ডি ও ছিলেন প্রাদেশিক সার্ভিসের সদস্য, বয়স্ক এবং অত্যন্ত সৎ। ধরা যাক তাঁর নাম ক। মহকুমার সামরিক প্রধান একজন মেজর। মার্শাল-ল'র সময় সেনাবাহিনীর অফিসাররা যা করে, অর্থাৎ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাড়তি উৎপাত শুরু করল। ক সেটা পছন্দ করতেন না। ফলে দু'জনের

মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ লেগেই ছিল। কিন্তু মেজর কিছুতেই বাগে আনতে পারছিল না ক-কে।

মেজরের এক চেলা তখন পরামর্শ দিল, সে একটি তদ্‌বির নিয়ে ক-এর কাছে যাবে। এবং একসময় কিছু টাকা ক-কে ঘুষ হিসাবে দিতে চাইবে। নোটগুলিতে সই থাকবে মেজরের। পুলিশকে আগেই জানিয়ে রাখা হবে। পুলিশ অতর্কিতে গিয়ে 'ঘুষ গ্রহণকালে' এস ডি ও-কে গ্রেফতার করবে।

কথামতো সেই লোক, মেজরের সই করা নোট নিয়ে গেল ক-এর কাছে। কিন্তু এরকম সৎ ব্যক্তিকে কিভাবে ঘুষ নেওয়ার জন্য অ্যাপ্রোচ করবে তা বুঝতে পারছিল না। এদিকে অতর্কিতে পুলিশ এসে হাজির। মেজরের সই করা নোট পেল তারা সেই লোকের কাছে। তখনই তাকে গ্রেফতার এবং এফ আই আর করে চালান দিয়ে দিল।

মেজর দেখল ভারি বিপদ। সে একদিন থানায় গিয়ে, এফ আই আর রেজিস্টার তাঁর পছন্দমতো কারেক্ট করল। সে জানত না, এফ আই আর-এর এক কপি ইতিমধ্যে এস ডি ও, ও এস পি-র কাছে চলে গেছে। ক ঘটনাটি জেনে তখুনি জানালেন বিভাগীয় কমিশনারকে। কমিশনার নির্দেশ দিলেন সরকারী দলিল জাল করার জন্য মেজরের বিরুদ্ধে মামলা করতে। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটি তিনি জানালেন চীফ সেক্রেটারিকেও।

পরে চীফ সেক্রেটারি জানালেন কমিশনারকে যে, জি ও সি ওমরাও খানের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে এবং তিনি মেজরকে বদলি করার নির্দেশ দিয়েছেন। সরকারী দলিল জাল করার ব্যাপারে তার শাস্তি এটুকুই হবে এবং কমিশনার যেন এ ব্যাপারে আর কিছু না করেন। কারণ, কমিশনার এ ব্যাপারে হৈচৈ করলে মেজরের হয়তো চাকরি যাবে ঠিকই, কিন্তু কমিশনার ও এস ডি ও-র অবস্থা আরো খারাপ হবে।

১০৬. ১৯৫৮-এর সামরিক শাসনের সময়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষককে বরখাস্ত করা হল সামরিক শাসন-বিরোধী বলে। ক তখন সরকারের ডেপুটি সেক্রেটারি। সরকারী সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট একটি ফাইল রেখে এলেন চীফ সেক্রেটারির টেবিলে—সব ফাইলের ওপর। অবাঙালী চীফ সেক্রেটারি ফাইলটি রেখে দিলেন সব ফাইলের নীচে। ক পরদিন আবার ফাইলটি সবার ওপরে উঠিয়ে রাখলেন। চীফ সেক্রেটারিও ফাইলটি আবার নামিয়ে রাখলেন। এভাবে, এক সপ্তাহ চলার পর, ক হাল ছেড়ে দিলেন। বোঝা গেল, চীফ সেক্রেটারি সামরিক কর্তাদের বিরাগভাজন হতে চান না।

১০৭. আবু হোসেন সরকার যখন পূর্ব-পাকিস্তানের তখন মুখ্যমন্ত্রী তাঁর জামাই ছিলেন একটি মহকুমার এস ডি পি ও। ঐ সময়ই তাঁকে বদলি করে নিযুক্ত করা হয়েছিল প্রাদেশিক সরকারের সহকারী সচিব হিসেবে। সমমর্যাদার চাকরি এবং তাঁর প্রয়োজনীয় যোগ্যতাও ছিল। কাজটি বে-আইনি কিছু ছিল না। কিন্তু মন্ত্রিত্ব হারানোর পর, সামরিক শাসনের সময়, ঘটনাটিকে আবু হোসেন সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত করা হয়।

১০৮. ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারী করা হলে শেখ মুজিবর রহমানকে আটক করা হল। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ— মন্ত্রী থাকাকালীন তিনি পরিচিত একজনকে নির্মাণ কাজের কনট্রাক্ট দিয়েছিলেন অনুকূল শর্তে। আসলে, শেখ মুজিবের আগের আমলের চেয়ে সেই কনট্রাক্টে নতুন কিছুই দেওয়া হয়নি। তবে হ্যাঁ, কনট্রাক্টটি যিনি পেয়েছিলেন তিনি ছিলেন বাঙালী, আগে যাঁরা ব্যবসা পেতেন তাঁরা ছিলেন সব অবাঙালী। বিচারে মুজিব দোষী সাব্যস্ত হলেন। পরবর্তীকালে, হাইকোর্টে আপীল করা হলে এই অভিযোগ টিকল না। কারণ, ব্যবসায়ীর সঙ্গে মুজিবের কোন সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়নি।

১০৯. ষাট দশকের শেষের দিকে। একজন আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক সভা আহ্বান করেছেন তাঁর বাসভবনে। বিভাগীয় সব সামরিক বেসামরিক কর্মকর্তাকে ডাকা হয়েছে। বিভাগীয় কমিশনার যথাসময়ে এসে হাজির হলেন আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসকের ভবনের সামনে। কিন্তু দ্বাররক্ষী ড্রাইভারকে গাড়ি নিয়ে ভেতরে যেতে দিল না। জানাল, হুকুম হয়েছে, গাড়ি ফটকের বাইরে রেখে তারপর হেঁটে ভেতরে যেতে হবে। কমিশনার সভায় না গিয়ে ফিরে গেলেন।

১১০. ষাট দশকের শেষের দিকে ক প্রাদেশিক সরকারের তথ্যমন্ত্রণালয়ে কাজ করতেন। সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে ঐ সময় গণআন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করেছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বারবার অনুরোধ জানাতে লাগল ক-কে যেন তিনি নিজের নামে সরকারের পক্ষ অবলম্বন করে কিছু প্রবন্ধ লেখেন। কারণ, ক-ছিলেন প্রখ্যাত লেখক। ক রাজী হলেন না। শেষ পর্যন্ত মোনেম খান তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে সেই একই নির্দেশ দিলেন। এবং ইঙ্গিত করা হল যে, এ নির্দেশ না মানলে তাঁকে চাকুরিচ্যুত করা হবে। উত্তরে ক বললেন, সরকারী চাকুরি ও তাঁর নিজের লেখা দুটি সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। এবং তারপর ক চাকুরি থেকে পদত্যাগ করলেন।

১১১. সত্তর দশক। ক তখন একটি মহকুমার এস ডি ও। ঐ এলাকায় আবার

নকশালবা ছিল তৎপর। স্থানীয় কলেজে নির্বাচন হবে। নকশালরা ঘোষণা করল, 'এই বুর্জোয়া নির্বাচন তারা হতে দেবে না।' কলেজের প্রিন্সিপাল উদ্বিগ্ন হয়ে জানালেন পুরো ঘটনা ক-কে।

নির্বাচনের দিন ক চলে গেলেন কলেজে। ভোট গ্রহণ শেষ হলে তিনি ফিরে এলেন এবং তখনই কলেজে বোমা বিস্ফোরিত হল। হৈচৈ পড়ে গেল চার-দিকে। জানা গেল, এক মেয়ে চাদরের নীচে বোমা লুকিয়ে নিয়ে এসেছিল কলেজে।

ক্যাণ্টনমেণ্ট থেকে সন্দেহভাজনদের তালিকা প্রেরণ করে তাদের গ্রেফতার করতে বলা হল। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, সন্দেহভাজনরা সবাই পালিয়েছে। তখন জেলা মার্শাল-ল'র দপ্তর থেকে জানানো হল, সন্দেহভাজন ঐ মেয়েটিকে গ্রেফতার করে সদরে পাঠাতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। ক বললেন, মেয়েটিকে ক্যাণ্টনমেণ্টে পাঠানো যাবে না। তখন ক-কেই নির্দেশ দেওয়া হল মেয়েটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য। এদিকে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা হৈচৈ করে অভিযোগ জানাতে লাগল যে, এস ডি ও নকশালদের সমর্থন করছেন।

মেয়েটি ছিল স্থানীয় আওয়ামী লীগ এম পি-র ভাগ্নী। ক সেই এম পি-কে ডেকে বললেম, 'আপনার ভাগ্নীকে বলেছে ক্যাণ্টনমেণ্ট পাঠাতে। মিলিটারিরা জিজ্ঞাসাবাদ করবে।' এম পি ক-কে অনুরোধ জানালেন, মেয়েটিকে যেন তিনিই জিজ্ঞাসাবাদ কবেন। আর আওয়ামী লীগ এ ব্যাপাবে হৈচৈ করবে না।

মেয়েটি দেখা করল ক-এর সঙ্গে। বলল, 'আপনি যা খুশি করুন। আমি আপনার কোন কথার উত্তর দেব না।'

একজন তরুণীর এই স্পিরিট দেখে ক মুগ্ধ হয়ে তাকে ছেড়ে দিলেন এবং সামরিক কর্তৃপক্ষকে জানালেন যে, মেয়েটি নির্দোষ।

১১২. ১৯৭০। ক তখন একটি মহকুমার এস ডি ও। সামরিক কর্তৃপক্ষ হঠাৎ তাঁকে নির্দেশ পাঠাল ঐ অঞ্চলের সত্তর বছরের এক বৃদ্ধকে গ্রেফতার করতে। কারণ, তাদের মতে, ভদ্রলোকের গতিবিধি সন্দেহজনক সুতরাং ভারতীয় গুপ্তচর না হয়ে তিনি পারেন না। গ্রেফতার করা হল সত্তর বছরের বৃদ্ধকে।

সদর থেকে এরপর, সামরিক গোয়েন্দা প্রধান [ঐ অঞ্চলের] জনৈক মেজর চিঠি লিখে জানাল এস ডি ও-কে, যাতে ঐ বৃদ্ধকে জামিন না দেওয়া হয়। এবং তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় সদরে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। মেজরের এ চিঠি লেখার কারণ, তখনও দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতারকৃত

ব্যক্তিকে কোর্টে হাজির করতে হয়। কিন্তু পরদিন এস ডি ও-র আদালত বসলে ক সেই বৃদ্ধকে জামিন দিয়ে দিলেন।

ঘণ্টা-দুয়েক পর, সদর থেকে ফোন এলো সেই মেজরের। মেজর বললেন, জামিন দিতে মানা করেছি তা সত্ত্বেও কেন জামিন দেওয়া হল? ক উত্তর দিলেন.

'এটা আদালতের ব্যাপার সুতরাং আদালতই তা দেখবে।'

'বুঝলাম, কিন্তু দেশ এখন মার্শাল-ল'র অধীন।'

'তা ঠিক। কিন্তু মার্শাল ল' তো কোর্ট বিলুপ্ত করেনি।'

তারপর মেজর ইংরেজী ও পাঞ্জাবী ভাষায় ক-কে গালাগাল দিতে লাগলেন। ক পশ্চিম পাকিস্তানে পাবলিক স্কুলে পড়াশোনা করেছেন। পাঞ্জাবী ভাষা তাঁর কিছুটা জানা। সুতরাং তিনিও পাঞ্জাবী ভাষায় পাল্টা গালাগাল দিলেন।

ফোন রাখার পর, ক ডেকে পাঠালেন তাঁর বয়স্ক সেকেণ্ড অফিসারকে পরামর্শের জন্য। সেকেণ্ড অফিসার বললেন, ঘটনা যখন এতই গড়িয়েছে তখন এখনই ব্যবস্থা নিতে হবে।

ক তখন মেজরের চিঠি ও ফোনের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট জারী করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পুরো ঘটনা বিবৃত করে দেশের সমস্ত সামরিক / বেসামরিক কর্মকর্তার কাছে চিঠির কপি পাঠিয়ে দিলেন। এস ডি পি ও-কে নির্দেশ দিলেন ওয়ারেণ্ট পোস্ট করে দেওয়ার জন্য।

এরপর সবখানে এই চিঠি নিয়ে শোরগোল পড়ে গেল। কয়েকদিন পর জেলার ডি সি ও ঐ অঞ্চলের মাশার্ল-ল' অধিকর্তা এলেন ক-এর মহকুমায়। ডি সি তাঁকে বললেন, ওয়ারেণ্ট প্রত্যাহার করে নিতে। ক বললেন, 'স্যার, আমি এখন মরিয়া ব্যক্তি সুতরাং আমাকে এধরনের অনুরোধ করবেন না। করলে, আদালত অবমাননার দায়ে আপনার নামেও ওয়ারেণ্ট ইস্যু করব।' মার্শাল-ল' অধিকর্তা তখন বলেন, 'আচ্ছা, যা হওয়ার হয়ে গেছে, আমি মাফ চাচ্ছি আমার বিভাগের তরফ থেকে।' ক বললেন, ক্ষমা প্রার্থনা লিখিত ভাবে করতে হবে। সামরিক অধিকর্তা তাই মেনে নিলেন। ক-ও মেজরের বিরুদ্ধে প্রত্যাহার করে নিলেন ওয়ারেণ্ট।

১১৩. সত্তর দশকে ক ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামে, ডি সি হিসেবে। ভারতীয় সীমান্তরক্ষীদের ব্যতিব্যস্ত রাখার জন্য, পাকিস্তানী সেনাবাহিনী সেখানে বিদ্রোহী মিজোদের সহায়তা করত। ক এটা জানতেন কিন্তু সরকারী ভাবে তাকে কিছুই জানানো হয়নি। এদিকে অন্যান্য উপজাতি ও বাঙালীরা এসে তাঁকে

প্রায় পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও মিজোদের অত্যাচারের কথা জানাত। সেনা-বাহিনী মাঝে মাঝে রাঙ্গামাটি শহরে এসেও হামলা করত। একবার পুলিশের এক ও সি-কে তারা প্রহার করে। আরেকবার জিজ্ঞাসাবাদের নামে একজনের ওপর এমন অত্যাচার চালায় যে সে মৃত্যুবরণ করে।

সেনাবাহিনী এমন করলে তার প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে, এ বিষয়ে, একটি নোট ক পাঠালেন প্রাদেশিক সরকারকে। সেখান থেকে তা পাঠানো হল কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। কয়েকদিন পর ক-কে জানানো হল, এটা সরকারী নীতি, সুতরাং এ ব্যাপারে করার কিছু নেই। তবে, অত্যাচারী সেই ইউনিটকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল।

১১৪. সত্তর দশকে সামরিক আইন থাকাকালীন ক ছিলেন একটি মহকুমার এস ডি ও। তাঁর নামে, সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে এক বেনামা চিঠিতে জানানো হল যে, তিনি কমিউনিস্ট ও হিন্দুদের দালাল। 'আমি সহজেই অনুমান করলাম যে,' জানালেন ক, 'সামরিক কর্মকর্তারা আমাকে বিপদে ফেলার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। কারণ আমি সব সময়ই চেষ্টা করি নিরপরাধ জনসাধারণের ওপর অত্যাচার করা থেকে সামরিক বাহিনীকে নিরস্ত করার।' যা হোক, সামরিক কর্তৃপক্ষ তদন্ত করার জন্য পাঠাল একজন সেনা অফিসারকে। ক বললেন তাকে, তদন্ত হবে না, কারণ, আইনের চোখে বেনামী চিঠি অচল। সামরিক অফিসার এ কথার জবাব দিতে না পেরে ফিরে গেল। কর্তৃপক্ষও আর তদন্ত করেনি এ বিষয়ে।

১১৫ ক প্রথম জীবনে ছিলেন শিক্ষক, কিন্তু সে সময় শিক্ষকদের বেতন ছিল স্বল্প। তাই তিনি যোগ দিয়েছিলেন সিভিল সার্ভিসে কিন্তু, আমলা জীবনেও তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেননি। আমলা হয়েও বাঙালী রাজনীতিবিদদের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা ছিল অবাধ। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার তিনি ছিলেন অন্যতম আসামী।

তিনি জানিয়েছেন, ষাটের দশকে, পূর্ব পাকিস্তানে ১২/১৩ ব্যাটালিয়ান সৈন্য ছিল যার মধ্যে বাঙালী ব্যাটালিয়ানের সংখ্যা ছিল ৬ থেকে ৭টি। পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য ও অফিসারদের প্রতি বাঙালী অফিসার ও জওয়ানদের ঘৃণা ছিল তীব্র। কারণ, প্রমোশন ও অন্যান্য সুবিধা পেত তারা বেশি এবং বাঙালীদের প্রতি তাদের ব্যবহারও ছিল শাসকদের মতো। ঐ সময় বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ ক্যান্টন-মেণ্ট ছিল দুটি—কুমিল্লা ও যশোর। ঢাকা ও চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেণ্ট ছিল গুরুত্বহীন। এখানে অস্ত্রাগার ছিল বটে কিন্তু সৈন্য সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম। কয়েকজন বাঙালী

অফিসার একসময় ভেবেছিলেন, হঠাৎ আক্রমণে ঢাকা চট্টগ্রাম সেনানিবাস দখল করে, সাধারণ বাঙালীদের মধ্যে অস্ত্র বিলিয়ে দিয়ে বিদ্রোহ করা হবে যুক্তিসঙ্গত। সেসব বাঙালী অফিসাররা ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের পূর্বে শেখ মুজিবকে এ পরিকল্পনা জানিয়েছিলেন। ক বিষয়টি জেনেছিলেন ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পর। পরবর্তী কালে ক শেখ মুজিবের সঙ্গে [অন্যান্য অভিযুক্ত সহ] এ বিষয় নিয়ে কয়েকবার আলোচনা করেছিলেন। বৈঠকে, অনেকে এ পরিকল্পনার ব্যাপারে আশঙ্কা প্রকাশ করছিল। ক এবং আরো অনেকের সন্দেহ [যাঁরা অভিযুক্ত হয়েছিলেন], বৈঠকে যোগদানকারী একজন [যিনি পরবর্তীকালে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর অতি উচ্চপদে ছিলেন] বৈঠকের বিষয়টি পাকিস্তান কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছিল। ফলে, ১৯৬৭ সালে, অনেককে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছিল।

১১৬. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত একজন সরকারী কর্মচারী জানিয়েছেন সম্পূর্ণ বিষয়টি সামরিক বাহিনী এমনভাবে উপস্থাপিত করেছিল যাতে তাদের অদক্ষতাই ফুটে উঠেছিল। তাঁর ভাষ্য—

'আমি তখন বিদেশে নিযুক্ত। সরকার আমাকে ডেকে পাঠাল ইসলামবাদে। সেখানে পৌঁছবার পর আগরতলা ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমাকে নানাবিধ প্রশ্ন করা হল। এটা সত্য যে, অভিযুক্ত সামরিক অফিসাররা পূর্ব-পশ্চিমের বৈষম্য নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করেছিল। প্রশ্নকর্তাদের শুধু এ কথা জানিয়ে বললাম, এ ধরনের আলোচনা নিশ্চয় ষড়যন্ত্র নয়। কিন্তু, সরকার আমাকে আর বিদেশ যেতে দেয়নি। তারা আমাকে ঢাকা পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিল এবং ঢাকায় পৌঁছনো মাত্র আমাকে গ্রেফতার করা হল।

শেখ মুজিবকে আগরতলা ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলে সামরিক কর্তৃপক্ষ বিষয়টি আরো জটিল করে তুলেছিল। তা ছাড়া আইনকানুন সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে [যেমন, ল অফ এভিডেন্স] তারা অভিযুক্ত কর্মচারীদের শাস্তি দিতে পারেনি যা সাধারণ চাকুরি বিধি অনুযায়ী করা সম্ভব ছিল। শেখ মুজিবকে এই মামলায় না জড়ালে সামরিক কর্তৃপক্ষ হয়তো গণজাগরণ এড়াতে পারত। বরং অস্ত্রসংগ্রহ ও পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য সামরিক বাহিনীর অভিযুক্তদের কোর্ট মার্শাল করলে ব্যাপারটি হয়তো এত জটিল হত না। কারণ, সামরিক বাহিনীর সদস্যদের এ ধরনের আলোচনাও অপরাধ। আর অভিযুক্ত সি এস পি-দের 'ইনসাবর্ডিনেশনের' অভিযোগে বিচার করা তাদের পক্ষে সহজ হত।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় প্রমাণের সংখ্যা ছিল নগণ্য। কিন্তু, সামরিক বাহিনীর বদলে যদি পুলিশ কর্মকর্তারা বিষয়টি তদন্ত করতেন তা'হলে অভিযোগ-নামায় এত ফাঁক থাকত না। দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

একজন রাজসাক্ষী, জবানবন্দী দিতে গিয়ে বললেন, ক-কে তিনি একটি ডজ গাড়ি করে ফেনী থেকে বেলোনিয়া নিয়ে গিয়েছিলেন, যাতে ক সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে যেতে পারেন। রাজসাক্ষী জানালেন, ঘটনাটি ঘটেছিল জুলাই অথবা ভরা বর্ষায়। সবাই জানেন যে, ঐ সময় ড'জ গাড়ি করে ফেনী থেকে বেলোনিয়া যাওয়া অসম্ভব।

তারপর, যেমন আমার ব্যাপারে বলা হল···তারিখে আমি ঢাকায় ষড়যন্ত্র-কারীদের এক বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম। অথচ, ওই তারিখে আমি ছিলাম ইসলামাবাদে, সরকারী কাগজপত্রেই তার প্রমাণ ছিল। আমাদের আইনজ্ঞরা ফলে অতি সহজেই সরকারী অভিযোগসমূহ নস্যাৎ করে দিয়েছিল।'

১১৭. পশ্চিম পাকিস্তানে, সাধারণ মানুষ বা সমাজের কাছে আমলা বা সেনাবাহিনী মর্যাদা পেত, সামন্ততান্ত্রিক ঐতিহ্যের শক্তির কারণে, পূর্ব পাকিস্তানে এ মনোভাব ছিল না, কারণ, এখানকার গণতন্ত্রমনা মানুষ সব সময় আমলা ও সেনাবাহিনীকে দেখত সন্দেহের চোখে। পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত পশ্চিম পাকিস্তানী আমলারা স্বাভাবিকভাবেই এটি পছন্দ করত না। তারা এখানে এসেই ফিরে যেতে চাইত পশ্চিম পাকিস্তানে। ১৯৬৯ সালে, তাই অধিকাংশ পশ্চিম পাকিস্তানী আমলা ত্যাগ করেছিল পূর্ব পাকিস্তান।

ঐ সময়, দু'প্রদেশের বৈষম্য এমন এক বিসদৃশ পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, মোনেম খানের মতো লোকও এক উচ্চপদস্থ বাঙালী আমলাকে বলেছিলেন, 'তারা 'তারবেলা' [বাঁধ] 'তারবেলা' করে কিন্তু আমার বেলা কী হবে ?'

টিক্কা খান ঢাকায় এসে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের এক বৈঠক ডেকেছিলেন। বৈঠকে উচ্চপদস্থ একজন পুলিশ কর্মচারীকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা এখানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারছেন না কেন ?' তিনি বললেন, 'আইন শৃঙ্খলার দুটি দিক আছে— অপরাধ ও রাজনৈতিক। অপরাধ আমরা দমন করেছি।' টিক্কা খান বললেন, 'কেন, লাহোরে তো আমরা রাজনীতিকদের ধরেছি, সেখানে তো কোনো ঝামেলা হয়নি।'

ওই সময়ই, একদিন এক কর্নেল, দুর্নীতিদমন বিভাগের মহাপরিচালকের সঙ্গে দেখা করতে এসে তার চেয়ারেই বসে পড়েছিলেন।

১১৮. ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন চলছে। ক তখন একটি মহকুমার এস ডি ও। কাছেই, সেনানিবাসে থাকতেন তাঁর এক বন্ধু যিনি ছিলেন সেনানিবাসের নির্বাহী অফিসার। একদিন বিকেলে, ক রওয়ানা হলেন সেনানিবাসের দিকে সেই বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। ক-এর জীপে উড়ছে কালো ফ্ল্যাগ।

সেনানিবাসের প্রধান ফটকে তাঁকে বুকে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে আটকাল রক্ষী। তিনি একটুও না ঘাবড়ে বললেন, বন্দুকের নল নামিয়ে আগে স্যালুট দাও এবং তারপর তোমার অফিসার ঐ লেফটেনাণ্টকে ডাকো। রক্ষী একটু থম্‌কে তার অফিসারকে ডেকে আনল। লেফটেনাণ্ট কালো ফ্ল্যাগ দেখে গালিগালাজ শুরু করল। ক জোর গলায় তাকে বললেন, 'সেনাবাহিনীতে তোমরা এই শিক্ষা দাও। জানো না কথা বলার আগে অফিসারকে স্যালুট দিতে হয়।' লেফটেনাণ্ট কালো ফ্ল্যাগ দেখে ক-কে ঢুকতে দিল না ক্যাণ্টনমেণ্টে। ক ফিরে এসে স্থানীয় প্রেস ক্লাবে সব জানালেন। সঙ্গে সঙ্গে ঢাকায় খবর চলে গেল, জাতীয় বেতারে ঐ দিন রাতেই নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দিন আহমেদ এ ঘটনার প্রতিবাদ জানালেন।

১১৯. সত্তর সালে ক ছিলেন পুলিশের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। নির্বাচনে শেখ মুজিব জিতেছেন। সবাই আশা করছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবেন তিনি। এ সময় গোয়েন্দা সূত্রে ক খবর পেলেন শেখ মুজিবকে হত্যার এক গোপন ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। তাঁকে খুন করার ভার দেওয়া হয়েছে মিরপুরের কুখ্যাত আখতার গুণ্ডাকে। ক একথা জেনে নিজের উদ্যোগে শেখ মুজিবের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে চাইলেন। কিন্তু মুজিব এ ব্যাপারে কোন আগ্রহই দেখালেন না। এস পি ডি সি এবং ডি আই জিও শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করে তাঁর নিরাপত্তার প্রসঙ্গ তুললেন। মুজিব জানালেন, জনগণ তাঁকে এত ভালোবাসে যে নিরাপত্তার প্রশ্ন অবান্তর। ঘটনাটি তখন জানানো হল গভর্নর অ্যাডমিরাল আহসানকে। তিনি পুলিশ কর্মকর্তাদের এক বৈঠক ডেকে বিষয়টি আলোচনা করলেন। সব শুনে বললেন, ব্যাপারটির সমাধান তো সোজা। আখতারকে গ্রেফতার করলেই তো সমস্যা চুকে যায়। ক তখন বললেন, ব্যাপারটি সহজ নয়। কারণ উচ্চতর কর্তৃপক্ষ তাকে প্রটেকট করছে [অর্থাৎ সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তারা]। গভর্নর শুধু বললেন, 'বুঝেছি।' এরপর ক দেখা করতে চাইলেন শেখ সাহেবের সঙ্গে। তিনি তাঁকে সময় দিলেন রাত এগারোটার পর। কারণ, তখন দলের লোকজনেরা থাকবে না। ক তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন,

রাত এগারোটার পর। দীর্ঘ আলোচনার পর শেখ মুজিব রাজী হলেন, তাঁর বাসায় সাদা পোশাকে পুলিশ রাখতে।

১২০. ১৯৭০-এ রাওয়ালপিণ্ডিতে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ক। বৈঠকে সভাপতিত্ব করছিলেন ইয়াহিয়া খান। বৈঠকে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে ক-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন, রাজনৈতিক সমাধান না হলে সেখানে আগুন জ্বলবে যা কেউ থামাতে পারবে না। এ কথা, ইয়াহিয়া খান বা বৈঠকের কেউ পছন্দ করেনি।

কিছুদিন পর, ঢাকায় টিক্কা খানের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে ক আবার বলেছিলেন, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা প্রদানই সমস্যার সমাধান। উত্তরে টিক্কা খান বলেছিলেন, 'ইউ আর আসকিং ফর দা মুন।'

তথ্যপঞ্জী :

১. উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত যে সব সময় যৌক্তিক নয় এটি তার প্রমাণ। এর বিপরীত ঘটনার জন্য দেখুন, চৌধুরী কুদরতে গনি'র প্রবন্ধ, স্মৃতিচারণ, পৃ. ৩৪।

২. কেন্দ্রীয় সরকার কিভাবে বঞ্চনা করত পূর্ব পাকিস্তানকে তার একটি উদাহরণ পাওয়া যাবে, আবুল মনসুর আহমেদ, শেরে বাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ. ২৭৭-৯১ ; আরো দেখুন, EPLAP. First Session, 1962, p. 143.

৩. এ ধরনের ঘটনা সত্য বলে উল্লেখ করেছেন আবুল মনসুর আহমদ, 'পঞ্চাশ বছর…' গ্রন্থে, পৃ. ৪৫৩ ; সোহরাওয়ার্দী এই অর্থ নৈতিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গিয়ে নিজের পতন ত্বরান্বিত করেছিলেন। দেখুন, কোচানেকের প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৯৯-২০২।

৪. রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের একাংশের অপপ্রচারের জন্য দেখুন, সাঈদ-উর রহমান, পূর্ব বাংলার রাজনীতি সংস্কৃতি ও কবিতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১৯৮৩, পৃ. ৭৯-৮০ ; এ বিষয়ে সরকারী মনোভাবের জন্য সৈয়দ মুর্তজা আলীর প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ ২৬৫। বাঙালী সৎ বুদ্ধিজীবীদের প্রতি অবাঙালী আমলার মনোভাবের জন্য দেখুন, ঐ, পৃ. ২৭১-৭২।

৫. আতাউর রহমান খান মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় 'সরকারী আইনের দোহাই' দেওয়া থেকে আমলাদের বিরত করার চেষ্টা করে বারবার ব্যর্থ হয়েছেন, তাঁর অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেছেন তাঁর লেখা প্রাগুক্ত গ্রন্থে, পৃ. ১৩৮।

৬. মুসলিম লীগ নেতাদের অগণতান্ত্রিক মনোভাবের ব্যাপারে দেখুন, জহুর, দরকার-ই-জহুর, পৃ. ১০৪-০৭।

৭. একই ধরনের ঘটনার জন্য দেখুন, স্মৃতিচারণ, পৃ. ৩৪।

৮. 'The tradition of using patronage, repression, and intimidation begun during the Parliamentary period to maintain Government majorities and to deal with the opposition became an established practice in the Pakistani Political System.' Kochanek. *op. cit.*, pp. 64-72.

৯. এ ধরনের দুটি ঘটনার জন্য দেখুন, স্মৃতিচারণ গ্রন্থে দুটি প্রবন্ধ। লিখেছেন সিরাজউদ্দিন আহমদ ও একরামুল হক। প্রবন্ধ দুটির নাম, 'সরকারী সংগঠনে সংঘাত ও সংগ্রাম' ও 'জাতীয় উন্নয়নে সিভিল সার্ভিসের ভূমিকা', পৃ. ৪০,১০১।

১০. এ ধরনের ঘটনার উদাহরণের জন্য, ঐ সিরাজউদ্দিনের প্রবন্ধ। কোচানেক তাঁর প্রাগুক্ত গ্রন্থে লিখেছেন, 'পলিটিকাল পার্টিসিপেশন' এবং পার্লামেণ্টারি ইনষ্টিটিউশন-এর অভাবে পাকিস্তানে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যেখানে আমলারা কোন কিছুর জন্য দায়ী ছিলেন না। পৃ. ৩০৭।

১১. এ ধরনের ঘটনার জন্য স্মৃতিচারণ গ্রন্থে কুদরতে গণি'র প্রবন্ধ, পৃ. ৩৫-৩৬।

১২. অজ্ঞতা যখন গর্বের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তখন বিশেষজ্ঞ জেনারিলিস্ট সহযোগিতা হয়ে ওঠে কষ্টসাধ্য। এ ধরনের উদাহরণের জন্য দেখুন, মোহাম্মদ ইসহাক, 'সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাদেশিকতা', ঐ, পৃ. ৭১।

১৩. কিছু স্মৃতি, পৃ. ৭১

১৪. ১৯৬৩ সালে চট্টগ্রামে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় কমিশনার, ডি সি এবং এ ডি সি-র কার্যকলাপের জন্য সিরাজউদ্দিন আহমদের প্রবন্ধ দেখুন। ঐ, পৃ. ৪০-৪১।

১৫. এর বিপরীতে পুলিশী অত্যাচারের অনেক বিবরণ পাওয়া যাবে প্রাদেশিক পরিষদের কার্যবিবরণী, সমসাময়িক সংবাদ সাময়িকপত্র এবং গ্রন্থে। উদাহরণস্বরূপ এ ধরনের একটি ঘটনার জন্য দেখুন, **EPLAP, First Session, 1963, pp. 127-31.**

১৬. মুজিবনগর সরকার বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে কী পরিমাণ টাকা পেয়েছিল তার একটি মোটামুটি হিসাব পাওয়া যাবে শামসুল হুদা চৌধুরীর গ্রন্থে, মুক্তিযুদ্ধে মুজিব নগর, বিজয় প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ২৩৫।

১৭. আবুল মনসুর আহমদ, শেরে বাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু, পৃ. ৮।

১৮. মধ্যবিত্ত মন ও মুক্তিযুদ্ধ— এ সম্পর্কে দেখুন জহুর হোসেন চৌধুরীর মন্তব্য, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২৭-২৮।

১৯. বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা অবসরপ্রাপ্ত লেঃ কর্নেল কাজী নুরুজ্জামানের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে পর্যালোচনার জন্য দেখুন তাঁর গ্রন্থ, মুক্তিযোদ্ধা ও রাজনীতি, জানা প্রকাশনী, ঢাকা।

২০. উদাহরণস্বরূপ বলা যায় অধ্যাপক রাশব্রুক উইলিয়ামসের কথা যিনি ছিলেন মৌলিক গণতন্ত্রের ভক্ত ও ১৯৭১ সালে সমর্থন করেছিলেন পাকিস্তানীদের।

২১. এর বিপরীতে বেশ-কিছু আমলা ছিলেন যাঁরা সামরিক শাসনকে দেখেছেন নিজেদের বিজয় হিসেবে।—পঞ্চাশ বছর, পৃ. ৫৬৯; আতাউর রহমান খান, দুই বছর, পৃ. ২৬৭।

২২. ১৯৬২ সালে আইয়ুব খান কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রীসভায় যে সব বাঙালীকে মন্ত্রী করেছিলেন তাঁরা সবাই পরাজিত হয়েছিলেন ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে। তোফাজ্জল হোসেন, প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৬৮, ১৭২।

২৩. ১৯৬৮ সালের ১০ নভেম্বর পেশোয়ারের এক জনসভায় আইয়ুব খানকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়েছিল। ভাসানী, পৃ. ৬০, ৭৭-৭৮।

২৪. আইয়ুব ও ইয়াহিয়ার আমলে যে সব বাঙালীরা নিগৃহীত হয়েছিলেন তাঁর বিবরণের জন্য দেখুন, আবদুল সোহাইমেনের প্রাগুক্ত গ্রন্থ।

২৫. এ ব্যাপারে একজন শিক্ষক ও প্রবন্ধকারের পর্যালোচনার জন্য, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, নিরাশ্রয়ী গৃহী···, পৃ. ৬২।

২৬. সামরিক শাসনামলে রাজনীতিবিদদের গ্রেফতার ও হেনস্থার বিবরণের জন্য দেখুন—আবুল মনসুর আহমদ, পঞ্চাশ বছর, পৃ. ৫৭৪-৭৭; তোফাজ্জল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-১৮।

২৭. সৈয়দ আবদুস সুলতান, ব্যতিক্রমের এক অধ্যায়, রুণা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮১, পৃ. ১৮৮।

২৮. এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ঢাকা বেতার থেকে গভর্নর মোনেম খানের প্রায় সমস্ত বক্তৃতা প্রচার করতে হত। এসব বক্তৃতায় প্রায় তিনি

সমালোচনা করতেন বাঙালী সংস্কৃতি ও বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের। দেখুন, স্মৃতিচারণ গ্রন্থে আশরাফুজ্জামনের প্রবন্ধ, পৃ. ১৬১।

২৯. সৈয়দ আবদুস সুলতান তাঁর গ্রন্থে নিরীহ জনসাধারণের ওপর সামরিক শাসনামলের নির্যাতনের বহু ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন।

৩০. অভিযুক্তদের অভিহিত করা হত ভারতীয় এজেন্ট হিসেবে যারা পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্টে তৎপর। দেশ বিভাগের পর মওলানা ভাসানী ভারত থেকে পূর্ববঙ্গে ফিরে এলে মুসলিম লীগ নেতারা তাঁকেও একই ভাবে অভিযুক্ত করেছিল। জহুর হোসেন চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০।

৩১. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে কিছু মন্তব্যের [পর্যালোচনা] জন্য দেখুন, পঞ্চাশ বছর, পৃ. ৬১৫-১৬।

৩২. ক্রুদ্ধ জনতা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ট্রাইবুনালের বিচারপতির বাসায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। বিচারপতি পালিয়ে যেতে পেরেছিলেন। ভাসানী, পৃ. ২৮৫।

৩৩. এ প্রসঙ্গে জয়প্রকাশ নারায়ণের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, ১৯৭১ সালে মুজিবের অসহযোগ আন্দোলনের সাফল্য হয়তো গান্ধীও কখনও কল্পনা করতে পারেননি। কামরুদ্দিন আহমদ, স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং অতঃপর, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ১১৪।

৩৪. রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানী কমাণ্ডাররা মুজিবের বাড়ি আক্রমণ ক'রে তাঁকে অপহরণ করতে পারে— এ সম্ভাবনা জানিয়ে একজন বাঙালী ব্রিগেডিয়ার গোপন খবর পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন। কামরুদ্দিন আহমদ, ঐ, পৃ. ১১৬।

৩৫. 'The Government has employed three basic strategies in dealing with politicians and Political Groups : control, coercion and harassment... Parties unable to develop within the system have therefore tended to organise against the system and have contributed to the lack of stability and legitimacy of Pakistan regimes.' See, Kochanek, *op. cit.* pp. 67-68.

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশ : পালামেণ্টারি শাসন

১১ সাধারণ প্রশাসন

সামরিক শাসকদের অবিবেচনা আহত করে আমলাদের [দ্রষ্টব্য : পূর্ববর্তী অধ্যায়]। এ পরিপ্রেক্ষিতে, ১৯৭১-৭২ সালে, স্বাধীন বাংলাদেশে যেসব জন-প্রতিনিধি শাসক হয়ে এসেছিলেন তাঁদের মানবিক গুণাবলী মুগ্ধ করেছিল আমলাদেব। প্রশাসনের গুণাগুণ নির্ভরশীল প্রশাসক রাজনীতিবিদদের সম্পর্কের ওপর এবং শেষোক্তটি আবাব অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয় আন্তর্ব্যক্তিক সম্পর্ক দ্বারা। যেহেতু, রাজনীতিবিদদের অবস্থান সর্বোচ্চে, সেহেতু তাদের প্রয়োগ করতে হয় মানবিক নৈপুণ্য, আমলাদের সঙ্গে তৈরি করে নিতে হয় বিশ্বাসপূর্ণ সম্পর্ক এবং সংবেদনশীল হতে হয় তাদের সেণ্টিমেণ্ট সম্পর্কে। বাজনীতিবিদদের সঙ্গে যেহেতু যোগ আছে সাধারণ মানুষের সেহেতু তাঁদের পক্ষে সহজ আমলাদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে মানবিক উষ্ণতা প্রদর্শন। ঠিক এ কাজটিই করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব,[১] মাঝারী পর্যায়ের একজন আমলার অফিসরুম পরিদর্শন করতে গিয়ে [নক্শা ১২১]। বা উল্লেখ করা যেতে পারে একজন পার্লামেণ্ট সদস্যের কথা যিনি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন ডি সি-কে। কারণ, প্রধানমন্ত্রীর অনির্ধারিত সফর-সঙ্গীদের জন্য খাবারের বন্দোবস্ত করতে গিয়ে ডি সি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন [নক্শা ১২২]।

বিশ্বাসপূর্ণ সম্পর্ক একজন শাসক রাজনীতিবিদ এবং একজন আমলাকে সহায়তা করে প্রশাসনিক রীতিনীতি উন্নত ক'রে তুলতে। যেমন, একবার একজন উচ্চপর্যায়ের আমলার বিরুদ্ধে পার্লামেণ্টে অভিযোগ আনয়নের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছিলেন শেখ মুজিব [নক্শা ১২৩]। কারণ, পার্লামেণ্টে একজন আমলার আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন উপায় নেই।[২] অন্যদিকে, আবার একজন আমলা, একজন এম পি-র মাধ্যমে নিজের বিভাগ সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করাতে পারেন পার্লামেণ্টে [নক্শা ১২৪] যাতে অধস্তনদের প্রতি চাপ দেওয়া যায় সঠিক তথ্যাদি প্রেরণে। কারণ, এর ফলে দপ্তরে কাগজপত্র গুছিয়ে রাখা হবে, ও ভবিষ্যতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে।

স্বাধীনতার পর, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র যখন বিপর্যস্ত তখন শাসক রাজনীতিবিদদের ঝোঁক দেখা যায় স্বল্প সময়ে অনেক কিছু করার। এ ক্ষেত্রে, যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। এসব ক্ষেত্রে, প্রশাসনের ছোটখাটো বিষয়ে মন্ত্রীর হস্তক্ষেপের ঝোঁক দেখা দিতে পারে। মন্ত্রীদের এ ধরনের চিন্তাভাবনার ভিত্তি নিয়মকানুনের ব্যাপারে অজ্ঞতা বা মহৎ কিছু তাড়াতাড়ি করার ঝোঁক। একজন প্রধানমন্ত্রী পুলিশের ইউনিফর্ম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন [নকৃশা ১২৫] এ কথা না ভেবেই যে, এর ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতি হবে প্রচুর : ঘোষণা করতে পারেন তিনি দুষ্কৃতকারীদের নিকেশ করার সিদ্ধান্ত যারা অস্থিরতার সৃষ্টি করছে দেশে [নকৃশা ১২৬] ; বা একটি জেলাপরিদর্শনের সময় জনগণের দাবিতে গ্রহণ করতে পারেন নিম্নপর্যায়ের কয়েকজন পুলিশকে বরখাস্ত করার ত্বরিত সিদ্ধান্ত [নকৃশা ১২৭]।[৩] উল্লেখ যে, উপরোক্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট আমলা, জনপ্রতিনিধি প্রধানমন্ত্রীকে এসব ভুল দেখিয়ে দিতে পেরেছেন যা শুধু প্রচলিত নিয়মকানুনই ভঙ্গ করে না, ক্ষতি করতে পারে জনস্বার্থেরও। আরো উল্লেখ্য যে, আমলারা এটাও অনুধাবন করেন যে, একজন জনপ্রতিনিধি থাকায় তাঁরা যা করতে পেরেছেন, একজন সামরিক শাসক থাকলে তা করা সম্ভব হত না।

প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের মত, তাঁর মন্ত্রীসভার একজন সদস্য নিজের ভুল সংশোধন করে নেন একজন ও সি-র বিরুদ্ধে সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার ক'রে [নকৃশা ১২৮]। এবং তিনি তাঁর ভুল স্বীকার করতে দ্বিধা করেন না। তাঁর অধস্তন কর্মচারীর যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আছে তা তিনি নিজেই নিয়েছিলেন। একজন ডি সি আওয়ামী লীগের উচ্চপর্যায়ের একজন নেতাকে অনুরোধ করে বলতে পারেন যে [নকৃশা ১২৯] বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যারা পাকিস্তানীদের সহায়তা করেছে তাদের বিরুদ্ধে তিনি নিজে ব্যবস্থা না নিয়ে বরং তাদের তালিকা ডি সি-কে দেওয়া উচিত। একজন মন্ত্রী [নকৃশা ১৩০] শিক্ষা নীতি সম্পর্কে এমন সব সংস্কারের কথা ঘোষণা করেন যা তিনি ঘোষণা করতে পারেন না মন্ত্রীসভা ও অর্থমন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে। মন্ত্রী পরিষদ সচিব এটি জানান প্রধানমন্ত্রীকে এবং তিনি মন্ত্রীকে জানিয়ে দেন তাঁর ভুলের কথা। মন্ত্রী নিজের ভুল স্বীকার করেন।

ব্যতিক্রমধর্মী মন্ত্রী থাকেন কিছু, যাঁরা প্রশাসনে বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ না করে তুলে ধরেন নিজেদের স্বাতন্ত্র্য [নকৃশা ১৩১]। সুষ্ঠু প্রশাসন নির্বাহে তাঁদের এই ভূমিকা গভীর ভাবে শ্রদ্ধা করেন আমলারা।

আমলাদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের সম্পর্ক ছিল সৌহার্দ্যপূর্ণ। কিন্তু, আমলাদের ওপর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য তিনি কঠোরও হতে পারতেন [নক্শা ১৩২]। একবার এক সচিবের সঙ্গে মন্ত্রীর মতপার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী মুজিব সচিবকে সরিয়ে দিয়েছিলেন কারণ সচিব ছিলেন দোষী। প্রশাসন ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যখন একজন প্রধানমন্ত্রী পার্টির সহকর্মী / আত্মীয়-স্বজনের প্রভাবে পড়ে, উচ্চপর্যায়ের আমলার নিরপেক্ষ পরামর্শ অগ্রাহ্য করে অনুচিত পোস্টিং / বদলি / বরখাস্ত করেন [নক্শা ১৩৩ ও ১৩৪]। রাজনৈতিক চাপে পড়ে শেখ মুজিব কখনও কখনও এমনটি করেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও উল্লেখ্য যে, এসব ক্ষেত্রে ন্যায্য ব্যবহার প্রদর্শনের সাহসও তাঁর ছিল। শাসকদলের নেতা বা কর্মীদের হঠকারী দাবির প্রতি মাথা নুইয়েছেন তিনি মাঝেমাঝে, বদলি করে দিয়েছেন আমলাকে, কিন্তু উচ্চতর পদ দিয়ে [নক্শা ১৩৫ ও ১৩৬]। অবশ্য, শাসকদলের সদস্যদের অন্যায় দাবি বজায় রাখতে গিয়ে মুজিব আইন শৃঙ্খলার ক্ষতি করেন।[৪]

নক্শা ১৩৭ ও ১৩৮ আমাদের একটি মৌলিক প্রশ্নের সম্মুখীন করে : সামরিক শাসকেরা কি সেই সব রাজনীতিকদেরই সমর্থন করেন যাঁরা খ-এর মতো জনগণের অর্থের অপব্যবহারে তৎপর, অথবা গ-এর মতো বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধী? সম্পূর্ণ পৃথক এবং উজ্জ্বল অবস্থানে দেখতে পাই ক-কে নক্শা ১৩৯-এ : প্রখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা ক অযাচিত সুযোগ পেয়েও সরকারী সম্পদের স্বার্থদুষ্ট অপব্যয় থেকে বিরত থাকেন।

ন ক্ শা

১২১. স্বাধীনতার পর। শেখ মুজিব প্রধানমন্ত্রী। ঠিক হল নতুন গণভবন হবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। গণভবনের প্রস্তুতির কাজ চলছে। প্রধানমন্ত্রী এসেছেন হঠাৎ করে তদারক করতে। ঘুরে ঘুরে শেখ মুজিব সব দেখছেন, কে কোথায় বসবেন তাও জেনে নিচ্ছেন। তারপর একসময় এসে ঢুকলেন ক-এর ঘরে। ক তখন প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের উপ-সচিব মাত্র। ক-এর ঘরে ঢুকে, ঘরের সাজসজ্জা দেখে শেখ মুজিব উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, 'তোর ঘরটা দেখি আমার থেকেও সুন্দর। তোরা তো আবার ইংরেজি টিংরেজি পড়েছিস, সেজন্যই বোধহয় এত সুন্দর করে ঘরটর সাজাতে পারিস। না, আমিই এখানে বসব, তুই বরং আমার ঘরে বোস।'

১২২. প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ মুজিব এসেছেন চট্টগ্রাম সফরে। ক তখন

চট্টগ্রামের ডি সি। প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সফর-সঙ্গীদের আপ্যায়নের ভার তাঁর ওপর। ঢাকা থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, দুপুরে শেখ মুজিব সার্কিট হাউসে খাবেন। সঙ্গে জনা পঞ্চাশেক থাকবেন। সুতরাং ডি সি যেন খাবার-দাবারের আয়োজন সে ভাবে করেন।

দুপুরে প্রধানমন্ত্রী এলেন সার্কিট হাউসে। ডি সি তাঁর সফর-সঙ্গীদের সংখ্যা দেখে ঘাবড়ে গেলেন। কোথায় পঞ্চাশজন ! শেখ মুজিবের সঙ্গে প্রায় আড়াইশো লোক। ক প্রধানমন্ত্রীর সচিবকে জিজ্ঞেস করলেন, এখন তিনি কী করবেন ? সচিব নির্বিকার ভাবে বললেন, যা বন্দোবস্ত হয়েছে তা দিয়েই হবে। বাড়তি লোকেরা খেয়ে নেবেন বাইরে। সচিবের সঙ্গে কথা বলে ফিরে আসছেন ক, তখন তাঁর সঙ্গে দেখা আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যা ও প্রভাবশালী এক নেত্রীর সঙ্গে। দুপুরের খাওয়ার অপ্রতুল বন্দোবস্ত দেখে তিনি বেশ হৈচৈ করলেন। ক-কে বললেন, আপনার জানা উচিত বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বাড়তি লোক থাকবে, ইত্যাদি। যা হোক, ক কিন্তু সবারই খাবার বন্দোবস্ত করলেন।

বিকেলে ক-এর সঙ্গে সার্কিট হাউসে আবার সেই নেত্রীব দেখা। দুপুরে নেত্রীর ব্যবহারে একটু ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন ক। তাঁর চেহারায়ও বোধহয় সেটা ফুটে উঠেছিল। এসব আঁচ করেই বোধহয় নেত্রী হেসে ক-কে বললেন, 'ডি সি সাহেব, আপনি রাগ করেছেন নাকি ? কী মুশকিল, আপনি রাগ করলে আমরা যাই কই ? আপনি তো আমাদেরই লোক।'

ক-এর মন্তব্য এ প্রসঙ্গে—'শুধু এ সময়ই নয়, পাকিস্তান আমলেও দু'অঞ্চলের জনপ্রতিনিধিদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল প্রশাসকদের প্রতি এরকম।'

১২৩. ক তখন প্রধানমন্ত্রীর [শেখ মুজিব] সচিবালয়ে নিযুক্ত। তাঁর একটি দায়িত্ব ছিল, সংসদে সদস্যদের প্রশ্নের উত্তর প্রদানে প্রধানমন্ত্রীকে সাহায্য করা। একবার একটি প্রশ্ন এল, ঠিক প্রশ্নও নয়— পার্বত্য চট্টগ্রামের সংসদ সদস্য মানবেন্দ্র লারমা অভিযোগ এনেছেন প্রিন্সিপাল সেক্রেটারির বিরুদ্ধে। ক সংশ্লিষ্ট কাগজ-পত্র নিয়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে। শেখ মুজিব অভিযোগ দেখে বললেন, 'লারমার এ অভিযোগ তো খুব আনফেয়ার। কারণ, সরকারী অফিসার হিসেবে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি তো আর পার্লামেণ্টে নিজেকে ডিফেণ্ড করতে পারবে না। সুতরাং পার্লামেণ্টে এ প্রশ্ন ওঠানো যাবে না।'

১২৪. ১৯৭৩-৭৪-এর মাঝামাঝি। ক সচিব হিসেবে যোগ দিয়েছেন এমন এক বিভাগে যার অব্যবস্থা ও দুর্নাম তখন প্রবাদতুল্য। ক কাজে যোগ দিয়ে

দেখলেন, তাঁর মন্ত্রণালয়ে রেকর্ডপত্র থেকে শুরু করে সাধারণ তথ্য পর্যন্ত অনেক জায়গায় নেই। শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে গেলে অধস্তনরা হয়তো কাজের হঠাৎ চাপে অসন্তুষ্টও হতে পারে। এর সমাধানের জন্য তিনি তাঁর পূর্বপরিচিত এক সংসদ সদস্যের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন এবং তাঁকে অনুরোধ জানালেন, সংসদে এই মন্ত্রণালয় সম্পর্কে মাননীয় সদস্য যেন কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করেন। সংসদ সদস্য সচিবের অনুরোধ রাখলেন। সংসদে এই মন্ত্রণালয় সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন উত্থাপিত হতেই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও অন্যান্য কর্মচারীরা সতর্ক হয়ে উঠলেন। সচিবও এ সুযোগ কয়েকদিনের মধ্যে বিভাগীয় তথ্যাদি আপডেট করে শৃংখলা ফিরিয়ে আনলেন।

১২৫. পুলিশ-বিরোধী মনোভাব ছিল শেখ মুজিবের প্রচণ্ড। দেশে ফিরে আসার পর পরই তিনি চাইলেন পুলিশের প্রশাসনিক কাঠামো ও ইউনিফর্ম বদলাতে। ভারতে, এ কারণে বেশ কয়েক লক্ষ টাকার পুলিশ ইউনিফর্মের অর্ডারও দেওয়া হয়েছিল। ক ছিলেন তখন পুলিশ বিভাগের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। তিনি শেখ সাহেবকে সমস্ত পরিস্থিতি বুঝিয়ে বললেন, 'এখন প্রথম দরকাব আইন-শৃংখলা ফিরিয়ে আনা। সুতরাং পোশাক-আশাক ইত্যাদি নিয়ে মাথা ঘামালে ঝামেলা বাড়বে।' শেখ মুজিব ক-এর পরামর্শ মেনে নিয়েছিলেন।

১২৬. শেখ মুজিব প্রধানমন্ত্রী হিসেবে খুলনা সফরে গেছেন। পুলিশ কর্ম-কর্তা হিসেবে কও তাঁর সঙ্গী। সেখানে মুজিব এক জনসভায় বললেন, দুষ্কৃতকারী-দের গুলি করে হত্যা করা হবে।' বক্তৃতা শেষে ক বললেন প্রধানমন্ত্রীকে, 'এ আপনি কী বলেছেন। ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী একথা বললে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয়ে যেত। কারণ, আইনে আছে, সে যেই হোক, অপরাধ করলে আগে তার বিচার হবে।' শেখ সাহেব ক-এর যুক্তি অনুধাবন করলেন, বললেন, 'হ্যাঁ, এটা তো ভাবিনি। ঠিক আছে যাও, এরকম আর হবে না।'

১২৭. ক তখন পুলিশ বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। একদিন সকালে দৈনিক কাগজ খুলে দেখলেন, এক জেলা সদর সফরকালে, 'জনগণের দাবি'র পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী ছ-সাতজন পুলিশকে বরখাস্ত করেছেন। খবরটি পড়ে, ক গেলেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। জানালেন প্রধানমন্ত্রীকে, 'স্যার, আপনি আমাদের বিভাগের লোক বরখাস্ত করেছেন কিন্তু আমরা তো এ ব্যাপারে কিছুই জানি না।' প্রধানমন্ত্রী বললেন, 'জনগণের দাবি অনুযায়ী এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' ক বললেন, 'কিন্তু স্যার, আমাদের জানালে আমরাই ব্যবস্থা নিতে পারতাম। পুলিশ রেগুলেশন অনুযায়ী জেলা পর্যায়ে এস পি-ই নিয়োগকারী ও

বরখাস্তকারী কর্তা। কিন্তু, স্যার, সার্ভিস বুকে এখন লিখতে হবে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে বরখাস্ত করা হল। এটা হলে একটা প্রিসিডেন্স থেকে যাবে।' শেখ মুজিব বললেন, 'তার মানে কি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমি বরখাস্তও করতে পারি না ?'

ক বললেন, 'আপনি পারবেন না বলে এমন কিছু তো নেই ? কিন্তু একজন দারোগা বা কনস্টেবলের সার্ভিস বুকে লেখা থাকবে, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে চাকরি গেল, এই বা কেমন কথা ?'

'কিন্তু আমি তো অর্ডার দিয়ে দিয়েছি,' একটু বিরক্ত হয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী. 'আমি যেটা করতে চাই সেটাতেই তোমরা বাধা দাও।'

'স্যার,' বিনীতভাবে বললেন ক, 'অফিসার হিসেবে আমার কাজ এগুলি তুলে ধরা।'

'খালি বড় বড় কথা বল,' বললেন শেখ মুজিব, 'যা ভালো বোঝ করো।'

পুলিশ বিভাগ থেকে এরপর প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশকে একেবারে উপেক্ষা না করে দেওয়া হল তদন্তের নির্দেশ। তদন্তে দেখা গেল, অভিযুক্তরা বরখাস্ত হওয়ার মতো দোষী নয়।' সুতরাং ওয়ার্নিং দিয়ে তাদের পূনর্বহাল করা হল।

১২৮. শেখ মুজিবের প্রধানমন্ত্রিত্বের সময়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী গেছেন একটি জেলা পরিদর্শনে। সেখানে স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তাদের এক বৈঠক ডাকা হয়েছিল। বৈঠকে, একটি থানার ও সি আসেননি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ভাবলেন, ও সি তাঁর নির্দেশ অমান্য করেছে। ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি তাঁকে বৈঠক শেষে সাসপেণ্ড করলেন। পুলিশ কর্মকর্তা হিসেবে ক-কেও জানানো হল সে কথা। ক দেখা করলেন মন্ত্রীর সঙ্গে। বললেন, 'স্যার, আইন অনুযায়ী আপনি তো তাকে সাসপেণ্ড করতে পারেন না। তা'ছাড়া এমনও তো হতে পারে যে ও সি কোন ঝামেলায় আটকে গিয়েছিল।

ক তারপর ঐ জেলার এস পি-কে নির্দেশ দিলেন সাসপেণ্ড হওয়া ও সি-র খবর নিতে। খবর নিয়ে এস পি জানালেন, ও সি সেদিন বৈঠকে আসার জন্যে রওয়ানা হয়েছিল, কিন্তু তাঁর স্ত্রী ঐ সময় গোসলখানায় পড়ে অজ্ঞান হয়ে যান। দিশেহারা ও সি স্ত্রীকে নিয়ে ব্যস্ত থাকায় বৈঠকে যোগ দিতে পারেননি।

ক তখন এস পি-কে নির্দেশ দিলেন ঘটনাটি লিখে পাঠাতে। তারপর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে পুরো ঘটনাটি জানিয়ে ক বললেন, 'আমি এস পি-কে নির্দেশ দিয়েছি সাসপেনশন অর্ডার প্রত্যাহার করতে।' মন্ত্রী কোন মন্তব্য করলেন না বরং মনে হল তিনি খানিকটা লজ্জিত হয়েছেন।

১২৯. দেশ মাত্র স্বাধীন হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা [সি এস পি] ক নিযুক্ত হয়েছেন একটি জেলার ডি সি হিসেবে। ঐ সময় সমগ্র দেশকে কয়েকটি 'জোন'-এ বিভক্ত করা হয়েছিল। এবং প্রত্যেকটি জোনের প্রধান ছিলেন একজন করে সংসদ সদস্য [যাঁরা যুদ্ধের আগে নির্বাচিত হয়েছিলেন]। ক যে জেলার ডি সি সে জোনের চেয়ারম্যান বা প্রধান ছিলেন খ।

হানাদার বাহিনীর সহায়তাকারী বা 'কোলাবরেটরদের' কী শাস্তি দেওয়া হবে তখনও তা ঠিক হয়নি। সরকার জানালেন, কয়েকদিন সবুর করো, আইন হচ্ছে।

স্থতরাং 'কোলাবরেটর'দের গ্রেফতার করে জেলে রাখা হত। এদিকে খ ও সি-দের নির্দেশ দিতেন একে ওকে গ্রেফতার করতে। ও সি-রা পড়ল বিপাকে। কারণ, খ-এর ক্ষমতা সম্পর্কে তারা সরকারী কোন নির্দেশ পায়নি। আর 'জোন' ও 'জোনের চেয়ারম্যান' নিযুক্ত করেছিল প্রবাসী সরকার মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে। ও সি-রা তাই ভিড় জমালেন ডি সি-র কাছে। ক খ-কে ফোনে বিনীত ভাবে জানালেন, কাউকে গ্রেফতার করতে হলে তিনি যেন ক-কে জানান। ডি সি হিসেবে ক ব্যবস্থা নেবেন। খ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'কেন, নির্দেশ কি আমি দিতে পারি না ?'

ক এর পর খ-এর সঙ্গে দেখা করে বললেন, বর্তমান আইন অনুযায়ী গ্রেফতার করার ক্ষমতা শুধু ডি সি-রই। স্থতরাং খ যদি কোলাবরেটরদের একটি তালিকা ক-কে দেন তা'হলে ক ব্যবস্থা নেবেন। খ তখন ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সানন্দে রাজী হয়ে ক-কে কোলাবরেটরদের একটি তালিকা দিলেন।

১৩০. স্বাধীনতার বছর-দুয়েকের মধ্যে একদিন শিক্ষামন্ত্রী ঘোষণা করলেন, দেশের অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা চালু করা হবে এবং শিক্ষার সমস্ত উপকরণাদি যোগাবে সরকার।

ক তখন মন্ত্রী পরিষদের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তিনি শিক্ষামন্ত্রীর ঘোষণার পর দেখলেন সরকারের এ ধরনের কোন সিদ্ধান্ত নেই। স্থতরাং মন্ত্রী 'রুলস অফ বিজনেস' ভঙ্গ করেছেন। কারণ, শিক্ষানীতি একটি মূল বিষয় যা অবশ্যই মন্ত্রী পরিষদে পাস হতে হবে। দ্বিতীয়ত, অর্থমন্ত্রণালয়ের অনুমোদন লাগবে। ক প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিতে আনলেন ব্যাপারটা। প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে ডেকে বিষয়টি জানালেন। মন্ত্রী বললেন, 'বা, শিক্ষার ব্যাপারে তো আমিই বলব।' প্রধানমন্ত্রী বললেন, 'অবশ্যই, কিন্তু এটা পারেন না, কারণ, সরকার নীতিগত ভাবে এটা ঠিক করেনি।' মন্ত্রী বুঝতে পেরে ব্যাপারটি মেনে নিলেন।

১৩১. ক তখন চাটগাঁর ডি সি। মন্ত্রীসভায় তখন চাটগাঁ থেকে ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী দু'জন মন্ত্রী এম, আর, সিদ্দিকী এবং জহুর আহমেদ চৌধুরী।

চাটগাঁর শিল্পাঞ্চলে দেখা দিয়েছে শ্রমিক সমস্যা। বি টি সি-তে চলছে শ্রমিক ধর্মঘট। বি টি সি-র কালেকটিভ বারগেইনিং এজেন্ট ছিলেন জহুর আহমদ চৌধুরী। মন্ত্রী হওয়ার পর তিনি তা ছেড়ে দেন কিন্তু তার প্রভাবাধীন ইউনিয়ন তখনও ছিল বারগেইনিং এজেন্ট।

ক এর উদ্যোগে মালিক, সরকার [ডি সি] ও শ্রমিকদের ত্রিপক্ষীয় বৈঠক বসল। শ্রমিকদের দাবি ১৫% মজুরী বৃদ্ধি। ক জহুর আহমেদ চৌধুরীকে [শ্রমমন্ত্রী] জানালেন, 'স্যার, আপনি যদি ইনসিস্ট না করেন তা' হলে ৭-৮% ভাগেই একটা ফয়সালা হতে পারে। নয়তো সব জায়গায়ই ঝামেলা হবে। মন্ত্রী বললেন, 'দু' পক্ষের জন্য যা ভালো বোঝেন তাই করেন। আমার কিছু বলার নেই।'

ক মালিক ও শ্রমিক পক্ষকে ৭-৮% মজুরী বৃদ্ধিতে রাজী করালেন। ক আরো উল্লেখ করেছেন, মন্ত্রী থাকাকালীন এঁরা দু'জন [চাটগাঁর] কখনও কোন তদ্‌বিরে ক-কে ফোন করেননি।

১৩২ মুক্তিযুদ্ধের সময় ক চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন মুজিব নগরে। স্বাধীনতার পর তাঁকে একটি মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদে নিয়োগ করা হয়। স্বাধীন হওয়ার আগেও তিনি ছিলেন একজন প্রভাবশালী অফিসার। স্বাধীনতার পর তিনি আরো প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। কিছুদিন পর নিজ মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হয়। মন্ত্রী নিজেও ছিলেন খুব প্রভাবশালী। তিনি শেখ মুজিবকে অনুরোধ করেন ক-কে সরিয়ে দিতে। ক-কে মন্ত্রণালয় থেকে সরিয়ে একটি সংস্থার চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত দেওয়া হয় যা ছিল আবার ঐ মন্ত্রণালয়েরই অধীন। মন্ত্রী এতেও আপত্তি জানালে, ক-কে করা হয় ও এস ডি। এতে ক অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে কড়াভাষায় প্রধানমন্ত্রীকে একটি চিঠি লিখে পদত্যাগপত্র পেশ করেন। শেখ মুজিব এ চিঠি পেয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, 'নো ওয়ান রিজাইনস ফ্রম দিস গভর্নমেণ্ট। আইদার দে সার্ভ অর আই স্যাক দেম।' ক-কে চাকুরিচ্যুত করা হয়। ক মনস্থ করলেন মামলা করবেন। তখন তাঁর বন্ধুরা তাঁকে বুঝিয়ে বলেন, মামলা করলে প্রধানমন্ত্রী হয়তো কিছু কববেন না কিন্তু তাঁর অনুচররা এটাকে অপমান হিসেবে নিয়ে তাঁর ক্ষতি করতে পারে। ক তখন নিরস্ত হন।

১৩৩. শেখ সাহেব যখন প্রধানমন্ত্রী তখন ক প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের

একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। একবার প্রধানমন্ত্রী একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে বরখাস্ত করতে চাইলেন। ক এবং তাঁর সহকারী [সহকারী ছিলেন সি এস পি, ক অন্য ক্যাডারের] কয়েকবার প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করলেন এ সিদ্ধান্ত কার্যকর না করার জন্য। শেখ মুজিব বললেন, না, এ হতেই পারে না। সে করাপ্ট ইত্যাদি। কিন্তু ক ও তাঁর সহকারীর অনুরোধে ফাইলে আর কিছু না লিখে চলে গেলেন।

শেখ মুজিবের এক ভগ্নীপতি ছিলেন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব। অনেক সিনিয়র কর্মকর্তাকে ডিঙিয়ে তাঁকে ঐ পদে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রীর আত্মীয় বিধায় তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং কার্যত সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের তিনিই ছিলেন সর্বেসর্বা। শেখ সাহেবের আরেক ভগ্নীপতি ছিলেন মন্ত্রী। এঁরা দু'জন বাসায় প্রধানমন্ত্রীকে প্রশাসনিক ব্যাপারে পরামর্শ দিতেন।

যা হোক, এ ঘটনার পরের দিন ক অফিসে গিয়ে সেই ফাইলটি পেলেন এবং দেখা গেল প্রধানমন্ত্রী তাতে ঐ কর্মকর্তার বরখাস্তের আদেশ দিয়েছেন। ক মুখ ভার করে গেলেন প্রধানমন্ত্রীর ঘরে। প্রধানমন্ত্রী তাঁকে একবার দেখে ফাইল দেখতে লাগলেন, একবার ফোন করলেন, খানিকক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর এক সময় ক-কে বললেন, 'কী ব্যাপার, মুখ ভার কেন?'

ক বললেন, 'স্যার, অর্ডারটা দিয়েই দিলেন? আমার স্যার ব্যাপারটা ভালো লাগছে না।'

শেখ মুজিব তখন বললেন, 'আমি যদি আপনার জায়গায় থাকতাম তা'হলে আপনার মতোই কথা বলতাম। কিন্তু আমাকে তো পলিটিক্স করে খেতে হয়।'

ক বললেন, 'এটা যদি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হয়, স্যার, তা'হলে আমার আর বলার কিছু নেই।'

১৩৪. স্বাধীনতার পর পর প্রশাসনের একজন প্রভাবশালী ও উচ্চতম কর্মকর্তা ছিলেন ক। বলেছেন তিনি, শেখ মুজিবের অহং ছিল বেশি এবং তিনি ছিলেন খানিকটা অস্থিরও বটে। তিনি যদি কোন কিছু করতে ইচ্ছে করতেন তা'হলে আইন ভঙ্গ করেও তা করতেন। যেমন, একবার প্রস্তাব নেওয়া হল সরকারী কর্মকর্তাদের অবসর গ্রহণের বয়স হবে ৫৭। কিন্তু দেখা গেল, প্রধানমন্ত্রী নিজেই আইন ভঙ্গ ক'রে অনেককে এক্সটেনশন দেওয়ার জন্য নির্দেশ পাঠাতেন। এমন-কি বেগম মুজিব ও প্রধানমন্ত্রীর পুত্রও এসব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতেন। মাঝে মাঝে ক-কে তাঁরা এসব নিয়ে অনুরোধ জানাতেন। তিনি রাজী না হলে, তাঁর অধস্তনদের দিয়ে কাজটি করিয়ে নিতেন।

১৩৫. শেখ মুজিব যখন প্রধানমন্ত্রী তখন ক পুলিশ বিভাগের একজন কর্মকর্তা। ঐ সময় আওয়ামী লীগের কর্মীদের দৌরাত্ম্য/তদ্‌বির ভয়াবহ ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এক সাংবাদিক সম্মেলনে ক এসব কথা বলে ফেলেছিলেন এবং দেশী বিদেশী সংবাদপত্রগুলি তা ফলাও করে প্রচার করেছিল। যেদিন সংবাদপত্রে ক-এর মন্তব্য প্রকাশিত হল সেদিন রাতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁকে ফোন করে বললেন, 'আমি যাচ্ছি শেখ সাহেবের বাসায়, আপনিও চলুন।' গেলেন তাঁরা দু'জন শেখ সাহেবের বাসায়। গাড়িতে যেতে যেতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খালি বলেছিলেন, 'সরকারী কর্মচারীদের এ ধরনের কথা না বললেই কি নয়?'

শেখ সাহেবও পড়েছিলেন সংবাদটি। তাঁরা দু'জন তাঁর সঙ্গে দেখা করতেই তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে বললেন, 'আমি আর কি করুম? আমার অধীনস্থ কর্মকর্তাই আমার কথা শোনে না।' তারপর ক-এর দিকে ফিরে বললেন, 'তা আপনি কন দেখি কবে কখন আমি আপনার কাজে হস্তক্ষেপ করছি?'

ক উত্তর দিলেন, 'আপনি করেননি। কিন্তু আপনার মন্ত্রী, ছাত্রনেতা—এরা করছে। শুধু তাই নয়, হুমকিও দিচ্ছে।' [যেমন, একদিন রাত বারোটায় প্রভাবশালী এক ছাত্রনেতা ফোন করে তাঁকে বলেছিলেন, বোমা মেরে তাঁকে উড়িয়ে দেবেন]।

শেখ সাহেব আর কিছু বললেন না। কিন্তু তারপরই পুলিশ বিভাগ থেকে ক-কে সরিয়ে নিজের সচিবালয়ে আরো উচ্চতম ও প্রভাবশালী পদে নিযুক্ত করলেন।

১৩৬. স্বাধীনতার ঠিক পর পর ক ছিলেন পুলিশ বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। মুজিবনগরেও ছিলেন তিনি। তাই, মন্ত্রী থেকে শুরু করে অনেকের সঙ্গেই তাঁর যোগাযোগ ছিল। লক্ষ্য করলেন তিনি, যতই দিন যাচ্ছে, প্রশাসনে হস্তক্ষেপ তত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ছোটখাটো ব্যাপারে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে প্রশাসনে শুরু হয়েছিল হস্তক্ষেপ। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব এসব ব্যাপারে কঠোর কোন মনোভাব গ্রহণ করেননি। তাই ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে ক চাকরি থেকে মুক্তি চাইলেন। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকেও জানালেন। কিন্তু এ ব্যাপার তারা বিশেষ গ্রাহ্যের মধ্যে আনল না। এ সময় প্রধানমন্ত্রী এক সপ্তাহের জন্য বিদেশ গেলে ক ছুটি নিলেন। প্রধানমন্ত্রী ফিরে আসার পর, তিনি ছুটি বৃদ্ধির আবেদন করলেন। কিন্তু ছুটি মঞ্জুর হয় না। ক-ও জয়েন করলেন না। প্রধানমন্ত্রী অন্যের মারফত কয়েকবার তাঁর খোঁজখবরও নিলেন। এদিকে গুজব রটে গেল ক

আওয়ামী লীগের কর্মীদের প্রশাসনে হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে পদত্যাগ করেছেন। এ সময় শেখ মুজিব একদিন ফোন করলেন ক-এর শ্বশুরকে যিনি ছিলেন তাঁর পূর্বপরিচিত। শেখ মুজিব জানালেন, ক যেন শিগ্‌গিই কাজে যোগ দেয়, না হলে পার্টির বদনাম হবে।

এরই মধ্যে চলে এল ঈদ। নিয়ম অনুযায়ী ক গেলেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। প্রধানমন্ত্রী তাঁকে বললেন, একসপ্তাহের মধ্যে কাজে যোগ দিতে। ক জানালেন তিনি অসুস্থ। এদিকে নানারকম হুমকি দিয়ে ফোন করা হতে লাগল ক-কে। প্রধানমন্ত্রী তখন আরেকদিন ক-কে ডেকে নিয়ে বললেন, আর কয়েকমাস পর তিনি নির্বাচন দিচ্ছেন, সুতরাং ক-কে তিনি এখন আর সরাতে চান না। কারণ, মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বাইরে ক-এর একটা ইমেজ আছে। ক তখন যোগ দিলেন আবার চাকরিতে।

নির্বাচন হয়ে গেল কিন্তু ক তখনও তাঁর পূর্বপদে বহাল। তিনি তাই এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন। এবং কয়েকদিন পর অর্ডার পেলেন তাঁকে একটি মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। ক তখন আবার দেখা করলেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। বললেন, 'স্যার, আমি সচিব হতে চাই না। আমি রিলিজ চাই।' প্রধানমন্ত্রী বললেন, 'সে কথা পরে হবে।… বিভাগ আমার ইজ্জত ডোবাচ্ছে, তাই সেখানে তোমাকে পাঠাতে চাই। তুমি মুক্তিযোদ্ধা ছিলে, তোমার নামে কোন অপবাদও শুনিনি। এখন আমার ইজ্জত রক্ষা করো।'

১৩৭. মন্ত্রী পরিষদের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন ক। ১৯৭২-এর দিকে প্রেসিডেন্ট থেকে প্রতিমন্ত্রী পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে কে কী বেতন ও সুযোগসুবিধা পাবেন তার একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেছিল মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ এবং তা অনুমোদিত হয়েছিল।

সরকার তখন ঘোষণা করেছিলেন ব্যয় সংকোচন নীতি। ১৯৭২-৭৫ পর্যন্ত নতুন কোন গাড়ি কেনা হয়নি। প্রথম দিকে মন্ত্রীরা অনেকে তখন নিজ নিজ বাড়িতে থাকতেন। তারপর অনেকে মিণ্টু রোডে গিয়ে উঠলেন [মন্ত্রীপাড়া] এবং কয়েক বছরের মধ্যে তাদের আশা আকাঙ্ক্ষাও বৃদ্ধি পেল। নানা ধরনের সুযোগসুবিধার ব্যাপারে তাঁরা মন্ত্রী পরিষদ বিভাগে ফোন করতে লাগলেন। একমাত্র [ক-এর মতে] তাজউদ্দিন আহমদ, কামরুজ্জামান, সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও মনসুর আলী ছিলেন এর ব্যতিক্রম।

সুযোগসুবিধা চাওয়ার ব্যাপারটি তুঙ্গে পৌঁছেছিল যখন রাজনীতিক খ

ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেন। সংস্কার ও পরিবর্ধনের নামে ঢাকায় নিজ বাড়িটি তিনি দোতলা করে ফেললেন সরকারী খরচে। এ দৃষ্টান্ত দেখিয়ে, অনেক মন্ত্রী নিজেদের বাড়ি সংস্কার করতে চাইলেন। ক কারো প্রস্তাবেই রাজী হননি। খ-এর বাড়ির কাজটি করে দিয়েছিলেন তৎকালীন পূর্ত সচিব যিনি ছিলেন খ-এর একান্ত অনুগত।

খ যখন প্রেসিডেণ্ট তখন একদিন প্রেসিডেণ্টের একান্ত সচিব এসে ক-কে বললেন. 'সরকারী আইনে তো আছে প্রেসিডেণ্ট নিজ বাড়িতে থাকলে সরকার তা মেইনটেইন করবে। এখন প্রেসিডেণ্ট তো নিজ বাড়িতেই আছেন। স্থতরাং সেটা এবং তাঁর গ্রামের বাড়িটা সরকারের মেইনটেইন করা উচিত।'

উত্তরে ক বললেন, 'যতদূর জানি তিনি বঙ্গভবনেই থাকেন। আর তিনি যখন গ্রামের বাড়িতে যান তখন তো রাজধানী সেখানে শিফ্‌ট করে না। স্থতরাং সে প্রশ্নই ওঠে না।'

একান্ত সচিব অনুরোধ জানিয়ে বললেন, 'নিয়মটা একটু অন্যভাবে ব্যাখ্যা করলেই হয়।'

'তা সম্ভব নয়।'

'কিন্তু টুঙ্গীপাড়াতে তো শেখ সাহেবের বাড়ি করে দেওয়া হয়েছে।'

'কখনোই নয়। এ বিষয়ে কোন কাগজপত্রই আমার নজরে পড়েনি।'

'পি ডব্লিউ ডি করেছে।'

'আমি জানি না। সে বিষয়ে আমার কাছে কোন রেকর্ড নেই। তারা যদি তা করে থাকে এবং অভিযোগ প্রমাণিত হয় তা হলে তাদের শাস্তি হবে।'

শেষ পর্যন্ত সরকারী খরচে খ-এর গ্রামে খ-এর জন্য গৃহাদি নির্মাণ হয়। এর কিছুদিন পর ক-কে ক্ষমতার অপব্যবহার / দুর্নীতি ইত্যাদির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। তবে খ ক্ষমতাচ্যুত হলে তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি / ক্ষমতার অপব্যবহারের যেসব অভিযোগ তোলা হয়েছিল তার মধ্যে একটি ছিল, সরকারী খরচে নিজ গ্রামে বাড়ি তৈরি।

১৩৮. স্বাধীনতা যুদ্ধের পর পর ক ছিলেন একটি জেলার প্রশাসক বা ডি সি। সে সময় রাজাকারদের গ্রেফতার করা হচ্ছিল। এসব গ্রেফতারকৃত স্বাধীনতা-বিরোধীদের মধ্যে গ ছিলেন একজন।

গ গ্রেফতার হওয়ার পর তাঁর মুক্তির জন্য ক-এর কাছে এলেন তাঁর স্বামী। প্রথমেই তিনি জানালেন, একসময় ক-এর পিতা ও তিনি ছিলেন প্রতিবেশী। এবং

তাবপব 'বাবা বাবা' সম্বোধন কবে অনেক কথা বলাব পব তুললেন স্ত্রীব প্রসঙ্গ। তাঁব স্ত্রীব কয়েক দিন আগে একটি সন্তান হযেছে। অত্যন্ত দুর্বল শবীব তাঁব। সুতবাং তাঁকে ছেড়ে দিলে বোধহয ভালো। ক কঢ কণ্ঠে বললেন, 'ওসব কথা বলে লাভ হবে না। আপনাব স্ত্রী যখন দালালী কবেছিলেন তখন বাধা দিযেছিলেন তাঁকে ? কি কবছিলেন তখন ?

ক গ-কে মুক্তি দেননি। পবে, অবশ্য তিনি মুক্তি পেযেছিলেন এবং প্রেসিডেণ্ট জিয়াব সংসদে সদস্যা হযেছিলেন। এখন তিনি অতি দক্ষিণপন্থী একটি দলেব নেত্রী।

১৩৯. ক ছিলেন অসীম সাহসী মুক্তিযোদ্ধা। বাংলাদেশে একনামে সবাই তাঁকে চিনতেন। খ ছিলেন বাংলাদেশ বিমানেব একজন পাইলট। একদিন খ বিমান-বন্দবে ঢোকাব সময দেখলেন ক-ও সেই একই প্লেনে যাচ্ছেন। ক-এব সঙ্গে কযেক বছবেব একটি ছেলে। খ নিজেও ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। তাই দু'জনেব আলাপ পবিচয হল। এবং খ কথায কথায জানতে পাবলেন, ক-এব বালকটিব টিকিট কবা হযনি। খ জানালেন ক-কে যে, বাচ্চাটিবও টিকিট লাগবে। ক বিস্মিত হযে বললেন, 'কিন্তু ম্যানেজাব ও অন্যান্যবা যে বলল ওব টিকিট লাগবে না।' খ বললেন, 'যেহেতু এখন আপনি প্রভাবশালী ব্যক্তি তাই তাবা তোষামোদ কবে আপনাকে বলেছে যে টিকিট লাগবে না।' ক অসহায ভাবে বললেন, 'দেখেন আমাকে এভাবে অপমান কবাব কোন মানে হয। এখন কী কবি বলুন তো। প্লেনও তো ছাড়াব সময হযে এল।' খ তখন বিমান বন্দবেব কাউণ্টাবে একটি হাফটিকিটেব টাকা জমা দেওযাব বন্দোবস্ত কবে দিলেন।

১২ উন্নয়ন ও প্রশাসন

অসম্পূর্ণ তথ্য এবং দূবদর্শিতাব অভাব, যে-কোন উন্নযন পবিকল্পনাকে অকার্যকব কবে তুলতে পাবে। যেমন, সিদ্ধান্তদাতা যাবা সমতলেব লোক, তাবা যখন ঐতিহাসিক নৃতাত্ত্বিক পটভূমি ভুলে পার্বত্য এলাকাব[৫] জন্য উন্নযন পবিকল্পনা প্রণযন কবেন তখন তাঁবা একটি ভুল কবেন যাব ফলে সেই উন্নযন পবিকল্পনা কার্যকব কবা মুশকিল হযে ওঠে [নকৃশা ১৪০]।

অনেক অ্যাকাডেমিক ও বিশেষজ্ঞবা মনে কবেন এবং বলেন, সিদ্ধান্ত গ্রহণের উচ্চপর্যায়ে যদি তাঁবা থাকেন তা'হলে উন্নয়ন প্রশাসনেব মান উন্নত হবে। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে দেখা যায় তাঁবা অযথা প্রশাসনিক বীতিনীতি লঙ্ঘন কবছেন। যদি এমন হত যে, আমলাতন্ত্রের বেড়াজাল ভাঙার জন্য তাঁবা এসব রীতিনীতি ভঙ্গ

করছেন তা'হলে কথা ছিল। কিন্তু তারা সে কারণে এসব করেন না। তাঁরা রীতিনীতি ভঙ্গ করেন ক্ষমতা দেখাবার জন্য যার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় নেই [নকৃশা ১৪১]। একজন শিক্ষামন্ত্রীব [যি'ন ছিলেন !বশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক] সিদ্ধান্ত গ্রহণ দেখে বোঝা যায় অগ্রগণ্যতা সম্পর্কে তাঁর কোন বোধ নেই। কারণ. ১৯৭৪ সালে দুর্ভিক্ষের সময় যখন অর্থসংকট প্রবল. দেখা যায় তিনি সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন উচ্চ-বিত্তের জন্য গড়ে তোলা একটি বেসিডেনশিয়াল স্কুলের প্রাচীর নির্মাণে [নকৃশা ১৪২]। তিনি নাকচ করে দেন সচিবের সিদ্ধান্ত যিনি স্মরণ করিয়ে দিতে চাচ্ছিলেন সংকটময় পরিস্থিতির কথা।

বাংলাদেশের মতো স্বল্প উন্নত দেশে পুঁজিবাদী বা সমাজতন্ত্রী দেশের বেসরকারী সংস্থা বা সরকার সব সময় চাইবে ঘোলাটে জলে মাছ শিকার করতে। জাতীয় স্বার্থ সংবক্ষণের জন্য আমলাদের এক্ষেত্রে সবসময় সতর্ক থাকতে হবে। মাঝারি পর্যায়ের একজন সৎ আমলাও এসব ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা রাখতে পারেন। এ পর্যায়ের একজন আমলা একবার পরাক্রমশালী ইউ এস এইড-কে বাধ্য করেছিলন অন্যান্য শর্তাবলী বাংলাদেশের ওপর চাপিয়ে না দিতে [নকৃশা ১৪৩]। আরেক-জন আমলা অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীনের গভীর আস্থা অর্জন করেছিলেন, কারণ তিনি থামিয়ে দিয়েছিলেন ভারতীয় একটি সংস্থাকে যারা ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের ভূমিকা পুঁজি করে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে একটি হোটেলের ব্যবস্থাপনা-ভার গ্রহণ করতে চেয়েছিল [নকৃশা ১৪৪]।[৬] অন্যদিকে, একজন উপ-সচিব চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নকে রোধ করতে. যে টেকৃনিক্যাল এইড দেওয়ার নাম করে শোষণ করতে চেয়েছিল বাংলাদেশকে [নকৃশা ১৪৫]।

আওয়ামী লীগ শাসনের ব্যর্থতা মনে রাখা সহজ। এবং সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও ভুলে যাওয়া সহজ অনেক ব্যাপারে প্রশাসনে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য শেখ মুজিবের বিপুল প্রচেষ্টা। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি, এখনও আওয়ামী লীগ সরকারের জাতীয়করণ নীতির ব্যর্থতা বয়ান করতে ক্লান্তি বোধ করেন না। হয়তো অজ্ঞতা বা দেশী বিদেশী ষড়যন্ত্রকারী চক্রের প্রতারণা এর কারণ। কিন্তু ১৯৭১-৭২ সালে কি এছাড়া আর কোন বিকল্প ছিল [নকৃশা ১৪৬]? ষড়যন্ত্রকারীরা সমর্থ হয়েছিল এমন সময় শেখ মুজিবকে খুন করতে যখন জাতীয়করণকৃত শিল্পগুলি স্বল্প সময়ের মধ্যে বহু বাধা-বিপত্তি এড়িয়ে মাত্র কার্যক্ষমভাবে যাত্রা শুরু করেছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, শেখ মুজিব একজন উচ্চ-পর্যায়ের আমলার পরামর্শে কর্ণপাত না করে সরকারী একটি সংস্থার উচ্চপদে নিয়োগ করেছিলেন দক্ষ একজন ব্যক্তিকে যিনি

ছিলেন তাঁর শত্রু এক রাজনীতিবিদের আত্মীয় [নকশা ১৪৭]।[৭] মুজিব এভাবে সংকীর্ণ রাজনৈতিক পক্ষপাতের উর্ধ্বে উঠে সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় মন দিয়েছিলেন এবং সৎ আমলাদের খুঁজছিলেন [নকশা ১৪৮] যাঁদের তিনি নিয়োগ করতে পারেন উচ্চ পদে প্রশাসক হিসেবে।

মুদ্রাস্ফীতিরোধে শেখ মুজিব ডি-মনিটাইজেশন[৮] করেছিলেন [নকশা ১৪৯]। প্রশাসনের ওপর ইনডেনটারদের অশুভ প্রভাব লুপ্ত করার জন্য তিনি ব্যবস্থা করেছিলেন স্টেট ট্রেডিংয়ের [নকশা ১৫০]। কয়েক দশক আওয়ামী লীগের কর্মীরা[৯] যাঁরা ভুগেছেন অর্থনৈতিক দুর্দশায় তাঁদেব কথাও তিনি ভেবেছেন [নকশা ১৫১]। তা সত্ত্বেও মুজিবের দলের সহকর্মীরা ব্যর্থ হয়েছিলেন ব্যক্তিগত স্বার্থ ও জাতীয় স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে। তাঁদের অনেকে[১০] দ্বিধা করেননি আক্ষরিক অর্থে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা সমূহ লুট করতে [নকশা ১৪৮]। দ্বিধা করেননি ডি-মনিটাইজেশন বা স্টেট-ট্রেডিং-এর নীতি ব্যর্থ করতে [নকশা ১৪৯ ও ১৫০]। এখানে যোগ করা ভালো যে, আওয়ামী লীগের ক্ষমতাচ্যুতির পব বাংলাদেশের প্রশাসনে প্রবলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল ইনডেনটারদের প্রভাব।

রাষ্ট্রীয় নীতি ব্যর্থকরণে ভূমিকা রেখেছেন শেখ মুজিবের আত্মীয়রাও [নকশা ১৫২], যেমন, স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য আত্মসাতে।[১১] হয়তো, ১৯৭৫-এর মধ্যে তাঁব দলেব সহকর্মী / আত্মীয়দের চাপ তাঁব ওপর এত প্রবল হয়ে উঠেছিল যে, হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি অগ্রগণ্যতা বোধ।[১২] এ কারণেই হয়ত দীর্ঘদিন ধরে প্রকল্প বাস্তবায়ন সংস্থা গঠন করার সিদ্ধান্ত তিনি দেননি [নকশা ১৫৩]। বা শুধু শুধু অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন উচ্চ পর্যায়ের জনৈক আমলার প্রতি [নকশা ১৫৪]। এবং বলেছিলেন, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে তিনি উচ্চশিক্ষিত আমলা থেকে বরং নির্ভর করবেন অর্ধশিক্ষিত সাধারণ লোকের ওপর।

নকশা

১৪০. পাকিস্তান আমলে, সামরিক এবং পুলিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় নেতাদের বেশ সদ্ভাব ছিল। ঐ সময়, সামরিক গোয়েন্দা বাহিনী সফলতা অর্জন করেছিল ভারতীয় সীমান্তরক্ষীদের ব্যতিব্যস্ত রাখার কাজে উপজাতীয়দের ব্যবহার করায়। এমনকী, ১৯৭১ সালে, পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নেয়নি।

১৯৭২ সালে, পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে একটি বিশেষ বৈঠক হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবও সেখানে উপস্থিত। ঐ বৈঠকে আরো উপস্থিত ছিলেন, সামরিক-

বেসামরিক গোয়েন্দা দফতরের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারাও। বৈঠকের এক পর্যায়ে, সামরিক গোয়েন্দা দফতরের একজন, পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীর অসহযোগী মনোভাবের খুব নিন্দা করলেন। তখন পুলিশের একজন কর্মকর্তা বললেন, 'কিন্তু ক সাহেব, কয়েকদিন আগেই তো আপনারা প্রচুর টাকা খরচ করে তাদের অন্যকথা বুঝিয়েছেন। এখন এত অল্প সময়ে আপনি কিভাবে আশা করেন তারা আবার উল্টো স্বরে কথা বলবে ?'

মুজিব আমলে, পার্বত্য চট্টগ্রামে 'রি-সেটলমেন্ট প্ল্যান' নেওয়া হয়। এর অর্থ ছিল সমতলভূমি থেকে লোক এনে পার্বত্য অঞ্চলে বসানো। এর ফলে শুরু হয় সংঘাত। তখন বেশ কয়েকজন আমলা প্রস্তাব দিয়েছিলেন বিষয়টিকে নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে কিন্তু সরকার তা করেনি। পরবর্তী সরকার সমূহও অবলম্বন করেছে একই পদ্ধতি। ফলে, মুজিব আমলে যে সংকট শুরু হয়েছে সে সংকট এখন ক্রমেই জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে।

১৪১. স্বাধীনতার ঠিক পরের ঘটনা। একটি সংস্থার প্রধান ছিলেন একজন বিশেষজ্ঞ। ধরা যাক তাঁর নাম ক। খ ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের একজন উপ-সচিব। ক ঐ সময় অর্থমন্ত্রণালয় থেকে কিছু টাকার রিলিজ চাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে টাকা না চেয়ে টাকাটা সরাসরি চাইলেন অর্থমন্ত্রণালয়ের কাছে। সেই ফাইল খ-এর কাছে এলে, খ ফাইল ফেরত দিয়ে জানালেন, ক-কে তাঁর নিজের মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে টাকা চাইতে হবে।

ক এতে অপমানিত বোধ করে অভিযোগ জানালেন পরিকল্পনা কমিশনের এক সদস্যের কাছে। সদস্য, কমিশনের প্রধানের মাধ্যমে অর্থমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ এনে বললেন, বুরোক্র্যাসি সময়মতো টাকা দিচ্ছে না, তাই উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হচ্ছে। মন্ত্রী সচিবকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। সচিব নোট দিয়ে খ-এর কাছে এ অভিযোগের উত্তর জানতে চাইলেন। উত্তরে খ লিখলেন, 'সরকারের আইন অনুযায়ী প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের সচিব, নিজ নিজ মন্ত্রণালয়ের আয়-ব্যয়ের জন্য দায়ী। এই আইন এখনও পরিবর্তন করা হয়নি। সুতরাং ক-এর সচিব [মন্ত্রণালয়] যদি টাকা না চান তা'হলে কোন্ আইনে আমি তা দেব ?'

১৪২. শেখ মুজিবের আমল। ক উপ-রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর পরিচয় বিশ্ববিদ্যালয় জীবন থেকে। এই সচিবালয়ের দায়িত্ব ছিল সমস্ত মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা সমন্বয়ের।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী তখন অধ্যাপক মুজাফ্‌ফব আহমেদ, যিনি একসময ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও। ক ছিলেন একসময় তাঁব ছাত্র।

একবাব, শিক্ষা মন্ত্রণালয থেকে অনুমোদনেব জন্য একটি প্রকল্প পাঠানো হলো উপ-বাষ্ট্রপতিব সচিবালয়ে। প্রকল্পটেব ব্যাপাবে বেশি উৎসাহ ছিল শিক্ষা সচিব এবং পবিকল্পনা কমিশনেব সচিবেব। প্রকল্পটি ছিল— ঢাকা বেসিডেনশিযাল মডেল স্কুলে প্রাচীব ও বান্নাঘবেব কর্মচাবীদেব জন্য গৃহ নির্মাণ। ব্যয চল্লিশ লক্ষ টাকা। ১৯৭৪ সালেব দুর্ভিক্ষেব বেশ তখনও মিলিযে যাযনি।

ক এই পবিপ্রেক্ষিতে ফাইলে লিখলেন, এখন এই ধবনেব প্রকল্প শোভন নয, বিশেষ কবে সে শিক্ষালযে যেখানে খালি উচ্চবিত্তবাই পডাশোনাব সুযোগ পায। আব যদি এ টাকা খবচ কবতেই হয তা'হলে, বেশ কযেকটা হাইস্কুল পুনরুজ্জীবিত কবলেই হয।

নোট গেল উপ-বাষ্ট্রপতিব কাছে। এদিকে প্রকল্প পাস কবানোব জন্য ফোনও আসতে লাগল। উপ-বাষ্ট্রপতি ক-কে ডেকে বললেন এধবনেব কড' নোট না লিখলেও চলত। ক বললেন, 'আমি নোট দিযেছি, কিন্তু সিদ্ধান্তেব ভাব আপনাব।' সৈযদ নজরুল বললেন, 'দাঁডান, আমি একটু শিক্ষামন্ত্রীকে ফোন কবি।' মন্ত্রীকে ফোন কবে উপ-বাষ্ট্রপতি বললেন, 'স্যাব [বিশ্ববিদ্যালযেব অধ্যাপক হিসেবে সম্মান দেখানোব জন্য শিক্ষামন্ত্রীকে অনেকেই এ সম্বোধন কবতেন] প্রকল্পটি আপাতত স্থগিত বাখলে চলে না।' তাবপব দু'জনে ফোনে কী কথা হল ক বুঝলেন না। কিন্তু উপ-বাষ্ট্রপতি একসময গম্ভীব হযে ফোন বেখে বললেন ক-কে, 'ঠিক আছে, আপনাব মত আমি ডিসবিগার্ড কবব না।

কয়েকদিন পব ক জানলেন, উপ-বাষ্ট্রপতিব আপত্তি সত্ত্বেও, শিক্ষামন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে গিয়ে প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবব বহমানকে দিযে প্রস্তাবটি অনুমোদন কবিযে নিযেছেন। ক এ ঘটনা বর্ণনা কবে বললেন, 'এবপব থেকে অধ্যাপক মুজফফব আহমদকে আমি কোনদিন শিক্ষক হিসেবে আব শ্রদ্ধা কবতে পারিনি। এমনকি সম্মানসূচক 'স্যাব' হিসেবেও তাঁকে আব সম্বোধন কবিনি।'

১৪৩ দেশ তখন সদ্য স্বাধীন হয়েছে। ক নিযুক্তি পেয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। ঐ সময় ইউ এস এইড-এর এক কর্মকর্তা দেখা করলেন ক-এর সঙ্গে। জানালেন, বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে সববকমের সাহায্য করতে তাঁর সংস্থা বাজী। খুব সম্ভব একাত্তরে নিজ দেশের ন্যক্কারজনক ভূমিকার জন্য বেচারা নিজেকে অপরাধী মনে কবছিল। যা হোক, প্রাথমিকভাবে তাঁরা আলোচনা করে একটি প্রকল্প ঠিক

করলেন। সিদ্ধান্ত হল, প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত বাংলাদেশ টেক্সট বুক বোর্ড বই ছাপবে এবং তা বিনামূল্যে ছাত্রদের মাঝে বিতরণ করবে। এর জন্য যা ব্যয় হবে তা ডলারে ইউ এস এইড পরিশোধ করবে। ক এ মৌখিক চুক্তিতে খুশিই হলেন। কারণ, এতে শিক্ষার্থীরা ঠিক সময়ে বই পাবে আর অর্থমন্ত্রণালয়ের বহিঃসম্পদ বিভাগ পাবে কিছু বৈদেশিক মুদ্রা যা বাংলাদেশের জন্য তখন খুব জরুরী।

টেক্সট বুক বোর্ড এরপর মহা উৎসাহে কাজ শুরু করল। বই বাঁধানোর সময়, ক ইউ এস এইডের কাছে টাকা চাইলেন। বাঁধাইওয়ালারা তখন টাকার জন্য বোর্ডের চেয়ারম্যানের ওপর চাপ দিচ্ছে। ইউ এস এইডের সেই কর্মকর্তা ক-এর সঙ্গে দেখা করে বললেন, টাকার জন্য চিন্তা করার দরকার নেই। টাকা মজুদ আছে। তবে বোর্ডের বইয়ের প্রথম পাতায় যুক্তরাষ্ট্রের সেই বিখ্যাত প্রতীক 'করমর্দন'-এর ছবিটি ছাপতে হবে। এই করমর্দনের ছবি হবে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুত্বের প্রতীক।

এ ধরনের শর্তের কথা আগে বললে ক রাজী হতেন কিনা সন্দেহ। এখন তিনি পড়লেন সংকটে। বাঁধাইওয়ালারা একদিকে বোর্ডের চেয়ারম্যানকে পয়সার জন্য ঘেরাও করে রেখেছে। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলেও ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে তার ভূমিকা কেউ ভোলেনি। রাজনৈতিকভাবে তখন এই প্রস্তাব মেনে নেওয়ার উপায় ছিল না। ক সেটা জানালেন সেই কর্মকর্তাকে। কিন্তু তিনি জানালেন, ঐ শর্ত না মানলে টাকা দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে।

ক ইউ এস এইড কর্মকর্তাকে তখন একটু অপেক্ষা করতে বলে দেখা করতে গেলেন শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে।' ক মন্ত্রীকে সব বুঝিয়ে একটি প্রস্তাব দিলেন— ইউ এস এইড কর্মকর্তা যদি পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তা'হলে বাংলাদেশে তাঁকে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বলে ঘোষণা করা হবে। মন্ত্রী সায় দিলেন ক-এর প্রস্তাবে।

মন্ত্রীর ঘর থেকে ফিরে ক 'এইড' কর্মকর্তাকে জানালেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এখন খারাপ দেখে তিনি পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ এমনকি ব্ল্যাকমেলও করতে চাচ্ছেন। ঠিক আছে, তা তিনি করুন। কিন্তু তাঁর দেওয়া প্রতিশ্রুতি যদি তিনি না রাখেন তবে তাঁকে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি হিসাবে ঘোষণা করা হবে।

এ কথা শুনে মার্কিন ভদ্রলোক বিমূঢ় হয়ে গেলেন। তিনি এধরনের কথা আশা করেননি। ক তাঁকে আরো জানালেন, এখন তিনি যেতে পারেন এবং আগামী কয়েকদিনের মধ্যে ইউ এস এইডের সিদ্ধান্ত যেন তিনি জানিয়ে যান। এরপর এক সপ্তাহের মধ্যে ইউ এস এইড থেকে প্রতিশ্রুত টাকা এসে গেল।

১৪৪. সত্তর দশকের প্রথম দিকের ঘটনা। ক নিযুক্ত অর্থমন্ত্রণালয়ে। মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন তাজউদ্দিন আহমেদ।

ঢাকাব হোটেল ইণ্টারকন্টিনেণ্টালের মালিকানার আশিভাগ ছিল বাংলাদেশ সরকাবের, বাকি বিশভাগ ছিল মূল কোম্পানির। এই হোটেল সংক্রান্ত স্বার্থ বাংলাদেশের পক্ষ থেকে দেখতেন ক। স্বাধীনতার পর, হোটেল ব্যবস্থাপনা চুক্তি রিনিউ করার জন্য নিউইয়র্ক থেকে মূল কোম্পানির প্রতিনিধি এসেছে। আলোচনা চলছে। এমন সময় ভারতের 'ওবেরয় হোটেল' কর্তৃপক্ষও একটি প্রস্তাব দিল। কিন্তু প্রস্তাব বাংলাদেশ সরকারের অনুকূল না হওয়ায় ক তা প্রত্যাখ্যান করলেন।

বাংলাদেশে, ওবেরয়ের স্বার্থ দেখছে এমন একজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে পরিচয় ছিল অর্থমন্ত্রীর। তিনি গিয়ে ক-এর বিরুদ্ধে অর্থমন্ত্রীব কাছে অভিযোগ করে বললেন, 'আপনার অফিসার বন্ধু-রাষ্ট্রের স্বার্থ না দেখে, শত্রু যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি করছে।' এ অভিযোগ শুনে অর্থমন্ত্রী ক-কে ডেকে পাঠিয়ে বকাবকি করলেন। বললেন, 'কী পেয়েছেন আপনারা ? শত্রু রাষ্ট্রের কাছে দেশ বিক্রি করে দিচ্ছেন।'

'আমাকে যে কাজ দিয়েছেন স্যার, বিনীত ভাবে বললেন ক, 'তা দেশ বিক্রি করার জন্য নয়, দেশের স্বার্থ দেখার জন্য।'

'ওসব বুঝি না। কালকেই আমি দেখতে চাই যে ওবেরয়ের অফার নেওয়া হয়েছে।'

'আপনি স্যার এখন উত্তেজিত', বললেন ক, 'আমি আগামীকাল কাগজপত্র নিয়ে আসব।'

ক পরের দিন, দুটি অফারের তুলনামূলক আলোচনা, চার্ট করে কোন্‌টাতে লাভ, কোন্‌টাতে ক্ষতি— সব বিস্তারিত দেখিয়ে, ফাইল নিয়ে গেলেন মন্ত্রীর কাছে। মন্ত্রী সব দেখে বললেন, 'ঠিক আছে, এ কাগজপত্র আমি আবার অন্য আরেকজনকে দিয়ে পরীক্ষা করাব। কিন্তু এ বিষয়ে যে-কোন প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য তৈরি থাকবেন।'

তারপরের দিন অর্থমন্ত্রী ডেকে পাঠালেন ক-কে। ক ঘরে ঢোকামাত্র, বললেন, 'বসেন, চা খান।' চা পর্ব শেষ হলে মন্ত্রী বললেন, 'আপনার যুক্তি তো নড়ানো গেল না। ঠিকই করেছেন আপনি। আমাকে ভুল বোঝানো হয়েছিল। এ ধরনের কাজই আমি আশা করব আপনার কাছ থেকে।'

এরপর অর্থমন্ত্রী হিসেবে তাজউদ্দিন যতদিন ছিলেন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ততদিন ক-এর কোন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেননি।

১৪৫. স্বাধীনতার ঠিক পর পর ক ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন উপ-সচিব। এ সময় একটি 'টিচার্স ট্রেনিং কলেজ'-এর জন্য সোভিয়েত 'টেকনিকাল' সাহায্যের প্রস্তাব এলো। রাশিয়ানরা প্রস্তাব দিল, তারা যন্ত্রপাতি সরবরাহ করবে এবং বাংলাদেশের লোকদের তা ব্যবহারের জন্য শিক্ষা দেবে। বিনিময়ে বাংলাদেশকে তিন বা চারজন রুশ ট্রেনারের ব্যয়ভার বহন করতে হবে। ক-হিসেব করে দেখলেন, যন্ত্রপাতি থেকে ট্রেনারের ব্যয়ভার বেশি। তাই তিনি প্রস্তাব করলেন, এর বদলে দু'জন বাংলাদেশীকে যদি রাশিয়া পাঠানো হয় ট্রেনিং-এর জন্য তাতে বাংলাদেশের পক্ষে সুবিধা হয়। রাশিয়ানরা এ প্রস্তাবে রাজী হল না। বরং তারা ইঙ্গিতে জানাল, ক রাজী না হলে তারা প্রধানমন্ত্রীর কাছে যাবে। ক জানতেন, রুশ রাষ্ট্রদূত যখন খুশি তখন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে পারতেন। এসব জেনেও ক বহিঃসম্পদ মন্ত্রণালয়ের কাছে একটি কড়া নোট পাঠালেন। নোটের মূল বক্তব্য ছিল, একটি গরিব দেশের ওপর রাশিয়ানরা ইচ্ছে করে ব্যয়বহুল বিশেষজ্ঞ চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে যা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়।

সেই নোট গেল পরিকল্পনা সচিবের কাছে। তিনি নোট পড়ে ডেকে পাঠালেন ক-কে। বললেন ক-এর নোট তিনি পছন্দ করেছেন। কিন্তু ক কি জানে, যে, রাশিয়ানরা আরো অনেক মন্ত্রণালয়ের ওপর এ ধরনের প্রতিকূল শর্ত চাপিয়ে দিয়েছে। এবং কোন মন্ত্রণালয়েই তার প্রতিবাদ করেনি। সুতরাং ক-এর এই এক নোটে কী আর হবে। বরং, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওপরও হয়তো রাশিয়ানরা একই ধরনের প্রতিকূল শর্ত চাপিয়ে দেবে। এ জন্য ক-কে বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়নি। কিন্তু তিনি খুব ব্যথিত হয়েছিলেন। কারণ, বলেছেন তিনি, 'ছাত্রাবস্থা থেকেই আমি যুক্ত ছিলাম বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে।'

১৪৬. ১৯৭১-৭২ সালে শিল্প জাতীয়করণ করা হলে নিন্দুকরা অহরহ এর সমালোচনা করতেন। সমালোচনা করার সময় তাঁরা ভুলে যেতেন যে, এসব শিল্প কারখানার মালিকদের শতকরা পঁচানব্বই ভাগ ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানী। যাঁরা চলে গিয়েছিলেন দেশ ছেড়ে। বাঙালী ব্যবসায়ী বাছাই করে যে কারখানার ভার দেওয়া হবে সে রকম বাঙালীও ছিলেন না। তা'ছাড়া, এভাবে বাছাই করতে গেলে শিল্পক্ষেত্রে আরো বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হত। জাতীয়করণের প্রথম দিকে ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য দেখা দিয়েছিল তার কারণ, ভালো অনেক বাঙালী অফিসার তখনও আটকা পড়ে ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানে। সমালোচকরা কখনও এসব অনুধাবনের চেষ্টা করেননি। তাঁরা স্বীকার করতে চাননি যে, মাত্র

তিনবছরের মধ্যে ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে একটি ক্যাডার গড়ে তোলা হয়েছিল এবং ১৯৭৫-এর দিকে অবস্থার উন্নতিও হচ্ছিল।

এ পটভূমিকায়, একজন অবসরপ্রাপ্ত সচিব বললেন, ১৯৭২ সালে এ ধরনের উৎসর্গীকৃতপ্রাণ অফিসারদের জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চল সহ সারা দেশে ত্রিশলক্ষ মন খাদ্য-শস্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছিল, যদিও দেশে যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল প্রায় না থাকারই মতো। পরবর্তীকালে, এরকম অনেক দক্ষ অফিসারকে পদচ্যুত করেছিলেন জিয়াউর রহমান। সামরিক শাসকরা জাতীয়করণকৃত শিল্পকারখানাগুলি আবার ব্যক্তিগত মালিকানায় ফিরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তাতে কি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে? ১৯৮৫ সালেও দেখা যাচ্ছে বেসরকারী পাটকল থেকে মুনাফা বেশি হয়েছে জাতীয়করণকৃত পাটকলে।

১৪৭. স্বাধীনতার পর ··· মিলস কর্পোরেশন গঠিত হয়েছে। নবগঠিত কর্পোরেশনের একজন কর্মকর্তা হিসেবে নিযুক্ত হযেছেন ক। কর্পোবেশনের বিভিন্ন পদে লোক নেওয়া হবে। বিভিন্ন পদেব জন্য মনোনয়ন দিয়ে ক ফাইল পাঠালেন মন্ত্রীকে। মন্ত্রী সবাব পদ অনুমোদন করলেন একটি ছাড়া। সেটি হচ্ছে সচিবেব পদ। এ পদে ক মনোনয়ন দিয়েছিলেন এমন একজনকে যিনি ভাগ্যচক্রে ছিলেন মোনেম খানের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। ভদ্রলোক কিন্তু সব সময় মোমেন খান থেকে দূবে থেকেছেন এবং একজন অফিসাব হিসাবেও ছিলেন দক্ষ। ক ভেবেছিলেন সচিব পদে তাঁকে পেলে কর্পোরেশনের সুবিধা হবে। কিন্তু ক-এব অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও মন্ত্রী এতে রাজী হলেন না।

এরই মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব একদিন ডেকে পাঠালেন ক-কে। ক গেলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। ঘবে ঢোকা মাত্রই প্রধানমন্ত্রী বেশ কড়া গলায় তাঁকে নানা অভিযোগে অভিযুক্ত কবে তুললেন। যেমন বললেন প্রধানমন্ত্রী, 'ফরিদপুরে মিল হয়নি কেন?' দশ মিনিট পব শেখ মুজিব শান্ত হলেন, বললেন ক-কে, 'বসেন।' তারপর ক-এর সঙ্গে নবগঠিত কর্পোরেশন নিয়ে আলোচনা করলেন। ক তখন সচিব পদে মনোনয়নের ব্যাপাবটি তুললেন। শেখ মুজিব বললেন, 'কই, আমি তো এটা জানি না। মোনেম খানের আত্মীয় হয়েছে তো কী হয়েছে? আপনি নিশ্চয় জানেন, মুসলিম লীগ মন্ত্রী রাজাকার ওয়াহিদুজ্জামানের ছেলেকে নিরাপদে রাখার জন্য জেলে রেখেছিলাম কয়েকমাস। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি যান, আমি দেখছি।'

ক অফিসে ফিরতেই শুনলেন তাঁর মন্ত্রী তাঁকে ফোন করেছিলেন। ক আবার ফোন করলেন মন্ত্রীকে। মন্ত্রী বললেন, 'ক, আপনি জিতেছেন।'

১৪৮. সবে মাত্র ক্ষমতা হাতে নিয়েছেন শেখ মুজিব। কল-কারখানা জাতীয়-করণ করা হয়েছে। দক্ষ প্রশাসকের অভাব। এ পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিবের হঠাৎ মনে পড়ল, ক-এর কথা। দক্ষ প্রশাসক হিসেবে ক-এর খ্যাতি ছিল এবং ব্যক্তিগতভাবে শেখ মুজিব তাঁকে চিনতেনও। শেখ মুজিব তাঁকে চট্টগ্রামের একটি বৃহৎ কারখানা পরিচালনার জন্য মনোনীত করলেন এবং চট্টগ্রামেব এক আওয়ামী লীগ নেতাকে পাঠালেন ক-এব কাছে এ সিদ্ধান্ত জানাতে।

নেতা ক-এর সঙ্গে দেখা করে বললেন, 'বঙ্গবন্ধু তো চাটগাঁয়···আপনাকে দিতে চান। আমাদেরও আপত্তি নেই। তবে আমাকে লাখ খানেক টাকা দিতে হবে।' ক অবাক হয়ে বললেন, 'সে কি কথা। আমি আপনাকে শুধু শুধু টাকা দিতে চাইলেই বা সে টাকা পাব কোথায় ?'

নেতা বললেন, 'ও চিন্তার কোন কারণ নেই। কারখানায় এখনও পাঁচ-ছয় লাখ টাকার জিনিস আছে। এগুলি বিক্রি করে আপনি পাঁচ-ছয়লাখ টাকা পাবেন। আমবা বলব, যুদ্ধের সময় রেকর্ডপত্র সব পুড়ে গেছে। এ না হলে, আপনার পক্ষে সেখানে কাজ করা সম্ভব হবে না।'

ক সবিনয়ে তখন তাঁর নতুন চাকরি গ্রহণে অসম্মতি জানালেন।

১৪৯. প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান, বাংলাদেশের ব্যাঙ্কের গভর্নর ও অর্থ-মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন কালো টাকা ধরাব জন্য 'ডি মনিটাইজেশন' করা হবে। বিষয়টি আর কাউকে জানানো হয় নি এমনকি অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদকেও নয়। [এ নিয়ে পরে প্রশ্ন উঠেছিল, বিতর্কও হয়েছিল এবং শেখ মুজিবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের অবনতিও হয়েছিল]। নির্দিষ্ট দিন এ সম্পর্কিত ঘোষণা প্রকাশিত হল এবং দেশজুড়ে হৈচৈ পড়ে গেল। আওয়ামী লীগের নেতা বা অন্যান্যরা যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তারা সবাই চাপ দিতে লাগল টাকা জমা দেওয়ার তারিখ বৃদ্ধির জন্য। প্রধানমন্ত্রী সে চাপ মেনে নিয়ে পূর্বোক্ত আদেশ সংশোধন করলেন। ফলে, এ নির্দেশবলে যে ফল লাভ আশা করা গিয়ে-ছিল তা আর পাওয়া গেল না।

১৫০. পাকিস্তান আমলেও সরকারের শিল্পসংক্রান্ত নীতিতে প্রভাব বিস্তার করতেন ইনডেনটররা। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর তাই শেখ মুজিব সিদ্ধান্ত নিলেন, এবার বাণিজ্য হবে সরকারী পর্যায়ে। এ সিদ্ধান্ত বিত্তবানদের মধ্যে

প্রবল বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল এবং আওয়ামী লীগের মন্ত্রীদের দিয়ে তারা এটা বানচাল করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি। শেখ মুজিবের আমলে শেষের দিকে এ বিধিনিষেধ খানিকটা শিথিল করা হয়েছিল কিন্তু মুজিবের অপসারণের পর এ নীতি প্রত্যাহার করা হয়। এর অশুভ ফল, এখন ভোগ করতে হচ্ছে সারা দেশের সাধারণ মানুষ অথবা অন্যকথায় বাংলাদেশকে।

১৫১. পাকিস্তানী আমলে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে পান রপ্তানী করা ছিল লাভজনক ব্যবসা। স্বাধীন হওয়ার পর সরকার সিদ্ধান্ত নিলেন পান রপ্তানীর জন্য পারমিট দেওয়া হবে। পারমিট বিতরণের পর দেখা গেল, অধিকাংশ পারমিট পেয়েছে, জেলা পর্যায়ে আওয়ামী লীগের কর্মী বা নেতারা। এ নিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল অসন্তোষের। এবং একদিন একজন এ ব্যাপারে প্রশ্নও করেছিলেন শেখ মুজিবকে। মৃদু হেসে তিনি বলেছিলেন, 'গত বিশ বছর এরা কিছু পায়নি। এখন নাহয় কিছু পেল।'

১৫২. সত্তর দশকের গোড়ার দিককার ঘটনা। ক তখন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা। ইউনিসেফের সঙ্গে ঐ সময় বাংলাদেশ সরকারের একটি চুক্তি হয়। চুক্তি অনুযায়ী, ইউনিসেফ জরুরী ভিত্তিতে বাংলাদেশের স্কুলসমূহের জন্য কিছু উপাদান সরবরাহ করতে রাজী।

বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ক মাঝে মাঝে খবর নিতেন উপাদানগুলি পৌঁছলো কিনা জানার জন্য। একদিন শুনলেন, যে-জাহাজে ইউনিসেফ-প্রদত্ত সরঞ্জাম আসার কথা সে জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে ভিড়েছে কিন্তু ইউনিসেফের জিনিসপত্র আসেনি। ক তখুনি যোগাযোগ করলেন ঢাকাস্থ ইউনিসেফের কর্মকর্তার সঙ্গে। তিনি জানালেন, যে-ঠিকাদারকে এই মাল পরিবহনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সে এগুলি আত্মসাৎ করেছে, এবং এই ঠিকাদার নিয়োগ করতে হয়েছে শিক্ষামন্ত্রীর অনুরোধে। যদিও টেণ্ডারে ঠিকাদারের 'রেট' ছিল অনেক বেশি।

ক ছুটলেন মন্ত্রীর কাছে। জানলেন, ঠিকাদার হলেন শেখ মুজিবের ছোট ভাই শেখ নাসের। মন্ত্রী শেখ নাসেরের এই কীর্তি শুনে লজ্জায় মুখ নীচু করে রইলেন। তাঁর চোখে পানি চলে এসেছিল। একসময় মন্ত্রী বললেন, শেখ নাসেরকে নিয়োগের অনুরোধ জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী। এ বলে তিনি বসে রইলেন অসহায়ের মতো। এরপর ক এবং ইউনিসেফ কেউ-ই এ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেননি।

১৫৩. ক ও খ একই সঙ্গে সি এস পি হয়েছিলেন। শেখ মুজিব যখন

প্রেসিডেন্ট তখন তারা দু'জনই দুটি মন্ত্রণালয়ের সচিব। তবে, ক ছিলেন তখন অত্যন্ত প্রভাবশালী।

প্রেসিডেন্টের কাছে সরাসরি তিনি যেতে পারতেন। খ-ও শেখ মুজিবের পরিচিত। যুক্তফ্রন্টের সময় শেখ সাহেব যখন মন্ত্রী ছিলেন তখন খ তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন। সৎ ও সাহসী কর্মচারী হিসেবে তাঁর সুনামও ছিল।

ক একদিন খ-কে ডেকে বললেন, 'আপনাব হয়তো ধারণা শেখ সাহেব আপনাকে পছন্দ করেন। কিন্তু তা ঠিক নয়। আপনি আমাকে বিভিন্ন সময় সাহায্য করেছেন তাই একথা আপনাকে জানানো প্রয়োজন বলে মনে করছি। আমি চেষ্টা কবছি আপনার জন্য রাষ্ট্রদূতেব একটি পদ যোগাড় করার।'

এ কথার পর খ-এর মনে হল, ক ঠিকই বলেছেন। একটি জরুরী বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একটি ফাইল পাঠিয়েছিলেন প্রেসিডেন্টকে, কিন্তু সেটা না দেখেই তিনি বলেছেন, 'নিয়ে যাও, পরে।' এরকম আবো কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। শুধু তাই নয়, নতুন একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন সংস্থার প্রধান হয়ে যাওয়ার কথা খ-এর। সে বিষয়েও শেখ মুজিব কিছু বলছেন না। এসব কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে খ দেখা কবতে চাইলেন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে। আগে সাক্ষাৎ করতে চাইলে সঙ্গে সঙ্গে অনুমতি মিলত। এখন অনুমতি পাওয়া গেল তিনদিন পর।

প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করে খ সরাসরি বললেন, 'স্যার, আপনি যদি আমাকে পছন্দ না করেন বলে দিন, আমি চলে যাই। কারণ, এ চাকরিতে আমার আর কোন মোহ নেই। আমার কয়েকটি প্রস্তাব স্যার এতদিন হল, আপনি কনসিডার করেও দেখছেন না। একটি নতুন জরুরী কাজে আমার যাওয়ার কথা, সে ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন না। তা আমার থেকে কী লাভ?'

শেখ মুজিব এ সাক্ষাতের দু'দিন পরই খ-এর সব প্রস্তাব মঞ্জুর করে দিলেন।

১৫৪. একবার উচ্চপর্যায়ের এক বৈঠকের অবকাশে নানা বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছিল শেখ মুজিব ও কয়েকজন পদস্থ কর্মকর্তার। ক একটি মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, 'স্যার, শুনলাম আপনি নাকি সমবায়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে চাচ্ছেন। কিন্তু গত পঁচিশ বছরের সমবায়ের ইতিহাস তো ব্যর্থতার ইতিহাস।' মুজিব তাঁর দিকে তাকিয়ে উত্তর দিলেন, 'আমি অর্ধশিক্ষিত। আমার দরকার অর্ধশিক্ষিত লোকের। আপনার মতো অতি শিক্ষিত লোকের দরকার আমার নেই।'

১৩ সংকট ও প্রশাসন

১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর বাংলাদেশী আমলারা যে অবস্থার মুখোমুখি হয়েছিলেন বা সে অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য তাঁদের কেউ কেউ সাহস/ত্যাগ সততা/কর্মক্ষমতার মাধ্যমে যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন [হতে পারে তাঁদের সংখ্যা নগণ্য], সমকালীন ইতিহাসে এ ধরনের নিদর্শন বিরল। ফলে কারখানায় অসন্তোষ, বিভ্রান্ত মুক্তিযোদ্ধা ও শাসকদলের কর্মীদের দ্বারা সংঘটিত ঘটনাবলীর কথা বাদ দিলেও সিভিল সার্ভিসের অস্তিত্ব ও আইডেনটিটিও ছিল হুমকির সম্মুখীন। ১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমি এত জটিল যে, সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার সুযোগ বা মোটিভেশন সব আমলার এক ছিল না। ঢাকায় এমন অনেক ছিলেন তাঁদের যাপন করতে হয়েছে দ্বৈত জীবন—প্রকাশ্যে অনুগত পাকিস্তানী হিসেবে, অপ্রকাশ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তাকারী বা সমব্যথী হিসেবে।[১৩] অধিক সংখ্যক পাকিস্তানী সৈন্য আসার আগে, সীমান্তবর্তী অঞ্চলে কর্তব্যরত আমলাদের সুযোগ বেশি ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে গভীর মেলামেশা করার। অনেকের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল সীমান্ত পার হয়ে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার। সেখানেও তাঁদের সম্মুখীন হতে হয়েছে আর্থিক ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তায়। ঢাকায় আবার অনেকে পরিচিত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের সমব্যথী হিসেবে। তাদের এখানে জীবন যাপন করতে হয়েছে গ্লানি ও অনিশ্চয়তার মধ্যে। ১৯৭১-এর সময় এবং পরে এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। মুজিবনগর সরকারে কর্মরত আমলাদের অনেকে বাংলাদেশে অবস্থানরত আমলাদের চাকরিতে রাখা উচিত ছিল কিনা সে নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন [নকশা ১৫৫]।[১৪] এ পরিপ্রেক্ষিতে, ১৯৪৫-পরবর্তী ফ্রান্সের কথা বলা যেতে পারে, যেখানে জার্মান পুতুল সরকারের সহায়তাকারী আমলাদের হত্যা করা হয়েছিল নির্বিচারে। বাংলাদেশে এড়ানো হয়েছে এ ধরনের চরমপন্থা।[১৫] তবে নিছক সন্দেহের কারণে, স্বাধীনতাযুদ্ধের সমব্যথী কোন কোন আমলাকে বদলি করা হয়েছিল কম গুরুত্বপূর্ণ পদে [নকশা ১৫৬]। কিন্তু তার প্রধান কারণ, অস্থির সময়ে সঠিক তথ্যের অভাব। এ ধরনের নামমাত্র কয়েকটি ঘটনা ছাড়া অনেকেই পেয়েছিলেন প্রমোশন, পাকিস্তানীদের শূন্য পদে (নকশা ১৫৭), এবং এদের সবাই যে ১৯৭২-এর ঝঞ্ঝাময় সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সহৃদয় ছিলেন তা নয়। অনেক আমলাই অনুভব করেননি যে তাঁদের উচ্চপদের ভিত্তি মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ।[১৬] ফলে লজ্জাকর, হৃদয়হীন অনেক ঘটনাও ঘটেছে। দেখা গেছে,

একজন সচিব মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত ফাইল মাসের পর মাস আটকে রেখেছেন [নক্শা ১৫৮]। অবশ্য, একজন উপসচিব তখন সচিবকে উপেক্ষা করে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন।

স্বাধীনতার পর পর আমলাদের হাতে সম্পদ, যেমন, ফাণ্ড বা পুলিশ—যার দ্বারা মুখোমুখি হওয়া যায় সংকটময় পরিস্থিতির, তা ছিল কম। সে জন্য আমলাদের নির্ভর করতে হয়েছে সাহস, সততা এবং অনেক ক্ষেত্রে ভাগ্যের ওপর।[১৭] একজন ডি সি একটি কারখানায় শান্তি ফিরিয়ে এনেছিলেন শুধুমাত্র আলোচনা দ্বারা শ্রমিক প্রতিনিধিদের ক্লান্ত করে। এ আলোচনা চলেছিল একটানা ছত্রিশ ঘণ্টা [নক্শা ১৫৯]। আরেকজন ডি সি, গ্রামবাসীদের হুমকি দিয়েছিলেন শরণার্থীদের লুণ্ঠিত জিনিসপত্র ফেরত দিতে এবং তাতে কাজ হয়েছিল [নক্শা ১৫৯]।[১৮] বলে রাখা ভালো, এ হুমকি কার্যে পরিণত করার মতো শক্তি বা বা সম্পদ ডি সি-র ছিল না।

যখন ভারতীয় সেনাবাহিনীর একাংশ সাধারণের কাছে পরিচিত হয়ে উঠল মুক্তিযুদ্ধের সহায়তাকারী থেকে লুটেরা হিসেবে, তখন এই লুট থামাবার কোন উপায় বাংলাদেশের প্রশাসকদের ছিল না। এ পরিস্থিতি নিশ্চয় হতাশ করে তুলেছিল তাদের। এটি বিশেষভাবে আহত করেছিল সেসব প্রশাসকদের যারা ভারতে প্রবাসী সরকারের সঙ্গে ছিলেন কর্মরত। আবার এ কথাও সত্য যে, ঐ সময় আওয়ামী লীগের কিছু সদস্য এবং মুক্তিযোদ্ধাদের একাংশও ব্যবহার করছিলেন লুটেরার মতো এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশী সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যাপারটাও ছিল কষ্টকর। কিন্তু ঐ প্রলয়কর পরিস্থিতিতেও কয়েকজন সাহসী ডি সি-র সফল পদক্ষেপ সুফল এনে দিয়েছিল। একজন ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার জনৈক ডি সি-র অভিযোগ পেয়ে তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করে লুণ্ঠনকৃত বেশ-কিছু দ্রব্য ফেরত দিয়েছিলেন [নক্শা ১৬১]। আরেকজন ব্রিগেডিয়ারকে বলেও যখন ফল পাওয়া যায়নি তখন ডি সি শুধু সফররত ভারতীয় পার্লামেণ্ট সদস্যদেরই নয়, স্বয়ং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকেও[১৯] বিষয়টি জানিয়েছিলেন [নক্শা ১৬২]। এর ফলে, দ্রুত সেই বাহিনীকে ঐ অঞ্চল থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছিল।

বাঙালী বিহারী সংঘাতও ঐ সময়, বাংলাদেশের আমলাদের জন্য এক সংকটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। শান্তি রক্ষার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক পুলিশও তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল না। স্বাভাবিক ভাবেই বিহারীদের প্রতি মারমুখী ছিল বাঙালীরা, কারণ, ১৯৭১ সালে আগাগোড়াই তারা পাকিস্তানী বাহিনীর সহায়তা

করেছে, নির্যাতন, লুণ্ঠন, ধর্ষণ করেছে। পরাজিত পাকিস্তানী সৈন্যরা ফিরে যাবার সময় বেশ-কিছু অস্ত্রশস্ত্রও রেখে যায় বিহারীদের কাছে যাতে নবজাত রাষ্ট্রে এরা অস্থির অবস্থা বজায় রাখতে সাহায্য করে। এ পরিস্থিতিতে একজন ডি সি অভূতপূর্ব সাহস দেখিয়ে অহিংসনীতি প্রচার ও প্রয়োগ করে বিহারীদের আস্থাভাজন হন এবং তারা অস্ত্র সমর্পণ করে [নকৃশা ১৬৩]। ডি সি এই সময় অন্য একটি কাজে সদর ছেড়ে গেলে, বাঙ্গালীরা তখন নিরস্ত্র বেশ-কিছু বিহারীকে হত্যা করে [নকৃশা ১৬৪]। ডি সি ফিবে এসে সব শুনে যারা এই কাপুরুষোচিত কাজ করেছিল তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করেন।[২০] বিহারীদের তিনি পাস-পোর্টও ইস্যু করে দিচ্ছিলেন যাতে ইচ্ছুক বিহারীরা ভারতে চলে যেতে পারে। স্বাধীনতার পরিস্থিতি ছিল বাংলাদেশের আমলাদের জন্য এক কঠিন পরীক্ষার সময়। এমন সব পবির্স্থিতিব সম্মুখীন তাঁরা হচ্ছিলেন যেসব পরিস্থিতি তাঁদের প্রশিক্ষকরা কখনোই উদাহবণ হিসেবে দেখাতে পারেননি। যেমন, এক তরুণী টেলিফোন অপারেটর যে বিহারী বলে পরিচিত তাকে ধর্ষণ করেছিল তার বাঙালী প্রতিবেশী।[২১] তকণীটি ডি সির কাছে জানতে চায় সে কি বিহারী না বাঙালী, কারণ, তার পিতা বিহাবী, মাতা বাঙালী। ডি সি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নি [নকশা ১৬৫]। এ উত্তর কারো পক্ষেই দেওয়া সম্ভব নয়, ডি সি ছিলেন যেহেতু অবিবাহিত যেহেতু তিনি তকণীটিকে নিজের বাসায় আশ্রয় দিতে পারেন-নি। তখন তিনি মধ্যবয়সী এ ডি সি-কে অনুরোধ জানিয়ে ছিলেন, যতদিন পরিস্থিতি শান্ত না হচ্ছে ততদিন যেন তিনি, তরুণীটি ও তাব ছোটভাইকে তার বাসায় আশ্রয় দেন। ডি সি জানতেন, এরকম অনেক ঘটনা ঘটছে, অভিযোগ আকারে যা তার কাছে খুব কমই আসবে এবং তিনিও ঐসব অভিযোগের সব-গুলির প্রতিকার করতে পারবেন না। ঐ সময়ে নিরতিশয় সৎ ও দক্ষ একজন প্রশাসকের পক্ষেও সম্ভব ছিল না সব অবস্থা নিজের আয়ত্তে এনে নিষ্কলুষ প্রশাসন বজায় রাখা।

এখানে উল্লেখ্য যে, এ ধরনের পরিস্থিতিতে জনস্বার্থ এবং পেশাগত দক্ষতা বজায় রাখার জন্য অনেক আমলা জীবন-ঝুঁকি নিয়েছিলেন। ভবিষ্যতের আমলা-দের জন্য তাদের এ অভিজ্ঞতা উদাহরণ হয়ে থাকবে, সে উদাহরণের সম্মুখীন হয়তো তাঁরা আর হবেন না। স্বাধীনতার পর অনেক তরুণ মুক্তিযুদ্ধ করার সুবাদে, হাতে অস্ত্র নিয়ে তাঁদের ইচ্ছা অনেক সময় আমলাদের উপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছেন।[২২] আওয়ামী লীগের এম পি-বৃন্দ যাঁদের অধিকাংশ প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন

নি, এসব তরুণদের নিয়ন্ত্রণে রাখার মতো নৈতিক সাহস অর্জন করতে পারেননি। এসব তরুণদের অনেকে আবার পরিচিত ছিল 'ষোড়শ বাহিনী' হিসেবে।[২১] এর বিপরীতে, অনেক আমলা মনে করতেন, এসব বিভ্রান্ত, বেকার [এবং মানসিক-ভাবে বিপর্যস্ত] যুবকদের নানা কায়দায় শান্ত ও সুস্থ করা যেতে পারে। যেমন, একবার এক ডি সি এ ধরনের সশস্ত্র যুবকদের সঙ্গে আলোচনায় বসতেই রাজী হন নি [নক্শা ১৬৬]। আরেকজন ডি সি উদ্ধত ব্যবহার করায় সশস্ত্র এক যুবককে ঘুঁষি মেরে মাটিতে ফেলে দিয়েছিলেন [নক্শা ১৬৭]। এসব ক্ষেত্রে তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে পরে সুস্থ ব্যবহার করেছে। কিছু মুক্তিযোদ্ধা একটি শহরে পরিত্যক্ত কতকগুলি বাড়িঘর সম্পত্তি দখল করেছিল। ডি সি তা জানতে পেরে এসব সম্পত্তির হিসেবনিকেশের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন একজন ম্যাজিস্ট্রেট-কে। এতে লজ্জা পেয়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধারা এবং সব ধরনের সহযোগিতা করে-ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেটকে [নক্শা ১৬৮]। এমনকি অত্যন্ত ক্ষমতাধর একজন মুক্তি-যোদ্ধাকে [পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রাক্তন অফিসার][২২] জনৈক ডি সি আইনের অপব্যবহার করায় উচ্চতর কর্তৃপক্ষের সাহায্যে তাকে গ্রেফতার করিয়েছিলেন [নক্শা ১৬৯]। একটি মহানগর পৌর কর্পোরেশনের একজন প্রশাসক জনৈক মুক্তিযোদ্ধাকে ফিরিয়ে এনেছিলেন আইনের পথে। সাহসী সেই মুক্তিযোদ্ধা অস্ত্রের সাহায্যে দখল করছিল পরিত্যক্ত দোকানপাট [নক্শা ১৭০]। আইনের পথে এদের রাখতে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব ব্যর্থ হয়েছিলেন। বরং দেখা যায়, একজন মন্ত্রী [যিনি শেখ মুজিবের নিকট আত্মীয়] আলমের মতো একজন সাহসী মুক্তিযোদ্ধার ওপর নির্যাতন চালাচ্ছেন [নক্শা ১৭১]।[২৫]

পারিপার্শ্বিক অবস্থা, রাজনীতিকদের ক্ষমতার আস্ফালন ও দুর্নীতি দেখে মুক্তিযোদ্ধা আলম শেষে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন।[২৬] আওয়ামী লীগের এক নেতার কারণেই বিনা দোষে আলমকে যেতে হয়েছিল জেলে এবং সেখানেই তিনি আস্তে আস্তে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছিলেন। আওয়ামী লীগের রাজ-নৈতিক অবক্ষয়ের পরিচায়ক এধরনের ঘটনাই [দেশী ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র তো ছিলই] ১৯৭৫ সালে আওয়ামী লীগের পতন নিশ্চিত করে দিয়েছিল।

দুর্নীতিবাজ আওয়ামী লীগের অনেক নেতাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে চেয়েছেন অনেক সৎ আমলা এবং এতে শেখ মুজিবর রহমানও সায় দিয়েছেন। এভাবে রক্ষিত হয়েছে জনস্বার্থ এবং পেশাগত উৎকর্ষ। এ পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায়, জাল দলিল করে একটি পেট্রোল পাম্প অধিকার করে নেওয়া থেকে একজন

মন্ত্রীকে[২৭] বাধা দিয়েছেন একজন ডি সি [নকৃশা ১৭২]। প্রথমে দলীয় কর্মীদের কথা শুনে শেখ মুজিব ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন কিন্তু পরে, সমস্ত ঘটনা শুনে তিনি ডি সি-র কাজের প্রশংসা করেছেন। আরেকজন ডি সি কয়েকজন এম পি-র দ্বারা একজন ব্যবসায়ীকে[২৮] সম্পত্তি থেকে উৎখাত করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন [নকৃশা ১৭৩]। ঐ এম পি-রা মিথ্যা অভিযোগ তুলে বলেছিলেন ঐ ব্যবসায়ী ১৯৭১ সালে সহায়তা করেছিলেন পাক-বাহিনীকে সুতরাং তার বার্জ দুটি নিয়ে নেওয়া হোক। শেখ মুজিব এ ক্ষেত্রে সমর্থন জানিয়েছিলেন ডি সি-কে এবং ডি সিও সম্পূর্ণ ঘটনা তদন্ত করে দেখেছিলেন অভিযোগটি ভুয়া। আওয়ামী লীগের অনেক নেতা আসল বাজাকারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ না তুলে, অনেককে রাজাকার আখ্যা দিয়ে তাদের উত্ত্যক্ত করছিল এবং তারাও মুক্তি পাবার জন্য বাধ্য হচ্ছিল আওয়ামী নেতাদের ঘুষ দিতে [নকৃশা ১৭৪]।[২৯] এমনকি একজন মন্ত্রী কুখ্যাত এক রাজাকারকে আশ্রয় দিতেও দ্বিধা করেনি।[৩০] কুখ্যাত রাজাকারটি ছিল ধনী এক শিল্পপতি [নকৃশা ১৭৪]। রাজধানী ঢাকা শহরে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি সম্পর্কেও আওয়ামী লীগ নেতারা ছিল নির্লিপ্ত। মুজিব একবার একজন সৎ ও একরোখা আমলাকে ঢাকার ডি সি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এ পদক্ষেপে আওয়ামী লীগ নেতারা বাধা দিয়ে সফল হয়েছিলেন। কারণ, তারা নিশ্চিত জানতেন, ঐ ব্যক্তি ডি সি হলে দলীয় কর্মীদের বে-আইনি কাজে বাধা দেওয়া হবে [নকৃশা ১৭৫]।

বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হল। কিন্তু ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ দলের বিচক্ষণতা বা দায়িত্ববোধের বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেল না।[৩১] এমনকি, বিরোধী দলীয় একজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যার ব্যবস্থা নিতে[৩২] একজন এস পি-কে ইঙ্গিত করতেও দ্বিধা করতেন না একজন মন্ত্রী। অবশ্য, অনেক ক্ষেত্রে এস পি এ ইঙ্গিত উপেক্ষা করতেন [নকৃশা ১৭৬]। এমনকি ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষও[৩৩] আওয়ামী লীগকে নাড়া দিতে পারেনি। শেখ মুজিব নিজেও যেন আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলেন [নকৃশা ১৭৭]। অধিকন্তু, কিছু আমলার অপদার্থতা শাসক দলের অযোগ্যতা ও দায়িত্বহীনতার কুফল তুলেছিল বাড়িয়ে। যেমন, নকৃশা ১৭৭-এর ঘটনার খাদ্য সচিব। পরবর্তীকালে ঐ খাদ্য সচিব জনৈক সামরিক নেতার অনুগ্রহে লাভ করেছিলেন খাদ্যমন্ত্রীর পদ।

নক্‌শা

১৫৫. স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালীন অনেক সরকারী চাকুরে চলে গিয়েছিলেন দেশ ছেড়ে। তাঁদের অধিকাংশই প্রবাসী সরকারে যোগ দিয়েছিলেন।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের ঠিক আগে, প্রবাসী সরকারের একটি বৈঠক হয়েছিল। বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল মুজিব নগরে যে যে পদে বহাল রয়েছেন, স্বাধীন বাংলাদেশেও তারা সে সে পদে বহাল থাকবেন। তরুণ সিভিল সার্ভেণ্টরা প্রস্তাব করেছিল, ঢাকায় যাঁরা চাকরি করছেন তাঁদের সবাইকে বরখাস্ত করতে হবে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ক। তিনি ছিলেন তাঁদের সবার সিনিয়র এবং প্রভাবশালীও। তিনি এর বিরোধিতা করে বলেছিলেন, যারা একমাত্র দোষী তাদেরই শুধু শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। মুজিব নগরে বসে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে না। এ কথায় 'জুনিয়ররা' যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু ক-এর প্রস্তাবমতোই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

১৫৬. স্বাধীনতার ঠিক আগে ক ছিলেন একটি জেলার ডি সি। স্বাধীনতা-সংগ্রাম চলাকালীন মুক্তিযোদ্ধাদের একটি গ্রুপের সঙ্গে তাঁর সংযোগ ছিল। সুতরাং ব্যক্তি হিসেবে তিনি গ্রহণযোগ্য ছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে।

স্বাধীনতার পর, ঐ জেলার ডি সি হিসেবে নিযুক্তি দেওয়া হল এমন একজনকে যিনি ছিলেন তার আগে একটি মহকুমার এস ডি ও [ইপি সি এস ক্যাডারের]। ভদ্রলোকের সঙ্গে আওয়ামী লীগের কোন কোন নেতার সম্পর্ক ছিল বেশ ভালো। ঐ সময় দেশে যে ধরনের অস্থিরতা বিদ্যমান ছিল, তাতে সময়মত সব খবর ঢাকায় পৌঁছত না ; সম্ভবত সেজন্য ঢাকাস্থ কর্মকর্তারা স্বাধীনতা যুদ্ধে ক-এর ভূমিকা সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন না।

নতুন ডি সি র নাম ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা বললেন, তারা এ আদেশ কার্যকর করতে দেবেন না। এদিকে কয়েকদিনের মধ্যে মুজিব-কোট পরে পান চিবুতে চিবুতে নতুন ডি সি এসে বললেন ক-কে, 'ভাই সাহেব, চার্জ দেন।' মুক্তিযোদ্ধারা বললেন, নতুন ডি সি-কে তারা চার্জ নিতে দেবেন না। ফলে, সৃষ্টি হল এক জটিল পরিস্থিতির। ক-তখন ছোটখাটো একটি জনসভা করে বললেন, 'অন্য সব কথা ছেড়ে দেন। আমি দেশে ছিলাম, 'সহযোগিতা' করেছি পাক বাহিনীর সঙ্গে। আমার চলে যাওয়াই উচিত।

মুক্তিযোদ্ধারা এসব কথা শুনতে রাজী নয়। তিনি তাদের অনেক বুঝিয়ে, নতুন ডি সি-কে চার্জ দিয়ে রওয়ানা হলেন ঢাকার দিকে। এর আগে অবশ্য

ফোনে কেবিনেট সেক্রেটারির সঙ্গে আলোচনা করে নিয়েছিলেন পরিস্থিতি নিয়ে। ক-এর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দলও গিয়েছিলেন ঢাকায়, তাঁকে আগের পদে বহাল রাখার জন্য তদবির করতে। কিন্তু ক নিজেই আর ফিরে যেতে চাননি পুরনো পদে।

১৫৭. স্বাধীনতার পর স্বাভাবিকভাবে, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিরাজ করছিল বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য। প্রবাসী ও স্বদেশে অবস্থানকারী আমলাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল দ্বন্দ্বের। সে সময় ক ছিলেন সবচেয়ে প্রভাবশালী সরকারী চাকুরে। তিনি যতটা সম্ভব ততোটা এই দ্বন্দ্ব নিরসনের চেষ্ট' করেছিলেন। সরকাবী চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের পর তাঁর অনেক সহকর্মী অভিযোগ করে বলেছেন, স্বাধীনতার পর পর সিনিয়র এবং একজন প্রভাবশালী কর্মকর্তা হিসেবে তিনি তাঁদের যথাযথ প্রোটেকশন দেননি। এ পরিপ্রেক্ষিতে ক মন্তব্য করেছেন. 'এ ধবনেব পবিস্থিতিকে অন্যান্য দেশে আমলাদেব ফাঁসী দেওয়া হয়েছে এবং সবাই তাই মনে কবেছে স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাধীনতার পর এখানকাব আমলাদের বিরুদ্ধে সেবকম কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এমনকি তাদের চাকুরিচ্যুতও করা হয়নি বরং তাঁরা প্রমোশান পেয়েছেন—অংশত পাকিস্তানী আমলাদের প্রস্থানের ফলে। কিন্তু, এ সুবিধাগুলির কথা তাঁবা কখনও অনুভব করেননি।

১৫৮. সত্তর দশকের গোড়াব দিকে ক ছিলেন একটি মন্ত্রণালয়ের উপসচিব। তাঁর সচিব ও তিনি নিজে—দু'জনেই পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের সদস্য। তবে ক ছিলেন মুক্তিযুদ্ধফেরত আর সচিব অবস্থান কবেছিলেন দেশেই।

১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে অনেকছাত্র ছাত্রী খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সাহায্যের জন্য তারা ধর্না দিচ্ছিল মন্ত্রণালয়ে। তাদের সাহায্য করার জন্য মন্ত্রণালয়ে অর্থও বরাদ্দ করা ছিল। ক প্রত্যেকের কাগজপত্র তৈরি কবে [ফাইল] পাঠাচ্ছেন সচিবের কাছে। কিন্তু অনুমোদন আসে না। দিনের পর দিন যায়। ক্ষতিগ্রস্তরা সচিবের কাছে গেলে তিনি তাদের পাঠিয়ে দেন ক-এর কাছে। অবস্থা অসহনীয় হয়ে উঠলে ক একদিন সোজা সচিবের ঘরে ঢুকে তাকে অনুবোধ করলেন এবং বললেন পুরনো ফাইলগুলি ছেড়ে দিতে। সচিব অসন্তুষ্ট হলেন বটে কিন্তু ক সামনে বসে থাকায়, বেশ-কিছু ফাইল সেদিন ছেড়ে দিলেন '

মুক্তিযুদ্ধে অনেক মুক্তিযোদ্ধা হাত বা, পা চোখ হারিয়েছিলেন। তাঁদের অনেকেও ক-এর কাছে আসতেন সাহায্যের জন্য। ক ভেবে দেখলেন, সাময়িক-ভাবে তাঁদের আর্থিক সাহায্য দিয়ে খুব একটা লাভ হবে না। বরং সমাজে

তাদের সুপ্রতিষ্ঠিত কবার জন্য দীর্ঘমেয়াদী একটি পরিকল্পনা নেওয়া দরকার। এ পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসনের জন্য ক একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত কবে সচিবের কাছে প্রেরণ করলেন। এ ধবনেব পরিকল্পনার জন্য অর্থমন্ত্রণালয়ের ছাড় পাওয়া বরাদ্দ অর্থও ছিল। সুতরাং এ নিয়ে কোন ঝামেলা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু কয়েকমাস সচিব ফাইলটি ফেলে রাখলেন। এ ধরনের আচরণ নবীন বয়সের যুদ্ধফেরত ক-এব সহ্য হল না। সরাসরি একদিন সচিবের কাছে গিয়ে তিনি অনুরোধ করলেন একদিনেব মধ্যে যেন ফাইলটি তিনি ছেড়ে দেন। খুব বিরক্ত হয়ে সচিব মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে কিছু কটূক্তি ক'বে তাঁদের সমব্যথী হওয়ার জন্য ক-কে ব্যঙ্গও করলেন। ক আর সহ্য করতে না পেরে সচিবকে সাবধান করে দিয়ে বললেন, ভবিষ্যতে যদি তিনি মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে এ ধরনের মন্তব্য করেন তা'হলে এর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ক-কে যতটা যাওয়া দরকার তা তিনি যাবেন। ক সচিবের টেবিলে চাপড় মেবে তাঁকে এও বললেন যে, মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে দেখেই তিনি আজ সচিব হতে পেবেছেন। তারপর ক্রুদ্ধ ক সজোরে সচিবের ঘরের দরজা বন্ধ কবে হনহন করে ঢুকলেন মন্ত্রীর ঘরে। মন্ত্রী ক-কে চিনতেন মুজিবনগরে থাকার সময়।

সচিবের ঘরে যা ঘটেছে ক তা খুলে বললেন মন্ত্রীকে। এবং তাঁকে অনুবোধ জানালেন [ক-কে] অন্য মন্ত্রণালয়ে বদলি করে দেওয়ার জন্য। কারণ, এ মন্ত্রণালয়ে তিনি কাজ করতে পারছেন না। ফলে হতাশ বোধ করছেন। এরপর ক-এর ভাষায়—

'আমার মন্ত্রী রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার আগে ছিলেন কলেজেব অধ্যাপক। আমার সচিব যিনি পাকিস্তান এলিট সার্ভিসের তাঁর থেকে মন্ত্রীর বুদ্ধি কোন অংশে কম ছিল না বরং তিনি ছিলেন অনেক বেশি ন্যায়পরায়ণ। মন্ত্রী ধৈর্য ধরে আমার কথা শুনে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, এ ব্যাপারে যা হোক তিনি কিছু একটা করবেন।'

ক এরপর চলে এলেন নিজের ঘরে। তার কিছুক্ষণ পবেই মন্ত্রী ঢুকলেন তাঁর ঘরে। বললেন ক-কে যে তিনি নিজেও সচিবের ব্যাপাবে অসন্তুষ্ট। কিন্তু, সচিবের বদলির দাবি জানিয়ে এখন তিনি আর প্রশাসনিক টেনশন বাড়াতে চান না। তিনি ক-কে অনুরোধ জানিয়ে বললেন, ফাইলটা যেন ক তাঁর কাছে পৌঁছে দেন তা'হলে সেটা অনুমোদন করে দেবেন। শুধু তাই নয়, এ ধরনের কোন ফাইল নিয়ে জটিলতা দেখা দিলে ক যেন সোজা তাঁর কাছে চলে আসেন।

এরপর থেকে এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হলে ক সচিবের কাছে ফাইল না নিয়ে চলে যেতেন সোজা মন্ত্রীর কাছে।

১৫৯. স্বাধীনতার পর পর ক ছিলেন একটি জেলার ডি সি। তখন কলকারখানায় বিরাজ করছে চরম বিশৃঙ্খলা। জেলাব একটি কারখানা ঘেরাও করেছিলেন শ্রমিকরা। ক শ্রমিকদের দাবিদাওয়া আলোচনার জন্য শ্রমিক নেতাদের আমন্ত্রণ জানালেন। আলোচনা শুরু হল এবং ক একটানা ছত্রিশ ঘণ্টা আলোচনা চালালেন। দীর্ঘ আলোচনার ফলে নেতারা হয়ে পড়েছিলেন ক্লান্ত এবং অমনোযোগী। ফলে, এরপর ক যা বললেন তারা তাই মেনে নিলেন।

১৬০. ১৯৭২। ডি সি হিসেবে ক গেছেন এক গ্রাম-পবিদর্শনে। এক হিন্দু ভদ্রলোক তাঁকে জানালেন, যুদ্ধেব সময় তিনি চলে গিয়েছিলেন সীমান্ত পেরিয়ে। স্বাধীন হবাব পর গ্রামে ফিবে দেখেন তার অধিকাংশ তৈজসপত্র তাব প্রতিবেশীবা নিয়ে গেছে। কিছু জিনিসপত্র এখনও আছে তাঁব এক মুসলমান প্রতিবেশীব ঘবে। তাঁকে অনুরোধ জানাবার পরও তিনি জিনিসপত্র ফেরত পাচ্ছেন না।

অভিযোগ শুনে ক গ্রামবাসীদেব ডেকে পাঠালেন। বললেন, যাঁবা এই হিন্দু ভদ্রলোকের জিনিসপত্র নিয়ে গেছেন তাঁরা যেন তা এক সপ্তাহেব মধ্যেই ফেরত দিয়ে দেন। এক সপ্তাহ পব তিনি এসে আবাব খোঁজ নেবেন। এবং তখন যদি দেখেন তাঁর নির্দেশের হেবফের হয়েছে তা হলে গ্রামবাসীদেব বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থা নেবেন। ঐ সময়ে অবশ্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবাব মতো পুলিশ ক-এব হাতে ছিল না। কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যে ক খবব পেলেন অভিযোগকারী ভদ্রলোক তাঁর অধিকাংশ জিনিসপত্র ফেরত পেয়েছেন।

১৬১. ১৯৭২ সালের গোড়ার দিককার ঘটনা। ক সীমান্তবর্তী একটি জেলার ডি সি। স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা একদিন তাঁর কাছে এসে অভিযোগ কবলেন, ভারতীয় বাহিনীরা জিনিসপত্র লুট কবে নিয়ে যাচ্ছে। ক তখনই ফোন করলেন স্থানীয় ভারতীয় কমাণ্ডার এক ব্রিগেডিয়াবকে। মুক্তিযোদ্ধাদের অভিযোগ জানালেন তিনি। ব্রিগেডিয়াব বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হলেন। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, ভারতীয় ট্রাক সব কালেকটবেটেব সামনে এসে মালপত্র স্তূপ করে যেতে লাগল। কিন্তু সব 'কনজিউমার গুড্স'। সামরিক বা 'ক্যাপিটল গুড্স' নয়।

১৬২. স্বাধীনতা যুদ্ধেব পর পর সীমান্তবর্তী একটি জেলায় তুমুল অরাজকতা চলছিল। বিহারী, রাজাকার হত্যা ছাড়াও লুট চলছিল দু'ধরনের। ভারতীয় সেনাবাহিনী লুট করছিল 'ক্যাপিটল গুড্স' আর মুক্তিযোদ্ধা একজন মেজরের

নেতৃত্বাধীন লোকজন লুট করছিল 'কনজিউমার গুড্‌স।' ভারতীয় বাহিনীর কমাণ্ডার ছিলেন একজন ব্রিগেডিয়ার। ক ছিলেন ডি সি। মুক্তিযোদ্ধা, বয়সে নবীন। ভারতীয় বাহিনীর লুটের কথা তাঁকে অবহিত করেছিলেন তাঁর এস পি।

এ পরিপ্রেক্ষিতে ক একদিন নিজেই গেলেন ব্রিগেডিয়ারের সঙ্গে দেখা করতে। কুশল বিনিময়ের পর সরাসরি তিনি বললেন, 'আপনার ট্রুপস লুট করছে। ঐটা বন্ধ করতে হবে।' ব্রিগেডিয়ার ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'হ্যাভারস্যাকে করে যন্ত্রপাতি লুট করা যায় না।'

'তারা হ্যাভারস্যাকে লুট করছে না,' বললেন ক, 'লুট করছে তারা শক্তিমান ট্রাকে।

'আমরা এ দেশের জন্য রক্ত দিয়েছি', আরো ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন ব্রিগেডিয়ার, 'আর আপনি এখন দু'দেশের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট করতে চাইছেন।'

ক ফিরে এলেন। তারপর এস পি-কে বললেন, কী পরিমাণ যন্ত্রপাতি লুট করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তার একটি বিবরণ তৈরি করতে। এস পি সেই বিবরণ তৈরি করে দিলে তিনি তা সব উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে পাঠালেন। এর মধ্যে ভাবত থেকে কয়েকজন এম পি এবং ব্রিটেনের সাংবাদিক মার্টিন উলাকটও এসে-ছিলেন সে জেলায় সফর করতে। তিনি তাদের কাছেও সেই বিবরণের কপি বিতরণ কবলেন। ফলে, অল্প সময়ের মধ্যে এই লুটপাটের কথা জানাজানি হয়ে গেল। এখানে উল্লেখ্য যে, জেলার আওয়ামী লীগ নেতাদের অধিকাংশ তখন মারোয়াড়ীদের নিয়ে ব্যবসা সংক্রান্ত লেনদেনের কাজে ব্যস্ত ছিলেন।

এরই মধ্যে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন পি এন হাকসারের মেয়ে নন্দিনী হাকসার। ক তাকে অনুরোধ করলেন, একটি চিঠি কোনোভাবে ইন্দিরা গান্ধীর হাতে পেঁাছে দেওয়া সম্ভব হবে কিনা। নন্দিনী রাজী হলেন। ক ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে যে চিঠিটি দিলেন, তার মূলকথা ছিল— প্রোটোকল অনুযায়ী সরাসরি তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে লিখতে পারেন না কিন্তু এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তাঁকে বাধ্য করছে সেই প্রোটোকল ভাঙতে। চিঠির সঙ্গে সংযুক্ত করে দিলেন সেই বিবরণটি। [বিবরণটি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে পেঁাছানোই ছিল মূল উদ্দেশ্য]।

এর কয়েকদিন পর, একদিন রাত একটায়, সেই ব্রিগেডিয়ার ও এক কর্নেল এসে ক-এর বাসভবনে হাজির। এবার দেখা গেল ব্রিগেডিয়ার আর তেমন উদ্ধত নন। বরং বিনীতভাবে ক-কে তিনি জানালেন, দু'জনের মাঝে একটা

ভুলবোঝাবুঝি হয়েছে। ক নাকি প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠি লিখেছেন। আজ রাতের মধ্যে তাঁব বাহিনীকে এই জেলা ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়েছে। এ বিষয়ে নাকি তদন্তেবও আদেশ দেওয়া হয়েছে। ক যদি চিঠিটা প্রত্যাহার করেন তা'হলে তাঁরা অনেক ঝামেলা থেকে হয়তো মুক্তি পেতে পারেন। ক সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন।

ঐ সময় পরিস্থিতি ছিল অস্বাভাবিক। অনেকে এই লুটকে দেখেও না-দেখাব ভান করেছে অনেকটা বন্ধুত্ব ও কৃতজ্ঞতার কারণে. অনেকে সাহস পাননি, অনেকে আবার সহযোগিতাও কবেছেন। কয়েকদিন বয়স হওয়া রাষ্ট্রের সরকারেরও সেই সাহস বা দৃঢ়তা না থাকাই স্বাভাবিক [যে পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে]। ক তাই কৌশলে এই বিশৃংখলা বন্ধ করতে চেয়েছিলেন।

১৬৩. স্বাধীনতার ঠিক পর পরই ক নিযুক্ত হয়েছেন একটি জেলার ডি সি হিসেবে। জেলার ভার গ্রহণের পর, প্রথম যে সমস্যার সম্মুখীন হলেন তিনি তা হল বিহারীদের নিয়ে। বিহারীরা সবাই একটি অঞ্চলে এসে আশ্রয় নিয়েছিল এবং তা তাদের শক্ত ঘাটি হিসেবে ছিল পরিচিত। প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রও ছিল তাদের কাছে। অন্যদিকে, বাঙালীরা সব ধরনের সরবরাহ বন্ধ করে এলাকাটি রেখেছিল অবরোধ করে।

এ উত্তেজনা তাড়াতাড়ি প্রশমন না করতে পারলে মারাত্মক দাঙ্গার সম্ভাবনা ছিল। ক তাই একদিন নিরস্ত্র হয়ে প্রবেশ করলেন বিহাবীদের এলাকায়। গিয়ে দাঁড়ালেন একটি খোলা জায়গায়। যাতে আশেপাশের বাড়ি থেকে খালি চোখে তাঁকে দেখা যায়। তাবপর একটি মাইক হাতে নিয়ে উর্দু'তে তিনি নিজেব পরিচয় দিয়ে বললেন. 'আমি তোমাদের কাছে এসেছি একেবারে নিরস্ত্র হয়ে। তোমাদের আশ্বাস দেওয়ার জন্য। তোমাদের সব অস্ত্র একটি খালি বাড়িতে এনে জমা করো। তোমবা আমার ওপব বিশ্বাস রাখতে পারো, কেউ তোমাদের ওপর হামলা করবে না। আমি তোমাদের পানি খাবার সব-কিছু বন্দোবস্ত করছি।'

ক-এর আশ্বাসে কাজ হল। বিহারীরা খালি একটি বাড়িতে এনে অস্ত্র জমা করতে লাগল। প্রচুর অস্ত্র। ক-ও সেই এলাকায় পাহারার বন্দোবস্ত করে তাদের খাবার, পানি সরবরাহের বন্দোবস্ত করলেন।

১৬৪. উপরোক্ত [নকশা ১৬৩] জেলার, একই সময়ের ঘটনা। বিহারীদের আশ্বাস দিয়ে কয়েকদিন পর তিনি গেলেন একটি মহকুমা পরিদর্শন করতে।

পরিদর্শন শেষে সদরে ফিরে এসে শুনলেন, বিহারী এলাকায় তথাকথিত মুক্তি-যোদ্ধারা হামলা করে অনেককে হত্যা করেছে। ক নিজেকে দোষী এবং খুবই অপমানিত বোধ করলেন। কারণ, তাঁর আশ্বাসের ভিত্তিতেই বিহারীরা অস্ত্র জমা দিয়েছিল। তিনি এর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার বন্দোবস্ত করলেন। খুঁজে পেতে অপরাধী সন্দেহে দশ-বারোজন তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধাকে ধরা হল। জনসমক্ষে, নিজের হাতে তিনি তাদের প্রহার করলেন, ভবিষ্যতে এ কাজ করতে যাতে কেউ সাহস না পায়। অন্যদিকে. বিহারীদের রক্ষার জন্য দ্রুত তিনি তাদের পাসপোর্ট ইস্যু করতে লাগলেন যাতে তারা যে ভারত থেকে একসময় এসেছিল বিতাড়িত হয়ে, আবার ফিরে যেতে পারে সে ভারতেই আরেকবার বাস্তুহারা হয়ে।

১৬৫. স্বাধীনতার ঠিক পরের, একটি জেলার ঘটনা। ক ছিলেন সে জেলার ডি সি।

একদিন সকালে, এক সুন্দরী তরুণী এসে তাঁর কাছে কেঁদে পড়ল। কাঁদতে কাঁদতে তরুণীটি বলল, 'আমার বাবা বিহারী, মা বাঙালী। এখন আপনি বলুন, 'আমি কি বাঙালী, না বিহারী?' প্রশ্ন করে ক জানলেন, মেয়েটি টেলিফোন এক্সচেঞ্জের অপারেটর। বিহারী বলে চিহ্নিত করে পাড়ার বাঙালী সন্তানরা তাকে আট-ন'বার ধর্ষণ করছে।

ক অবিবাহিত। এ অবস্থায়, তরুণীটিকে আশ্রয় দেন কোথায়? অনেক ভেবে তিনি ডেকে পাঠালেন তাঁর প্রৌঢ় এ ডি সি-কে। অনুরোধ জানালেন, যতদিন অবস্থা শান্ত না হয় ততদিন যেন তিনি মেয়েটি ও তার ছোটভাইটিকে আশ্রয় দেন। এ ডি সি রাজী হলেন।

এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ক মন্তব্য করে বলেছেন, 'আমি জানতাম আমার জেলায় অনেক অসহায় মেয়ে আছে। সবাইকে রক্ষা করতে পারছি না। কিন্তু যে আশ্রয় চেয়েছে তাকে তো রক্ষা করতে পারলাম।'

১৬৬. স্বাধীনতালাভের অল্পদিনপরে ক একটি জেলার নবনিযুক্ত ডি সি হিসেবে চার্জ নিতে এসেছেন। স্বাধীনতার আগে যিনি ছিলেন সদরের এস ডি ও তিনিই তখন জেলার ডি সি। ডি সি-র ঘরে গিয়ে ক দেখলেন তাঁকে ঘিরে বসে আছেন কয়েকজন এম পি। এবং এস এল আর, কাঁধে এক যুবক ধমকাচ্ছে ডি সি-কে। এরই মাঝে ক চার্জ বুঝে নিলেন তারপর আগ্নেয়াস্ত্র কাঁধে যুবক ও তার সঙ্গীদের [এরাও আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছিল] ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার?' ছেলেরা জানাল তাদের কিছু দাবিদাওয়া আছে। ক বললেন, ঠিক আছে,

তিনি তাদেব কথা শুনবেন। কিন্তু তাদেব কাছে অস্ত্র থাকলে তিনি কথা বলবেন না। শুধু তাই নয়, তাদেব মধ্যে থেকে দু'জন প্রতিনিধিব নাম বেখে যেতে হবে যাদেব সঙ্গে দু'দিন পব তিনি কথা বলবেন। ক-এব দৃঢ়তা দেখে তাবা তাঁব কথা মেনে নিল।

১৬৭. ১৯৭২। ক একটি জেলাব ডি সি। তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধাদেব তখন খুব উৎপাত। একদিন ক অফিসে বসে লোকজনেব সঙ্গে কথা বলছেন এমন সময় একজন তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধা ঢুকল ঘবে। কাঁধে স্টেনগান। ক তাকে বললেন, স্টেনগানটি বাইবে বেখে আসতে। সে তাব তোযাক্কা না কবে বেশ অবহেলাব ভঙ্গীতে সবাব দিকে তাকিযে বসল ক-এব সামনে এক চেযাবে। ক হঠাৎ উঠে প্রচণ্ড এক ঘুষি চালালেন তাব মুখে। চেযাবসহ সে ছিটকে পড়ল। তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধা এ ধবনেব ব্যবহাব কল্পনাই কবেনি। মেঝে থেকে উঠে সে ক্ষমা চেযে বেবিযে গেল ঘব ছেড়ে।

১৬৮. দেশ স্বাধীন হযেছে। ক এখন জেলাব ডি সি নিযুক্ত হযেছেন যেখানে পূর্বে বসতি ছিল অনেক অবাঙালীব। ক-এব কাছে প্রতিনিযত অভিযোগ আসছিল যে, মুক্তিযোদ্ধাবা অবাঙালীদেব পবিত্যক্ত ঘববাড়ি দোকানপাট দখল কবে নিচ্ছে, লুট কবছে জিনিসপত্র [এদেব অধিকাংশই ছিল তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধা যাবা পবিচিত ছিল 'ষোড়শবাহিনী' হিসেবে]।

এসব অভিযোগ শুনে একদিন অবাঙালী অধ্যুষিত একটি এলাকা পবিদর্শনে গেলেন ক। দখলকাবী বেশ-কিছু যুবকেব সঙ্গে আলাপ হল। তাদেব তিনি বললেন, তাবা যা কবছে তা হযতো ভালো কিন্তু এখন তাদেব সঙ্গে একজন ম্যাজিস্ট্রেট থাকবেন। এবং সে যে জিনিসেব 'দাযিত্ব' নিচ্ছে তাকে পবে সে জিনিসেব হিসাবপত্র বুঝিয়ে দিতে হবে।

এবপব এ ধবনেব অবাজকতা অনেকটা প্রশমিত হয়েছিল।

১৬৯. ১৯৭২ সালে ক ছিলেন একটি জেলাব ডি সি। ঐ জেলায় তখন অবস্থান কবছিলেন একজন মেজব, মুক্তিযুদ্ধে যিনি বেশ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। ধবা যাক তাঁব নাম খ।

খ জেলা শহবে তাঁব সঙ্গীদেব নিয়ে পবদ্রব্য অপহবণ করছিলেন, সৃষ্টি কবছিলেন অবাজকতাব। নিজে তিনি একটি দখল কবা গাড়িতে ঘুবে বেড়াতেন। আবেকজনের কাছ থেকে একটি গাড়ি ছিনিয়ে তিনি উপহাব দিয়েছিলেন ভাবতীয় বাহিনীব একজন সেনানায়ককে। মাবোয়াড়ীদেব সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের আলাপও

চালিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি একই সঙ্গে। কিন্তু শহরের কারো সাহস ছিল না তাঁর বিরুদ্ধে কিছু বলার।

ক একদিন তাঁকে ডেকে বললেন যে, এসব বন্ধ করতে হবে এবং তাঁর বাহিনীকেও সংযত করতে হবে। খ এসব কথায় বিন্দুমাত্র কর্ণপাত না করে ক-কে চড়া গলায় 'নিজের চরকায় তেল দিতে' বলে চলে গেলেন।

ঐ পরিস্থিতিতে ক দেখলেন অনুরোধ জানিয়ে কিছু হবে না। তাই তিনি তাদের চলাচল সীমিত করতে চাইলেন। শহরের পেট্রোল পাম্পের মালিকদের ডেকে বললেন, এখন থেকে পেট্রোল রেশন করতে হবে। সুতরাং ডি সি অফিসের অনুমোদন ছাড়া বাড়তি পেট্রোল কাউকে দেওয়া যাবে না। পেট্রোল সরবরাহ কমে যাওয়ায় খ-এর বাহিনীর চলাচল সীমিত হয়ে এলো। এই পরিপ্রেক্ষিতে খ. ক-এর কাছে এসে প্রচণ্ড হৈচৈ করলেন। ক অনড় থেকে বললেন, যারই পেট্রোল দরকার তাকেই প্রয়োজন দেখিয়ে ক-এর কাছ থেকে রশিদ [অনুমোদ] নিতে হবে। খ ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গেলেন এবং খুব সম্ভব সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন মহলে ক-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানালেন।

এর কয়েকদিন পর ষাট বছরের এক বৃদ্ধা বিহারী এসে জানালেন ক-কে যে. খ-এর লোকেরা তাঁর তিনটি মেয়েকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে।

ক আবার খ-কে ডেকে এর ব্যাখ্যা চাইলেন। খ বলল. 'বাহ্, বিহারীরা কি আমাদের মেয়েদের ধর্ষণ করেনি ?'

ক বললেন, এসব যুক্তি এখানে চলবে না। দু'ঘণ্টার মধ্যে যদি অপহৃত মেয়েদের ফেরত না দেওয়া হয় তবে তিনি হবেন খ-এর পরম শত্রু। খ কোন তোয়াক্কা না করে চলে গেলেন। ক সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদকে সমস্ত ঘটনা লিখে জানালেন। সঙ্গে সঙ্গে এও জানালেন, খ-কে যদি এখান থেকে প্রত্যাহার না করা হয় তা'হলে তিনি এখানে থাকবেন না। খ-ও অন্যদিকে জেনারেল ওসমানীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আর ওসমানী খুব সম্ভব লেঃ কর্নেল [পরবর্তীকালে জেনারেল ও নিহত] মনজুরকে নির্দেশ দিলেন ব্যাপারটি দেখার জন্য।

ক এবং কর্নেল মনজুর এক সময় পাবলিক স্কুলে একই সঙ্গে পড়াশোনা করেছেন এবং কর্নেল মনজুর ছিলেন ক-এর সিনিয়র। এবং ক ও তাঁর বন্ধুরা কর্নেল মনজুরকে বেশ সমীহ করতেন। মনজুর তখন পোস্টেড ছিলেন পার্শ্ববর্তী ক্যান্টনমেণ্টে। ক অবশ্য জানতেন না মনজুরকে পাঠানো হয়েছে তদন্তের জন্য।

এর কয়েকদিন পর ক অফিসে বসে কাজ করছেন। এমন সময় কর্নেল মনজুর তাঁর ঘরে ঢোকার অনুমতি নিয়ে ভিতরে ঢুকে তাঁকে স্যালুট করে বললেন, কী, ক, ব্যাপার কী?' ক শশব্যস্ত হয়ে বললেন, 'আরে মনজুর ভাই, করেন কী, করেন কী।' মনজুর বললেন, 'ব্যস্ত হোয়ো না। যে চেয়ারে বসে আছ তার প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো আমার কর্তব্য, এখন বলো সব ঘটনা।'

ক তখন তাঁকে পুরো ঘটনা খুলে বললেন। মনজুর বললেন— ক্যান্টনমেন্টে মিটিংয়ের নাম করে তাকে পাঠিয়ে দাও। আই উইল রোপ ইন দ্যাট বাস্টার্ড।'

ক পরদিন খ-কে খবর পাঠিয়ে জানালেন ক্যান্টনমেন্টে জরুরী মিটিং। তাকে তখুনি যেতে হবে। খ রওয়ানা হলেন ক্যান্টনমেন্টের দিকে। পথে কর্নেল মনজুরের বাহিনী তাকে গ্রেফতার করে। এভাবে শহরে খ-এর ত্রাসের রাজত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে।

১৭০. সত্তর দশকের গোড়ার দিকে ক ছিলেন পৌর কর্পোরেশনের প্রশাসক। সদ্য স্বাধীনদেশে সব ক্ষেত্রেই বিরাজ করছে বিশৃংখলা, নৈরাজ্য। একদিন খসরু [তৎকালীন 'যুব নেতা' এবং পরে অভিনেতা] তার দলবল নিয়ে এসে ঢুকল ক-এর অফিস ঘরে। তার হাতে একটা রিভলবার। মাঝে মাঝে তা শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে সে লুফে নিচ্ছে। ক জিজ্ঞেস করলেন, 'কাকে চান?'

'আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, 'বলল খসরু। আসলে খসরু ও তার সঙ্গীরা তাঁকে ভয় দেখিয়ে পৌর কর্পোরেশনের কিছু সম্পত্তির ওপর দখল পাকা করতে চাইছিল।

'আমার সঙ্গে দেখা করার নিয়ম তো এটা নয়।' বললেন ক, 'অফিসের একটা ডিসিপ্লিন আছে।'

'কিসের ডিসিপ্লিন?' তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল খসরু।

'প্রত্যেক অফিসের একটা ডিসিপ্লিন আছে,' দৃঢ় স্বরে বললেন ক, 'আমার সঙ্গে দেখা করতে হলে আপনাকে স্লিপ দিতে হবে। তারপর আমার সময় হলে কথা বলব, নয়তো নয়।'

খসরু তখন তার সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আচ্ছা, তোরা যা, আমিই কথা বলব।'

'না, আপনিও যান।' বললেন ক, 'স্লিপ দিয়ে তারপর আসুন।' কিন্তু যখন দেখলেন খসরু একটু নমিত তখন তিনি বললেন, 'আচ্ছা, আপনি থাকুন। আপনার আর এখন স্লিপ লাগবে না। বসুন।'

তারপর ক খসরুকে পরামর্শ দেওয়ার ভঙ্গীতে বললেন, আপনারা দেশ স্বাধীন করেছেন, সবাই আপনাদের অনুসরণ করবে। আপনারা কি চান সবাই এভাবে আপনাদের অনুসরণ করুক, ইত্যাদি। এরপর খসরু অনেকবার ক-এর কাছে এসেছে বিভিন্ন এলাকার অভিযোগ নিয়ে, কোন কিছু পাওয়ার প্রত্যাশায় আর নয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে ক-এর মন্তব্য, 'প্রশাসনে তেমন রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ না হলে, স্বাধীনতার পর এসব ছেলেরা চলে যেত না।'

১৭১. ক তখন একটি মন্ত্রণালয়ের প্রভাবশালী যুগ্ম সচিব। একদিন তাঁকে ফোন করলেন জেনারেল [তখনও হননি] মনজুর। ক-কে জানালেন তিনি, বরিশালে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল অসীম সাহসী এক ছেলে। সবাই তাকে ডাকত 'বিচ্ছু আলম' বলে। এখন তাকে কারাগারে আটক করে রাখা হয়েছে, ক কি কিছু করতে পারবেন তার জন্য ? ঘটনার পটভূমিকা ছিল এ রকম—

যুদ্ধশেষে বরিশালে নিজ বাড়িতে ফিরে এসে আলম দেখে তার ঘরবাড়ি সব ধ্বংস হয়ে গেছে। মা-বোনেরা প্রায় অভুক্ত থাকে। পরনে আস্ত কাপড়ও নেই। অন্যদিকে, শেখ মুজিবের ভগ্নীপতি ও মন্ত্রী আবদুর রব সেরনিয়াবাত ও তাঁর অনুচররা সারা শহরে জাঁকজমক আর তাণ্ডব করে বেড়াচ্ছে। আলম তখন তার বয়সী আরো অনেককে সঙ্ঘবদ্ধ করে এর প্রতিবাদ জানায়। সেরনিয়াবাত এতে ক্ষিপ্ত হয়ে মিথ্যা মামলা দিয়ে আলমকে গ্রেফতার করায়। এই পরিপ্রেক্ষিতেই জেনারেল মনজুর অনুরোধ জানিয়েছিলেন ক-কে।

ক অবশ্য তখন কিছুই করতে পারেননি। শেখ মুজিব নিহত হওয়ার পর তিনি আলমের মুক্তির ব্যবস্থা করে তাকে ছোটখাটো একটা ব্যবসা ধরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সরল আলমকে ব্যবসাতেও অনেকে প্রতারণা করল। এসমস্ত মিলে মুক্তিযোদ্ধা সহজ সরল আলমকে শেষে পাগল করে দেয়।

১৭২. স্বাধীনতা যুদ্ধ শেষ হয়েছে। ক নিযুক্তি পেয়েছেন একটি জেলার ডি সি হিসেবে। তাঁর এলাকা থেকে যিনি মন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন তিনি ছিলেন বেশ প্রভাবশালী। ঢাকায় থাকতেন তিনি আর তাঁর এলাকায় তাঁর স্বার্থ দেখতেন স্থানীয় একজন এম পি। ধরা যাক তাঁর নাম খ। পেশায় খ ছিলেন অ্যাডভোকেট এলাকায় পরিচিত ছিলেন মন্ত্রীর ডান হাত হিসেবে।

ঐ সময় খ-এর প্রধান কাজ ছিল, রাজাকার বলে লোক ধরে তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করা। অবশ্য টাকা আদায় হলে সে তাদের ছেড়ে দিত। একবার পুলিশ তার পক্ষের কয়েকজনকে গ্রেফতার করে। খ, ও সি-কে চিঠি দেয়

তাদের ছেড়ে দেওয়ার জন্য। ও সি ঘটনাটি জানিয়ে চিঠিটি পেশ করেন ক-এর কাছে। ক চিঠিটা রেখে দিলেন তাঁর কাছে।

ঐ এলাকার একটা পেট্রোল পাম্পের মালিক ছিলেন একজন অবাঙালী যাঁর পার্টনার ছিলেন উল্লিখিত মন্ত্রী। যুদ্ধের পর অবাঙালী ভদ্রলোক বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যান। একদিন খ এসে ক-কে অনুরোধ জানিয়ে বললেন, যেহেতু পেট্রোল পাম্পের অংশীদার বাংলাদেশ ত্যাগ করেছেন সেহেতু পেট্রোল পাম্পটি এখন মন্ত্রীর নামে হবে।

ক পেট্রোল পাম্প সংক্রান্ত দলিলপত্র দেখতে চাইলেন। খ দলিলপত্র এনে দেখাল ক-কে। ক দেখলেন, সেগুলি জাল। এ নিয়ে খ-এর সঙ্গে তাঁর উত্তপ্ত তর্ক হল এবং এক পর্যায়ে ক থাপ্পড় মেবে বসলেন খ-কে। বললেন সবার সামনে [এ তর্কবিতর্কের সময় আবো কয়েকজন উপস্থিত ছিল]। 'আপনারা আইনের লোক, দেশের আইন তৈরির ভার আপনাদের ওপর। আপনারা বে আইনি কাজ কবেন কিভাবে ?' এরপর ক এসব কাগজপত্র স্বরাষ্ট্র সচিবকে পাঠিয়ে বললেন, তিনি অব্যাহতি চান ডি সি পদ থেকে।

এদিকে ভিমরুলের চাকে ঢিল পড়েছে। স্থানীয় আওয়ামী লীগেরা খুবই ক্ষুব্ধ। পারলে তারা খুন করে ফেলে ক-কে। খবর পৌঁছে গেছে শেখ মুজিবের কাছে। একজন ডি সি-র এধরনের আচরণে তিনি ক্রুদ্ধ। তাঁর ব্যক্তিগত সচিব [যিনি ছিলেন ক-এর পরিচিত] ক-কে ফোন করে জানালেন, সম্ভব হলে পরদিন সকালেই যেন তিনি ঢাকা রওনা দেন।

সারা শহর জুড়ে এই একই কথার আলোচনা। এ সময় মুক্তিযোদ্ধারা এসে বলল ক-কে, আপনাকে থাকতে হবে। আমরা এর শেষ দেখে ছাড়ব। ক জানালেন, তিনি সরকারী কর্মচারী। অর্ডার পেয়েছেন চলে যাওয়ার। সুতরাং তিনি চলে যাবেন। এবং রাতের বেলায় তিনি রওনা হলেন ঢাকার দিকে।

ইতিমধ্যে স্বরাষ্ট্র সচিব এই ঘটনা সংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে হাজির করেছেন শেখ মুজিবের কাছে এবং তাঁকে বুঝিয়েও বলেছেন সব। শেখ মুজিব তখন ক্রুদ্ধ হয়ে ফোন করলেন উল্লিখিত মন্ত্রীকে। গালিগালাজ করলেন। শেখ সাহেব মন্ত্রীকে যা বললেন তার মর্মার্থ হল, এসব টাউটদের জন্য সরকারী কর্মচারীরা পর্যন্ত কাজ করতে পারছে না। তারপর প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিকে তিনি নির্দেশ দিলেন ক-কে আবার তার পুরনো পদে ফিরে যাওয়ার কথা বলতে। ক অনেক কষ্টে সে আদেশ রদ করে সচিবালয়ে যোগ দিলেন উপ-সচিব হিসেবে।

১৭৩. ক ছিলেন…একজন বড় ব্যবসায়ী। শেখ মুজিবরের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কও ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি নিজ এলাকাতেই ছিলেন। যুদ্ধের পর, মুজিবনগর-ফেরত এম পি-রা তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে কিছু আদায় করা যায় কিনা তার অজুহাত খুঁজছিলেন। ক-এর ছিল দুটি বার্জ। রটিয়ে দেওয়া হল, পাকিস্তানী সৈন্যদের কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল চার্জ দুটি। ক বললেন, না এগুলি ব্যবহৃত হয়েছিল খাদ্য আনা-নেওয়ার জন্য। আটক করা হল বার্জ দুটি। স্থানীয় এম পি-রা, জাহাজ ও নৌ-চলাচল মন্ত্রী জেনারেল ওসমানীকেও ব্যবসায়ীব বিরুদ্ধে 'কনভিন্স' করে ফেললেন।

প্রধানমন্ত্রীব সচিবালয়ের একজন কর্মকর্তা ছিলেন খ। এব° খ-এব বন্ধু গ ছিলেন ক-এর এলাকার ডি সি। খ ও গ দু'জনেই মুক্তিযোদ্ধা এব° দু'জনকেই স্নেহ করতেন শেখ মুজিব এবং জেনারেল ওসমানী। ক-এর জামাই ছিলেন খ-এব বন্ধু। সেই সুবাদে খ-কে কিছুটা জানতেনও। ক ইচ্ছে করলে সবাসরি শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা কবতে পারতেন বা খ-এর মাধ্যমে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানাতে পারতেন। কিন্তু তিনি এসব না কবে. পুবো ঘটনা বিবৃত করে বেশ একটা ফর্মাল দরখাস্ত পাঠালেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে। শেখ মুজিবের কাছে ছিল অবস্থাটা বিব্রতকর। তিনিও সরকারীভাবে ডি সি গ-কে নির্দেশ দিলেন ঘটনাটি তদন্তের জন্য। তদন্ত কবে গ জানালেন ক-এর কথাই সত্য। প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে তখন নির্দেশ গেল বার্জ দুটি ছেড়ে দেওয়ার জন্য।

জেনাবেল ওসমানী এ খবর জেনে, প্রধানমন্ত্রীর দফতরে এসে হৈচৈ শুরু করে দিলেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বললেন, 'খ আপনাকে মিসলেড করেছে। আসল ঘটনা অন্যরকম। আমি এ ইস্যুর ওপর পদত্যাগ করব।'

'না এটা ঠিক নয়,' বললেন প্রধানমন্ত্রী, 'আমরা নিরপেক্ষ তদন্ত করেছি।'

'তদন্ত, কে তদন্ত করল ?'

'…ডি সি গ।' গ সম্পর্কে ওসমানীর ধারণা ছিল খুব ভালো। তাই একথা শুনে তিনি একটু দমে গেলেন। কিন্তু বললেন,'মন্ত্রী হিসেবে আমার মতামত নেওয়া হয়নি।'

'না, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমি কনভিন্সড' বললেন শেখ মুজিব, 'তা ছাড়া আপনি আমার অফিসারদের ব্যাপারে অহেতুক অভিযোগ করছেন যা ঠিক নয়। তাঁরা সবাই হ্যাণ্ড পিক্‌ড।'

জেনারেল ওসমানী তখন দুঃখ প্রকাশ করে চলে গেলেন।

১৭৪. স্বাধীনতা যুদ্ধ সমাপ্ত। চারদিকে অস্থির অবস্থা। আওয়ামী লীগের

এম পি-রা চাচ্ছেন, বিরোধী দলীয়দের কোন অজুহাতে ধরিয়ে দিতে। প্রশাসন চাচ্ছে রাজাকারদের ধরতে। ক এ পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের এম পি-দের কাছে ডি সি [একটি জেলার] হিসেবে প্রধান রাজাকারদের নাম চাইলেন। কিন্তু এম পি-রা তা দিতে পারলেন না। ক তখন এস পি-কে বললেন একটি তালিকা তৈরি করতে। এস পি তালিকা তৈরি করলে সে তালিকা অনুযায়ী ধরা হল সব রাজাকারদের।

কিন্তু ঐ এলাকার রাজাকার নেতা খ-কে ধরা গেল না। খ-এর আছে জুট মিল, ধনী ব্যক্তি, এক নামে সবাই তাকে চেনে। যুদ্ধচলাকালীন সময়ে খ পাকিস্তানী বাহিনীর সক্রিয় সহযোগী হিসেবে খুন, ধর্ষণ, সব করেছে। খ-এর কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। ক এস পি-র ওপর খুব রাগারাগি করলেন।

কয়েকদিন পর এস পি এসে বললে, 'স্যার খ-এর খোঁজ পেয়েছি। সে আশ্রয় নিয়েছে এক মন্ত্রীর বাসায় এজন্য মন্ত্রী প্রচুর টাকা নিয়েছেন খ-এর কাছ থেকে।' ক অসহায় হয়ে বসে রইলেন।

এর মধ্যে মন্ত্রী একদিন ক-কে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি যে লোকদের [অর্থাৎ বামপন্থীদের] ধরতে বলেছিলেন তাদের ক ধরেছেন কিনা। উত্তরে ক বললেন, 'না।' মন্ত্রী তখন রাগত স্বরে বললেন, 'নির্দেশ দিলে আপনারা তা শোনেন না। ছিলেন এস ডি ও আমরা এসে করেছি ডি সি।' ক-ও ক্রুদ্ধ হয়ে জবাব দিলেন, 'আমি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পেয়েছিলাম। বাংলাদেশ না হলেও আমি ডি সি হতাম। কিন্তু যাক সে কথা, খ-কে পাচ্ছি না কেন?'

মন্ত্রী ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন। ক-কে আর না ঘাটিয়ে চলে গেলেন। রাজাকার খ এখন বাংলাদেশের প্রধান ধনীদের একজন।

১৭৫. ১৭২ নম্বর ঘটনার উল্লিখিত ক তখন একটি মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব। কিন্তু মন্ত্রণালয়ে কাজ করতে গিয়েও দেখলেন সব দিকে প্রতিকূলতা। প্রশাসনে কোন শৃংখলা নেই। সব মিলিয়ে তিনি হতাশা ও অবসাদে ভুগতে লাগলেন। ঠিক করলেন, উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ চলে যাবেন। বিনাবেতনে ছুটির জন্য দরখাস্ত পাঠালেন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে।

ক-এর দরখাস্ত প্রধানমন্ত্রীর টেবিলে অনুমোদনের অপেক্ষায়। এমন সময়, প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব ফোন করে জানালেন ক-কে, যে প্রধানমন্ত্রী এখনি তাঁকে বলেছেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। সচিবালয় থেকে রিকশা নিয়ে ছুটলেন ক গণভবনের দিকে।

প্রধানমন্ত্রীর ঘরে ঢুকে তিনি দেখলেন, তাঁকে ঘিরে বেশ কয়েকজন বসে আছেন। ক-কে দেখে প্রশান্ত হাসিতে ভরে উঠল শেখ মুজিবের মুখ। বললেন, নানা জনের কাছে তিনি ক-এর প্রশংসা শুনেছেন। তা ক এতদিন দেখা করেনি কেন তাঁর সঙ্গে? উত্তরে বিনীতভাবে ক বললেন. সরকারী চাকুরে হিসেবে এটা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। আর তিনি না ডাকলে ক যদি দেখা করতে আসেন তবে সেটা নিয়মের বরখেলাফ হবে। শেখ মুজিব এরপর তাঁকে কাছে ডেকে সস্নেহে সশব্দ চুম্বন করলেন। তারপর বললেন, তিনি চান ক যেন, হয় ঢাকা অথবা পার্বত্য চট্টগ্রামের ডি সি-র পদ গ্রহণ করেন। কারণ, তিনি শুনেছেন ক নির্ভীক, সৎ, ন্যায়পরায়ণ। সুতরাং এ দুটি গুরুত্বপূর্ণ পদে ক-ই হচ্ছে যোগ্যতম ব্যক্তি।

ক-এর তখন আর দেশে থাকতে ইচ্ছেই করছে না। তাই তিনি বললেন, এর আগে তিনি···ডি সি ছিলেন এবং সেখানে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। আওয়ামী লীগের হস্তক্ষেপের কথা আর তিনি উল্লেখ করলেন না। শেখ মুজিব সেসব ঘটনা ভোলেননি। বরং অনুরোধ জানালেন তিনি সেসব কথা ভুলে যাবার জন্য।

এরপর ক বললেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে তাঁকে যদি ডি সি হিসেবে যেতেই হয় তা' হলে সামরিক বাহিনীর লোকজন তাঁর সঙ্গে থাকতে পারবে না। সে অঞ্চলে সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধান দরকার এবং তিনি সেখানে তা করতে পারবেন। আর যদি ঢাকায় তিনি থাকেন তা'হলে প্রধানমন্ত্রীকে স্পষ্টভাবে 'চেইন অফ কমাণ্ডে'র কথা বলে দিতে হবে। না হলে, ঢাকায় কাজ করা সম্ভব হবে না। কারণ এখানে যাঁরা আছেন তাঁরা পদমর্যাদায় ও কর্তৃত্বে তাঁর অনেক উপরে। মুজিব বললেন ক-কে, 'ঠিক আছে, তুমি ঢাকার ডি সিই হইবা। আর বিদেশ যাওয়ার চিন্তা কইরো না। সেই বন্দোবস্ত আমিই করুম।'

চার-পাঁচদিন পর ক-এর সঙ্গে দেখা করতে এলেন আওয়ামী লীগের একজন কর্মী। তাঁর সঙ্গে ক-এর জানাশোনা ছিল। তিনি ক-কে জানালেন, দু-একদিন আগে তিনি শেখ মুজিবের ঘরে বসে আছেন এমন সময় সেখানে ঢুকলেন খ [সেই সময় আওয়ামী লীগের তরুণ নেতা। বর্তমানে সমাজতন্ত্র স্থাপনে অঙ্গীকারবদ্ধ একটি দলের নেতা]। কথায় কথায় শেখ মুজিব খ-কে বললেন, তিনি ঠিক করেছেন ক-কে ঢাকার ডি সি করবেন। সঙ্গে সঙ্গে খ তার প্রতিবাদ করে জানালেন, ক ঢাকার ডি সি হলে আওয়ামী লীগের বারোটা বাজিয়ে দেবে। কেননা ছাত্র-জীবনে ক ছিল বামপন্থী। খ ভালো করেই জানতেন ক ডি সি হলে আওয়ামী

লীগের মস্তানদের দৌরাত্ম্য সহ্য করবেন না। শেখ মুজিব খানিকটা অপ্রস্তুত হয়েই খ-কে জানালেন, ক ঢাকার ডি সি হতে চায়নি। তিনি নিজেই এর প্রস্তাব করেছেন। ক বরং উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যেতে চায়। খ তখন বললেন, ক-এর মতো মেধাবী ছাত্র খুব কমই দেখা যায়। প্রধানমন্ত্রীর উচিত বরং এ ধরনের মেধাবীদের বিদেশ থেকে উচ্চশিক্ষিত করে আনা।

এরপর শেখ মুজিব ক-এর ফাইলে. স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে দিলেন—ক-কে যেন একটি স্কলারশিপ দিয়ে বিদেশ পাঠিয়ে দেওয়া হয় উচ্চশিক্ষার জন্য। ফাইল গেল পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে। তারা বিদেশী একটি সংস্থা থেকে ক-কে একটি স্কলারশিপ দিয়ে পাঠিয়ে দিল বিদেশে।

১৭৬. একদিন রাত বারোটায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মনসুর আলী কোন-এক জেলার এস পি-কে ফোন করে বললেন, 'আপনার ওখানে একটা খারাপ লোক আছে (বিরোধীদলীয় রাজনীতিবিদ)। তার ব্যবস্থা করুন।' অর্থাৎ তাকে 'লিকুইডেট' করে ফেলতে হবে। এস পি কারো সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করলেন না। দিন তিনেক পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবার ফোন করলেন তাঁকে, 'কি হল? ঐ লোকের কোন ব্যবস্থা হয়েছে?' এস পি জানালেন, লোকটিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তার পর অবশ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছ থেকে আর কোন ফোন আসেনি।

১৭৭. ১৯৭৪ সাল। সারা দেশ জুড়ে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি। ঐ সময় শেখ মুজিব গেলেন কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগ দিতে। ঐ পরিস্থিতিতে হয়তো তাঁর যাওয়া উচিত ছিল না। যাক, তবুও তিনি গেলেন।

ক তখন···মন্ত্রণালয়ের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। শেখ মুজিব যাওয়ার আগে তিনি দেখা করলেন তাঁর সঙ্গে এবং কিছু লঙ্গরখানা খুলবেন কিনা তা জানতে চাইলেন। শেখ মুজিব অনুমতি দিলেন না। কিন্তু ক, নিজের উদ্যোগে প্রতিটি জেলায় লঙ্গরখানা খোলার প্রস্তুতি নিতে লাগলেন।

শেখ মুজিব ফিরলেন কমনওয়েলথ সম্মেলন থেকে। দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে। ক একদিন জামালপুর গেলেন সফরে। সেখানে গিয়ে দেখলেন খাদ্য মজুদ সম্পর্কে যে রিপোর্ট সচিবালয়ে পাঠানো হয়েছে সে পরিমাণ খাদ্য গুদামে নেই। বুঝলেন সর্বত্রই এ অবস্থা। ফিরে এসে খাদ্য সচিবকে তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন, একদিন সারা দেশে বিতরণ বন্ধ রেখে হিসেব নেওয়া হোক আসলে গুদামে কী পরিমাণ চাল আছে। খাদ্যসচিব তাতে রাজী হননি।

জামালপুর থেকে তিনি আবার গেলেন কুড়িগ্রাম। যাবার আগে মন্ত্রীকে

জানিয়ে গেলেন, হেলিকপ্টারে যাবেন। এয়ারপোর্টে দেখেন ইত্তেফাকের দু'জন রিপোর্টার দাঁড়িয়ে। তাঁর পূর্বপরিচিত। তাঁরাও যাবেন কুড়িগ্রাম। কিন্তু যাবার বন্দোবস্ত করতে পারছেন না। ক-কে দেখে তাঁরা অনুরোধ জানালেন হেলিকপ্টার তো খালি যাচ্ছে, ক কি তাঁদের নেবেন তাঁর সঙ্গে। রাজী হলেন ক। কুড়িগ্রামে নেমে রিপোর্টার দু'জন চলে গেলেন নিজের কাজে।

কুড়িগ্রামে নেমে দেখলেন ভয়াবহ অবস্থা। স্থানীয় এম পি অসহায়ভাবে প্রায় কাঁদছেন। এস ডি ও ঘেরাও হয়ে আছেন সকাল থেকে। টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন। ঢাকার সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই। চতুর্দিকে খাদ্যের দাবিতে উত্তেজিত অবসন্ন মানুষ। ক, খাদ্য গুদাম খুলে খাদ্য দিতে বললেন কিন্তু দেখা গেল, গুদামে চাল নেই। সন্ধে হয়ে আসছে। গেলেন একটি শরণার্থী শিবিরে। গিয়ে দেখেন সেখানে বাতি নেই। স্থানীয় ট্রেজারি অফিসারকে ডেকে বললেন, কিছু টাকা দিতে যাতে খোলা বাজার থেকে কেনা যায় কিছু চাল। ট্রেজারি অফিসার জানালেন, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছাড়া তিনি কিছুই দিতে পারবেন না।

ক তখন প্রথমে ব্যক্তিগতভাবে ঘেরাওকারীদের বুঝিয়ে এস ডি ও-কে বের করে আনলেন। তারপর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি করে প্রায় ধমক দিয়ে ট্রেজারি অফিসারের কাছ থেকে টাকা রিলিজ করালেন। সে টাকা তখনি দেওয়া হল এস ডি ও-কে চাল কেনার জন্য। স্থানীয় প্রকৌশলীকে হুমকি দিয়ে তখনি বাতির বন্দোবস্ত করালেন শরণার্থী শিবিরে। ক-এর ভাষায়, 'মানুষের লাশ আর ক্ষুধার্ত মানুষ দেখে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম।'

যাক, পরের দিন তিনি ফিরে এলেন ঢাকায়। সেই সাংবাদিকরাও ফিরে এলেন তাঁর সাথে যাঁদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তিনি কিছুই জানতেন না।

পরের দিন, রংপুরের দুর্ভিক্ষের ওপর ইত্তেফাকে সচিত্র এক প্রতিবেদন প্রকাশিত হল। সঙ্গে তাঁর নামও উল্লিখিত হল। দুর্ভিক্ষের এই প্রতিবেদন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। ক্রুদ্ধ শেখ মুজিব তাঁকে ডেকে পাঠালেন। এবং তিনি কিছু বলার আগেই বললেন, 'আমাকে কিছু বলতে হবে না। আমি সব শুনেছি। ট্রেজারির টাকা বিলিয়েছ, অফিসারদের থ্রেট করেছ, সাংবাদিকদের উশকিয়েছ— এগুলি তো তোমার কাজ নয়।' বলে একটু থামলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'তা লোকে কয় কী ?' প্রধানমন্ত্রীকে খুশি করার জন্য ক বললেন, 'তারা বঙ্গবন্ধুকে চায়।'

এ কথা শুনে মনে হল প্রধানমন্ত্রী খানিকটা নার্ভাস হয়ে গেছেন, বললেন, 'কেন্, আমি গেছি না কয়েক জায়গায় !'

ক-এর মতে, খাদ্য সচিবের 'ইনএফিশিয়েন্সি খাদ্য সরবরাহ বিপর্যস্ত হওয়ার জন্য অনেকাংশে দায়ী। এ ঘটনার পর খাদ্য সচিবকে বদল করার কথা উঠেছিল। কিন্তু ক বললেন, এখন তাঁকে বদলি কবলে সবাই ক-কেই দোষী ভাববে। তবে, ক-কে এ ঘটনার পর অন্য মন্ত্রণালয়ে বদলি কবে দেওয়া হয়। সামরিক আধিপত্যেব আমলেও, ঐ অকর্মণ্য খাদ্য সচিবকে দেখা যায় খাদ্যমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করতে।

১৪ সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক

ঐতিহ্যেব অভিঘাত বোধ হয় অমোঘ। ঐতিহ্যব সংজ্ঞা দেওয়া দুরূহ। এর প্রভাব অস্বীকাবও অসম্ভব। অসামবিক সবকাবের ওপর সামরিক প্রাধান্যের পাকিস্তানী ঐতিহ্য, ১৯৭১ সালের ঘটনা সত্ত্বেও অনেক অফিসাব মুছে ফেলতে পাবেননি। ঐ ঐতিহ্য তাদেব এতটা সংক্রামিত করেছিল ! মনে হয়, বাংলা-দেশেব সামরিক বাহিনীর ওপব পাকিস্তানী ঐতিহ্যের অশুভ প্রভাব শেখ মুজিব অবিবেচকভাবে উপেক্ষা কবতে চেয়েছিলেন। সামরিক বাহিনীর সঙ্গে তাঁর ব্যবহার ছিল অসাবধান। যেখানে উচিত নয় সেখানে শেখ মুজিব কঠোব হতেন।[৩৪] পাকিস্তান-প্রত্যাগত বেশ-কিছু অফিসারকে তিনি কারণ না দর্শিয়ে বরখাস্ত করেন [নকশা ১৭৮]। একজন যুগ্ম সচিব এ বিষয়ে সতর্ক হওয়ার অনুরোধ জানিয়েছিলেন শেখ মুজিবকে। আবার যেখানে কঠোব হওয়া প্রয়োজন সেখানে মুজিব নমনীয় হয়েছেন। তিনি অর্থ দফতরের কর্মকর্তাব পরামর্শ উপেক্ষা করেছেন [নকশা ১৭৯]। ঐ কর্মকর্তা বলেছিলেন, সামরিকক্ষেত্রেও অপ্রয়োজনীয় ব্যয়বৃদ্ধি করলে [বাজেট] এর ফলাফল শুভ নাও হতে পারে। প্রচণ্ড আত্ম-বিশ্বাসই ছিল বোধ হয় শেখ মুজিবের এসব সিদ্ধান্তের কারণ। আত্মবিশ্বাস ও আত্মহননের সীমারেখা টানতে মুজিব ব্যর্থ হয়েছিলেন।

আসলে, সামরিক বাহিনী ও জাতীয় রক্ষীবাহিনীর[৩৫] ওপর আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও শেখ মুজিব যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। অ-সামরিক কর্মচারীদের ওপর সামরিক বাহিনীর প্রাধান্যের পাকিস্তানী ঐতিহ্য, বাংলাদেশের সামরিক অফিসারদের মনে এতটা প্রোথিত ছিল যে তাঁরাও তাঁদের চেয়ে অনেক উঁচু পদমর্যাদার বেসামরিক অফিসারদের সঙ্গে উদ্ধত ব্যবহার করতেন। কর্নেল

পদমর্যাদার একজন সেনাপতিকে তাই দেখা যায়, প্রতিরক্ষা সচিবকে বলেন টেলিফোন ধরে রাখতে [নক্শা ১৮০] ; অথচ গণতন্ত্রে ব্যাপারটি উল্টো হওয়া বাঞ্ছনীয়। আবেকজন কর্নেলকে দেখা যায় একজন উচ্চপদস্থ অসামরিক কর্মকর্তাকে উদ্ধতভাবে উপেক্ষা কবার চেষ্টা করছেন। তখন সেই কর্মকর্তা কর্নেলকে মনে করিয়ে দেন. তিনি যখন অতিরিক্ত জেলাশাসক ছিলেন তখন কর্নেল ছিলেন ক্যাপ্টেন এবং তাঁদের তখন পরিচয় হয়েছিল [নক্শা ১৮১]।

সামরিক বাহিনীর ব্যক্তিদের ঔদ্ধত্যেব বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াও পরিলক্ষিত হয়। এর একটি হচ্ছে বে-সামবিক সরকাবের দক্ষতা হ্রাস। তাই দেখা যায়. বিমানে ভ্রমণের সময় একজন ব্রিগেডিয়ার তাঁর টিকেটহীন পুত্রকে নিয়ে ভ্রমণ করেন [নক্শা ১৮২]। রক্ষীবাহিনীর নির্দেশে কারচুপি না করায় একজন প্রতিষ্ঠিত ডাক্তারকে রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা প্রহার করে কিন্তু এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় না [নক্শা ১৮৩]। যখন সৈন্যরা গোপনে হয়ে ওঠে আততায়ী তখন বেসামরিক কর্মচারীরা অসহায় দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে থাকেন [নক্শা ১৮৪] ; আঞ্চলিক রাজনৈতিক নেতার ওপর যখন নিপীড়ন চালানো হয় [নক্শা ১৮৫] তাও প্রত্যক্ষ করতে হয় অসহায় ভাবে। শুধু তাই নয়, সামরিক বাহিনীর বেআইনি কাজের জন্য একজন মন্ত্রী দায়ী করেন বেসামরিক অফিসারদের।

বেসামরিক শাসনই যে সর্বোচ্চ— এ বিষয়ের কিছু ঘটনা দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল কিছু বাঙালী অফিসারের। একবার একজন ভারতীয় মেজর জেনারেল যথাযোগ্য সম্মান দেখিয়ে সাক্ষাৎ করেন ডি সি-র সঙ্গে এবং জানান যে সেখানে অবস্থানরত ভারতীয় ব্রিগেডিয়ারের কর্তাও হলেন ডি সি [নক্শা ১৮৬]। আরেকটি জেলায়, একজন ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার উদ্ধতভাবে প্রবেশ করেন ডি সি-র ঘরে এবং তখন ডি সি তাঁকে মনে করিয়ে দেন, ভারতের মাটিতে কি তাঁর এমন ব্যবহার করার সাহস হত [নক্শা ১৮৭] ব্রিগেডিয়ার লজ্জিত হয়ে আধোমুখে ত্যাগ করেছিলেন ডি সি-র অফিস।

ন ক্ শা

১৭৮. ১৯৭৩ সালে, পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙালী সামরিক [অসামরিকও] অফিসাররা দেশে ফিরে আসতে লাগলেন। বাংলাদেশ বাহিনীতে যেসব মুক্তিযোদ্ধারা ছিলেন তাঁরা ফিরে-আসা অনেক অফিসারকে ফের বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছিলেন। ক তখন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন পদস্থ কর্মচারী। শেখ মুজিব তাঁকে ডেকে একদিন ফিরে-আসা অফিসার-

দের একটি তালিকা দিলেন। ক দেখলেন তালিকায় অনেকের নামের পাশে 'আর' এবং 'ডি' লেখা। তিনি এর অর্থ জিজ্ঞেস করলে শেখ মুজিব বললেন, 'ডি মানে ডিসমিস্‌ড্‌' এবং 'আর' মানে রিলিজ্‌ড্‌ বা রিটায়ারড্‌।'

ক মৃদু আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'এভাবে করা বোধহয় ঠিক হবে না, স্যার। প্রত্যেকের চার্জ লিখে তারপর ব্যবস্থা নিতে হবে।'

'এভাবে লিখলেই চলবে।' বললেন শেখ মুজিব।

'স্যার,' বিনীতভাবে বললেন ক, 'আমরা পরামর্শ দিয়ে যাব। এ জন্যই আমরা বেতন পাচ্ছি। পরামর্শ নেওয়া না-নেওয়া আপনার ব্যাপার, স্যার।'

১৭৯. শেখ মুজিবের সময় বাজেট পাস করা হবে। বাজেটে আর্মির জন্য বেশ মোটা অঙ্কের টাকা ধরা হয়েছিল। এ ব্যাপারে অর্থমন্ত্রণালয়ের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী মৃদু আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'স্যার, এর বোধহয় প্রয়োজন নেই। বরং এদের তোষণ কবলে ভবিষ্যতে বিপদ হতে পারে।' শেখ মুজিব মৃদু হেসে বললেন, 'এর দরকার আছে। আর তোমরা যা ভাবছ তা আমি থাকতে হবে না। সব-কিছু আমার কনট্রোলে।'

১৮০. ১৯৭২-৭৩ এর ঘটনা। সেনাবাহিনীর চীফ অফ স্টাফ তখনও একজন কর্নেল। তাঁর এ ডি সি একদিন, প্রতিরক্ষা সচিবের দফতরে ফোন করলেন। পি এ ফোন ধরলে বললেন, 'সচিবকে বলুন চীফ অফ স্টাফ কথা বলবেন।' পি এ লাইন দিলেন সচিবকে। এ ডি সি সচিবকেও একই কথা বললেন। সচিব ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'আপনার স্পর্ধা দেখে আমি অবাক হচ্ছি। আমাকে ফোন ধরে থাকতে বলছেন। আপনার চীফ অফ স্টাফকে বলুন লাইনে থাকতে।' ব'লে তিনি ফোন রেখে দিলেন।

এ ঘটনা বিকৃত হয়ে পৌঁছয় শেখ সাহেবের কানে। তিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে আবার ফোন করে বললেন, 'কী সব ঝামেলা নাকি হচ্ছে। এসব কমিউনিকেশন গ্যাপ মিটিয়ে ফেলো।'

১৮১. ক তখন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। শেখ মুজিব একদিন তাঁকে ফোন করে বললেন, 'সেনাবাহিনীর সঙ্গে নাকি তোমাদের কমিউনিকেশন গ্যাপ হচ্ছে। তুমি একটু ক্যান্টনমেণ্টে গিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলো।'

সভ্যদেশের নিয়ম অনুযায়ী সেনা-প্রধানদেরই তাঁর কাছে আসার কথা। কারণ, পদমর্যাদায় তিনি তাঁদের ওপরে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তাই তিনি কৌশলে

কাজটি করতে চাইলেন। এক বাহিনীর প্রধান যার সঙ্গে তাঁর খানিকটা ভালো চেনাশোনা ছিল, তাঁকে ফোন করে ক বললেন, 'আমি আপনার···ইউনিট পরিদর্শনে আসব। আপনি অন্যান্য চীফদেরও থাকতে বলবেন।' গেলেন তিনি সেনানিবাসে। যে সেনানায়ককে ফোন করেছিলেন তিনিও তাঁকে সম্মানের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানালেন।

এরপর ক সবার সঙ্গে আলাপ করছেন। দেখলেন একজন সেনানায়ক [পদমর্যাদায় কর্নেল] খুব তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বসে আছেন। ক বললেন তাকে, 'কি ব্যাপার, আমাকে চিনতে পারছেন না ? আমি তো আপনাকে চিনেছি। আমি যখন···অতিরিক্ত জেলাশাসক তখন আপনি সেখানে ই পি আর-এর ক্যাপ্টেন ছিলেন না ?' কর্নেল তখন অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'না, না, আপনাকে চিনতে পেরেছি।' ইত্যাদি।

এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ক-এর মন্তব্য—'প্রথম থেকে বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে তাচ্ছিল্য করার প্রবণতা এদের সবার মধ্যে ছিল। তবে দু-একজন ব্যতিক্রমও ছিলেন। —[এখন অবসরপ্রাপ্ত ; তখন একটি বাহিনীর প্রধান ছিলেন] আমার অফিসে ঢোকার আগে মাথার টুপিটা খুলে রাখতেন। কারণ, টুপি থাকলে আমাকে স্যালুট দিতে হয়। জিয়াউর রহমান সম্মানের সঙ্গেই ঢুকতেন তবে সামরিক অভিবাদন না ক'রে, আধা সামরিক ভঙ্গীতে অভিবাদন জানাতেন।'

১৮২. স্বাধীনতার পর পর। যশোর থেকে বিমানের একটি ফ্লাইট নিয়ে রওয়ানা হবেন ক। সেই একই প্লেনে যাবেন যশোর সেনানিবাসের কমাণ্ডার, একজন ব্রিগেডিয়ার। তাঁর সঙ্গে আছে তাঁর দশ-এগারো বছরের একটি ছেলে। ব্রিগেডিয়ার ছেলের টিকিট করেননি। বিমান বন্দরের কর্মীরা এতে আপত্তি জানায়। পাইলট হিসেবে ক-কেও জানানো হয়। তিনিও আপত্তি তোলেন। ব্রিগেডিয়ার কারো কথায় কর্ণপাত করেলনই না বরং সবাইকে গালি-গালাজ করে প্লেনে উঠলেন।

ঢাকা বিমান বন্দরে নামল প্লেন। বিমান থেকে বেরিয়ে ব্রিগেডিয়ার আস্ফালন করে বললেন, 'সেই বাস্টার্ড ক্যাপ্টেন কোথায় যে আমার কথার ওপর কথা বলে ?' ক এগিয়ে এলেন সামনে। ব্রিগেডিয়ার বললেন, 'তুমি জান আমি কে ? আমি এখনই ওসমানীর কাছে তোমার ব্যাপারে অভিযোগ জানাব।'

ওসমানী ছিলেন বিমান ও পর্যটন বিষয়ক মন্ত্রী। ব্রিগেডিয়ার ওসমানীর নাম করা সত্ত্বেও ক নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললেন, 'শুধু জেনারেল ওসমানী কেন ? আপনি প্রধানমন্ত্রীকেও বলতে পারেন।'

এধরনের নিরুত্তাপ কণ্ঠ শুনে ব্রিগেডিয়াব ভড়কে গেলেন। ক শান্তভাবে চলে গেলেন টারম্যাকের বাইরে। ব্রিগেডিয়ার জানতেন না যে ক একজন মুক্তিযোদ্ধা, যিনি বীরত্বের জন্য পদকপ্রাপ্ত। শুধু তাই নয়, আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গেও তাঁর আছে সু-সম্পর্ক। টারম্যাক ছেড়ে যাবার সময়ই কেউ হয়তো ব্রিগেডিয়ারকে এ তথ্য দিয়ে থাকবেন। কারণ, এরপর বিমান বন্দরের বাইরে আবার ক-এর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর ব্রিগেডিয়ার তাঁকে নবম স্বরে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না। ঐ সময় একটু রাগারাগি করে ফেলেছি।' তারপর ক-কে জোর কবে ব্রিগেডিয়ার নিয়ে গেলেন তাঁর বাসায় এক পেয়ালা চা খাওয়ানোর জন্য।

১৮৩. ১৯৭৪ সাল। এক প্রথিতযশা চক্ষু চিকিৎসক ছিলেন রেডক্রসের সঙ্গে জড়িত। রক্ষীবাহিনীর আঞ্চলিক কমাণ্ডার তাঁর কাছে কিছু কম্বল চেয়েছিল। তিনি দেননি। ফলে তাঁকে রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে প্রহার করা হল। এ কথা জানাজানি হলে এবং ঐ এলাকায় অসন্তোষ দেখা দিলে তদন্তেব আদেশ হল। কিন্তু কারো বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোন ব্যবস্থা নেওয়া হল না। কিছুদিন পর, এক ধরনের সমঝোতার ব্যবস্থা করা হল দু'পক্ষের মধ্যে। রক্ষীবাহিনীর তরফ থেকে বলা হল, ভুল হয়েছে, ডাক্তার সাহেব যেন সব-কিছু ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখেন।

১৮৪. ১৯৭৫ সালের প্রথম দিককার ঘটনা। চোরাকারবারীদের নির্মূল করাব জন্য ডাকা হল সেনাবাহিনীকে। তাদের নির্মূল অভিযানে যে আসল চোরা-কারবারীরা নির্মূল হতে লাগল তা নয়। যেমন, একদিন—শহর থেকে খানিকটা দুরে দু'জন প্রভাবশালী মারোয়াড়ীর মৃতদেহ পাওয়া গেল। অন্যান্য কয়েকটি জায়গায়ও একই ঘটনা ঘটল। হৈচৈ পড়ে গেল চারিদিকে। শেখ মুজিব, খালেদ মোশাররফ সহ একজন সেনাপতিকে পাঠালেন ঐ এলাকায় তদন্ত করতে। মিটিং হল স্থানীয় সার্কিট হাউসে। এক পর্যায়ে সেনাপতি বললেন ঐ জেলার এস পি-কে, 'কিসের এস পি হয়েছেন, কিছু জানেন না।' তিনি ইঙ্গিত করতে চাচ্ছিলেন যে পুলিশরাই এসবের সঙ্গে জড়িত, যদিও সাধারণ লোকেরা জানতেন ঘটনা বিপরীত। এস পি উত্তরে বললেন, 'খাকি কি শুধু পুলিশই পরে। অন্যান্য এজেন্সীর লোকজনদের পোশাকের রংও তো খাকি।' সেনাপতি তাড়াতাড়ি কথার মোড় ঘোরাবার জন্য বললেন, 'আপনারা কেবল আজেবাজে কথাবার্তাই বলতে পারেন।' ইত্যাদি।

১৮৫. অনেকে মন্তব্য করেছেন, যে, সেনাবাহিনীর ১৯৭২ সাল থেকেই নিজেদের ভেবেছে আইনের উর্ধ্বে। এবং বিভিন্নভাবে তা প্রমাণিতও হয়েছে।

মন্ত্রীরাও তাদের তোষামোদ করতেন। এরকম অনেক ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনা বর্ণিত হল নীচে। ঘটনাটি ঘটেছিল একটি জেলা শহরে।

শেখ মুজিব নিহত হওয়ার কয়েকদিন আগের ঘটনা। সেনাবাহিনীর কয়েক-জন, স্থানীয় এক চেয়ারম্যানকে প্রায় বিনা কারণে পুকুরে চোবাল। হৈচৈ পড়ে গেল চারদিকে। ঢাকা থেকে সরেজমিনে তদন্ত করতে এলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মনসুর আলী। সার্কিট হাউসে স্থানীয় লোকজন, এম পি, ও অফিসারদের নিয়ে বৈঠক বসেছে। দেখা গেল ঘরে একটি টেপ রেকর্ডার চলছে। কেউ এটাকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি। সভা শেষ। তখন অনেকের খেয়াল হল [পুলিশ অফিসারদেরও] টেপটির কথা। কিন্তু সেটি আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

সেদিন বিকেলে মনসুর আলী ফিরে যাবেন। উপস্থিত হয়েছেন হ্যালিপ্যাডে। সঙ্গে স্থানীয় কর্মকর্তারা এবং সেনাবাহিনীর কয়েকজন অফিসার। তিনি তাদের সামনে এস. পি ও ডি সি-কে লক্ষ্য করে বললেন, 'আপনারা কোন কাজের না। লোকজনকে হ্যারাস করা হচ্ছে আর আপনারা বসে আছেন।'

১৮৬. স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ক ছিলেন একটি জেলার ডি সি। ১৯৭১ সালের ১২ ডিসেম্বর তিনি শহর ত্যাগ ক'রে একজনের গাড়িতে করে চষা ক্ষেতের ভেতর দিয়ে পৌঁছলেন একটি নিরাপদ গ্রামে। শহরে তখন বিহারীরা রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড দিচ্ছে বাঙালীদের আটক করার জন্য। পাকিস্তানী সেনারা গুলি ছুঁড়ছে এলোমেলো। ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হল।

এর কয়েকদিন পর, ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি জীপ এসে পৌঁছলো গ্রামে যেখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন ক। জীপটি পাঠানো হয়েছে ক-কে শহরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। জীপে করে ক গেলেন ওয়াপদা রেস্ট হাউসে। সেখানে অবস্থান করছিলেন একজন ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার। তিনি ক-কে অনুরোধ জানালেন শহরের ভার গ্রহণের জন্য এবং আশ্বাস দিলেন এ বলে যে, ক যে সাহায্যই চাইবেন তাঁর কাছে, তা পাবেন। এর খানিক পর এলেন একজন ভারতীয় মেজর জেনারেল। তিনি যথাযথ সৌজন্য প্রদর্শন করে নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'আপনার হাতে আমি ব্রিগেডিয়ারকে সোপর্দ করে যাচ্ছি।'

এ পরিপ্রেক্ষিতে ক-এর মন্তব্য—'সত্যি বলতে কি তখনই আমার সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল পার্লামেণ্টারি ব্যবস্থায় [ভারত] এবং সামরিক শাসন ব্যবস্থায় [পাকিস্তান] সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক কেমন হয়।'

১৮৭. ক যে-এলাকার ডি সি সে-এলাকায় অবস্থান করছিলেন সেনাবাহিনী

সহ একজন ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার। তিনি মাঝে মাঝে হামবড়া ভাব নিয়ে আসতেন ক-এর অফিসে এবং নানা ব্যাপারে তাঁদের সম্পর্কও তিক্ত হয়ে উঠছিল।

একদিন ক তাঁর অফিসে বসে কাজ করছেন। এমন সময় অনুরূপ ভাব নিয়ে ব্রিগেডিয়ার ঢুকলেন তাঁর অফিসে। ক তাঁর দিকে তাকিয়ে শান্ত স্বরে বললেন, 'ব্রিগেডিয়ার, যখন চব্বিশ পরগনার ডি সি-র রুমে ঢোকেন তখন অনুমতি নিয়ে ঢোকেন এবং স্যালুট করে তাঁকে সম্মান জানান। এখানে সে নিয়মের হেরফের হচ্ছে কেন? ভবিষ্যতে যেন এরকম আর না হয়।'

ব্রিগেডিয়ার ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন এবং একটি কথাও না বলে অফিস ত্যাগ করলেন।

তথ্যপঞ্জী :

১. শেখ মুজিবের মানবিক উষ্ণতার সুযোগ নিয়ে অনেক রাজাকার পার পেয়ে গেছেন। এর কিছু উদাহবণ পাওয়া যাবে খতিবের গ্রন্থে। তাঁর একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—

'By being kind to some one he is being unjust to the overwhelming majority.' A. L. Khatib, *Who Killed Mujib ?* (এরপর শুধু Mujib ?) Vikas, Delhi, 1981, p. 128.

২. ১৯৫৭ সালে, মুজিব একই ধরনের মন্তব্য করেছিলেন। দেখুন ***EPLAP*, Second Session, 1957, p. 34,**

৩. এর বিপরীতে কুখ্যাত 'কোলাবরেটর'দের তিনি শাস্তি দেননি। ***Mujib* ? pp. 126-30.**

৪. ঐ সময় পুলিশরা প্রায়ই অভিযোগ করতেন যে, আইনশৃংখলাভঙ্গকারী কাউকে গ্রেফতার কবলে প্রভাবশালী মহল থেকে বলা হত তাদের ছেড়ে দিতে। রেজোয়ান সিদ্দিকী, কথামালার রাজনীতি, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৩৩।

৫. এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন—

Syed Anwar Husain, 'Insurgency in the Chittagong Hill Tracts : Problem of Ethnic Minorities in Bangladesh,' a

paper presented to an International Conference at the Netaji Institute of Asian Studies, Calcutta. 30 Jan-1 Feb. 1986.

৬. রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ব্যবসার প্রসারের অনেক বিবরণ পাওয়া যাবে ঐ সময়কার সাময়িক পত্রে (যেমন, দৈনিক বাংলা, ৩১.৩.১৯৭৪)। তবে অর্থমন্ত্রী হিসেবে তাজুদ্দিন এসবের উর্ধ্বে ছিলেন যে কারণে আমলারা তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। *Mujib ?*, পৃ ১৩৫।

৭. অনেক সন্দেহজনক ব্যক্তিকে তিনি নিয়োগ করেছিলেন উঁচু পদে, ঐ. পৃ. ১২৯-৩০। এই মহানুভবতা যদি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রতি তিনি দেখাতেন তা'হলে দেশের জন্য হত তা মঙ্গলময়। বেলাল মোহাম্মদ, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, ফুলদল প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ১০৬।

৮. এ বিষয়ে পর্যালোচনার জন্য দেখুন, আবদুল মোহাইমেন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ, লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৮-১১।

৯. এ বিষয়ে দেখুন প্রখ্যাত সাংবাদিক জহুর হোসেন চৌধুরীর মতামত। দরবার-ই-জহুর, পৃ. ২০২।

১০. এ বিষয়ে বিভিন্ন মন্তব্য ও পর্যালোচনার জন্য দেখুন, বদরুদ্দীন উমর, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কয়েকটি দিক, পৃ. ১৪ ; আবদুল মোহাইমেন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ, পৃ. ৪ ; রেজোয়ান সিদ্দিকী, প্রাগুক্ত, পৃ ৮০।

১১. বিদেশী অর্থ আত্মসাৎ করার সম্পর্কে দেখুন মোহাইমেনের উপরোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৮। জহুর হোসেন চৌধুরীর মতে, মুজিব-পরবর্তী শাসনামলে এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল কয়েকগুণ। দরবার-ই-জহুর, পৃ. ২০৯।

১২. সিরাজউদ্দিন আহমদের প্রবন্ধ, স্মৃতিচারণ, পৃ. ৪৫।

১৩. এ ধরনের এবং আমলাদের ঝুঁকি নিয়ে জীবনযাপনের বিবরণের জন্য দেখুন, কাজী শামসুজ্জামান, আমরা স্বাধীন হলাম, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ৯৭, ১৪৯। পঞ্চাশ বছর, পৃ. ৭৩৯-৪৩।

১৪. মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য পুরস্কার হিসেবে মুজিবনগরের অনেক কর্মচারী চেয়েছিলেন প্রমোশন, সিনিয়রটি এবং তা পেয়েছিলেন। অল্প

কয়েকজন এ ধবনের 'পুরস্কার' প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। দেখুন, বেলাল মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭।

১৫. এ পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য—

'Most Bengali officcr belonging to the Civil Service of Pakistan continued to serve the Pakistan Government during the liberation struggle and some of them even advanced themselves. Yet with a few exceptions they retained their jobs after liberation, and some who had won special favour from the Pakistan Government even came to occupy key positions from which they could influence policies. How sensitive jobs could be entrusted to officials with such an odious past is inexplicable.' *Mujib ?* p. 83.

১৬. সিরাজুল ইসলাম চোধুবী, আশীর দশকে বাংলাদেশের সমাজ, পৃ. ৬৩।

১৭. স্বাধীনতার পর এক সপ্তাহ লোকজনের ব্যবহার ছিল ফেরেশতার মতো। এমনকি সমাজবিরোধীবাও নিজেদের বিরত রেখেছিল সমাজবিরোধী কার্যকলাপ থেকে। পঞ্চাশ বছব, পৃ. ৭৫৭-৫৮।

১৮. ১৯৭২ সালে যেসব শরণার্থী ফিরে এসেছিলেন তাঁদের সম্পর্কে আলোচনার জন্য দেখুন কামরুদ্দিন আহমদ, স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং অতঃপর [এরপর উল্লিখিত হবে অভ্যুদয়], পৃ. ৯৭-৯৮।

১৯. এ বিষয়ে একটি ঘটনার বিবরণের জন্য দেখুন, পঞ্চাশ বছর, পৃ. ৭৮০-৮১।

২০. এ পরিপ্রেক্ষিতে লণ্ডনের *The Times* পত্রিকা মন্তব্য করেছিল [৯. ৩. ১৯৭৩]: 'It was something of a miracle that no mass vengeance against Biharis took place when independence came in December 1971.'

২১. স্বাধীনতার পর বিহারীদের অবস্থা সম্পর্কে দেখুন, অভ্যুদয়, পৃ. ১১৮।

২২. ঐ, পৃ. ১৫৫।

২৩. কাজী নুরুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯। কাদের সিদ্দিকী, স্বাধীনতা ৭১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৬, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩১৪, ৩৫৭-৫৯।

২৪. এ পরিপ্রেক্ষিতে উদাহরণস্বরূপ মেজর জলিলের সমাজতন্ত্রী থেকে মৌল-

বাদীতে পরিণত হওয়ার সম্পর্কে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর পর্যালোচনা দেখুন, আশির দশকে বাংলাদেশের সমাজ, পৃ. ৫১-৫৩।

২৫. অজানা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে দেখুন, কাদের সিদ্দিকীর প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১০০-৬০, ৩৪৮, ৩৫৮।

২৬. রাজনীতিকদের দুর্নীতি নিয়ে সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় অনেক লেখা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে, দৈনিক বাংলা, ২৪ ও ৩১ মার্চ, ১৯৭৪। মওলানা ভাসানী ১৯৭১ সাল-পরবর্তী আওয়ামী লীগকে ১৯৪৭-পরবর্তী মুসলিম লীগের সঙ্গে তুলনা করে লুটেরা হিসেবে আখ্যা দিয়েছিলেন। ভাসানী, পৃ. ৪০৮, ৪২৩-২৪।

২৭. শামসুল হুদা চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮। বদরুদ্দিন উমর, বাংলাদেশে বুর্জোয়া রাজনীতির চালচিত্র, ও. জে পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ১৫৪। দরবার-ই-জহুর, পৃ. ১৬।

২৮. অভ্যুদয়, পৃ. ১৬২।

২৯. শামসুল হুদা চৌধুরী ও কাদের সিদ্দিকার প্রাগুক্ত গ্রন্থদ্বয়, পৃ. [যথাক্রমে] ২৫৪, ৩২১।

৩০. রাজাকারদের প্রতি শেখ মুজিবও যথেষ্ট সদয় ব্যবহার করেছেন। শামসুল হুদা চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪।

৩১. শেখ মুজিবের হত্যা সম্পর্কে উমরের পর্যালোচনার জন্য দেখুন তাঁর উপরোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৭০।

৩২. বেলাল মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪-৪৫ ও দরবার ই জহুর, পৃ. ১১৬।

৩৩. রংপুরে ক্ষুধার্ত মানুষের আন্দোলন, আমাদের কথা, ১৯. ৪. ১৯৭৪।

৩৪. পঞ্চাশ বছর, পৃ. ৭৭৫-৭৮।

৩৫. রক্ষীবাহিনীর অত্যাচার সম্পর্কে উদাহরণস্বরূপ দেখুন, দৈনিক বাংলা, ১১ জুন ও ১৩ অক্টোবর ১৯৭৩। অভ্যুদয়, পৃ. ১৬৫।

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশ : সামরিক শাসন

১৫ সাধারণ প্রশাসন

সামরিক শাসকরা বলতে ভালোবাসেন যে, বেসামবিক প্রশাসন থেকে তাদেব নিয়ন্ত্রিত প্রশাসনের মান উচ্চতর। এ ধরনেব দাবিব কারণ অবশ্য তাঁবা দেখান না। পাশ্চাত্যেব অনেক লেখকও এ ধাবণা সমর্থন করেন।[১] কিন্তু, সামরিক শাসকরা কী ধবনের লোক পছন্দ কবেন, সে দিকে কিঞ্চিত দৃক্‌পাত কবলে, স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বাংলাদেশের মতো দেশে আব যাই হোক, প্রশাসনিক কর্মদক্ষতা প্রতিষ্ঠা করা সামরিক শাসকদেব মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। যেমন, সামবিক শাসক এমন একজনকে প্রেসিডেণ্ট নিয়োগ কবেন যিনি বাধ্য কবেন একজন আমলাকে বিভিন্ন ফাইলের বিষয় অগ্রিম মুখস্থ করতে। কারণ, আলোচনাকালে ফাইল দেখা তিনি পছন্দ কবেন না। ফলে, সেই অফিসাবকে প্রতিদিন বিভিন্ন বিষয়ের ফাইলের বক্তব্য মুখস্থ রাখতে হত [নকৃশা ১৮৮]। সামরিক শাসক এমন একজনকে ভাইস প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করেন, যিনি নিরীহ লোকদেব রক্ষার দায়িত্ব নির্লজ্জভাবে বিস্মৃত হন। নিজেদের অযোগ্যতা ঢাকাব জন্য, গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন এদের নাজেহাল করছিল [নকৃশা ১৮৯]। এই একই ব্যক্তি তাঁর রাজনৈতিক সহযোগীর মহিলা অপহরণ-কারী পুত্রকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসেন। যদিও তাতে তিনি ব্যর্থ হন [নকৃশা ১৯০]। একজন মন্ত্রী অনুধাবন করতে ব্যর্থ হন যে, অপ্রয়োজনে তাঁর অফিস ঘর বড় করার কারণে, ব্যক্তিগত সচিবের ঘর ছোট করছেন এবং সেই আচরণ কতটা গ্রাম্য [নকৃশা-১৯১]। শালীনতাবোধ সম্পূর্ণ বিসর্জন দেন এক আল-বদর নেতা[২] যিনি মন্ত্রীর জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে প্রথম দিন প্রবেশ করেই দুর্গন্ধনাশক দ্রব্য ছড়ান, কারণ তাঁর পূর্বসূরী ছিলেন বিধর্মী [নকৃশা ১৯১ক]। একজন মন্ত্রী যিনি আবার সামরিক বাহিনীর অফিসার, মন্ত্রণালয়ের সচিবকে বদলি করে এমন একজনকে সচিব করে আনতে চান যিনি একজন সামরিক অফিসার ও দুর্নীতিবাজ [নকৃশা ১৯২]। এ ধরনের ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত প্রশাসন যে কী হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। এ ধরনের প্রশাসন যে দেশকে একেবারে রসাতলে নিয়ে যেতে পারেনি তার কারণ,

বেসামরিক কিছু সৎ ও দৃঢ়চেতা আমলা পেশাগত উৎকর্ষ ও জনস্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করেন এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ সামরিক শাসকের সঙ্গে মাঝে মাঝে যোগাযোগ করে সফলও পান [নকৃশা ১৯০ ও ১৯২]।

সামরিক ব্যক্তিবর্গ যখন বেসামরিক রাজনীতিবিদদের অস্ত্রের জোরে হটিয়ে প্রশাসনের ভার গ্রহণ করেন তখন উচ্চকণ্ঠে বলেন, তাঁরা এসেছেন প্রশাসনের উন্নয়ন ও রাজনীতিকে শুদ্ধ করতে। এরং যারা সামরিক শাসকদের প্রাথমিক কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করেছেন তাঁরা জানেন যে, সামরিক শাসকরা ক্ষমতায় এসেই প্রথমেই কিছু বরখাস্ত / বদলি করেন। কিছু ব্যক্তিকে প্রমোশন দেন। এ ক্ষেত্রে দেখা যায়, সর্বোচ্চ সামরিক প্রশাসকও দ্বিধা করেন না একজন এস ডি ও-র বদলি রদ করতে [নকৃশা ১৯৩]। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য[৩] প্রণোদিত বদলি। পোস্টিং-এর ব্যাপারে মৃদু প্রতিবাদ করলে প্রতিবাদকারীই বদলি হয়ে যান কম গুরুত্বপূর্ণ পদে [নকৃশা ১৯৪]। ই পি সি এস-দের প্রমোশনের ভিত্তি হওয়া উচিত লিখিত পরীক্ষা··· ক্যাবিনেট দ্বারা অনুমোদিত, সচিবের আইনানুগ এই সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করেন প্রেসিডেণ্ট, কারণ আসন্ন নির্বাচনে[৪] তিনি ঐ ক্যাডার-ভুক্ত আমলাদের ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন [নকৃশা ১৯৫]।

সামরিক শাসককে যে বেসরকারী আমলা তুষ্ট রাখতে পারেন, তিনিই পারেন প্রশাসনকে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করতে [নকৃশা ১৯৬] যেমন, তিনিই পারেন একই সঙ্গে সচিব ও বিচারপতির মর্যাদায় থাকতে যা এক অচিন্তনীয় ব্যাপার [নকৃশা ১৯৭]। এর বিপরীতে আছেন, জনস্বার্থব্রতী আমলারা যারা তোষামোদ করতে চান না সামরিক কর্তাদের। টেলিভিশনে[৫] সামরিক প্রশাসনের গুণকীর্তন করার অলিখিত নিয়মও হয়তো তাঁরা পারেন উপেক্ষা করতে [নকৃশা ১৯৮]। আরো লোভনীয় পদের প্রলোভন দেওয়া সত্ত্বেও পদত্যাগ করতে পারেন হঠাৎ বদলির প্রতিবাদে [নকৃশা ১৯৯]।

সরকারীভাবে পশ্চিম এশিয়ায় ভাগ্যান্বেষণে পাড়ি দিয়েছেন অনেকে, অনেক ক্ষেত্রে-প্রায় সর্বস্ব খুইয়ে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অর্থসংগ্রহের জন্য তাঁদের থেকে অন্যায্যভাবে অর্থ সংগ্রহে[৬] সামরিক শাসকরা লজ্জা পান না [নকৃশা ২০০]। যখন কোন সৎ আমলা এ ধরনের অর্থ সংগ্রহে বাধা দেন [যেমন সুবিধাজনক শর্তে উন্নতমানের যন্ত্রপাতি পূর্ব ইউরোপ থেকে সংগ্রহ না ক'রে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের যন্ত্র দুরূহ শর্তে পূর্ব এশিয়া থেকে সংগ্রহ করার সিদ্ধান্তে], তখন সামরিক অধিকর্তা কলকব্জা আমদানী সংক্রান্ত পুরো প্রকল্পটিই স্থগিত রাখেন [নকৃশা ২০১]।

সহানুভূতি ও নিয়ন্ত্রণ—এ দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য একজন বিবেকবান আমলাকে সবসময়েই চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। তার ক্ষমতা এত বিস্তৃত এবং কোন কাজ সঠিক বা বেঠিক তার ব্যাখ্যা এত স্থিতিস্থাপক elastic যে, 'কর্তব্যকর্ম'ও অনেক সময় নিপীডনের মাধ্যম হতে পারে। পেশাগত উৎকর্ষ এবং জনস্বার্থের প্রতি নজরের কারণেই বোধহয় একজন আমলা প্রাক্তন এক মন্ত্রীকে আক্ষরিক অর্থেই কষ্ট দেন না কর্তব্যকর্মের দোহাই তুলে। জেলবন্দী এই মন্ত্রী ক্ষমতায় থাকাকালীন, জেলবন্দীদের সুযোগসুবিধা হ্রাসের চেষ্টা করেছিলেন এবং তখন এই আমলা তার প্রতিবাদ করেছিলেন। মন্ত্রী এখন জেলে এসে সেই সুযোগসুবিধা দাবি কবছিলেন এবং সেই একই অফিসার তাঁকে নিয়মকানুন সদয়ভাবে প্রয়োগ করে সেসব সুবিধা দিয়েছিলেন [নক্শা ২০২]। এই একই সহানুভূতির কারণে একজন ডি সি প্রত্যয়ের সঙ্গে জনৈক সামরিক অধিকর্তাকে বলতে পারেনী যে তাঁর নাজির দুর্নীতিবাজ নন ; সরকারী ছাঁচে বাঁধা আইনের বাইরে তাঁকে কাজ করতে হয়েছে এবং এর কারণ সামরিক বাহিনীর চিন্তাহীন হুকুম (নক্শা ২০৩)। সৎ একজন আমলা বিদ্যমান প্রশাসনের বিভিন্ন ত্রুটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং এজন্যে যে তিনি ক্ষুব্ধ হন না, তা নয়। তিনি হতে পারেন সেই ডি সি-র মতো [নক্শা ২০৪] যিনি মনে মনে শ্রদ্ধা করেন বিপ্লবী নেতাদের, যাঁরা জীবনের অনেক কিছু ত্যাগ করে বিপ্লবের সাধনা করে যাচ্ছেন যাবা হয়তো একদিন ক্ষমতায় এসে উৎপাটন করবেন দুর্নীতি, ঢেলে সাজাবেন প্রশাসন। এই ডি সিই একদিন খবর পেলেন যে, একজন নিম্নপদস্থ পুলিশ অফিসার প্রখ্যাত বামপন্থী এক বিপ্লবীকে ধ'রেও পরে তাঁকে পালাবার সুযোগ করে দিয়েছেন। এই অফিসারের সুনাম কিছু ছিল না, বরং দুর্নাম ছিল অনেক। ডি সি কে সেই পুলিশ অফিসার পাঠিয়েছিলেন মিথ্যা রিপোর্ট এবং ডি সি-ও সমস্ত ঘটনা জেনে অনুমোদন করেছিলেন সে রিপোর্ট [নক্শা ২০৪]।

সামরিক শাসনে একটি ভয় থাকে যে তারা আমলাদের বোধশক্তির সজীবতায় আঘাত করে সহানুভূতি ও নিয়ন্ত্রণের যে সূক্ষ্ম ভারসাম্য তা নষ্ট করে দিতে পারে। এটি হতে পারে বিভিন্ন কারণে, যেমন, সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তিদের বেতন স্কেলের তারতম্য। বেসামরিক চাকরিতেও এ তারতম্য দৃষ্টিকটু। কিন্তু সামরিক শাসকরা এ তারতম্য এত প্রকট করে তুলেছে (সামরিক -বেসামরিক) যে, এর কোন জবাব নেই। একজন সামান্য সামরিক অফিসার তাঁর চেয়ে শিক্ষিত ও উঁচু পদে নিয়োজিত বেসামরিক আমলা থেকে বেশি বেতন / ভাতা পান। এ ধরনের

ব্যাপার সৃষ্টি করে ব্যাপক নীতিভ্রংশতার। খানিকটা এ কারণেই বোধহয় একজন সচিব সৌজন্য দেখাতে ভুলে যান একজন মহিলাকে যিনি কয়েকদিন আগেও ছিলেন তার মন্ত্রী (সামরিক শাসক কর্তৃক নিযুক্ত) [নকশা ২০৫]। এই একই কারণে দেখি, সরকারী সভায়, সচিব ও উপসচিব সব বিস্মৃত হয়ে গালিগালাজ করছেন পরস্পরকে [নকশা ২০৬]।

নকশা

১৮৮. ক বেশ-কিছুদিন এমন একজন প্রেসিডেন্টের অধীনে কাজ করেছেন যিনি সামরিক আইনের অধীনে ছিলেন বেসামরিক প্রেসিডেন্ট। ক-এর ভাষায় —'তাঁব কিছু কিছু আচরণ ছিল অদ্ভুত। প্রতিদিন সকালে স্বাস্থ্যমন্ত্রী এসে হাজিব হতেন তাঁর মূত্র পরীক্ষার জন্য। স্বাস্থ্যমন্ত্রী কাঁচেব পাত্রে মূত্র নিয়ে প্রেসিডেন্টকে মূত্রের রঙ দেখিয়ে বলতেন, 'চিন্তার কোন কারণ নেই স্যার।' প্রতিদিন সকালে এটাই ছিল প্রথম সরকাবী কাজ।

তারপব প্রেসিডেন্ট বসতেন ফাইল নিয়ে। এ সময় আমি খুব টেনশনে ভুগতাম। কারণ প্রেসিডেন্ট ফাইল নিয়ে আলোচনা করার সময় ফাইলেব দিকে তাকানো পছন্দ কবতেন না। আব ফাইল তো একটা-দুটো নয়, অনেক। ফলে, প্রতিদিন যেসব ফাইল তাঁব কাছে পেশ করা হবে সেসব ফাইলেব সারমর্ম আমাকে মুখস্থ কবতে হত। প্রেসিডেন্ট খুব খুশি হয়ে বলতেন, 'তুমি সি এস পি হতে পেরেছ কারণ ছাত্র ছিলে তুমি ভালো আর তোমার স্মৃতিশক্তিও প্রখর।' শুধু তাই নয়, অনেক সময় অতিথিদের সামনে আমাকে নিয়ে গর্ব করে বলতেন, 'এই যে ক, অদ্ভুত এর স্মৃতিশক্তি। প্রতিদিন অজস্র ফাইলের খুঁটিনাটি সে আমাকে ফাইল না দেখেই বলে দিতে পারে।'

১৮৯. সত্তর দশকের শেষ দিককার ঘটনা। ঐ বছর সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে প্রেসিডেন্ট জিয়া দুটি গোয়েন্দা সংস্থার প্রধানকে জিজ্ঞেস করেন, তাঁরা অস্বাভাবিক কিছু টের পাচ্ছেন কিনা। তাঁরা উত্তরে জানালেন, না। এর কয়েক-দিন পর একটি ব্যর্থ অভ্যুত্থান হয়। জিয়া এদের দু'জনকে সরিয়ে দেন।

এ সময় ক ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন পদস্থ কর্মচারী। একদিন সকালে, খবর কাগজে পড়লেন, বঙ্গভবনে টেলিফোন লাইন কেটে দেবার একটি ষড়যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে এবং— ব্যাংকের সহকারী ম্যানেজার খ সহ কয়েকজন গ্রেফতার হয়েছেন।

ঘটনাটির কথা ক ভুলেই গিয়েছিলেন। কিন্তু কয়েকদিন পর, তাঁর পরিচিত

একজন তাঁকে জানালেন, তাঁর ভাগ্নে খ [যিনি আগে উল্লিখিত ব্যাংকের সহকারী ম্যানেজার]-কে 'বঙ্গভবন ষড়যন্ত্রে'র কারণে গ্রেফতার করা হয়েছে, কিন্তু সে নির্দোষ। আসলে পূর্বে উল্লিখিত অভ্যুত্থানের ব্যাপারে নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকাব জন্য এবং একজন ডি এস পি ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটাবার জন্য ঘটনাটি ঘটিয়েছিল। ক-এর হস্তক্ষেপের পর, পুরো ঘটনাটি জানা যায় এবং অভিযুক্তরা মুক্তি পায়। ঘটনাটি ছিল এ রকম—

একটি গোয়েন্দা সংস্থার এক ডি এস পি-ব চার বউ। তাদের সে বিভিন্ন কাবণে ব্যবহার করত। তার বতুর্থ বউ ছিল সুন্দরী এবং তাব ও তাব স্বামীব একটি যৌথ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ছিল ব্যাংকে। মাঝে মাঝে বোরখা পবে বউ আসত ব্যাংকে টাকা তুলতে। এভাবে কিছুদিন ব্যাংকে আসার পর একতরফা ভাবে সে প্রেমে পড়ে যায় ব্যাংকের সহকাবী ম্যানেজাব খ-এব। একদিন রাতে কথায় কথায় স্বামীকে সে বলেছিল, 'ব্যাংকটি খুব ভালো। কোন অসুবিধা হয়নি। আর খ ভাই তো আছেন, সব সময় সাহায্য কবেন।' ডি এস পি স্বামী বউয়েব মনোভাব আঁচ করে প্রহার কবেছিল বউকে। সে সময় অক্টোবরের ব্যর্থ অভ্যুত্থান হয়েছে। ডি এস পি এ সুযোগে 'কেস' সাজিয়ে খ-কে অভিযুক্ত কবে। এক ঢিলে সে দু'পাখি মারতে চেয়েছিল।

খ যখন জেলে তখন তরুণীটি খ-এর সঙ্গে দেখা কবে তাকে দশহাজার টাকা নিতে অনুরোধ জানায়। টাকাটা তার নিজের। টাকাটা, খ-কে সে বলে তাব স্বামী ডি এস পি কে ঘুষ দিতে।

যা হোক, তদন্ত শেষে অভিযুক্তরা নির্দোষ বলে প্রমাণিত হয়। তাদের মুক্তির ফাইল [কারণ, তারা ডিটেনশনে ছিল] ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাত্তারের কাছে যায়। তিনমাস তিনি ফাইলটি ধরে রাখেন। ক তখন তাঁর মন্ত্রীকে গিয়ে বলেন, 'জোর জুলুমের একটা সীমা আছে। এটার বিহিত না হলে প্রতিবাদস্বরূপ চাকরি ছেড়ে দেব।' তারপরের দিনই, ভাইস প্রেসিডেন্ট ক-কে বললেন, 'ঠিক আছে, ওদের ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিন।' কিন্তু সেই ফাইল আর ভাইস প্রেসিডেন্ট পাঠাননি।

১৯০. ক একটি জেলার ডি সি। খ সে জেলার বি এন পি-র জেলা আহ্বায়ক। স্বাভাবিকভাবেই ঐ জেলায় তার ও পরিবারের প্রভাব অপ্রতিহত। একদিন খ-এর ছেলে একটি মেয়েকে অপহরণ করে নিজের বাসায় নিয়ে যায়। ক তখন ঢাকায়। সুতরাং জেলা প্রশাসনের কেউ কোন ব্যবস্থা নিল না বা নিতে সাহস

পেল না। ক ঢাকা থেকে ফিরে এসে গুণ্ডা অ্যাক্টে ঐ ছেলেকে গ্রেফতার করে জেলে পুরলেন।

খ এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতারা [বি এন পি] ক-এর ওপর চাপ প্রয়োগ করেও কিছু করতে পারলেন না। তখন, তারা ঢাকায় আরো উচ্চপর্যায়ে তদ্‌বির শুরু করলেন। বি এন পি-র কেন্দ্রীয় কমিটির এক সভায় ভাইস প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে মৌখিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে— জেলার ডি সি এবং এস পি-কে 'রিমুভ' করতে হবে। এ সিদ্ধান্ত পেশ করা হল প্রেসিডেন্ট জিয়ার কাছে। তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, দেখব।'

কিন্তু এ ব্যাপারে ডি সি এস পি-কে রিমুভ করা তো দূরে থাকুক, তিনি তাদের মৌখিক কোন নির্দেশ দেননি বা অনুরোধও করেননি।

১৯১. সত্তর দশকের শেষের দিকের ঘটনা। একজন মন্ত্রী, প্রথমদিন পুরোটা সময় ব্যয় করলেন, তাঁর অফিসে কী ধরনের কার্পেট, পর্দা, ফার্নিচার হবে তা নিয়ে। এরপর তিনি ঠিক করলেন তাঁর ঘরের আয়তন বৃদ্ধি করতে হবে। তিনি দেখছেন, তাঁর অনেক সহকর্মীর [মন্ত্রী] ঘর তাঁর ঘরের থেকে বড়। আয়তনের এই পার্থক্য ছিল বড়জোর তিনফুট। এবং তাও ইচ্ছাকৃত নয়। কারণ, তখন হরহামেশা মন্ত্রী বদল হত। একেক সময় একেক জন একেক ঘরে বসতেন। যাহোক, এই তিনফুট বাড়াতে হলে তাঁর ও তাঁর ব্যক্তিগত সচিবের ঘরের দেওয়ালটি ভাঙতে হয়। তিনি তাই করেছিলেন।

১৯১ ক. প্রেসিডেন্ট জিয়া একসময় এমন একজনকে মন্ত্রী করলেন যে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ছিল আলবদরদের নায়ক এবং স্বাধীনতার পরপর বুদ্ধিজীবী হত্যার দায়ে তার বিরুদ্ধে হুলিয়া জারী করা হয়েছিল।

নতুন মন্ত্রী, পুরনো যে মন্ত্রীর বদলে এলেন, তিনি ছিলেন অন্য সম্প্রদায়ের। শপথ গ্রহণের পর নতুন মন্ত্রী যেদিন সচিবালয়ে তার ঘরে প্রথম এলেন তখন সঙ্গে নিয়ে এলেন দুর্গন্ধনাশক একটি স্প্রে। নিজের ঘরে নিজের হাতেই ভালো করে স্প্রে করে নতুন মন্ত্রী বললেন, 'আ বাঁচলাম। মালাউন বসায় ঘরটা গন্ধ হয়েছিল।'

১৯২. প্রেসিডেন্ট জিয়ার সময় কিছুদিনের জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী করা হয় সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত এক কর্নেলকে যিনি ছিলেন ডাক্তার। মন্ত্রীর সচিবও ছিলেন ডাক্তার। দু'জনেই ডাক্তার কিন্তু কেউ কাউকে পছন্দ করতেন না। মন্ত্রী একদিন সংস্থাপন সচিবকে ডেকে অনুরোধ করলেন সচিবকে বদলি করে দিতে। সংস্থাপন সচিব জানতে চাইলেন, কাকে তিনি সচিব হিসেবে পেতে চান? মন্ত্রী

একজন যুগ্ম সচিবের নাম করেন। এই যুগ্ম সচিব ছিলেন ব্রিগেডিয়ার এবং ঘুষ খাওয়ার ব্যাপারে তার বেশ দুর্নাম ছিল। তা'ছাড়া সচিব হওয়ার মতো সিনিয়রিটিও তাঁর ছিল না। সংস্থাপন সচিব প্রেসিডেন্টের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করলেন এবং জানালেন তিনি এই প্রস্তাব সমর্থন করেন না।

প্রেসিডেন্ট বললেন, 'এটা করবেন না।'

'মন্ত্রী জানতে চাইলে ?'

'বলবেন, প্রেসিডেন্ট এটা চান না।'

১৯৩. প্রেসিডেন্ট জিয়াব সময় ক ছিলেন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের একজন পদস্থ কর্মচারী। মন্ত্রণালয় থেকে একজন এস ডি ও-কে রুটিনমাফিক বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। বদলির নির্দেশ পেয়ে এস ডি-ও ধবল মন্ত্রীকে এবং তাঁর মাধ্যমে প্রেসিডেন্টকে, যাতে তার বদলিব আদেশ রদ করা হয়। প্রেসিডেন্ট ফোন করে বললেন ক-কে, 'ও যেখানে আছে সেখানেই রেখে দিন।' রাজী হলেন না ক। পরে প্রেসিডেন্ট নিজে অর্ডার দিয়ে বদলিব সে আদেশ নাকচ করে দেন।

১৯৪. জিয়ার সঙ্গে ক-এর আগে থেকেই পরিচয় ছিল। ক যখন পূর্ণ সচিব তখনও জিয়াউর রহমান চীফ অফ স্টাফ হননি। প্রেসিডেন্ট হওয়ার পব, জিয়াউর রহমান কয়েকটি মন্ত্রণালয় ঘুরিযে তাঁকে সচিব হিসেবে নিয়োগ কবেন গুরুত্বপূর্ণ এক মন্ত্রণালয়ে। প্রশাসনিক বিভিন্ন ব্যাপাবে জিয়াউর রহমান তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতেন। কিন্তু সক্রিয়ভাবে জিয়া রাজনীতি শুরু করলে বিভিন্ন প্রশাসনিক ব্যাপারে তাঁদের মতানৈক্য শুরু হয়। ছোটখাটো ব্যাপারেও ক-এর সিদ্ধান্ত জিয়া বদলে দিতে লাগলেন। এক পর্যায়ে তিনি প্রেসিডেন্টকে বললেন, 'আপনি আমাকে জিজ্ঞেস না করে বরং নিজেই কী করতে হবে সরাসরি নির্দেশ দেন তা'হলে ভালো হয়। প্রেসিডেন্ট তখন হেসে তাঁকে বললেন, 'শোনেন, এখন রাজনীতি করছি। সব বোঝেনই তো। অনেক কিছু অ্যাকোমোডেট করতে হয়।' এর কিছুদিন পর ক-কে আবার বদলি করা হয় গুরুত্বহীন এক পদে।

১৯৫. প্রেসিডেন্ট জিয়ার আমলে ইপি সি এস দের পদোন্নতির ব্যাপার নিয়ে ঝামেলা শুরু হল। ক তখন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের পদস্থ কর্মচারী। এ বিষয়ে নীতি নির্ধারণের জন্য তাঁর ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন, উচ্চতর পদে নিয়োগের জন্য সার্ক্‌ল অফিসারদের লিখিত পরীক্ষা দিতে হবে। কেবিনেটও এই প্রস্তাব পাস করেছিল।

সামনে তখন নির্বাচন সার্ক্‌ল অফিসাররা জানালেন, পরীক্ষা দিতে হলে,

নির্বাচনে তাঁরা সহায়তা করবেন না [অর্থাৎ প্রেসিডেন্টের পক্ষে কাজ করবেন না]। প্রেসিডেন্ট রাতে ফোন করলেন ক-কে। বললেন. 'সার্কেল অফিসারদের ব্যাপারটা কি ক্যানসেল করা যায় না ?' ক-এর বিপক্ষে নানা যুক্তি দেখালেন এবং সবশেষে বললেন, 'এটা তো কেবিনেট ডিসিশন, আমার করার কিছু নেই।'

এরপর প্রেসিডেন্ট নিজেই এই পরীক্ষার আদেশ বাতিল করে ক-কে বদলি করে দেন এক গুরুত্বহীন পদে।

১৯৬. সচিব-মন্ত্রী দ্বন্দ্ব সব সময়ই ছিল। প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের সময় আমলারা খুব একটা দাপট দেখাতে পারতেন না। কিন্তু সে ধরনের সরকার না হলে আমলারাই ব্যবহার করতেন মন্ত্রীর মতো। এর দুটি উদাহরণ—

এক. শেখ মুজিবের সময় ক ছিলেন একটি মন্ত্রণালয়ের সচিব। তাঁর মন্ত্রী ছিলেন একজন অধ্যাপক। মন্ত্রী সচিবকে পছন্দ করতেন না। মন্ত্রী তাই একদিন ক সম্পর্কে আপত্তি তোলেন শেখ মুজিবের কাছে। শেখ মুজিব সঙ্গে সঙ্গে ক-কে অন্য মন্ত্রণালয়ে বদলি করে দেন। একই সঙ্গে তিনি এভাবে মন্ত্রী ও আমলা দু'দিকের স্বার্থ রক্ষা করেছিলেন। বিবাদ এড়িয়েছিলেন।

দুই. জিয়ার আমলে উল্লিখিত ক ছিলেন যে-মন্ত্রণালয়ের সচিব, সে মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা / মন্ত্রী ছিলেন দেশের খ্যাতনামা একজন বিশেষজ্ঞ। সচিবের সঙ্গে তাঁরও বিভিন্ন বিষয়ে মতদ্বৈধ দেখা দেয়। বিশেষ করে বিভিন্ন প্রকল্প ক নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতেন যা উপদেষ্টা পছন্দ করতেন না। তিনি সংস্থাপন সচিবকে ডেকে অনুরোধ করেন ক-কে বদলি করে দেওয়ার জন্য। সংস্থাপন সচিব প্রেসিডেন্টকেও অনুরোধ জানালে তিনি তাতে গুরুত্ব না দিয়ে শুধু বললেন, 'দেখা যাবে।' পরে, উপদেষ্টা নিজে প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ জানালেন। ক এটি জানতে পেরে প্রেসিডেন্টের বেসরকারী উপদেষ্টা একজন অবসরপ্রাপ্ত জেনারেলের কাছে তদবির করলেন নিজের ব্যাপারে। তদবিরে কাজ হল। দেখা গেল কয়েকদিনের মধ্যে উপদেষ্টা বদলি হয়ে গেলেন কম গুরুত্বপূর্ণ একটি মন্ত্রণালয়ে। শুধু তাই নয়, কয়েকদিন পর তাঁকে উপদেষ্টা পদ থেকেও দেওয়া হল অব্যাহতি।

১৯৭. ক ছিলেন মুনসেফ। কিন্তু ভালো ড্রাফ্‌ট করতে পারতেন তিনি। অচিরেই তাঁকে করা হয় একটি মন্ত্রণালয়ের উপসচিব। জিয়ার আমলে সামরিক বিধির অনেক ড্রাফ্‌ট করে দিয়েছিলেন তিনি। যৌক্তিক ভিত্তি দিয়ে সামরিক আইনের অনেক বিধির ব্যাখ্যা দিতে পারতেন তিনি। অচিরেই দেখা গেল, সচিবালয়ের সর্বোচ্চ পদে পৌঁছে গেছেন তিনি। আর সেই সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের

বিচারকের মর্যাদাও অটুট রাখলেন। [এরই মাঝে হাইকোর্টের বিচারক হিসেবে কিছুদিন কাজও করে নিয়েছিলেন এবং নামের আগে 'বিচারপতি' শব্দটি যোগ করার বন্দোবস্ত করে নিয়েছিলেন]।

১৯৮. প্রচার মাধ্যমকেও পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছিলেন প্রেসিডেণ্ট জিয়া। উচ্চপদস্থ কর্মচারীদেরও সরকারের পক্ষে বলার জন্য যেতে হত রেডিও, টিভিতে। এটা ছিল অবশ্য অলিখিত আদেশ। জিয়া একদিন এক সচিবকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কই আপনাকে তো টিভিতে দেখি না।' 'স্যার, টিভিতে যাওয়ার কোন নির্দেশ আমি পাইনি।' জবাব দিয়েছিলেন সচিব।

১৯৯. প্রেসিডেণ্ট জিয়ার আমলের নির্বাচন মাত্র শেষ হয়েছে, ক পার্লামেণ্টের পদস্থ কর্মচারী। পার্লামেণ্ট সদস্যরা আসছেন পার্লামেণ্ট সচিবালয়ে তাঁদের আইডেণ্টিটি কার্ড নেওয়ার জন্য। এঁদের মধ্যে অনেকে ছিলেন স্বাধীনতা-বিরোধী। অন্যদিকে, ক ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। সুতরাং দু'পক্ষের জন্যই ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল অস্বস্তিকর। বিশেষ করে স্বাধীনতা-বিরোধীদের জন্য। তারা একটি দল করে প্রেসিডেণ্টকে জানাল, ক পার্লামেণ্ট সচিবালয়ে থাকলে ঝামেলা হতে পারে। জিয়া অবশ্য এটা ভেবে দেখেননি। ক-কে এই খবর দিলেন একজন এম পি যিনি আগে চাকরি করতেন ক-এর অধীনে।

পার্লামেণ্ট অধিবেশন বসার তিনদিন আগে, ক অফিসে গিয়ে দেখলেন 'জরুরী' লেখা একটা খাম পড়ে আছে টেবিলে। খাম খুলে দেখলেন তাঁকে বদলি করা হয়েছে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে ও এস ডি হিসেবে। তখুনি ক যোগাযোগ করলেন সংস্থাপন সচিবের সঙ্গে ব্যাপারটা জানতে। সংস্থাপন সচিবও অস্বস্তি বোধ করছিলেন, কারণ, ব্যাপারটা সম্পর্কে তিনিও তেমন কিছু জানতেন না। ক দেখা করলেন বিভাগীয় মন্ত্রীর সঙ্গে যিনি আগে ছিলেন একজন জেনারেল। মন্ত্রী ক-কে বললেন, 'প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে দেখা করেন।' ক বললেন, প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে তিনি দেখা করবেন না। মন্ত্রী জানালেন, তাঁকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে। সেখানে অনেক রাষ্ট্রদূতের পদ খালি আছে। ক যেখানে যেতে চান সেখানেই যেতে পারবেন। ক জানালেন, রাষ্ট্রদূতের পদ তিনি গ্রহণ করবেন না বরং ছুটিতে যাবেন। তাঁর পদমর্যাদার কোন পোস্ট খালি হলে তিনি জয়েন করবেন।

কিছুদিন পর ক জানলেন তাকে মন্ত্রণালয়ের সচিব করা হয়েছে। প্রেসিডেণ্টের অর্ডার হয়ে গেছে কিন্তু তখনও চিঠি ইস্যু করা হয়নি।

···মন্ত্রণালয়ের সচিব তখন একজন জেনারেল। ···মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী কয়েকবার

দল বদলেছেন। শেষবার দলবদলের ফল এই মন্ত্রিত্ব। সচিব আর মন্ত্রীর মোটেই বনাবনি ছিল না এবং প্রায় প্রতিদিনই তাদের কথাকাটাকাটি হত। দু'জনই প্রেসিডেণ্টকে পরস্পরের বিরুদ্ধে নালিশ জানাতেন। সচিব জেনে গিয়েছিলেন যে, তাঁর বদলির নির্দেশ আসছে।

একদিন এমনিই ক ফোন করলেন সচিব 'জেনারেল'কে। কথায় কথায় ক-কে তিনি জানালেন, তিনি অ্যাকটিভ সার্ভিসের লোক যেখানে ও এস ডি-র কোন স্থান নেই [তিনি শুনেছিলেন তাঁকে ও এস ডি করা হচ্ছে]। শুধু তাই নয়, তাঁকে ও এস ডি করা হলে তিনি দেখে নেবেন।

অন্যদিকে, ক-কে সচিব করা হচ্ছে শুনে মন্ত্রী প্রেসিডেণ্টের কাছে গিয়ে বললেন, ক-কে সচিব না করলেই ভালো। কারণ, রাজনৈতিক ভাবে ক বি এন পি-র বিরোধী।

সব মিলিয়ে ব্যাপারটা তালগোল পাকিয়ে গেল। ...সচিব হিসেবে তাঁর অর্ডার ইস্যু হয় না। এদিকে সংস্থাপন মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হলেই বলেন রাষ্ট্রদূত হতে। সব দেখে বিরক্ত হয়ে তিনি অবসর গ্রহণের জন্য দরখাস্ত করলেন। কিন্তু মন্ত্রী সে ব্যাপারও হ্যাঁ না বললেন না। বরং বলেন, 'প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি আপনাকে ছাড়তে চান না। একবার দেখা করুন-না প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে।'

ক জানালেন, যথেষ্ট চাকরি করা হয়েছে। তিনি আর চাকরি করবেন না। এবং প্রেসিডেণ্টের সঙ্গেও তিনি দেখা করতে চান না।

অবশেষে প্রায় তিনমাস পর তাঁকে অবসর গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হল।

২০০. ১৯৭৯ সাল। নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর একজন মন্ত্রী ও সরকারী দলের প্রভাবশালী নেতা প্রেসিডেণ্টকে একটি নোট পাঠালেন দলের ব্যাপারে মূল বক্তব্য— পার্টির ফাণ্ড খালি সুতরাং একটা ব্যবস্থা না করলেই নয়। এ পরি-প্রেক্ষিতে ফাণ্ড গড়ে তোলার জন্যে দু'টি প্রস্তাবও দিলেন তিনি। প্রেসিডেণ্ট একটি প্রস্তাবে সায় দিলেন। প্রস্তাবটি ছিল— ভিটেমাটি বিক্রি করে জনশক্তি উন্নয়ন ব্যুরোর মাধ্যমে যাঁরা মধ্যপ্রাচ্যে যাচ্ছেন তাঁদের কাছ থেকে চাঁদা হিসেবে দশ হাজার টাকা করে নেওয়া।

২০১. একটি প্রকল্পের জন্য কিছু যন্ত্রপাতি আমদানীর প্রয়োজন ছিল। দুটি দেশ আগ্রহী ছিল এতে। পূর্ব ইউরোপের একটি দেশের যন্ত্র ছিল গুণগতভাবে উন্নত এবং তা বার্টার ট্রেডের মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব ছিল। পূর্ব এশিয়ার একটি দেশও আগ্রহী ছিল। কিন্তু তাদের নির্মিত যন্ত্রটি ছিল খানিকটা ত্রুটিপূর্ণ এবং আমদানী

করতে হত তা আমদানীকারকের মাধ্যমে। সুতরাং এসব বিচার করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের উপসচিব পূর্ব ইউরোপীয় দেশটির পক্ষে ফাইল চালু করলেন। সচিব ফাইল দেখে তাঁকে ডেকে বললেন, 'তুমি কি চাকরি হারাতে চাও?'

'কেন স্যার?' জানতে চাইলেন উপসচিব।

'কারণ, তুমি জানো না পূর্ব এশিয়ার দেশটির যন্ত্রপাতি কে গছাতে চাইছে।'

যা হোক, সচিব কিন্তু উপসচিবের সঙ্গে এ ব্যাপারে একমত হলেন।

এদিকে আমদানীকারক মন্ত্রীকে ধরলেন যিনি ছিলেন সামরিক বাহিনীর লোক। মন্ত্রীকে বলল আমদানীকারক, 'আপনার অফিসাররা ফাইলে শুধু শুধু ঝামেলা করছে।' মন্ত্রী সচিব ও উপসচিবকে ডেকে ব্যাপারটা জানতে চাইলেন। তাঁরা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও যুক্তিতর্ক তুলে ধরলেন। মন্ত্রী বললেন, 'ঠিক আছে।' কিন্তু বাঞ্ছিত যন্ত্রপাতি আনানোর ব্যাপারে তাঁরও তেমন উৎসাহ দেখা গেল না।

কয়েকদিন পরে জনৈক আমলা মন্ত্রণালয়ের নতুন মন্ত্রী হয়ে এলেন। এবং পুরো প্রকল্পটিই তিনি প্রত্যাহার করে নিলেন।

২০২. ১৯৭২ সালে জেল কোড নিয়ে মন্ত্রী পরিষদে আলাপ হচ্ছিল। কয়েক-জন মন্ত্রী প্রশ্ন করেছিলেন, রাজনৈতিক বন্দী যারা জেলে যাবে তাদের কেন এত সুযোগসুবিধা দেওয়া হবে? এই মন্ত্রীরা জেলে সুযোগসুবিধা দেওয়ার পক্ষে ছিলেন না। শেখ মুজিব চুপচাপ তাঁদের আলোচনা শুনছিলেন। বৈঠকে কয়েকজন সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে ক-ও ছিলেন। শেখ মুজিব একসময় সরকারী কর্মচারী-দের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা কী বলেন?' তাঁরা চুপ করে রইলেন। ক শুধু বললেন, 'স্যার, আইন বদলাতে হলে পার্লামেন্টে বদলাতে হবে।' কিন্তু পার্লামেন্টে নয়, প্রশাসনিক নির্দেশে জেলবন্দীদের কিছু সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাহার করা হল।

১৯৭৬ সালের ঘটনা। ক তখন একটি জেলার ডি সি। ৭২ সালে যে মন্ত্রী জেলের সুযোগসুবিধা প্রত্যাহারের পক্ষে সোচ্চার ছিলেন এখন তিনি অবস্থান করছেন সেই জেলার কারাগারে। ডি সি হিসেবে ক একদিন গেলেন জেল পরি-দর্শনে। সেখানে সাবেক সেই মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা। তিনি ডি সি-কে দেখে অভিযোগ করলেন, জেলে অনেক সুবিধা থেকে তিনি বঞ্চিত। ক বললেন, 'জেল কোড অনুযায়ী আপনি সব পাবেন। যদি এর কোন ব্যত্যয় ঘটে তা'হলে আমাকে জানাবেন, আমি দেখব।'

'আমি জেল কোড অনুযায়ীই চাচ্ছি।' বললেন মন্ত্রী।

'কিন্তু, আপনাদের আমলেই তো প্রশাসনিক নির্দেশে ঐসব সুযোগসুবিধা প্রত্যাহার করা হয়েছে।' জানালেন ক।

সাত-আটদিন পর, মন্ত্রীর স্ত্রী বিদেশ থেকে সোজা সেই জেলায় এসে হাজির। তিনি দেখা করবেন স্বামীর সঙ্গে। আইনত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতি ছাড়া কেউ রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে দেখা করতে পারে না। কিন্তু মন্ত্রীর স্ত্রী ক-এর কাছে সে অনুমতি প্রার্থনা করলে, ক তাঁকে অনুমতি দিলেন।

কয়েকদিন পর আবার জেল পরিদর্শনে গেছেন ক। সাবেক মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা। মন্ত্রী ক-এর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বললেন, 'আপনি কিন্তু বে-আইনি কাজ করেছেন।'

'কথাটা ঠিক নয়,' বললেন ক, 'আমি জেল কোড অনুযায়ী কাজ করেছি। জেল কোড অনুযায়ী বিশেষ অবস্থায়, ডি সি বন্দীর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি দিতে পারেন। প্রশাসনিক নির্দেশে জেল কোড বদলাবার সময় আপনারা এটা খেয়াল করেননি।'

২০৩. সত্তর দশকের শেষ দিকের ঘটনা। ক একটি জেলার ডি সি। একদিন ঐ বিভাগের সামরিক আইন প্রশাসকের [একজন জেনারেল] দপ্তর থেকে বিভাগীয় কমিশনারের অফিসে অভিযোগ এল— ডি সি-র [ক-এর] নাজির দুর্নীতি করছে। কমিশনার ডি সি-কে নির্দেশ দিলেন তদন্তের।

সপ্তাহ তিনেক পর কমিশনার এলেন জেলা পরিদর্শনে। ডি সি-কে জিজ্ঞেস করলেন তদন্তের ব্যাপারে। ডি সি জানালেন, তিনি তদন্ত করেননি. কারণ, 'নাজির কী দুর্নীতি করেছে যে তদন্ত করব?' কমিশনার বললেন, 'এর মানে কী?' ডি সি জানালেন, নৈশভোজে যেখানে জেনারেলও থাকবেন সেখানে তিনি বিষয়টি খোলসা করবেন।

রাতে, নৈশভোজে বসেছেন কমিশনার, ডি সি এবং বিভাগীয় সামরিক আইন প্রশাসক। কথায় কথায় নাজিরের দুর্নীতির কথা উঠল। ক তখন বললেন, নাজিরের কাজ করতে হলে তিনটি জিনিসের দরকার— ১. তাকে হতে হবে রিসোর্সফুল, কারণ, তাকে যখন যা হুকুম করা হয় তখনিই তা করতে হয় ২. কাজ সম্পন্ন করতে হলে তাকে হতে হবে ক্রুক এবং ৩. তাকে আবার ডি সি-র প্রতি লয়ালও হতে হবে।

জেনারেল জিজ্ঞেস করলেন, 'ক্রুক হতে হবে কেন?'

'কেন, তার একটি উদাহরণ দিই,' বললেন ক, 'পরশু, আপনি হুকুম করলেন সকাল এগারোটায় ৬৫টি ট্রাক লাগবে। ভালো কথা। রিকুইজিশন ইত্যাদি করা হল। সকাল ৯টায় সব ট্রাক রিপোর্ট করল ডি সি অফিসে। একটার সময় আপনারা খবর পাঠালেন, না, ট্রাক এগারোটায় লাগবে না, লাগবে বিকেল পাঁচটায়। নাজির এসে বলল, 'এতক্ষণ রাখলে তো এদের খাওয়াতে হবে।' বললাম, 'খাইয়ে দিন।'

এখন, প্রতিটি ট্রাকে আছে কম করে তিনজন। সে হিসেবে ৬৫টি ট্রাকে ১৯৫ জন। দশ টাকা করে মাথাপিছু খাবার খরচ ধরলে লাগে ১৯৫০ টাকা। নাজির কিন্তু তাদের খাওয়াল। বিকেলে, আপনিও ট্রাক পেলেন। কিন্তু নাজির হঠাৎ করে এতগুলি টাকা পেল কোথায় ? কারণ, আমার বাজেটে তো এ বরাদ্দ নেই। আপনি তো নির্দেশ দিয়েছেন, টাকা দেননি। এ কারণে, তাকে ক্রুক হতে হয়। এখন বলুন কী করব ?

জেনারেল নিশ্চুপ।

[অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাজির এ টাকা যোগাড় করে ধার ক'রে। অথবা অন্য উপায়ে। ধরা যাক, একহাজার টন সিমেন্ট বরাদ্দ করা হবে ডি সি অফিস থেকে। প্রার্থী হয়তো দশজন। তাদেরকে বলা হল টনপ্রতি দশটাকা চাঁদা দিতে। এভাবে ফাণ্ড গড়া হয়। তিনমাস পরপর নাজির ডি সি-র সঙ্গে বসে এর হিসাব-নিকাশ করেন। ব্রিটিশ আমল থেকেই এ ব্যবস্থা চলে আসছে। এ ছাড়া নাজির বা ডি সি-র কোন উপায়ও নেই এ ব্যবস্থায়। কারণ, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিক ভাবে কাজ চায় কিন্তু অর্থ যোগায় না]।

২০৪. ক একটি জেলার ডি সি। সেই জেলায়, প্রখ্যাত একজন বামপন্থী নেতাকে পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে। বহুদিন ধরে চেষ্টা হচ্ছে তাঁকে ধরার কিন্তু ধরা যাচ্ছে না। একবার খবর এলো, এক গ্রামে তাঁকে ফিরে ফেলা হয়েছে। খবরটা শুনে ক-এর মন খারাপ হয়ে গেল। ছাত্রজীবনে বামপন্থী আন্দোলন করেছেন। এখন প্রশাসনে আছেন ঠিকই, কিন্তু একটি লোক এতদিন গরিবের জন্য সংগ্রাম করছেন, এখন তিনি ধরা পড়বেন এটাও তিনি চাচ্ছিলেন না।

বিকেলে খবর এল, বামপন্থী নেতা ধরা পড়েননি। সরেজমিনে তদন্ত করতে গিয়ে শুনলেন, যে পুলিশ ফোর্স তাঁকে ঘিরে ধরেছিল তার দারোগাই তাঁকে পালাবার সুযোগ করে দিয়েছেন। অথচ, এই দারোগার নানারকম কুখ্যাতি ছিল। ক দারোগাকে জিজ্ঞেস করলেন এ ব্যাপারে। দারোগা বললেন,

'রিপোর্ট লিখে দিচ্ছি স্যার।' ক বললেন, 'ঠিক আছে।' দারোগা রিপোর্ট দিলেন এবং কও ঐ রিপোর্ট ভিত্তি করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট পাঠালেন।

২০৫. প্রেসিডেন্ট একজন বিশেষজ্ঞ মন্ত্রী বাদ দিয়ে নতুন আরেকজনকে মন্ত্রী বানালেন। পুরনো মন্ত্রীব চাকরি যাওয়ার পরদিন একটি সভায় নতুন মন্ত্রী যোগ দিতে গেলেন সভাপতি হিসেবে। পুরনো মন্ত্রীও ছিলেন সেখানে। মন্ত্রণালয়ের সচিবও উপস্থিত। সভা শেষ হল। সচিব গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন নতুন মন্ত্রীকে। একজন, সচিবকে বললেন, ক-এর তো [পুরনো মন্ত্রী] গাড়ি নেই। তার জন্য একটা গাডির বন্দোবস্ত করা যাবে তো। সচিব রূঢ়ভাবে উত্তর দিলেন. 'তার আমি কী জানি? নিজের ব্যবস্থা নিজেকে করতে বলো।'

২০৬. সাম্প্রতিক প্রশাসনের একটি উদাহরণ— এক সরকারী বৈঠকে, সচিব উপসচিবকে এক পর্যায়ে বললেন, 'ইউ আর অ্যান ইডিয়ট।' উপসচিবও সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আই এগ্রি, বাট ইউ আর এ গ্রেটার ইডিয়ট।'

১৬ উন্নয়ন ও প্রশাসন

বাংলাদেশে সামরিক শাসকদের অনধিকারলব্ধ ক্ষমতাব সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নির্লজ্জ লোভের কথা অনেক বলা হয়েছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে, যেসব আমলা জনস্বার্থ এবং পেশাগত দক্ষতার প্রতি নজর রাখতে চান, তাঁদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে ওঠে উন্নয়নমুখী স্বষ্ঠু প্রশাসন গডে তোলা যা দেশকে নিয়ে যাবে স্বনির্ভরতার পথে। একটি প্রকল্প যার সাফল্য নির্ভর করে স্থানীয় সিদ্ধান্ত ও দায়িত্বের ওপর. সেখানে দেখা যায় বিভাগীয় মন্ত্রী সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নিয়ে এমন সব সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন যা প্রকল্পের জন্য ক্ষতিকর। এবং সেসব সিদ্ধান্ত তিনি দিচ্ছেন ক্ষমতা-বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে সচিবের সঠিক পরামর্শ নাকচ ক'রে [নক্‌শা ২০৭]। একটি আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সামরিক শাসক প্রত্যাখ্যান করেন সচিবের সুপারিশ। পরিণামে স্বার্থহানি হয় দেশের।[৯] সেই সচিব লিখিতভাবে মৃদু প্রতিবাদ করেন এবং সামরিক সরকার তাঁকে শাস্তি প্রদান করে হঠাৎ বদলির আদেশ দিয়ে [নক্‌শা ২০৮]। সামরিক অফিসাররা প্রয়োজনীয় কিছু পণ্য উৎপাদনের [নক্‌শা ২০৯ ও ২১০] ব্যাপারে বাংলাদেশের ক্ষমতা ব্যবহারের জন্যে যথাযথ উদ্যোগ নেননি [সৃষ্টির কথা না-হয় বাদ দিলাম]।[১০] একজন ব্যবসায়ী সামরিক কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করে একজন কর্তব্যনিষ্ঠ আমলাকে অবসর প্রদান করতে [নক্‌শা ২১১]। তাঁর অপরাধ ছিল দেশীয় শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণে

কিছু পণ্যের আমদানী বন্ধের ব্যাপাবে তিনি দৃঢ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।[১১] এমন-কি একজন বিদেশী ব্যবসায়ী হুমকি প্রদান করে একজন বাংলাদেশী কূটনীতিককে, যিনি নিজের দেশেব বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচাবার অভিপ্রায়ে সেই ব্যবসায়ীর একটি দুর্নীতিদুষ্ট প্রস্তাব [নকৃশা ২১২] প্রায় নাকচ কবে দিয়েছিলেন। বিদেশী ব্যবসায়ীটির সঙ্গে যোগাযোগ ছিল উচ্চতম সামরিক কর্তৃপক্ষের।[১২] একজন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার [১৩] যিনি শুরু কবেছেন ব্যবসা তাব স্বার্থের খাতিরে সামরিক কর্তৃপক্ষ দ্বিধা করে না আমদানী নীতি নমনীয় করতে [নকৃশা ২১৩]। সুতরাং এতে অবাক হওয়াব কিছু নেই যে, নিজেদের তুলে ধরার জন্য তাবা গুরুত্ব আবোপ করবে প্রতাবণার কারসাজিব[১৪] ওপব [নকৃশা ২১৪]।

প্রতিকূল পরিবেশে-কে অজুহাত হিসেবে দেখিয়ে অনেক আমলা নিষ্ক্রিয় থাকেন। কিন্তু, অনেকে আবার সামরিক শাসন ব্যবস্থায় ও জনস্বার্থ ও পেশাগত উৎকর্ষ বজায় রাখাব জন্য যতটুকু ক্ষমতা ততটুকু দিয়ে সরকাবী বেসরকারী চাপের মুখে নিরলস কাজ কবে যান। এভাবে নকৃশা ২১৫ ও ২১৬-এব ঘটনায় দেখি আমলারা রক্ষা কবেন অধস্তনদের হঠাৎ বদলি বা ববখাস্ত হওয়া থেকে। একজন উচ্চপদস্থ আমলা মুনাফালোভী একটি কোম্পানির পথে সৃষ্টি করতে পাবেন প্রতিবন্ধকতা [নকৃশা ২১৭]। দীর্ঘ পাইপ লাইন বসাবার প্রকল্পে সচিবের হস্তক্ষেপ বাঁচিয়ে দেয় বাইশকোটি টাকা [নকৃশা ২১৮], জনৈক মন্ত্রী সবকাবী 'বাহন' কেনার খাতিরে যে ঘুষ খেতে চাচ্ছিলেন তাতে বাধা সৃষ্টি করেন একজন সিভিল সার্ভেণ্ট অপ্রচলিত ব্যবস্থা গ্রহণ ক'রে। এ সংক্রান্ত খবর তিনি গোপনে জানান সাংবাদিকদের, পার্লামেণ্টে শুরু হয় বিতর্ক [নকৃশা ২১৯]। এখানে উল্লেখ্য যে, সংবাদপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে এসব ক্ষেত্রে, কারণ সামরিক প্রাধান্য থাকা সত্তেও একটি পার্লামেণ্ট ছিল। সরকারী শিল্পঋণ সংস্থার একজন পরিচালক প্রতিহত করেন একজন সাংবাদিক ব্যবসায়ীর প্রচেষ্টা যিনি এক খাতে ঋণ গ্রহণ ক'রে ব্যবহার করতে চাচ্ছিলেন অন্য খাতে ঋণ সংস্থাকে ভাঁওতা দিয়ে [নকশা ২২০]। একজন ডি সি সরকারী জমি উদ্ধারের জন্য মসজিদ-মন্দির ভেঙে ফেলতে দ্বিধা করেন না। এই ডি সি-কে অপছন্দ করতেন শাসক দল [সামরিক বাহিনী নিয়মিত]। কিন্তু তা সত্বেও এ ধরনের অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন [নকশা ২২১] যাতে বাধা দেননি সামরিক অধিকর্তা। হয়তো কর্মদক্ষ হিসেবে আমলার সুনাম এক্ষেত্রে কাজ করেছেন বর্ম হিসেবে।

প্রশাসনের পর্যালোচনায় যে নির্মম সত্য উদঘাটিত হয় তা হল বিপুলসংখ্যক

[সম্ভবত বেশির ভাগ] আমলাদের অনীহা ও অকর্মণ্যতা, কাজ এড়ানো বা কাজে বাধা দেওয়া, এবং প্রাপ্য নয় এমন ক্ষমতার লিপ্সা। এই গলদগুলি সামরিক বেসামরিক দুই আমলেই লক্ষণীয়। সেজন্য দেখা যায়, যেসব আমলা জনস্বার্থ ও পেশাগত মান অটুট রাখতে চান তারা আবিষ্কার করেন তাদের প্রধান শত্রু তাদের সহকর্মী এমনকি ওপরঅলারা। এভাবে, সৎ কাজে বাধার[১৫] সম্মুখীন হন জাতীয়করণকৃত একটি ব্যাঙ্কের একজন মহাব্যবস্থাপক যখন তিনি প্রয়োজনীয় কাজ চালাবার জন্য ন্যূনতম সংখ্যক কর্মচারী / জিনিসপত্র চান [নকৃশা ২২২ ও ২২৩]। বা উল্লেখ করা যেতে পারে রাষ্ট্রীয় একটি সংস্থার[১৬] চেয়ারম্যানের কথা যিনি সংস্থার সম্পদ বৃদ্ধি করতে চান [নকৃশা ২২৪] অথবা একটি রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের প্রধানের কথা যিনি সমাজের দুর্বল অংশের মাঝে বিতরণ কবতে চান ব্যাংক ঋণ [নকৃশা ২২৫]। একজন কর্মদক্ষ কর্মচারী সবচেয়ে বেশি প্রতিরোধ ও নিষ্ক্রিয়তার সম্মুখীন হন অর্থমন্ত্রণালয় থেকে যারা প্রশ্ন উত্থাপনে বিশেষজ্ঞ, যদিও সে প্রশ্নের উত্তর হয়তো দিয়ে দেওয়া হয়েছে আগেই [নকৃশা ২২৬]। এ ধরনের প্রবণতা রুদ্ধ কবে সেই সব উদ্ভাবনী প্রচেষ্টা[১৭] যা বাংলাদেশের মতো গরিব দেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয় কয়েকগুণ বৃদ্ধি করতে পারে [নকৃশা ২২৭]। প্রশাসনের উচ্চ-পর্যায়ে অনাহার ও অকর্মণ্যতার ফলে দেখি বা বুঝতে পারি কেন গ্রামাঞ্চলে স্কুল শিক্ষকরা নিয়মিত বেতন পান না [নকৃশা ২২৮] বা কেন গ্রামীণ গরিবদের জন্য করা গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প ব্যবহৃত হয় গ্রামীণ ধনীদের স্বার্থে [নকৃশা ২২৯] বা কেন অযথা বদলি[১৮] করা হয় এমন একজনকে যিনি ব্যস্ত গ্রামীণ কোন প্রকল্প বাস্তবায়নে বা জাতীয় 'যানবাহন সংস্থার' উন্নয়নে [নকৃশা ২৩০]।

উপরোক্ত অনীহা বা অযোগ্যতার কারণেই দেখি একটি মন্ত্রণালয় শ্রমিকদের ওপর যুগ যুগ ধরে সর্দারদের নিপীড়ন নিবর্তনে জারী করা অর্ডিন্যান্স আইনে রূপায়িত করার দায়িত্ব ভুলে যান [নকৃশা ২৩১] এবং আইন পাসের পরে এ দুর্দশা থেকে শ্রমিকদের মুক্তি দেওয়ার জন্য যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ[১৯] নেওয়া উচিত তা গ্রহণেও বিস্মৃত হন [নকৃশা ২৩২]।

পেশাগত উৎকর্ষ ও জনস্বার্থের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়ায় আমলাদের প্রাপ্য নয় এমন ক্ষমতা পাওয়ার লিপ্সা। একটি সংস্থার চেয়ারম্যান তাঁর একজন সহকর্মীর বিশেষজ্ঞ মতামত[২০] অগ্রাহ্য করেন, এবং ঐ সহকর্মীর প্রতি ঈর্ষাবশত[২১] দফতরের শৃঙ্খলাও নষ্ট করেন, যেহেতু সহকর্মীটি তাঁর অধস্তন [নকৃশা ২৩৩]। ১৯৮০ সালে শ্রমিকদের অবস্থা উন্নয়নের জন্য বোর্ড গঠন হওয়ার পরে শ্রমিকরা আশা করেছিল

সর্দার ও তাদের সহযোগীদের অত্যাচার এবং সরকারের অবহেলা ও উপেক্ষা এতদিনে দূর হবে। কিন্তু চেয়ারম্যানের আইন ভঙ্গ করে ক্ষমতা আহরণ, বোর্ডের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় সৃষ্টি করে প্রতিবন্ধকতা এবং স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয় শ্রমিকদের [নকৃশা ২৩৪]। আমলাদের এ ধরনের ক্ষমতা-লিপ্সা বর্তমানে এমন পর্যায়ে গেছে যে তা প্রশাসনে জেনারিলিস্ট ও স্পেশালিস্টদেব মধ্যে যে সূক্ষ্ম ভারসাম্য অপরিহার্য তা বিনষ্ট কবছে, নষ্ট করছে কমাণ্ড স্ট্রাকচার, নীতিগত প্রশ্ন/পার্থক্য দূবীকরণে/সমন্বয়ে বাধার সৃষ্টি করছে, এবং অত্যধিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করতে সাহায্য করছে উচ্চপর্যায়ে [নকৃশা ২৩৫]। অধিকাংশ আমলাই উপবোক্ত অপকর্ম থেকে মুক্ত নন, ফলে প্রশাসনিক অব্যবস্থা অব্যাহত থাকে।[২২] কিন্তু নিজেদের স্বার্থবৃদ্ধিতে তাঁরা অনীহা প্রকাশ কবেন না বা সৃষ্টি কবেন না প্রতি-বন্ধকতা। এ ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব তাঁরা তা করেন, বিশেষ করে জাতীয়/আন্তর্জাতিক লোভনীয় পদে আসীন হতে [নকৃশা ২২৭ ও ২৩৬]। স্বাভাবিকভাবেই, আমলারা যাঁবা অনীহা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির ভক্ত, তাঁরা অন্যদের দুর্দশাব কথা ভাবেন না। সমাজের দুর্বল অংশেব উন্নতিকল্পে একজন আমলা নিঃস্বার্থ বিপ্লবীর[২৩] ভূমিকা পালন করবে [নকৃশা ২৩৭] এটাও কেউ আশা কবে না। তবে এটা আশা করা তো অন্যায় নয় যে, তাঁরা খানিকটা সহানুভূতিশীল হবেন সাধারণের প্রতি বা যেসব প্রশাসক ভালো কাজ করছেন তার সমাদব করবেন, যেমনটি করেছিলেন গ্রামের নিরক্ষর বৃদ্ধারা [নকৃশা ২৩৮ ও ২৩৯]। যাই হোক-না কেন, বাংলাদেশে এখনও এমন কিছু আমলা আছেন যাঁরা সাধারণ মানুষ থেকে লাভ করেন এ ধরনের প্রেরণা।

নকৃশা

২০৭. জিয়াউর রহমানের আমলে ক ছিলেন একটি মন্ত্রণালয়ের সচিব। মন্ত্রণালয় থেকে···চাষ প্রকল্প ক গ্রহণ করা হল। সচিব পরামর্শ দিলেন, স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসনিক কমিটি গঠন করার যারা সিদ্ধান্ত নিয়ে পেশ করবে মন্ত্রণালয়ের কাছে অনুমোদনের জন্য। মন্ত্রী রাজী হলেন না এতে। তাঁর কথা মন্ত্রণালয়ই সব করবে। ক এ-ব্যাপারে নিজেকে না জড়ানোই বাঞ্ছনীয় মনে করলেন। মন্ত্রীই সব করতে লাগলেন মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য সব কর্মচারীদের নিয়ে। পরে 'অ্যালটমেণ্ট' নিয়ে নানাবিধ দুর্নীতির কথা শোনা যেতে লাগল। একদিন উচ্চপর্যায়ের একদিন মন্ত্রী ক-কে ফোন করে বললেন, ক-এর উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এখন সে বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ক পুরো ঘটনা

বিবৃত করে জানালেন : প্রকল্প নিয়ে যেসব কথা উঠছে সেসব মন্ত্রীপর্যায়েই আলোচনা হওয়া ভালো।

২০৮. জিয়ার সময় অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে সচিব পর্যায়ে এক দেশের সঙ্গে এক রকম আলোচনা হয়েছে [অর্থাৎ কোন চুক্তির ব্যাপারে] কিন্তু উচ্চ পর্যায়ে তা আবার বদল হয়ে গেছে। যেমন, একটি দেশের সঙ্গে সমুদ্র থেকে মৎস্য আহরণের ব্যাপারে একটি চুক্তি হয়েছিল। প্রথম দিকে তা ছিল বাংলাদেশের অনুকূলে। পরে নানারকম সংশোধনের পর দেখা গেল চুক্তি আর নেই বাংলাদেশের অনুকূলে। সংশ্লিষ্ট অফিসাররাও যে সবসময় এসব জানতেন তা নয়।

এ-সমস্ত দেখে একদিন ক [সচিব পর্যায়ের] বললেন প্রেসিডেন্টকে, 'সচিব পর্যায়ে আমরা যা করি উচ্চ পর্যায়ে তা হঠাৎ বদল হয়ে যায়, এতে সরকারের সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়।' প্রেসিডেন্ট তাঁর কথা শুনলেন, কিন্তু কিছু বললেন না। কয়েকদিন পর দেখা গেল ক-কে বদলি করা হয়েছে এমন পদে যার কোন গুরুত্বই তেমন ছিল না।

২০৯. একটি বিদেশী সংস্থা গভীর নলকূপ বসানোর জন্য বিশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দিয়েছিল। কথা ছিল বাংলাদেশের একটি সংস্থা কনট্রাক্টটি পাবে। কিন্তু স্বার্থান্বেষী মহল বাংলাদেশী সংস্থার অফিসারদের ঘুষ খাইয়ে টেণ্ডারটি নন রেসপনসিভ করে দিল। তিনটি মহল যারা সবাই ছিল বিদেশী সংস্থার প্রতিনিধি, কনট্রাক্টটি পাওয়ার চেষ্টা করছিল— প্রাক্তন একজন রাষ্ট্রদূত ক ইনডেনটর বা আমদানীকারক খ এবং একজন সচিবের আত্মীয় গ। বেশি নম্বর পেল গ। ক তখন ধরল সামরিক বাহিনীর উচ্চ মহলকে। তারা দেখল, ক-এর কেস খুব দুর্বল। তখন তারা সিদ্ধান্ত নিল, কনট্রাক্টটি ক বা গ কেউ পাবে না, পাবে বাংলাদেশী সেই সংস্থা। অনুদানকারী সংস্থা এতে রাজী হল না। তারা বলল, কনট্রাক্টটি দিতে হবে গ-কে এবং গ-ই পেল কনট্রাক্টটি।

২১০. একজন উচ্চ পর্যায়ের আমলা মন্তব্য করেছেন 'সরকারী নীতিতে বলে, যে পণ্য বাংলাদেশে উৎপাদিত হচ্ছে তা আমদানী করা যাবে না। কিন্তু, তাই যদি হত তা'হলে সরকারী ক্ষেত্রের অন্তর্গত জয়দেবপুরের মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি এতদিনে অনেক উন্নতি করতে পারত। কারণ, ঐ কারখানার ক্ষমতা আছে এখানকার চাহিদা মিটিয়ে রপ্তানী করার। কিন্তু তা হচ্ছে না। কারণ, নীতি মানা যাচ্ছে না।' [অনেক সময় বিদেশী ঋণদাতা-দেশের চাপেও]।

২১১. প্রেসিডেন্ট জিয়ার আমলে একটি শক্তিশালী টেক্সটাইল লবি ছিল

দেশে। এই লবির স্বার্থ প্রতিনিধিত্ব করতেন বাংলাদেশের একজন প্রভাবশালী ব্যবসায়ী ক। মন্ত্রণালয়ের সচিব ছিলেন খ। তিনি চাচ্ছিলেন দেশীয় শিল্পের উন্নতি ও সংরক্ষণ। এক সময় বস্ত্রসংক্রান্ত একটি টেণ্ডার নিয়ে গণ্ডগোল বাধলো। খ বললেন, টেণ্ডারে উল্লিখিত জিনিসপত্র দেশ থেকে নিতে হবে। ক বললেন, তা এগুলি আমদানী করতে হবে এবং তারা তাদের পক্ষে প্রেসিডেণ্টের কাছেও তদ্‌বির করল। এ পরিপ্রেক্ষিতে খ-কে হঠাৎ করে চাকুরি থেকে অবসর দেওয়া হল। খ মামলা করলেন সরকারের বিরুদ্ধে। মামলায় তিনি জিতলেন। কিন্তু, মামলাচলাকালীন সময়েই তাঁর অবসব নেওয়াব সময় হয়ে গিয়েছিল।

এ ঘটনার সময়েই এক পার্টিতে, সদ্য বিদেশপ্রত্যাগত একজন আমলা [যিনি পরে মন্ত্রী হয়েছিলেন সামরিক সবকারের] এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আফসোস করে বলেছিলেন, 'আমাদের একজন বেস্ট লোককে রিটায়ার করিয়ে দিল।' পাশে ছিলেন ক, এ মন্তব্য শুনে তিনি বললেন, 'বলেন কী! আমার দু'মাস লেগেছে তাঁকে রিটায়ার করাতে।'

২১২. সত্তর দশকের মাঝামাঝি। স্থান ওয়াশিংটন। ক বাংলাদেশ দূতাবাসের একজন পদস্থ কর্মকর্তার বাসায় তাঁর সঙ্গে আলাপ করছেন। বিষয় পি এল ৪৮০-এর অধীনে তিনশো মিলিয়ন ডলারের খাদ্যশস্য পাওয়া যাবে। ঢাকা থেকে নির্দেশ এসেছে মাল আনার ব্যাপারটা একজন মার্কিনীকে দিতে। সে এতে ৩½% কমিশন পাবে (প্রায় সাড়ে দশ মিলিয়ন ডলার)। কিন্তু দূতাবাস বলছে, তারা থাকতে এটার কোন দরকার নেই। ক এবং দূতাবাসের কর্মচারী যখন এসব থাকতে এটার কোন দরকার নেই। আলোচনা করছেন তখন ফোন বেজে উঠল। ফোন করেছেন সেই মার্কিনী ভদ্রলোক যাকে এজেন্সি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ধমক দিয়ে সে দূতাবাসের ভদ্রলোককে জানাল, তাকে সি এন এফ এজেন্সি দেওয়ার ব্যাপারে ঢাকা থেকে সাইফার আসবে। সে অনুযায়ী যেন দূতাবাস কাজ করে। নয়তো চাকরি থাকবে না। সে আরো জানাল স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট এবং খ গ ঘ [মন্ত্রী, জেনারেল প্রমুখ] এর সঙ্গে সে আলাপ করেছে এবং তারা তার পক্ষে। তবে হ্যাঁ, ই আর ডি-র এক সচিব বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল এতে, কিন্তু পারেনি।

২১৩. একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল জানালার বিশেষ ফ্রেমের ব্যবসা শুরু করলেন। এর কাঁচামাল আমদানী করতে হত যার শুল্ক ছিল ১০০%। কিন্তু উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে শুধু তাঁর জন্যই ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভেনিউ এই

শুল্কভার হ্রাস করে দেয় ১০%-এ। এদিকে, আরেক ব্যবসায়ীও শুরু করেছেন এই ব্যবসা। কিন্তু তার বেলায় শুল্ক হার ১০০% রইল। অন্যদিকে, বিভিন্ন সংস্থাকে, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হল, কর্নেলের ফ্রেম কিনতে। ব্যবসায়ী ভদ্রলোক কোন সুবিধা করতে না পেরে, অনেক চেষ্টাচরিত্র করে ধরলেন কর্তৃপক্ষের কয়েকজনকে। এরপর তাকে ও কর্নেলের সুবিধা সমূহ দেওয়া হতে লাগল।

২১৪. কৃষিমন্ত্রী নির্দেশ দিলেন একবার, শেরে বাংলা নগরে স্থায়ী কৃষি-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হবে। মন্ত্রণালয়ের পদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে ক মন্ত্রীকে এর অসারতা বোঝাতে চাইলেন। কিন্তু মন্ত্রীর নির্দেশ। প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা খরচ করে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হল কিন্তু তা স্থায়ী হল না। এভাবে শুধু প্রচারের জন্য বাজে খরচ হল পঞ্চাশ লক্ষ টাকা।

২১৫. জাতীয়করণকৃত একটি ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপককে একদিন অর্থ-মন্ত্রণালয়ের সচিব জরুরীভাবে ডেকে পাঠালেন। সচিবের সঙ্গে দেখা হবার পর তিনি বললেন, প্রেসিডেণ্টের ইচ্ছা [সামরিক বাহিনীর] ক-কে [ব্যাংকের ছোটখাটো একজন অফিসার] এ পোস্ট থেকে ঐ পোস্টে বদলি করে দিন। নতুন যে পোস্টটির কথা বলা হল, তা একটি সন্নিহিত ভবনে, দুটো পদের মর্যাদাও এক। মহা-ব্যবস্থাপক অবাক হয়ে বললেন, 'একটি দেশের প্রেসিডেণ্টের পক্ষে এত ক্ষুদ্র ব্যাপারেও মাথা ঘামানো বা হস্তক্ষেপ কিভাবে সম্ভব!' মহাব্যবস্থাপক সচিবকে বললেন, এ মুহূর্তে তাঁর পক্ষে এটা করা সম্ভব নয়, কারণ, মাত্র কয়েকদিন আগেই নতুন একজন অফিসার সেই পোস্টে জয়েন করেছেন।

২১৬. ক একটি ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক। কোন-একটি ঋণ প্রদানের বিষয়ে, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ থেকে তাঁকে জানানো হল, ঐ বিষয়ে ব্যাংকের কর্মচারীরা কাগজ-পত্র পরীক্ষা না করে ঋণ দিয়েছে। সুতরাং তাদের চাকুরিচ্যুত করতে হবে। ক উত্তরে তাদের জানালেন, 'ভালো কথা। কিন্তু আপনারা কি লক্ষ্য করেছেন আগের আমলের উপ-প্রধানমন্ত্রী কেসটি সুপারিশ করেছিলেন। এরপরও ব্যাংক ঋণ দেয়নি। তারপর অর্থমন্ত্রী প্রশ্ন তুলেছিলেন, কেন এটা হচ্ছে না? এতসব চাপের পরও ঐ কর্মচারীরা ন'মাস বিষয়টি আটকে রেখেছিলেন। কই তাদের এ সাহসের জন্য তো কোন প্রশংসা করলেন না।'

ক তাঁর অফিসারদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেননি।

২১৭. ক তখন প্রভাবশালী একটি মন্ত্রণালয়ের পদস্থ কর্মকর্তা। তাঁর উদ্যোগে

সমাজতান্ত্রিক একটি দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের চুক্তি হল। চুক্তি অনুযায়ী দেশটি বাংলাদেশ থেকে এগারোশ টন তামাক আমদানী করবে এবং এর বিনিময়ে বাংলা-দেশের কাছে দেশটির পাওনা ঋণ শোধ হবে। চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর, একটি বৃহৎ সিগারেট প্রস্তুতকারক কোম্পানি দেখল, এ পরিমাণ তামাক রপ্তানী হলে, তাদের লাভের পরিমাণ কমে যাবে। তাই তারা, এ চুক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহল বিশেষ করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে হাত করে ফেলল। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত দিল, তামাক রপ্তানী করা যাবে না। কিন্তু যেহেতু ঋণ পরিশোধের ব্যাপারটি ছিল সংশ্লিষ্ট তাই ফাইল আবার ফেরত এল ক-এর মন্ত্রণালয়ে। মন্ত্রী পর্যায়ে তখন চাপ এল ফাইল ছেড়ে দেবার জন্য। ক-এর মন্ত্রী বললেন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় যখন আপত্তি করছে তখন আর কী করা। কিন্তু ক এর বিরোধিতা করলেন, মন্ত্রণালয়ের সচিবও তাঁকে সমর্থন জানালেন। ফলে মন্ত্রীও সমর্থন করতে বাধ্য হলেন তাঁদের। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে মেনে নিতে হল মূল প্রস্তাবটি।

২১৮. একটি বিশাল প্রকল্প সম্পূর্ণ করার জন্য বরাদ্দ ছিল দুশো কোটি টাকা। উচ্চতর কর্তৃপক্ষের নির্দেশে এ কাজের ভার দেওয়া হয় ইনডেন্টার বা আমদানী-কারক ক-কে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে এ ব্যাপারে তেমন জড়িত করা হয়নি। কিন্তু কাগজপত্র চূড়ান্ত করার জন্য মন্ত্রণালয়কে জড়াতেই হয়। সুতরাং সচিব এ ব্যাপারে এক বৈঠক ডাকলেন। আলাপ চলাকালে সচিব এক পর্যায়ে বললেন ক-কে, 'আপনারা খালি বলছেন এখান থেকে ওখান পর্যন্ত শুধু লাইন আনবেন। কিন্তু জুনের মধ্যে প্ল্যান তৈরি না হলে ঐ লাইনের সঙ্গে অন্যান্য লাইন যুক্ত করা যাবে কিভাবে?'

ক বলল, 'কাজ নেওয়ার সময় একথা হয়নি। তা'ছাড়া সরকারের সঙ্গে কথা হয়েছে, লাইন বসানোর ব্যাপারে আনুষঙ্গিক কাজও আপনাদের করতে হবে।'

'এটাতে আমরা রাজী হতে পারি না,' বললেন সচিব।

'আমরা এ কাজ করতে চাইনি,' উত্তরে বললে ক, 'আমাদের ওপর এ কাজ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।' আসলে সে বোঝাতে চাচ্ছিল যা লাভ হবে তার একটা বড় ভাগ ঘুষ হিসেবে দিতে হবে কর্তাব্যক্তিদের যা তার মনঃপুত হচ্ছিল না। সচিব কিন্তু তাঁর প্রস্তাবে অটল রইলেন। নতুন ফাইল খুলে কর্তৃপক্ষকে সব জানালেন। ফলে, পুরনো চুক্তি বাতিল হয়ে নতুনভাবে আন্তর্জাতিক টেণ্ডার আহ্বান করা হল। এবং অন্তিমে দেখা গেল এতে সরকারের লাভ হয়েছে বিশ কোটি টাকার ওপরে।

২১৯. জেনারেল জিয়াউর রহমান তখন প্রেসিডেণ্ট। ক একটি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী। খ সে মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপক। কর্পোরেশনের জন্য কিছু 'বাহন' কেনা দরকার। মন্ত্রী চান '১০১' ধরনের বাহন কিনতে। কারণ, তা'হলে দশ লক্ষ টাকা পাবেন তিনি কমিশন হিসেবে। খ চান না ঐ ধরনের বাহন কিনতে। কারণ, তা'হলে দেশের আর্থিক ক্ষতি হবে। ক প্রেসিডেণ্ট-কে পরামর্শ দিলেন '১০১' ধরনের বাহন কিনতে। প্রেসিডেণ্টও সে অনুযায়ী নির্দেশ দিয়ে দিলেন।

খ এই নির্দেশ পেয়ে ফিজিবিলিটি রিপোর্ট তৈরি করে মন্ত্রীকে দেখালেন। বললেন, এতে দেশের ক্ষতি হবে। মন্ত্রী খ-এর প্রস্তাবে রাজী নয়। অনেক চেষ্টা করে খ তখন দেখা করলেন প্রেসিডেণ্টেব সঙ্গে, জানালেন তাঁর বক্তব্য। প্রেসিডেণ্ট বললেন, 'ভালো হোক, মন্দ হোক, নির্দেশ যখন দিয়েছি তখন তা আর বদলাব না।' খ বললেন, 'তা'হলে স্যার এক কাজ করা যাক [প্রেসিডেণ্ট হওয়ার আগে, পদমর্যাদায় খ ছিলেন প্রেসিডেণ্টের ওপরে এবং তখন তাঁকে অনুমতি দিয়ে ঢুকতে হত খ-এর ঘরে], পুরো প্রকল্প যৌথ উদ্যোগে করা হোক। যৌথ উদ্যোগে হলে রক্ষণাবেক্ষণের ভার থাকবে সে সংস্থার [যেখান থেকে কেনা হবে] ওপর। তা'হলে হয়তো ক্ষতিটা পুষিয়ে যাবে।' জিয়া বললেন, 'আমিও এটা চাই।'

ক এদিকে খ-কে বললেন কেনাকাটার ব্যবস্থা দ্রুত সম্পন্ন করতে। খ বললেন, কিনতে হলে প্রেসিডেণ্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিনতে হবে এবং ফাইলে তিনি যুক্তির পর যুক্তি সাজালেন।

এদিকে নিহত হলেন প্রেসিডেণ্ট জিয়া। ক আবার চাপ দিলেন খ-কে। মন্ত্রণালয়ের সচিব কিন্তু এ ব্যাপারে নিশ্চুপ। মন্ত্রীর উদ্দেশ্য জেনেও কিন্তু তিনি সমর্থন করছেন না খ-কে। খ দেখলেন, ব্যাপারটা আর ঠেকানো যাচ্ছে না। তখন তিনি যোগাযোগ করলেন সাংবাদিক বন্ধুদের সঙ্গে। এ বিষয় নিয়ে তারপর কয়েকদিন ধরে দৈনিক পত্রিকাগুলিতে হৈচৈ হল। পার্লামেণ্টের পাবলিক অ্যাকাউণ্টস কমিটি শমন পাঠালেন খ-কে তাঁদের সামনে হাজির হতে এবং এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য রাখতে। খ-এর বক্তব্য বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করা হল। ক সেটা দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে খ-কে ডেকে বললেন, 'আপনি কার অনুমতি নিয়ে গেছিলেন সেখানে?'

'সেখান থেকে ডাক এলেই যেতে হবে,' জানালেন খ, 'কারো অনুমতি নেওয়ার তখন প্রয়োজন হল না।'

'আপনি আমাকে প্রসিডিংস শেখাচ্ছেন ?' ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন মন্ত্রী।

'না,' বললেন খ, 'কিন্তু আপনিই বলুন আমার এ ক্ষেত্রে কী করা উচিত ছিল।'

'ঠিক আছে। কিন্তু কমিটির সামনে আপনি এগুলি কি বলেছেন ?'

'এসব বলার কথা সচিবের, কিন্তু কী আর করা, তিনি তো বলবেন না, তাই বলতে হল আমাকে।'

তারপর এ রিপোর্ট এবং ফাইল গেল অস্থায়ী প্রেসিডেণ্ট বিচারপতি সাত্তারের কাছে। তিনি খ-কে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, 'এগুলি তো আমি বুঝিটুঝি না।'

'আপনি ছিলেন স্যার স্প্রীম কোর্টের বিচারক,' বললেন খ, 'এই পদকে আমি প্রেসিডেণ্টের পদ থেকেও বড় মনে কবি। আমি ন্যায় বিচাব চাই আপনার কাছে।'

অস্থায়ী প্রেসিডেণ্ট মন্ত্রীর প্রস্তাব নাকচ কবে খ-এর প্রস্তাব রাখার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু সেই নির্দেশ আসে না। এর মধ্যে মন্ত্রী খ-কে ডেকে বললেন, '১৫ তাবিখ প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন হবে, ১৬ তারিখ তাবা [বিদেশী সংস্থা] আসবে চুক্তি করতে।'

ঠিক দিনে বিদেশীবা এল। খ তিনদিন নানা অজুহাতে তাদেব সঙ্গে দেখা করলেন না। বিদেশীবা অন্যান্য পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে চুক্তি প্রায় পাকা করে ফেলল। খ দেখলেন, তার সমস্ত পরিশ্রমই মাটি হয়ে যাচ্ছে। তিনি তখন অন্য উপায়ে [খুব সম্ভব, এটা তিনি বলেননি] সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের নজরে বিষয়টি [হয়তো সামরিক বাহিনীর মারফত] আনলেন। চুক্তির ঠিক আগের মুহূর্তে দেখা গেল ক-এর জায়গায় নতুন মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন। ঐ চুক্তি আর তখন হল না।

২২০. একজন সাংবাদিক-ব্যবসায়ী, ক (সরকারী) ব্যাংক থেকে এককোটি টাকা ঋণ নিয়ে একটি প্রেস করলেন। সে টাকা শোধ না করেই শহরের একটি দামী জায়গায় হোটেল করার জন্য খ [সরকারী ব্যাংক থেকে ষোলো কোটি টাকা ঋণের জন্য আবেদন করলেন গ তখন খ-ব্যাংকের পরিচালক মণ্ডলীর একজন। সাংবাদিক-ব্যবসায়ীর আবেদন বোর্ডের কাছে এলে, কাগজপত্র পরীক্ষা করে তিনি দেখলেন, ইতিমধ্যে মাটি কাটার জন্য ৯৬ লক্ষ টাকা নেওয়া হয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানলেন সে টাকায় মাটি না কেটে ভদ্রলোক ফ্ল্যাট করেছেন। গ বোর্ডে আপত্তি জানিয়ে বললেন, ঋণ মঞ্জুর করা যাবে না। বোর্ডও রাজী হল তাতে।

এরপর উচ্চতম পর্যায় থেকে খ-ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপকের ওপর চাপ আসতে

লাগল ঋণ দেওয়ার জন্য। অসহায় বোধ করতে লাগলেন মহাব্যবস্থাপক। গ তাঁকে পরামর্শ দিলেন পুরো বিষয়টি আবার বোর্ডে নিয়ে আসতে। বোর্ডে আবার এল বিষয়টি। পুরো বোর্ড ঋণের আবেদন নাকচ করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতম মহলেও [যেখান থেকে চাপ দেওয়া হচ্ছিল] পুরো ঘটনাটি জানানো হল। তারা এ ব্যাপারে পরে আর কোন উচ্চবাচ্য করেনি।

২২১. ১৯৭৬ সালে বিদেশ থেকে ফেরার পর, ক-কে জানানো হল, তাঁকে যেতে হবে ডি সি হয়ে। তাঁর সিনিয়রিটি নিয়ে আরো উচ্চতর পদে যাওয়ার কথা তখন। কিন্তু সংস্থাপন সচিব জানালেন, ছ'মাস পরই তিনি তাঁকে ঢাকা নিয়ে আসবেন। রাজী হলেন ক। তখন নিয়ম ছিল, যাওয়ার আগে ডি সি-রা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করে যেতেন।

চার্জ বুঝে নেওয়ার আগে ক গেলেন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে। হালকা আলাপের পর প্রেসিডেন্ট জিয়া জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন প্রশ্ন ?'

'না স্যার, কোন প্রশ্ন নয়,' বললেন ক, 'একটি আবেদন আছে শুধু।'

'কী আবেদন ?'

'ডি সি হিসেবে কাজ করতে গেলে স্যার,' বললেন ক, 'আমার বিরুদ্ধে নানারকম অভিযোগ আসতে পারে। আমার শুধু অনুরোধ এ ধরনের কোন অভিযোগ এলে, ব্যবস্থা নেওয়ার আগে আমাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেবেন।'

'আই হ্যাড নোটেড।' বললেন প্রেসিডেন্ট।

ছয় মাসের জায়গায় সে জেলায় প্রায় তিনবছর থাকতে হয়েছিল ক-কে। প্রেসিডেন্টই তাঁকে সরাতে চাননি সেখান থেকে। এই তিন বছরে ক বে-আইনি ভাবে জমি দখল করে যেসব ধর্মীয় উপাসনাগার বানানো হয়েছিল সেগুলি ভেঙে আবার জমি উদ্ধার করেছেন, সরকারী দলের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিতে কসুর করেননি। সংস্থাপন মন্ত্রী ও সরকারপক্ষীয়রা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন প্রেসিডেন্টের কাছে। কিন্তু জিয়া কখনও কর্ণপাত করেননি এসব কথায়।

২২২. একবার একটি জাতীয়করণকৃত ব্যাংকের পরিচালক মণ্ডলী, ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপকের একটি প্রস্তাব মেনে নিলেন। প্রস্তাবটি ছিল, ব্যাঙ্ক শিল্পখাতে যে ঋণ দিচ্ছে তা দেখাশোনার জন্য চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট নিযুক্ত করা। এতে লগ্নীকৃত অর্থের অপব্যবহার হ্রাস পেত। কিন্তু অর্থমন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়া সম্ভব ছিল না নতুন এই নিয়োগপত্র দেওয়ার। তবুও প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে

[কাবণ, ব্যাপারটা ছিল জরুবী, তারা প্রার্থী নির্বাচন করে মন্ত্রণালয়ের কাছে তা অনুমোদন করার জন্য আবেদন জানাল। মাসের পর মাস গেল, মন্ত্রণালয় থেকে আব অনুমোদন এল না। জাতীয় স্বার্থ ব্যহত হল এইভাবে।

২২৩. জাতীয়করণকৃত ব্যাঙ্কগুলির ন্যূনতম স্বাধীনতাও নেই। অর্থমন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে এদেব স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়, যা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

জাতীয়করণকৃত প্রধান একটি ব্যাংক তাব স্বাভাবিক কাজকর্ম অব্যাহত রাখা ও দ্রুতকরণের জন্য ৬৫টি জীপ ক্রয়ের এক আবেদন পাঠান অর্থমন্ত্রণালয়ে। অনেক টালবাহানার পর অর্থমন্ত্রণালয় অনুমোদন ছিল ৫টি জীপ কেনাব জন্য। ফলে, এমন অবস্থা হয়েছিল যে টাকা আনা-নেওয়ার জন্যও বাহন ছিল না ব্যাংকের।

২২৪. খোন্দকার মোশতাকের আমল। ক একটি কর্পোরেশনের চেয়াবম্যান। খ তাঁব প্রাক্তন ছাত্র এবং এখন কর্পোরেশনের ফিন্যান্স ডিরেক্টব। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব পছন্দ করতেন না ক-কে।

সবকার কর্পোরেশনের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক কবে দিয়েছেন। কিন্তু সে লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছনো যাচ্ছে না। এব কারণ ছিল দুটি, চাষীরা ন্যায্যমূল্য না পাওয়ায় উৎপাদন কমিয়ে দিয়েছিল এবং কর্পোরেশনের মিল থেকে উৎপাদিত দ্রব্য পাঁচশো টনের কম বিক্রি করা যেত না।

ক নিজের দায়িত্বে তখন উৎপাদিত দ্রব্যের দাম সেরপ্রতি চাব আনা কমিয়ে দিয়ে ফ্রি সেলের নির্দেশ দিলেন। অর্থাৎ একটনও যদি কেউ কিনতে চায় কিনতে পারবে। খ এটা পছন্দ করেননি। সচিবের সঙ্গে তাঁর ভালো সম্পর্ক ছিল। সচিবকে গিয়ে তিনি ক-এর নীতির বিরুদ্ধে বললেন। সচিব এ সম্পর্কে তথ্য বিকৃত করে তা উচ্চপর্যায়ে তুলল, বলা হল অনিয়ম চলছে। বিষয়টি আলোচনার জন্য দেওয়া হল মন্ত্রী পরিষদে। মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকের আগে সচিব তাঁকে ফোন করে বললেন, তিনি যেন খ-কেও সঙ্গে করে বঙ্গভবন নিয়ে যান, যা তাঁকে অবাক করল।

বৈঠকে প্রেসিডেন্ট কর্পোরেশনের নীতি সম্পর্কে কৈফিয়ত দাবি করলেন। ক বললেন, 'কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান আমি, এর লাভক্ষতির দায়িত্ব আমার। মন্ত্রিপরিষদে এর আগে কর্পোরেশনের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রার ব্যাপারে আমি কমিট করেছি। সুতরাং কমিটমেণ্ট রাখার জন্য ও কর্পোরেশনের স্বার্থে আমি. যা ভালো বুঝেছি তাই করেছি।'

প্রেসিডেন্ট উত্তরটি পছন্দ করলেন। সচিব তা দেখে পরে ক-এর কাছে ক্ষমা চেয়ে বললেন, তাঁর অগোচরে তথ্যের বিকৃতি ঘটেছিল।

ক-এর সিদ্ধান্তের ফলে, কর্পোরেশন ঐ সময় অচলাবস্থা কাটিয়ে উঠে মুনাফা অর্জন করেছিল।

২২৫. ক যখন···ব্যাংকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন তখন একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছিলেন 'রিকশা ফাইন্যান্স স্কীম।' এই প্রকল্প অনুযায়ী এক হাজার রিকশা-অলাকে রিকশা কিনে দেওয়া হয়েছিল। কথা ছিল প্রতিদিন তারা পাঁচ টাকা করে শোধ করবেন। প্রথমে, ব্যাংকের সবাই এর বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। কারণ, তাদের মতে, গরিবরা পয়সা মেরে দেবে। কিন্তু পরে তা ভুল প্রমাণিত হল। ক-এর মতে, ছোট ব্যবসায়ী বা এ ধরনের যারা ঋণ নেন তারা সবসময়ই টাকা ফেরত দেন। ঋণ নিয়ে ফেরত দেন না বড় বড শিল্পপতিরা।

একই ভাবে ক গ্রামের মহিলাদের ঋণ দিয়েছিলেন ধান কিনে ঢেকিতে ভেনে বিক্রি করার জন্য যা সফল হয়েছিল।

২২৬. ধরা যাক কৃষিবিভাগের ডিরেক্টর তার বিভাগের জন্যে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে চান। তিনি এর জন্য ফাইল তৈরি করে পাঠান সচিবালয়ে কৃষিমন্ত্রণালয়ে। সেখানে ফাইলটি শাখা অফিসার, উপসচিব হয়ে আসে যুগ্ম সচিবের কাছে। তিনি সোজা ফাইলে স্বাক্ষর করে পাঠিয়ে দেন অর্থমন্ত্রণালয়ে। এখানেই তাঁর দায়িত্ব শেষ। কিন্তু তাঁর উচিত, যেহেতু এটি তাঁর মন্ত্রণালয়ের সেহেতু অর্থমন্ত্রণালয়ের সঙ্গে তাঁরই বোঝাপড়া করা উচিত। কিন্তু তিনি তা করেন না। ফলে, কৃষিবিভাগের ডিরেক্টরকে তাঁর অন্যান্য কাজ বাদ দিয়ে অর্থমন্ত্রণালয়ের অফিসারদের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয়।

এ কথা সবাই জানেন যে, অর্থমন্ত্রণালয় কোন ফাইল পেলে অবান্তর অনেক প্রশ্ন করে। হয়তো অর্থমন্ত্রণালয়ের অফিসার যেসব তথ্য জানতে চান তা ফাইলেই লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু তবুও তিনি প্রশ্ন করে পাঠাবেন।

এ পরিপ্রেক্ষিতে ক-এর অভিজ্ঞতা···বিভাগের ডিরেকটর হিসেবে একবার দেখা করলাম আমি অর্থমন্ত্রণালয়ের এক উপসচিবের সঙ্গে। তিনি আমাকে জানালেন তাঁর কিছু প্রশ্ন আছে। প্রশ্নগুলি তিনি আমায় করলেন। আমি বললাম, 'আপনি আমার যে ফাইলটি দেখছেন, তাতেই প্রশ্নগুলির সব উত্তর লেখা আছে। এখন আমি কি সেগুলি পড়ে শোনাব?' উপসচিব ছিলেন যথার্থ ভদ্রলোক। তিনি বিব্রত হয়ে বললেন, 'না, না। ঠিক আছে।' তারপর ফাইল ছেড়ে দিলেন।

এভাবে প্রায় ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসিত, আধাস্বায়ত্ত-শাসিত সংস্থাগুলির কার্যক্রম বাধা পায় সচিবালয়ে গিয়ে।

২২৭ পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের একজন সদস্য বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত কিন্তু একসময়ের অত্যন্ত প্রভাবশালী একজন সচিব বলেছেন 'প্রায় ক্ষেত্রেই সিভিল সার্ভেন্টরা রাজনীতিবিদদের থেকে কম দেশপ্রেমী এবং প্রগতিশীল। অবসর গ্রহণের পর আইনানুগতাবে কিছু করাতে গেলে একজন আমলা তা আরো বেশি অনুভব করেন। রাষ্ট্রের আমলাতন্ত্র অবশ্যই যে-কোন নতুন ধরনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবে, যদিও সে প্রস্তাবে গরিবদের উন্নয়নের কথা থাকে [বিশেষ করে বাংলাদেশে]। এর অর্থ এই নয় যে, আমলারা সবসময় পুরনো নীতি আঁকড়ে ধরে থাকবেন এবং নতুন অবস্থার মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়ে পুরনো আইনের অজুহাত দেবেন। একজন ব্যবসায়ী উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে যদি এমন ব্যবসা করতে চান যেখানে দেশ শতকরা একশোভাগ বৈদেশিক মুদ্রা লাভ করবে। সেক্ষেত্রেও শাখা অফিসার বা ব্যাংকের সহকারী ম্যানেজার থেকে সর্বোচ্চ সবাই তাতে বাধা দেবে। নথিপত্রে আছে দেখবেন, একশত ভাগ রপ্তানীমূলক বস্ত্র কারখানা স্থাপনেও আমলাতন্ত্র একসময় বাধা দিয়েছিল। তারা পুরনো আমলের আইন-কানুন দেখিয়ে শত প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল। পরে উচ্চতর রাজনৈতিক নীতির কারণে এসব প্রতিবন্ধকতা দূর হয়। কিন্তু নিজের স্বার্থরক্ষার্থে, আমলারা কখনও পুরনো আইন রাতারাতি বদলাতে লজ্জা করে না। এ ধরনের একটা ঘটনা আশির দশকের একটি নিয়ম। যেখানে বলা হয়েছে, আমলারা অনুমতি নিয়ে সব ধরনের 'কনসালটান্সি' করতে পারবে। এবং এরজন্য আমলা হিসেবে প্রাপ্য তার কোন সুযোগসুবিধা ব্যাহত হবে না।'

২২৮ একবার নিয়ম করা হল প্রশাসনকে কর্মক্ষম, উন্নয়নমুখী ও দক্ষ করে তোলার জন্য প্রত্যেক সচিব, অতিরিক্ত সচিব এবং যুগ্ম সচিব প্রতিমাসে দুটি করে থানা সফর করবেন। প্রথম মাসে ক গেলেন তাঁর নির্ধারিত থানা সফরে। তাঁর ভাষায়—

সেখানে পৌঁছনোমাত্র স্থানীয় পদস্থ কর্মচারীরা আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে এলেন। অভিনন্দনের পালা শেষ হলে কাজ শুরু করলাম। বিভিন্ন জন এসে বিভিন্ন রকম অভিযোগ শোনাতে লাগল। যেমন, থানা শিক্ষা অফিসার এসে বললেন, থানার স্কুলের শিক্ষকরা নিয়মিত বেতন পাচ্ছেন না। ঐখান থেকে তো আর শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা বলা যায় না। সুতরাং অভিযোগ

টুকে রাখলাম। স্বাস্থ্যকর্মী এসে এবার পরিবার-পরিকল্পনার উপাদান ব্যবহার ও তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানাল। সেটাও টুকে রাখলাম।

ঢাকায় ফিরে, সমস্ত কিছুর বিবরণ লিখে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগে পাঠিয়ে দিলাম। তারপর নিজের টি এ ডি এ বিল গ্রহণ করলাম।

একমাস পর গেলাম আবার সেই থানায়। এবারও ঠিক আগের অভিযোগগুলি জানানো হল। আমি শুধু আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'সেকি! একমাসেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি! ঠিক আছে, আমি ফিরে গিয়ে দেখব।'

২২৯. আশির দশকে ক ছিলেন সমন্বিত পল্লী-উন্নয়ন কর্মসূচীর একজন পদস্থ কর্মকর্তা। ঐ সময় গ্রামীণ গরিবদের সহায়তাদানের জন্য তিনি একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। পরিকল্পনায় তিনি যুক্তি দেন, সরকার অবশ্যই গ্রামীণ ধনীদের জন্য কিছু ব্যবস্থা নিতে পারেন। কিন্তু, গরিবদের সাহায্য করার অজুহাতে গ্রামীণ ধনীদের আরো ধনী করে তোলার কোন মানে হয় না। সুতরাং এমন-কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হোক যাতে গরিবরা উপকৃত হয়। কিন্তু, তাঁর প্রস্তাবসমূহ বিশ্ব ব্যাংক, তাঁর সহকর্মী সিভিল সার্ভিসের বন্ধুরা— সবাই প্রত্যাখ্যান করল। তাঁর মতে, 'তাই দেখি দীর্ঘদিন ধরে আই আর ডি পি-র কর্মসূচী চালানো সত্ত্বেও গরিবদের বিন্দুমাত্র উপকার হচ্ছে না।'

২৩০ ঘন ঘন বদলি সরকারী কর্মসূচীকে ব্যাহত করতে পারে। যেমন, ক একটি মন্ত্রণালয়ে থাকার সময় ঠিক করলেন 'গ্রামউন্নয়ন দল' [ডি ডি পি] গড়ে তুলবেন। যদিও সরকারের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্য ইউনিয়ন কাউন্সিল রয়েছে। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা নিজেদের স্বার্থরক্ষায়ই ব্যস্ত। নতুন ভি ডি পি-দের শিক্ষা দেওয়া হবে, গ্রামের বিভিন্ন উন্নয়নে সাহায্য করার জন্য। কর্মসংস্থানের জন্য। মোটামুটি একটি কাঠামো যখন তিনি গড়ে তুলছেন তখন তাকে বদলি করে দেওয়া হল একটি সংস্থার প্রধান রূপে। তাঁর উত্তরসূরী আর ডি ডি পি-র কাজে কোন উৎসাহ দেখালেন না। ফলে, সে প্রকল্প প্রায় পরিত্যক্ত হয়ে গেল।

নতুন কাজে যোগ দিয়ে দেখলেন, সংস্থার সব-কিছুতে বিরাজ করছে বিশৃংখলা। কয়েক বছরে চেষ্টায় তিনি শৃংখলা ফিরিয়ে আনলেন। আরো বছরখানেক থাকলে তিনি সংস্থাটিকে গতিশীল করে যেতে পারতেন। কিন্তু তখনই আবার তাঁকে বদলি করে দেওয়া হল। তাঁর উত্তরসূরী নতুন ধরনের পরিকল্পনা নিলেন। ফলে আবার জটিলতা বৃদ্ধি পেতে লাগল ঐ সংস্থায়।

২৩১. ক 'বিশেষজ্ঞ' হিসেবে শ্রমিকদের অবস্থা উন্নয়ণের জন্য একটি বোর্ড

গঠনের প্রস্তাব তাঁর একটি রিপোর্টে পেশ করলেন। প্রস্তাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল —শ্রমিকদের মজুরি সর্দারদের মারফত না দিয়ে বোর্ডের মাধ্যমে দেওয়া হবে, ঠিকাদারদের এই বোর্ডের মাধ্যমে কাজ করতে হবে। এবং যে সংস্থায় এই বোর্ড হবে সে সংস্থাব চেয়াবম্যান পদাধিকাব বলে বোর্ডের চেয়াবম্যান হবেন।

কেবিনেট ক-এর রিপোর্ট পাস করে। ১৯৮০ সালে এ বিষয়ে একটি অর্ডিন্যান্সও পাস করা হয়। এখন অর্ডিন্যান্স পাস করতে হবে জাতীয় পরিষদের মাধ্যমে। কিছুদিনের মধ্যে পরিষদের অধিবেশন বসার কথা। কিন্তু সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় অর্ডিন্যান্সটিকে যে পেশ করতে হবে তা যেন বেমালুম ভুলে গেল। অধিবেশনের দুদিন আগে তাদের হঠাৎ খেয়াল হল অর্ডিন্যান্সের কথা। ক-কে ডেকে পাঠানো হল ঢাকায় এবং মন্ত্রণালয় নির্দেশ দিল দু'দিনের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন করতে হবে। দু'দিনের কাজের মধ্যে ছিল, অর্ডিন্যান্সটিকে বাংলায় অনুবাদ করা, প্রেসিডেন্টের অনুমোদন পাওয়ার পর, অনুবাদটি মুদ্রণ ও জাতীয় পরিষদের সদস্যদের মধ্যে বিতরণ।

ক দেখা করলেন আইন সচিবের সঙ্গে। তিনি বললেন ত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে এ কাজ করা অসম্ভব। আইন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ছিলেন ক-এর পূর্বপরিচিত। ক তাঁকে অনুরোধ করলেন অনুবাদের ব্যাপারে। তারা দু'জন দুপুর দেড়টায় অনুবাদ শুরু করলেন, রাত সাড়ে-এগারোটায় তা সম্পন্ন হল। প্রেসিডেন্টের অনুমোদনও নেওয়া হল। মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এরপর স্বাক্ষর করলেন রাত সাড়ে-বারোটায়। তারপর তাঁরা দেখা করলেন জাতীয় পরিষদের যুগ্ম-সচিবের সঙ্গে। তার প্রয়োজনীয় অনুমতি পাওয়ার পর রাত দু'টায় অনুবাদটি নিয়ে যাওয়া হল সরকারী মুদ্রণালয়ে। সারারাত ও সারা সকাল থেকে তারা দুপুর বারোটায় মুদ্রণকাজ শেষে করে দুপুর দেড়টায় তা পৌঁছে দিলেন জাতীয় পরিষদের সদস্যদের হাতে। ঐ দিনে বিকেলে পাস হয়ে এল আইনটি।

২৩২. একটি সংস্থার শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়নে, ১৯৮০ সালে সরকার একটি অর্ডিন্যান্স পাস করে ঐ সংস্থার অধীনেই একটি স্বায়ত্তশাসিত বোর্ড গঠন করে। ঐ বছরই পার্লামেন্টে এ বিষয়ে আইন পাস করে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ক-কে বোর্ডের প্রধান হিসেবে নিয়োগের সুপারিশ করে। কিন্তু প্রায় এক বছরেও যখন বোর্ড গঠন বা ক-এর নিয়োগপত্র এলো না তখন শ্রমিকরা শুরু করেন আন্দোলন। ১৯৮১-এর শেষার্ধে বোর্ড গঠন করে [অর্থাৎ বিভিন্ন প্রতিনিধির সমন্বয়ে] ক-কে প্রদান করে নিয়োগপত্র। ক সচিবালয়ে নিয়োগপত্র আনতে গিয়ে চাকুরির

শর্তাবলী জানতে চাইলে সচিব বললেন যে, চিন্তার কোন কারণ নেই, সেগুলি জানানো হবে। ক সচিবকে অনুরোধ জানালেন, মন্ত্রণালয় থেকে অন্তত একটি কাগজে লিখে দিতে হবে, ক আগের চাকুরিতে যেসব সুযোগসুবিধা পেতেন সেগুলি বলবৎ থাকবে। সচিব রাজী হলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, ক-এর চাকুরিব এইসব শর্তাবলী তাঁর কাছে পৌঁচেছিল তাঁর অবসর গ্রহণের সময়. প্রায় পাঁচ বছর পর—১৯৮৫ সালেব জুন মাসে।

বোর্ড গঠিত হওয়ার পর, কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে অনুমোদনের জন্য ক গেলেন আবার সচিবালয়ে। সচিব তাঁকে পাঠালেন যুগ্মসচিবের কাছে, তিনি আবার পাঠালেন উপসচিবের কাছে এবং অন্তিমে তাঁকে আসতে হল আবার সচিবের কাছে। সচিবের হস্তক্ষেপে কর্মচারী নিয়োগ করা সম্ভব হল প্রায় এক বছর পর। ১৯৮১ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত [জুন, ১৯৮৫] এই বোর্ডের কোন বাজেট অর্থমন্ত্রণালয় পাস করেনি। ক একবার উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক [যিনি মন্ত্রণালয়ের ও মন্ত্রী-কে] দিয়ে দু'বছরের ব্যয়ের অনুমোদন করিয়ে নিয়েছিলেন। এখনও অর্থমন্ত্রণালয়ের স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের তালিকায় বোর্ডের নাম ওঠেনি যদিও ১৯৮০ সালে. বাংলাদেশের পার্লামেণ্ট আইন করে বোর্ডটি গঠিত হয়েছিল।

২৩৩. প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে একটি বিশেষ সংস্থার শ্রমিকরা ঠিকাদার ও তাদের নিযুক্ত সর্দারদের দ্বারা নিপীড়িত ও শোষিত হয়ে আসছিল। ১৯৭২ সালে তারা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করে। দাবি তোলে, মজুরি সরাসরি দিতে হবে শ্রমিকদের, সর্দারদের মারফত নয়, গঠন করতে হবে এজন্য শ্রমিক উন্নয়ন বোর্ড। এ পরিপ্রেক্ষিতে সরকার ১৯৭৩ সালে, বিদেশের এ ধরনের সংস্থাগুলি পরিদর্শন ক'রে বাংলাদেশের জন্য কী করা যায় তার খসড়া পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য একটি পর্যবেক্ষক দল গঠনের প্রস্তাব নেয়। কিন্তু তা কার্যকর হয়নি। ১৯৭৮ সালে, একটি পর্যবেক্ষক দল এশিয়ার বিভিন্ন স্থান ঘুরে বাংলাদেশের এ ধরনের সংস্থাগুলির জন্য একই ধরনের বোর্ড গঠন করার প্রস্তাব করে একটি রিপোর্ট পেশ করে।

ক ছিলেন সে সময়···সংস্থার একজন পদস্থ কর্মচারী। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে তাঁকে অনুরোধ জানানো হয় রিপোর্টটি পড়ে মন্তব্য করার জন্য। এরপর তা মন্ত্রিপরিষদে পেশ করা হবে।

রিপোর্টটি পড়ে ক দেখলেন যে, কমিটি প্রধানত ভারত এবং পাকিস্তানের

সংস্থাগুলির এর আদলে বাংলাদেশে তা গঠন করার প্রস্তাব করছে। ক প্রস্তাব করলেন, এই বোর্ড গঠন করার আগে উচিত হবে নিজেদের এ ধরনের সংস্থাগুলি পরিদর্শন করা এবং শ্রমিক ও ঠিকাদারদের সঙ্গে আলাপ করা। মন্ত্রণালয় এ প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং ক-কে বিশেষজ্ঞ হিসেবে ঐ কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করে।

সংস্থার চেয়ারম্যান [যে সংস্থায় ক চাকুরিরত] ছিলেন পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের ক্যাডারের, সেজন্য স্বাভাবিকভাবেই তিনি এই সংস্থার সর্বোচ্চ পদ, পেয়েছিলেন। [বিভিন্ন সংস্থাগুলি সর্বোচ্চ পদ সংস্থার অভিজ্ঞ লোক দিয়ে নয়, ক্যাডার সার্ভিসের লোক দিয়ে পূরণ করা হত। এখন পূরণ করা হয় সামরিক বাহিনীর মধ্যম ব্যাংকের অফিসারদের দিয়ে]। চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটিতে ক-এর অন্তর্ভুক্তি পছন্দ করলেন না। তিনি মন্ত্রণালয়কে চিঠি লিখে জানালেন, ক-কে কমিটি থেকে বাদ দিয়ে, তাঁর অনুমোদিত ব্যক্তিকে কমিটিকে নেওয়া হোক। সরকার এতে রাজী হলেন না। চেয়ারম্যান আবার সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে বললেন, ক-কে যেন 'বিশেষজ্ঞ' হিসেবে কমিটিতে না রাখা হয়।···সংস্থার একজন কর্মচারী 'হিসেবে বড়জোর রাখা যেতে পাবে। কারণ, 'বিশেষজ্ঞ' হিসেবে তাঁকে রাখা হলে জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে [কিন্তু কী জটিলতা বা তিনি উল্লেখ করতে পারেননি]। মন্ত্রণালয় এ চিঠির উত্তর দিল না।

এদিকে ক-কে মাঝে-মাঝে কর্মস্থল ত্যাগ কবে কমিটির সঙ্গে ঘুবতে হত। একবার তিনি এরকম এক সফরশেষে ফিবে তার টেবিলে দেখেন চেয়ারম্যানের একটি অর্ডার পরে আছে তাঁর স্বাক্ষরের জন্য। অর্ডারটি ছিল, এখন থেকে ক-এর সহকারী [ক-এর মাধ্যমে নয়] সরাসরি চেয়ারম্যানের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

ক এটাতে স্বাক্ষর না করে জানালেন চেয়ারম্যানের এই আদেশ আইনানুগ নয়। কারণ, সংস্থার আইন অনুযায়ী চেয়ারম্যান কী কী করবেন তা লেখা আছে। এ ধরনের আদেশ দেওয়া তাঁর এক্তিয়ারভুক্ত নয়। উত্তরে চেয়ারম্যান জানালেন, তাঁর আদেশই বহাল থাকবে। ক তখন মন্ত্রণালয়কে জানালেন। মন্ত্রণালয়ের সচিব চেয়ারম্যানকে ডেকে পাঠালেন ঢাকায়। তিনি এবং মন্ত্রী তাঁকে নির্দেশ দিলেন এ বে-আইনি আদেশ প্রত্যাহার করে নিতে। তিনি রাজী হলেন কিন্তু কর্মস্থলে ফিরে এসে বেমালুম তা ভুলে গেলেন। তার এ ধরনের কার্যকলাপ···বন্দরে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করতে লাগল। ক আর এটা নিয়ে মাথা ঘামাননি, কারণ, বোর্ডের কাজ নিয়েই তিনি ব্যস্ত ছিলেন। তাছাড়া উপরোক্ত সংস্থায় তিনি আজীবন কাজ করছেন। তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনে দেখেছেন, ক্যাডার

বা সামরিক বাহিনীর অভিজ্ঞতাহীন লোকেরা সর্বোচ্চ পদে এসে কিভাবে তা নিজের জমিদারি মনে করে।

২৩৪. নকশা ২৩২-এ উল্লিখিত সংস্থারই ঘটনা। পার্লামেন্টের আইনে ঠিক হয়েছিল, সংস্থার প্রধান বোর্ডের প্রধান হবেন পদাধিকারবলে। কিন্তু বোর্ডের নির্বাহী প্রধান হবেন অন্য একজন। ক ১৯৮১ সালে যোগ দেন বোর্ডের নির্বাহী প্রধান হিসেবে। সংস্থার প্রধান তখন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবকে জানালেন বোর্ডের নির্বাহী প্রধানও তাঁর হওয়া উচিত (উল্লেখ্য, সংস্থা প্রধান হওয়ার আগে তিনি ছিলেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব এবং পার্লামেন্টের আইন তৈরির ছিলেন একপক্ষ]। সচিব জানালেন, সংস্থা-প্রধানের প্রস্তাব মানলে পার্লামেন্টের আইন ভাঙা হবে যা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

১৯৮২ সালে, সামরিক আইন জারীর পর, একদিকে সংস্থা-প্রধান, অন্যদিকে বোর্ডের বিভিন্ন বণিক সমিতির প্রতিনিধি, এমনকি মন্ত্রণালয়ও [বণিকদের সঙ্গে আঁতাতের ফলে] প্রস্তাব করল, বোর্ড ভেঙে তাঁকে আগের সংস্থার সঙ্গেই একত্রিত করা হোক। উপ-আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক এবং মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রী বিষয়টি ফয়সালা করার জন্য সব পক্ষকে নিয়ে একটি সভা আহ্বান করলেন। সভায় সবাই প্রস্তাবটি সমর্থন করে বললেন বোর্ড হবে সংস্থার শাখা, নির্বাহী প্রধানের পদ থাকবে তবে ক্ষমতা থাকবে সব সংস্থা প্রধানের। মন্ত্রী তখন ক-কে জিজ্ঞেস করলেন তাঁর বলার কিছু আছে কিনা। ক জানালেন, সরকাবী কর্মচারী হিসেবে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তিনি কিছু বলতে পারেন না, তবে দুটি বিষয়ের প্রতি তিনি সবার মনোযোগ আকর্ষণ করতে চান। এক, সংস্থার নিয়মিত কর্মচারীর সংখ্যা সাত হাজার। একত্রীকরণ হলে বোর্ডের অনিয়মিত পনেরো হাজার শ্রমিককে নিয়মিত কর্মী হিসেবে গণ্য করে সব সুযোগসুবিধা দিতে হবে তা সংস্থা পারবে কিনা। দুই, সরকারী নিয়ম অনুযায়ী একই ব্যক্তি একই সঙ্গে দুটি সংস্থার সার্বক্ষণিক নির্বাহী প্রধান হতে পারেন কিনা। মন্ত্রী বললেন, তাই তো, এ ব্যাপারে তো কেউ বলেনি। তারপর, পর পর তিনটি কমিশন গঠন করা হল এ ব্যাপারে এবং স্বাভাবিকভাবেই তিন কমিশনের সিদ্ধান্ত হল তিনরকম। যেহেতু একজন আমলার বিষয়টি পছন্দ হয়নি [এবং ব্যবসায়ীরা তাদের স্বার্থে মদত দিচ্ছে তাকে] তাই সম্পূর্ণ ব্যাপারটিকেই অন্যান্য সহযোগী আমলাদের সাহায্যে ঘোলাটে করে তোলা হল অযথা। অথচ বোর্ডটি পার্লামেন্টের আইনের বলে শ্রমিক উন্নয়নের জন্য গঠিত হয়েছিল। এখন শ্রমিক উন্নয়ন ভেঙে

গিয়ে তা অক্ষম একটি সংস্থায় পরিণত হয়েছে এবং বণিক প্রতিনিধিদল তাই চাচ্ছিল।

২৩৫. পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের একজন প্রাক্তন সদস্যের মতে, ইংরেজ এবং পাকিস্তানী শাসনের সময়, একজন সচিবের মূল বেতন ছিল সরকারী কর্মচাবী-দের মধ্যে সর্বোচ্চ। সাধারণত একজন জেনারিলিস্ট সচিবের পদ অলংকৃত করতেন। তিনি ছিলেন মন্ত্রণালয়েব নীতিনির্ধারক ও সমন্বয়কারক। মাঠ পর্যায়ে, অনেক বিশেষজ্ঞ তাঁর থেকে বেশি বেতন [বিভিন্ন ভাতা সহ] সত্য কিন্তু মূল বেতন সচিবেরই ছিল বেশি। আবাব অনেক সংস্থাব প্রধানের মূল বেতন ছিল সচিবের সমান কিন্তু তাদেব চাকরিব মেয়াদেব স্থায়িত্ব সচিবের চেয়ে কম ছিল। এ বকম সূক্ষ্মভাবে 'কমাণ্ড স্ট্রাকচাব' ঠিক রাখা হত। ফলে, সচিবালয়ের একজন উপসচিব বিশেষজ্ঞ না হয়েও মৎস্যবিভাগেব ডিবেক্টর ও পশুপালন বিভাগেব ডিরেক্টবের কাজের সমন্বয় সাধন কবতে পাবতেন।

সত্তব ও আশির দশকে বিভিন্ন সংস্কাবের ফলে এখন তার পরিবর্তন হয়েছে। এখন কোন কোন ক্ষেত্রে উল্লিখিত ডিরেক্টবদের মূল বেতন উপসচিব বা যুগ্মসচিবেব চেয়ে বেশি। ফলে, সচিবালয়ে উপসচিব বা যুগ্মসচিব সমন্বয় সাধনের জন্য কোন বৈঠক ডাকলে তারা 'দেখানোর জন্য' নিজেরা না এসে অধস্তনদের পাঠান। ফলে, প্রায় ক্ষেত্রে সচিবদের বৈঠক ডাকতে হয়। সচিব এ কাজ করতে করতে আব অন্য কাজে মনঃসংযোগ করতে পাবেন না। এর ফলে, কর্মক্ষমতা, শৃঙ্খলা হ্রাস পাচ্ছে। প্রকারান্তরে প্রশাসন হচ্ছে কেন্দ্রীভূত। উন্নয়নের কাজ হচ্ছে ব্যাহত।

২৩৬ একবার জাতি-সঙ্ঘের একটি বিশেষজ্ঞ দলের প্রধান হয়ে ক গিয়ে-ছিলেন আফ্রিকার একটি রাষ্ট্রে। সফরশেষে, তাঁরা এক হোটেলে বসে আলাপ করছিলেন। আলাপ চলাকালে জার্মানীর এক বিশেষজ্ঞ বললেন, 'রিপোর্টে কিন্তু একটি জিনিস ছাড়া সবই উল্লেখ করা হয়েছে।' সেটা কী ? জানতে চাইলেন সবাই। 'তা হল, এই রিপোর্ট আবার পর্যালোচনার জন্য বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা উচিত— এ কথা উল্লেখ করতে আমরা ভুলে গেছি।'

২৩৭. একবার ভূমি-সংস্কার কমিশনের সদস্য হিসেবে ক দেশের বেশ কয়েক-জন বামপন্থী নেতার সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। আলোচনাকালে প্রখ্যাত একজন বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতা অভিযোগের সুরে বললেন, কমিশন শুধু সংস্কার বা জোড়াতালির কথা বলছে। বিপ্লবের কথা বলা হচ্ছে না। ক বললেন, 'আপনাদের সংগ্রামের প্রতি আমার পূর্ণ সহানুভূতি ও আস্থা আছে।

কিন্তু যে কাজ আপনি বা আপনারা করতে পারেননি, সে কাজ আপনি কিভাবে আশা করেন সরকারী কর্মচারী হিসেবে আমি বা সরকারী এই কমিশন করবে।'

২৩৮. ক একটি জেলার ডি সি। নব্বই বছরের এক বৃদ্ধা থাকেন সে জেলার একটি গ্রামে। তাঁর আত্মীয়স্বজন সবাই চলে গেছেন পশ্চিমবঙ্গে। তিনি শুধু পৈত্রিক ভিটা আঁকড়ে পড়ে আছেন। তিনি একসময় জানালেন, মৃত্যুর আগে তাঁর ভিটার একটি স্কুল তৈরির জন্য দান করে দিতে চান। ক এ-খবর পেয়ে সে জমির দায়িত্ব নিয়ে সেখানে একটি স্কুল করেছিলেন এবং স্কুলের নামকরণ করলেন সে-বৃদ্ধার নামে।

নির্দিষ্ট দিনে ক গেলেন সেই স্কুল উদ্বোধন করতে। গিয়ে দেখলেন, সবাই উপস্থিত, কিন্তু বৃদ্ধাকে অনুষ্ঠানে নিয়ে আসার কথা কারো মনে নেই। ক তখন নিজে গিয়ে বৃদ্ধাকে অনুষ্ঠানে নিয়ে এসে তাঁকে দিয়েই স্কুলের উদ্বোধন করালেন। উদ্বোধনের পর, বৃদ্ধাকে তিনি অনুরোধ করলেন কিছু বলতে, তিনি কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন— 'আমারে সবাই ত্যাগ করে চলে গেছে। আমি শুধু পড়ে আছি এই গ্রামে। এখানে কে হিন্দু কে মুসলমান আমি বুঝি না। দেশ ভাগ হয়েছে, খুনখাবাপি হয়েছে, বহু লোক চলে গেছে। কিন্তু এই স্কুলে যারা পড়বে, সম্পর্কে যারা আমার নাতি, তাদের ছেড়ে আমি যাইনি। আমি খালি চাই, আমার জীবনে যা দেখেছি, যা ঘটেছে ; এদের যেন তা দেখতে না হয় বা তাদের জীবনে যেন তা না ঘটে।' বৃদ্ধা ক-কে তাঁর কর্মনিষ্ঠার জন্য এত আন্তরিক প্রশংসা ও শুভকামনা জানালেন যে ক অভিভূত হলেন।

২৩৯. সত্তর দশকের শেষভাগ। ক একটি জেলার ডি সি। একদিন একটি প্রকল্প পরিদর্শনে যাচ্ছেন ভোরবেলা। দেখলেন, রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছেন এক বৃদ্ধা। গাড়ি থেকে নেমে জিজ্ঞেস করলেন ক, 'কী ব্যাপার?' বৃদ্ধা জানালেন, তার গাই বিইয়েছে। প্রথম দোয়ানো দুধ গরম করে এনেছেন তিনি। ডি সি সাহেব তা না খেয়ে যেতে পারবেন না। ক-এর মতে, 'একজন প্রশাসকের কর্ম-জীবনে এর চেয়ে বেশি আর কী পাবার আছে?'

১৭ সংকট ও প্রশাসন

বেসামরিক শাসনে যেমন, সামরিক শাসনেও তেমন, অপরাধী / রাজনীতিবিদ এবং নির্বাচন প্রার্থী / ব্যবসায়ী নিজস্বার্থ সিদ্ধির জন্য আশ্রয় নেন কৌশলের। তাঁদের কৌশল শুধু আমলাদের ক্যারিয়ারের প্রতিই হুমকি নয়, তাঁদের কৌশল

নষ্ট করে প্রশাসনিক পরিবেশ, ক্ষুণ্ন করে জাতীয় স্বার্থ। এ ধরনের কৌশল মোকাবিলায় আমলাকে হতে হয় নিঃস্বার্থ, সাহসী এবং গ্রহণ করতে হয় অপ্রচলিত মাধ্যম [যেমন, সংবাদপত্রে খবরের সূত্র প্রদান, নক্শা ২৪০ ও ২৪১]। এরাও যোগ্য প্রশংসার, কারণ, গণতন্ত্রে যেখানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আছে, যেখানে এসব উপায় গ্রহণ সহজ, কিন্তু সামরিক শাসনামলে [যেখানে সবই রুদ্ধ] ঐ ধরনেব পদক্ষেপ নেওয়া কষ্টকর। এর বিপরীতে, অনেক আমলা সামরিক শাসনে পূর্ববর্তী বেসামরিক সরকারের ব্যবস্থাদি প্রয়োগ করে [উদাহরণস্বরূপ, খাদ্যসংকট] যথেষ্ট প্রশংসা পান কারণ, বেসামরিক আমল থেকে সামরিক আমলের প্রচারযন্ত্র (নক্শা ২৪২) অধিক শক্তিশালী।

ন ক্ শা

২৪০. ১৯৭৫। মুজিব হত্যার দু'সপ্তাহ পরের ঘটনা। খোন্দকার মুশতাক প্রেসিডেন্ট। জেলায় জেলায় স্থাপন করা হয়েছে নিয়ন্ত্রণকক্ষ। এর সদস্য হচ্ছেন ডি সি এস পি এবং সামরিক বাহিনীর একজন প্রতিনিধি। সরকার থেকে নির্দেশ এল, অননুমোদিত সকল অস্ত্র সমর্পণ করতে হবে। ক তখন একটি জেলার এস পি। যাদের কাছে অস্ত্র আছে তাদের তিনি ডেকে পাঠালেন। এর মধ্যে ছিলেন আওয়ামী যুব লীগের সভাপতি। তাঁকে তিনি বললেন, অস্ত্র জমা দিতে। যুবনেতা বললেন, তাঁর কাছে কোন অস্ত্র নেই। কিন্তু ক জানেন তাঁর কাছে অস্ত্র আছে। তখন তিনি আর তাঁকে কিছু বললেন না। তারপর দশদিন আর সভাপতির দেখা নেই। দশদিন পর তাঁর খোঁজ পাওয়া গেলে ক তাঁকে ডেকে পাঠালেন। খুব সভাপতি বললেন, 'আমি ঢাকায় গিয়েছিলাম। জিয়ার সঙ্গে কথা হয়েছে, তিনি আমার ভগ্নীপতি। তিনি বলেছেন, আমাকে অযথা বিরক্ত না করতে।' বলে তিনি চলে গেলেন। ক পরদিন তাঁকে গ্রেফতার করলেন।

গ্রেফতার হওয়ার পর যুব সভাপতিকে পুলিশ বেদম প্রহার করে যা ক জানতেন না। এর অবশ্য কারণও ছিল। তার আয়ের প্রধান উৎস ছিল ভুয়া রেশন কার্ড। মুজিব হত্যার কয়েকদিন আগে, মহকুমা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কাছে তিনি কিছু খাদ্যশস্য দাবি করেন যা দিতে অপারগতা জানান খাদ্য নিয়ন্ত্রক। ফলে তিনি খাদ্য নিয়ন্ত্রককে চপেটাঘাত করেন। এ ছাড়া জেলার কর্মকর্তাদের সবার সঙ্গেই তিনি খারাপ ব্যবহার করতেন।

যুব সভাপতিকে প্রহারের খবর ঢাকায় পৌঁছবোর সঙ্গে সঙ্গেই ক ফোন পেলেন যে, তাঁকে ঢাকায় চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ক সংবাদটি জানালেন

ডি সি-কে। ডি সি ফোনে কথা বললেন ঢাকায় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। পরদিনই ঢাকা থেকে একজন সচিব, একজন যুগ্মসচিব ও সামরিক বাহিনীর একজন কর্নেল-সমন্বয়ে গঠিত কমিটি সেই জেলায় এলেন ঘটনার তদন্ত করতে। তাঁরা সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। সচিব বললেন ক-কে, 'আপনার ঢাকায় যেতে হবে না, আপনিই এখানেই থাকবেন।' কর্নেল থানায় গেলেন, বন্দীকে দেখলেন. তারপর এসে মন্তব্য করলেন ক-কে—'আপনার বিরুদ্ধে এ লোক এতবড় কমপ্লেন করে কিভাবে? আমরা হলে তো একে অনেক আগেই ডিসপোজ কবে দিতাম।'

২৪১. একটি পরিবহন সংস্থা সুষ্ঠুভাবে চালাতে গেলে তার নিজের সংরক্ষণ ওয়ার্কশপ প্রয়োজন। একটি পরিবহন সংস্থার এ ধরনের একটি প্রকল্প ছিল। কিন্তু একটি সামরিক পর্যবেক্ষণ কমিটি এটি বাদ দিয়ে দেয়। তারপর আবার এ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্যে প্রয়োজন হয়ে পড়ে বৈদেশিক মুদ্রার। ক তখন সেই সংস্থার প্রধান ব্যক্তি। তিনি সংরক্ষণ ওয়ার্কশপের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে বিভিন্ন জায়গায় দেন-দরবার শুরু করলেন টাকার জন্য।

একদিন এক মন্ত্রী তাঁকে ফোন করে বললেন, 'আপনি তো টাকা খুঁজছিলেন। টাকার সংস্থান হয়েছে। আমার সম্বন্ধীকে পাঠাচ্ছি। অনেক টাকা এনেছে সে। তাঁর সঙ্গে আলাপ করুন।' এখানে উল্লেখ্য যে মন্ত্রীর স্ত্রী বিদেশী, মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশের।

মন্ত্রীর সম্বন্ধী খ এলেন ক-এর সঙ্গে দেখা করতে। সর্বাঙ্গে তার জৌলুশ। খ জানালেন, দুশো মিলিয়ন ডলার সে দিতে পারবে। কী চায় ক? পরিবহন সংরক্ষণ ওয়ার্কশপ? নতুন পরিবহন? সব পাবে। খ জানালেন, ক-এর প্রকল্প তাঁরা বাস্তবায়ন করে দিতে পারে ৮৬ মিলিয়ন ডলারের বিনিময়ে। অথচ ক জানেন, অন্যান্য অনেকে ২০ থেকে ৩০ মিলিয়নের মধ্যে কাজটি করে দেবে। শুধু তাই নয়, খ-এর শর্ত অনুযায়ী শতকরা ২৫ টাকা ক-এর সংস্থাকে অগ্রিম দিতে হবে। অর্থাৎ খ, ক-এর টাকা দেখিয়ে অন্য কোন পার্টির কাছ থেকে ঋণ নেবে। অর্থাৎ কইয়ের তেলে কই ভাজবে। ক ব্যবসার পুরো ফাঁকিটা ধরে ফেললেন এবং খ-এর প্রস্তাবে রাজী হলেন না।

এদিকে মন্ত্রীর চাপে, ঊর্ধ্বতন মহল খ-এর প্রস্তাব প্রায় মেনে নিচ্ছে। এখন দরকার শুধু সংস্থার প্রধান হিসেবে ক-এর অনুমোদন। খ বিভিন্ন মহলে টাকা বিলোচ্ছেন। আর ক-এর সঙ্গে বৈঠক করছেন। একদিন এরকম বৈঠক চলাকালে খ ক্ষিপ্ত হয়ে ক-কে বললেন, 'আমাকে ইয়োর এক্সেলেন্সি বলবেন।' 'কী কারণে?'

জানতে চাইলেন ক। খ দুটি পরিচয়পত্র পকেট থেকে বের করে দিলেন ক-এর হাতে। ক দেখলেন, খ একই সঙ্গে আফ্রিকার দুটি দেশে তার নিজের দেশেব রাষ্ট্রদূত। কিন্তু সরকারী চাকরি করে কিভাবে এ ধরনের ব্যবসা সম্ভব ? জানতে চাইলেন ক। খ জানালেন, অফিসের সময়ের বাইরে তিনি ব্যবসা করেন।

কিন্তু ক কিছুতেই রাজী নন খ-এর প্রস্তাবে। মন্ত্রী প্রেসিডেণ্ট পর্যন্ত তদ্‌বির করলেন। প্রেসিডেণ্ট ক-কে ডেকে ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, 'এত কষ্ট করে টাকা যোগাড় করি অথচ আপনারা সব ভণ্ডুল করে দেন।' [এখানে উল্লেখ্য যে, প্রেসিডেণ্ট আগে ক-এর অধীনে কাজ করতেন]।

এদিকে খ একদিন ক-কে হোটেল সোনারগাঁয়ে সকালের নাস্তা খাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন। ক জানালেন, ঐ দিন ছুটির দিন, তিনি বাসাতেই থাকতে চান। খ বললেন, ক-এর সঙ্গে তাঁর জরুরী দরকার। ক বললেন, যদিও ছুটিব দিন তবুও তার জন্য তিনি অফিসে যেতে রাজী আছেন। খ মিনতি করে বললো, 'আমি বুড়ো মানুষ, আমাকে কেন আর অফিসে আদালতে ছুটোছুটি করিয়ে কষ্ট দিতে চান ?' সুতরাং ক রাজী হলেন সোনার গাঁ যেতে।

হোটেলে গিয়ে ক দেখলেন তসবিহ হাতে উদ্বিগ্ন চিত্তে খ অপেক্ষা করছেন। ক-কে যথেষ্ট আপ্যায়ন করে খ নিয়ে বসালেন নাস্তার টেবিলে। মদ খাওয়াতে চাইলেন। ক তা প্রত্যাখ্যান করলেন। অনেক কথার পর খ বললেন ক-কে, তাঁদের অনেকে চাইছেন মধ্যপ্রাচ্য থেকে উন্নয়নমূলক সব কাজকর্ম সরিয়ে বাংলা-দেশে নিয়ে আসতে। যাতে এই দেশ মুসলিম জাহানের সেরা দেশ হয়ে ওঠে। এজন্য একটা বিশেষ বোর্ড করা হবে যার সদস্য হবেন স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট, ক এবং খ। তারপর কথাচ্ছলে জানতে চাইলেন ক-এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট নাম্বার কত এবং বিদেশে তার কোন অ্যাকাউণ্ট আছে কিনা ? ক এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। খ জানালেন, অফিসের সময়ের বাইরে ক যে তাঁদের পরামর্শ দিচ্ছেন এবং দেবেন তার জন্য খ একটা ফিস দিতে চান। ক বললেন, তাঁদের সরকারী চাকরির নিয়ম চব্বিশ ঘণ্টা। সুতরাং অফিসের বাইরে তাঁর কোন সময় নেই।

অন্যদিকে উর্ধ্বতন মহলের চাপ বাড়ছে। ক তখন একটি বিশেষ পত্রিকার শরণাপন্ন হলেন। তারা ফলাও করে পুরো ব্যাপারটা ছাপল। ক অন্য মাধ্যমে [মাধ্যমটি কী তা জানাননি] উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের একাংশকে ব্যাপারটা বিশদভাবে জানালেন। এবং অন্তিমে আর চুক্তি হল না বরং মন্ত্রী তাঁর চাকুরিটি হারালেন।

২৪২. একজন উচ্চপদস্থ আমলা জানিয়েছেন, সামরিক শাসন যুক্তির থেকে

বেশি নির্ভর করে প্রচারের উপর। ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের সময় [এবং অব্যবহিত পর] বেসামরিক সরকার সুচিন্তিত কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। পরবর্তীকালের সামরিক সরকার এর চেয়ে ভালো কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি। ১৯৭৪ সালে যে সব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল সেগুলির সফলতার গৌরব পেল পরবর্তী সরকার এবং প্রচারেব গুণে তা আরো প্রবল হল। কিন্তু যে সরকার এসব পদক্ষেপ গ্রহণ করছিল [বা পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিল] তাদের কথা কেউ মনে করেনি।

১৮ সামরিক-বেসামরিক সম্পর্ক

বাংলাদেশের সামরিক শাসন নির্ভর কবেছে এবং উচ্চপদে বহাল করেছে এমন কিছু সামরিক ও গোয়েন্দা অফিসারকে যাদের অতীত রহস্যাবৃত এবং মুক্তি-যোদ্ধাদের ওপর নিপীড়ন চালাবার জন্য যারা খ্যাত [নক্শা ২৪৩ ও ২৪৪]। এ ধরনের পরিস্থিতিতে সামরিক শাসকদের কাছে ঔচিত্য ও পরিমিতিবোধ আশা করা বাতুলতা (দ্রষ্টব্য তৃতীয় অধ্যায়)। এ কারণে দেখি, সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পদক (একুশে ফেব্রুয়ারি পদক)[২৮] দেওয়ার ক্ষেত্রে সামরিক শাসকরা একই সঙ্গে একজন সম্মানিত বৃদ্ধ জননেতা ও এক তন্বী পপ-গায়িকার নাম বিবেচনা করতে দ্বিধা বোধ কবেন না [নক্শা ২৪৫]। বিদেশী রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিযুক্ত একজন সামরিক অফিসার মনে করেন রাজকীয় অট্টালিকায় বসবাস করলে এবং বিদেশীদের দামি উপহার দিলে তারা বোধ হয় বুঝতে পারবে না বাংলাদেশের দারিদ্র্য [নক্শা ২৪৬]। একজন নিম্নপদস্থ সামরিক অফিসার (মেজর) মনে করেন একজন যুগ্ম সচিবের সঙ্গে সমপর্যায়ে কথা বলতে পারেন, প্রয়োজনে শাসাতেও পারেন [নক্শা ২৪৭]। পূর্ববর্তী শাসনামলের কোন মন্ত্রীকে বিপদে ফেলার জন্য মামলা সাজাতে[২৫] দ্বিধা করে না সামরিক শাসন এবং এ ক্ষেত্রে চাপও প্রয়োগ করে বেসামরিক আমলাদের ওপর (নক্শা ২৪৮ ও ২৪৯)। সামরিক শাসন বাধা দেয় না একজন কূটনীতিকের স্ত্রীকে (কূটনীতিক অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল) একজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে পার্টনারশিপ ব্যবসা করতে [নক্শা ২৫০]।

নির্লজ্জভাবে ওয়ারেন্ট অফ প্রিসিডেন্সের অদলবদল করে এবং সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের বেতন অনেক বাড়িয়ে সামরিক শাসকরা বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিসকে হেয় করেছে।[২৬] এ ব্যবস্থায় একজন মেজর জেনারেল একজন সচিবের সমকক্ষ।

কোন সভ্যদেশে এ ব্যবস্থা প্রচলিত নেই এবং এ ব্যবস্থা স্বাভাবিকভাবেই বিনষ্ট করে বেসামরিক আমলাদের নৈতিকতা এবং তাদের অনেকে নতজানু হয়ে যান ; এমনকি সুপারিশ করেন পাঁচ বৎসর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখতে যাতে সামরিক শাসকরা ছাত্র-আন্দোলনের 'ঝামেলা' থেকে বাঁচে [নক্শা ২৫১]। কিন্তু আরো অনেকে আছেন[২৭] যাঁরা মাথা উঁচু করে নিঃশঙ্ক চিত্তে দাবি কবেন একজন প্রেসিডেন্টের হত্যা সম্পর্কীয় ব্যাখ্যা যা সামরিক শাসকরা আর দেয় না [নক্শা ২৫২], সর্বোচ্চ সামবিক শাসককে অনুবোধ কবেন যাতে নিম্নপর্যায়ের সামরিক অফিসাববা অফিসের ভেতবে সংযত আচবণ কবেন [নক্শা ২৫৩]। এসব কিছুই সামবিক শাসকদের বাধ্য কবে **Defensive**-এ যেতে।

ন ক্ শা

২৪৩ একজন মন্ত্রী একাত্তরের যুদ্ধেব সময় ছিলেন··· বিভাগেব ইনফর্মাব। যুদ্ধের সময়, গোয়েন্দা বিভাগেব একজন পদস্থ কর্মকর্তা ক-কে সে ভয় পর্যন্ত দেখিয়েছে এ বলে যে কেন মুক্তিযোদ্ধাদের ধবা হচ্ছে না। স্বাধীনতার পবও সে ছিল ইনফর্মার, টাকা পর্যন্ত নিয়ে গেছে ক-এব কাছ থেকে। উচ্চতর কর্তৃপক্ষ খুঁজে পেতে প্রথমে তাঁকে রাজনৈতিক দলগঠনেব ভার এবং পবে মন্ত্রী কবেন। কর্তৃপক্ষেব 'ময়লা কাজ' সাঙ্গ হলে সে বাদ পড়ে মন্ত্রীসভা থেকে।

খ. একাত্তবের যুদ্ধের সময় একজন জেনাবেল [তখন ব্রিগেডিয়ার] ছিলেন ঢাকার মার্শাল ল'র হর্তাকর্তা। তাঁব দাপটে তখন সবাই অস্থিব থাকত। এ আমলে সেই হয়ে ওঠে সবচেয়ে ক্ষমতাশালী মন্ত্রী।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সময় আসামীদেব ওপর নিপীড়ন চালাত এক কর্নেল। সেই পরে হয়ে ওঠে ঐ সামবিক আমলে প্রভাবশালী একজন মন্ত্রী।

২৪৪. ক ছিলেন প্রেসিডেন্টের সচিবালয়ের একজন কর্মকর্তা। গোয়েন্দা দফতর থেকে প্রতিনিয়ত তাঁব কাছে পাঠানো হত 'সিচুয়েশন রিপোর্ট। মাঝে মাঝে এ রিপোর্টে থাকত ভুয়ো প্রতিবেদন। এরকম একটি প্রতিবেদন একবাব পড়ে প্রেসিডেন্ট ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। বিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছিল, প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ হজ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বভার একজন বিচারপতির ওপর ন্যস্ত করায় সামরিক-বেসামরিক অফিসাররা অসন্তুষ্ট হয়েছেন। প্রেসিডেন্ট ক-কে ডেকে বললেন, গোয়েন্দা প্রধান খ-কে টেলিফোন করতে। ক খ-কে ফোন করে জানালেন তিনি যেন অবিলম্বে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করেন। খ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে এলে ক প্রেসিডেন্টের রুম ছেড়ে যেতে উদ্যত হলেন। ক-এর

ভাষায়, 'আমি ছিলাম মুক্তিযোদ্ধা। আর সেই সামরিক শাসনে প্রাধান্য বিস্তার করে ছিল রাজাকাররা। আমি এ আলোচনায় জড়িত হতে চাচ্ছিলাম না, যাতে খ আমার ওপর ক্ষিপ্ত হওয়ার কোন অজুহাত পান। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট আমাকে যেতে বারণ করলেন। তিনি হয়তো চাচ্ছিলেন এ ঘটনার একজন সাক্ষী থাকুক। না'হলে খ 'প্রেসিডেণ্ট তাঁর সঙ্গে অযথা খারাপ ব্যবহার করেছেন' এ অজুহাতে আরেকটি গল্প তৈরি করে ফেলতে পারেন। প্রেসিডেণ্ট আমার সামনে তাঁকে গালাগালি করলেন। শুধু তাই নয়, এক পর্যায়ে বললেন, খ-এর মতো অর্ধ-শিক্ষিত সামরিক লোকের স্পর্ধা দেখে তিনি অবাক হচ্ছেন, যে একজন প্রাক্তন বিচারপতির বিচারবুদ্ধি সম্পর্কে প্রশ্ন তুলছে। তারপর প্রেসিডেণ্ট খ-কে বললেন, কোন কোন অফিসার এ ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে তাদের নামের তালিকা তিনি চান।'

ক যে ভেবেছিলেন, খ ভাববেন, ক-ই প্রেসিডেণ্টকে উশকেছেন— তা ঠিক প্রমাণিত হল। খ একদিন ক-এর সঙ্গে দেখা করে তাঁর সঙ্গে একজন বিদেশি সাংবাদিকের সম্পর্কের ব্যাপার জানতে চাইলেন। উক্ত সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হয়েছিল ১৯৭৫ সালের নভেম্বরে, এ অজুহাতে যে তাঁর সঙ্গে শক্তিশালী একটি বামপন্থী রাজনৈতিক দলের যোগাযোগ আছে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় সাংবাদিকটি তাঁর বন্ধুবান্ধবের মধ্যে ক-এর নামও উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, ক তাঁর কাছে চিঠিপত্র লিখলেন এবং ক একজন মার্কসবাদী। ক খ-কে জানালেন সাংবাদিকটি তাঁর বন্ধু নয়; ১৯৭৩ সালে, প্রেসক্লাবে তাঁর সঙ্গে ক-এর দেখা হয়েছিল মাত্র এবং তিনি কখনও সাংবাদিক ভদ্রলোককে চিঠি লেখেননি। ক-এর ভাষায়, 'তখন আমি ভাবলাম আমার একটু শক্ত হওয়া উচিত। তাই খ-কে বললাম, আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা। এবং আমার দেশপ্রেম নিয়ে কেউ কোন প্রশ্ন তুললে তাঁকে আমি ছাড়ব না।'

এরপর ক-এর সামরিক ও বেসামরিক আমলা বন্ধুরা তাঁকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বললেন, খ তাঁকে গ্রেফতার করতে চাচ্ছেন। তাঁরা ক-কে পরামর্শ দিলেন পালিয়ে থাকতে। ইতিমধ্যে তাঁরা ব্যাপারটির ফয়সালা করে ক-কে সংবাদ পাঠাবেন যাতে তিনি আবার প্রকাশ্যে চলে আসতে পারেন। ক পালিয়ে গেলেন এমন এক অঞ্চলে যেখানে তিনি একসময় ছিলেন জনপ্রিয় এস ডি ও। তিনমাস সেখানে তিনি ছিলেন এবং কেউ তাঁর কথা বাইরে আলোচনা করেননি। তিনমাস পরে, তাঁর বন্ধুরা তাঁকে খবর পাঠালেন ঢাকায় চলে আসতে।

২৪৫ একুশে ফেব্রুয়ারি পদক দেওয়া হবে। কমিটির বৈঠক হচ্ছে। ক ও একজন সদস্য। তিনি পদক পেতে পারেন এমন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের নাম করছেন। কিন্তু সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধি প্রায় ক্ষেত্রেই বলে, না দেওয়া যাবে না, একটি গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট আছে। শেষে কমিটির বাকি সদস্যরা ঠিক করল সে বছর পদক দেওয়া হবে রুণা লায়লা ও মওলানা ভাসানী-কে। যে বছর ভাসানীর মতো একজন ব্যক্তিত্ব পদক পাবেন সে বছর একজন লাস্যময়ী তরুণী গায়িকা যিনি চটুল গান গেয়ে থাকেন— তিনিও পুরস্কৃত হবেন এটা ক মেনে নিতে পারলেন না। বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন তিনি মিটিং থেকে।

২৪৬. একটি চুক্তি সম্পাদনেব জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীসহ সচিব গেছেন বাইরের একটি দেশে। সে দেশে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত একজন জেনারেল। সচিব প্রতি-পক্ষকে উপহার দেওয়ার জন্য নিয়ে গেছেন দেশের হাতে তৈরি জিনিস। বাষ্ট্রদূত উপহার দেখে আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'না, দামী জঁাকালো জিনিস দিতে হবে নয়তো সম্মান থাকবে না।' সচিব এতে বাজী নন। রাষ্ট্রদূত চান, জঁাকালো বা'ডিতে থাকতে, বড় গাড়িতে চড়তে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে প্রমাণ করতে হবে, বাংলাদেশ 'সম্পদশালী একটি দেশ।' সেজন্য উপহার সামগ্রী নিয়ে রাষ্ট্রদূতের এত আপত্তি। সচিব এতে রাজী না হওয়ায়, রাষ্ট্রদূত জানালেন, তা' হলে চুক্তি স্বাক্ষরের সময় তিনি থাকবেন না। সচিব জানালেন, তাতে কিছু আসে যায় না।

২৪৭. কুমিল্লার একটি সরকারী সংস্থায় বহিরাগত কিছু ছেলে এসে মেয়েদের উত্ত্যক্ত করে। সংস্থার পরিচালক ক-একদিন বাধ্য হয়ে কথায় কথায় জেড এম এল-কে [আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক] তা জানালেন। দু-একদিন পর এলাকার দায়িত্বে নিয়োজিত এক মেজর ফোন করে ক-কে বলল, 'আপনি আমাকে না জানিয়ে জেড এম এল-কে ফোন করেছেন? আগে তো আপনার ও সি-কে জানাবার কথা।' ক বললেন, কাকে জানাতে হবে তা তিনি জানেন। মেজর বলল, 'না, কোন অভিযোগ থাকলে আগে আমাকে জানাতে হবে এবং কে করেছে তাও জানাতে হবে।' এখানে উল্লেখ্য যে, ক তখন যুগ্ম-সচিবের পদ-মর্যাদার অধিকারী।

২৪৮. একজন উপ-প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কেস সাজানো হয়েছে। প্রাক্তন একজন ডি সি-কে সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে জিজ্ঞেস করা হল— মন্ত্রী থাকা-কালীন তাঁর এলাকায় মন্ত্রী কি কি 'দুষ্কর্ম' করেছিলেন। প্রাক্তন ডি সি যা বলার বললেন। সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধি বলল, 'তা'হলে তো কেস সাজানো

যাবে না। কেস বানাতে হবে। আপনাকে তার বিরুদ্ধে বলতে হবে, নয়তো আপনাকে দুর্নীতি দমন বিভাগে আটকানো হবে।' প্রাক্তন ডি সি তাঁর বন্ধু সি এস পি-দের জিজ্ঞেস করলেন, এখন তিনি কী করবেন? তাঁরা বললেন, এটা প্রতিহত করতে হবে। ইতিমধ্যে সামরিক পক্ষ প্রাক্তন ডি সি-র বিরুদ্ধে মামলা সাজিয়ে ফেলেছে। তাঁর চাকরি যায় যায় অবস্থা। তখন তাঁর বন্ধুরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁকে রক্ষা করলেন।

২৪৯. একবার আন্তর্জাতিক এক ব্যাংক বাংলাদেশকে দশকোটি ডলার অনুদান দিল—একটি বিশেষ পণ্য কেনার জন্য। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করা হল। বেশ কয়েকটি দেশ টেণ্ডারে অংশগ্রহণ করল। এদের মধ্যে সর্বনিম্ন দর দিয়েছিল খ দেশ, তারপর ক দেশ। কনট্রাক্ট নিয়ন্ত্রণ করবে অর্থ-মন্ত্রণালয়। গ তখন সে মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা। কনট্রাক্টটি তিনিই দেখাশোনা করবেন। এদিকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও কয়েকজন ব্যবসায়ীর একটি জোট গ-কে চাপ দিতে লাগল কনট্রাকটি ক-কে দেওয়ার জন্য। গ বললেন, তা সম্ভব নয়। কারণ, অনুদান প্রদানকারী ব্যাংক চাইবে যে-দেশ সর্বনিম্ন দর দিয়েছে তাকে দিতে।

মন্ত্রী ও ব্যবসায়ী জোট বলল, 'না, ক-কে দিতে হবে।'

গ বললেন, আলোচনা কবলে খ আরো দাম কমাবে।

অবশেষে এনিয়ে বৈঠক বসল। সভাপতিত্ব করছেন উপ-প্রধানমন্ত্রী। সভায় উপস্থিত আছেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী, ক ও তাঁর সচিব। এখানে উল্লেখ্য যে, গ ও বাণিজ্য মন্ত্রী একই স্কুলে পড়াশোনা করেছেন এবং তাঁদের মধ্যে জানাশোনাও ছিল। কে কনট্রাক্ট পাবে এ নিয়ে যখন তর্ক চলছে তখন মন্ত্রী এক পর্যায়ে গ-কে বললেন, 'আপনি ফ্যাক্ট মিসরিপ্রেজেন্ট করছেন।' গ উত্তর দিলেন, 'ফ্যাক্ট মিসরিপ্রেজেন্ট করার জন্য আমাকে বেতন দেওয়া হয় না মাননীয় মন্ত্রী।' সচিব সমর্থন জানালেন তাঁর সহকর্মীকে।

কয়েকদিন পর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হলো— ক খ-এর থেকেও কম দামে দেবে। সুতরাং তাদেরই কনট্রাক্টটি দেওয়া হোক।

গ দেখলেন, তাঁর পক্ষে আর এধরনের চাপ সহ্য করা সম্ভব হচ্ছে না। এ চাপ এড়াতে হলে তাঁকে সহযোগী করতে হবে দাতা ব্যাংক-কে। ঐ ব্যাংকের এক বৈঠকে তিনি তা জানালেন এবং খ-এর প্রতিনিধিকে জিজ্ঞেস করলেন, তারা কত দাম কমাতে পারবে। তারা জানাল, ক যত দামে দেবে তারাও তত দামে দেবে।

একদিকে, পত্র-পত্রিকায় অর্থমন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে লেখা হতে লাগল যে, তারা দুর্নীতি করছে। অন্যদিকে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে যখন গ জানালেন, ক যত দামে দেবে খ ও তত দামে দেবে, মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হল, ক যেহেতু খ-এর আগে এ দাম দিয়েছে সেহেতু তাদেরই কনট্রাক্টটি দিতে হবে। পরে, রাষ্ট্রপতির নজরে ব্যাপারটি এলে, কনট্রাক্টটি তিনি খ-কে দেওয়ার নির্দেশ দেন। হস্তক্ষেপ না হলে যে সিদ্ধান্ত নিম্নপর্যায়ে নেওয়া যেতো এখন তা নিতে হলো সর্বোচ্চ পর্যায়ে, যে কারণে, ক্ষতি হল লোকবল, সময় ও অর্থ।

এর কিছুদিন পর উক্ত মন্ত্রীকে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় এবং তার বিরুদ্ধে অনেকগুলি চার্জের মধ্যে একটি ছিল ঐ পণ্য ক্রয়ের ব্যাপারটি।

তদন্তের জন্য পুলিশ বিভাগ গ-এর কাছে ঘটনার বিবরণ জানতে চাইল। তারা জিজ্ঞেস করল, 'তিনি [মন্ত্রী] কি আপনার ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন ?'

'না', উত্তরে জানালেন গ, 'তা'ছাড়া, এ ডীলে দেশের কোন ক্ষতি হয়নি। আর এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন প্রেসিডেণ্ট, মন্ত্রী দায়ী নন।'

'তা'হলে তো কেস ফেল করবে।'

'সেটা আপনাদের সমস্যা।'

পরে সামরিক আদালতে এ বিষয়ে গ-কে সাক্ষী হিসেবে ডাকা হল। পুলিশ-কে তিনি যা বলেছিলেন, এখানেও তা বললেন। আদালত এ নির্দিষ্ট অভিযোগ থেকে মন্ত্রীকে অব্যাহতি দেয়।

মন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে তাঁকে যারা সবসময় তোষামোদ করতো, আদালতে তারাই মন্ত্রীর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছিল। পক্ষে বলেছিলেন গ ও তাঁর অতিরিক্ত সচিব।

২৫০. এক পুরনো ব্যবসায়ী এসেছেন তাঁর বন্ধু ক-এর সঙ্গে দেখা করতে। কিছুক্ষণ আড্ডা দেবার পর দেখা গেল বন্ধুটি ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে। এর কারণ জিজ্ঞেস করায় বন্ধুটি বলল, 'জেনারেল— [রাষ্ট্রদুত]-এর বউ আসবেন। তাঁকে রিসিভ করতে যেতে হবে এয়ার-পোর্ট।' ক বললেন,

'রাষ্ট্রদুতের বউয়ের সঙ্গে তোমার কি দরকার ?' বন্ধু উত্তর দিলেন,

'তিনি আমার বিজনেস পার্টনার।'

২৫১. একজন অবসরপ্রাপ্ত সচিবের মতে, সামরিক শাসকদের প্রথম সমর্থন জানায় বেসামরিক আমলারা ; এবং তারাই সবশেষে সে সমর্থন প্রত্যাহার করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন চলাকালে, একজন সচিব একবার একজন প্রধান সামরিক

আইন প্রশাসককে পরামর্শ দিয়েছিলেন পাঁচ বছর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখতে। এবং বলেছিলেন এতে দেশের কোন ক্ষতি হবে না। এভাবে অনেক বেসামরিক আমলা প্রমাণ করতে চান যে তারা সামরিক শাসনের প্রতি সৈন্যদের থেকেও বেশি অনুগত।

২৫২. ক তখন···বাংলাদেশের হাইকমিশনার। ১৯৭৫ এর পট-পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশি বেতার থেকে একটি সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো যেখানে ক এবং শেখ মুজিবের হত্যাকারীরাও উপস্থিত থাকবে। ক-কে আমন্ত্রণ জানানো হল সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্যে যেখানে তিনি উপস্থিত থাকতে চাইছিলেন না। এদিকে ঢাকা থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানালো তাকে অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য। তখন তিনি ঢাকায় মন্ত্রণালয়ের কাছে জানতে চাইলেন, হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সরকারী ভাষ্য কী হবে তাঁকে তা জানাতে। মন্ত্রণালয় সে প্রশ্নের কোন উত্তর পাঠাল না। ক-ও সেই অজুহাতে অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন না।

২৫৩. শেখ মুজিব নিহত। মোশতাক ক্ষমতায়। বঙ্গভবনে কর্মকর্তাদের বৈঠক চলছে। সামরিক বাহিনীর তরুণ-অফিসাররা প্রায়ই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সে কক্ষে ঢুকছে বেরুচ্ছে। হাবভাবে তারা তাদের অস্ত্রের ক্ষমতা প্রদর্শন করছে। এক পর্যায়ে স্বরাষ্ট্র সচিব জেনারেল জিয়াকে বললেন, 'এইসব আর্চিনরা যদি এরকম করে তা'হলে কাজ করা যাবে না। তাদের সামলান।' জেনারেল জিয়া কোন উত্তর দিতে পারলেন না।

তথ্যপঞ্জী :

১. Jahn J. Johnson, *The Military and Society in Latin America*, Stanford University Press, Stanford, 1964, p. 261 ; Alfred Stepan, *The Military in Politics : Changing Patterns in Brazil,* Princeton University Press, Princeton 1971, pp. 9-12. Abdur Razzaque comments that the military 'has the Physical force, but it does not have the

intellectual capacity'. See, *Bangladesh : State of the Nation,* University of Dhaka. Dhaka, 1981, p. 16.

২. অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, এরাই এখন আবার নিজেদের সংহত করে ক্ষমতাবান করে তুলেছে। পৃথিবীর আর অন্য কোন দেশে স্বাধীনতার পব স্বাধীনতা বিবোধীরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এসেছে বলে মনে হয় না। দেখুন, দরবার-ই জহুর, পৃ. ১৬১।

৩. এ পরিপ্রেক্ষিতে দেখুন আবদুল খালেকের 'প্রশাসনিক পদ্ধতি', স্মৃতিচারণ পৃ. ১২৮।

৪. মোটামুটি সবাই তা করেছেন, সিবাজুল ইসলাম চৌধুরী যেমন লিখেছেন, শেখ মুজিব বা জিয়াউর রহমান কেউই গণতান্ত্রিক ছিলেন না। আশির দশকে বাংলাদেশেব সমাজ, পৃ. ৪৮।

৫. প্রচারের দিকে জিয়াউর রহমানেব ঝোঁক সম্পর্কিত একটি ঘটনার জন্য দেখুন বেলাল মোহাম্মদের প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৬৫-৬৬।

৬. রাজনৈতিক টাউট, রাজাকার, আলবদব সুযোগসন্ধানী ক্ষমতাক্ষুধার্ত লোকজন নিয়েই দল গঠন করেছিলেন জিয়াউর রহমান। কাজী নুরু-জ্জামানের প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩২।

৭. অনেক আমলা আছেন, অল্পবয়সে বেশি ক্ষমতাব অধিকাবী হয়ে গেলে উদ্ধত হয়ে ওঠেন। আবদুল মোহাইমেনের প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৮। তোফা-জ্জল হোসেন লিখেছেণ, পার্লামেণ্টারি পদ্ধতিতে আমলারা উদ্ধত হওয়ার সাহস পায় না যে সাহস তারা পায় সামরিক শাসনামলে। প্রাগুপ্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৪৪।

৮. আমলাদের মূল্যবোধের অবক্ষয়ের উদাহরণ দিয়েছেন মোহাইমেন। উল্লেখ করেছেন তিনি সত্তর দশকে উচ্চপর্যায়েব কমপক্ষে আধডজন আমলা পরস্পরের স্ত্রী পরস্পরের মধ্যে বদল (বিয়ে) করেছেন। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

৯. একজন ব্যবসায়ীও তাই মনে করেন। ঐ, পৃ. ৪৯-৫০।

১০ দরবার-ই জহুর, পৃ. ১৭৪-৭৮।

১১. 'হিটলারকে সম্পত্তির হিসেব দাখিল করতে বললে তিনিও দেখাতে পারতেন যে তিনি আধবিঘা জমিরও মালিক নয় (প্রেসিডেণ্ট জিয়াউর রহমান হিসেব দাখিল করতে গিয়ে সগর্বে ঘোষণা করছেন যে তিনি মাত্র আধ বিঘা জমির মালিক)।... কাজেই সে প্রশ্ন বাদ দিয়ে যে প্রশ্ন তোলা যায়

তা হলো এই যে, নিজেদের শাসন ব্যবস্থা, সরকার ও রাজনৈতিক দল বজায় রাখার জন্য জিয়াউর রহমান এবং তাঁর মন্ত্রীরা কি চরম অসাধুতার আশ্রয় গ্রহণ করেন না?' বদরুদ্দীন উমর, বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কয়েকটি দিক, পৃ. ২৬-২৮।

১২. এ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামতের জন্য দেখুন, কাজী নুরুজ্জামানের প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩৩; বদরুদ্দীন উমরের, বাংলাদেশের বুর্জোয়া রাজনীতির চালচিত্র, পৃ. ১৫; দরবার ই জহুর, পৃ. ১৯৯-২০০।

১৩. 'The courtier sycophan, the corrupt and corrupting bureaucrats and businessmen had gone to work again within hours of Sheikh Mujib's murder ... some of the retired officers involved in the coup 'were making left and right' · ·Jawans and NCO's and some of the retired Majors and captains had set up extortion and protection rackets.. So Farook's revolution'—the great cleansing operation he had undertaken—and specifically his reasons for killing Sheikh Mujib had all come to nought !' See, Anthony Mascarenhas, *Bangl· desh : A Legacy of Blood*, Hodder and stoughton, London, 1985, pp 88-89.

১৪. উদাহরণের জন্য দেখুন ম্যাসকারেনহাসের প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৩১ ও বদরুদ্দীন উমরের বাংলাদেশে বুর্জোয়া রাজনীতির চালচিত্র, পৃ. ৪৯।

১৫. এ পরিপ্রেক্ষিতে এম ইসহাকের প্রবন্ধ, স্মৃতিচারণ, পৃ. ২৬।

১৬. এর বিপরীতেও আছে অনেক ঘটনা, যেমন একটি উদাহরণের জন্য দেখুন, বিচিত্রা, ১০ ২.১৯৭৮; ১৬.১১.১৯৭৯।

১৭. মোহাম্মদ ইব্রাহীম, 'প্রশাসনে ব্যক্তিগত গুণাবলী ও নেতৃত্ব', স্মৃতিচারণ, পৃ. ৭; আবদুল মোহাইমেনের প্রগুক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৪৮।

১৮. এ ধরনের ঘটনার জন্য কুদরতে গণির প্রবন্ধ, স্মৃতিচারণ, পৃ. ৩৫।

১৯. আতাউর রহমান খান তার মন্ত্রীত্বের অভিজ্ঞতা থেকে মন্তব্য করেছেন, সাধারণ মানুষের মত তিনিও বিশ্বাস করেন যে, আমলারা যে শুধু গণতন্ত্র বিরোধী তাই নয়, দেশের মঙ্গল বিরোধীও। দুই বছর, পৃ. ১৪৯।

২০. এ ধরনের উদাহরণের জন্য, কিছু স্মৃতি, পৃ. ৪০।

২১. এ ধরনের একটি ঘটনার বিবরণের জন্য দেখুন, কে. এম. শমসের আলী, 'প্রশাসনিক সংস্কারে সরকারী কর্মকর্তার ভূমিকা', স্মৃতিচারণ, পৃ. ৮৫।

২২. পাকিস্তানী আমলেও পূর্ব পাকিস্তানের জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হত, আমলাদের ঔদাসীন্যের জন্য তাও যথাযথভাবে খরচ হত না। দরবার-ই জহুর, পৃ. ৮৬।

২৩. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, নিরাশ্রয়ী গৃহী, পৃ. ৪৯।

২৪. বদরুদ্দীন উমর, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কয়েকটি দিক, পৃ. ১০-১১।

২৫. এ ধরনের ঘটনার বিবরণের জন্য দেখুন, দুই বছর, পৃ. ১৩১।

২৬. হাসানউজ্জামান, সামরিক বাহিনী এবং বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা ও রাজনীতি, লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, ঢাকা, পৃ. ৩৬-৩৮।

২৭. যেমন, সামরিক শাসক কর্তৃক গঠিত কমিটিতে একজন আমলার 'ভিন্নমত' প্রদান; দেখুন, ভূমি-সংস্কার কমিটির প্রতিবেদন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শেষ কথা

অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, বাংলাদেশে (বা ভারতে) কি এখনও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রশাসনিক ঐতিহ্য বিরাজ করছে (ব্যতিক্রম বাদে) ?[১] বিভিন্ন সময় সংস্কার সাধন সত্ত্বেও এই ঐতিহ্যের মূল কথা হল--দায়িত্বহীনতা। গত দুশো বছরে শাসকরা জনগণের দুর্ভোগেব জন্য আশংকা প্রকাশ করেছেন এবং সে দুর্ভোগ যে হ্রাস করা প্রয়োজন তাও স্বীকার করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৭৯৩ সালে ১১ ফেব্রুয়ারি গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিশ একটি কার্যবিবরণীতে কঠোর সমালোচনা করেছেন প্রশাসকদের গণবিরোধী কার্য-কলাপের (যেমন, জেলা কালেক্টর)[২]। ১৯৪৭ সালের পর ভারত, বার্মা প্রভৃতি দেশের প্রশাসনিক তদন্ত / সংস্কার কমিটির রিপোর্টগুলির পাতা ওল্টালেও সেই একই জিনিষ চোখে পড়বে।[৩] গত দুশো বছরে আর্থ-সামাজিক কৃৎকৌশলগত উন্নতি সত্ত্বেও প্রশাসকদের মৌল দুটি বৈশিষ্ট্য—ক্ষমতার অপব্যবহার ও দায়িত্ব-হীনতার কোন বদল হয় নি।[৪]

সংস্কারের সপক্ষে বলতে গিয়ে কর্ণওয়ালিশ জেলা কালেক্টরদের আখ্যায়িত করেছিলেন স্বৈরাচারী হিসেবে এবং মন্তব্য করেছিলেন, সাধারণ লোক একজন জেলা কালেক্টরের কাছ থেকে ন্যায় বিচার আশা করা দূরে থাক, ভয়েই কাছে ঘেঁষে না। বর্তমানে, আশির দশকে বাংলাদেশেও (ভারতেও) সাধারণ মানুষ পারতপক্ষে থানা পুলিশ বা আদালতের ধারে কাছে ঘেঁষতে চায় না কারণ তারা নিশ্চিত যে, সেখানে তাদের ঘুষ দিতে হবে, নাজেহাল হতে হবে।[৫] (কিছুদিন আগে চট্টগ্রামের এক পুলিশ চৌকিতে একটি বিশাল সাইন বোর্ড আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বড় বড় হরফে সেখানে লেখা ছিল পুলিশ জনগণের বন্ধু। এটি পড়ে আমাদের এক বন্ধু বললো, এটি হচ্ছে বছরের শ্রেষ্ঠ জোক)।

১৭৯৩ সালে, কর্ণওয়ালিশ কোডে এই আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে, সাধারণ মানুষকে কুশাসন থেকে রক্ষা করার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হবে আইনের শাসন। কিন্তু, ১৮১২ সালের 'ফামিঙ্গার রিপোর্টে'ই দেখতে পাচ্ছি লেখা হয়েছে যে, ১৭৯৩ সালের কোড প্রবর্তনের পর সাধারণ মানুষের জীবন হয়ে উঠেছিল আরো

দুর্বিষহ।[৮] ডাকাতদের সম্পর্কে রিপোর্টে মন্তব্য করা হয়েছে, একশোজনের মধ্যে দশজন ডাকাতকে ধরা সম্ভব কিন্তু মুশকিল হল সেই দশ জনের মধ্যে কর্তৃপক্ষ আবার সাজা দিতে পারেন মাত্র দু'জনকে। আশির দশকে বাংলাদেশে (বা ভারত ও অন্যান্য এল ডি সিতে) কর্তৃপক্ষ অপরাধীদের শাস্তি দেওয়াব এর চেয়ে ভালো বেকর্ড দেখাতে পারবেন কিনা সন্দেহ। আদালত সম্পর্কে সেই ১৮১২ সালেই বলা হয়েছে, হাজার হাজাব মামলা জমে আছে আদালতে। বর্তমান বাংলাদেশে, আদালত সমূহও-এব ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু আমাদের মত 'নির্বোধ'রা কিছুতেই বুঝতে পারেনা, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া কেন বছবের পর বছব মামলা জমে থাকবে আদালতে।

আসলে, এক মেরুতে সক্রিয়তাও অন্য মেরুতে নিষ্ক্রিয়তা—এই দুই মেরুর মাঝে প্রশাসনিক কার্যকলাপের নানাবিধ প্রকাশ তুলে ধরে সরকাবী সংস্থা সমূহেব বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা। সক্রিয়তার নিদর্শন স্বরূপ আমবা তুলে ধরতে পারি চার্লি চ্যাপলিনেব চলচ্চিত্র 'মডার্ন টাইমস'-এর একটি ঘটনাকে। চার্লি চ্যাপলিনের ধ্রুপদী এই চলচ্চিত্রে দেখি, ভবঘুরেদের এক আশ্রয় থেকে একটি মেয়ে পালিয়ে চাকরি নেন এক বেস্তোঁবায়। কিন্তু, সরকাবী কর্মকর্তারা তাকে ফের খুঁজে বের কবে নিয়ে যেতে চায় ভবঘুবেদের আশ্রয়ে। সাধাবণ জ্ঞান ও নৈতিকতাবলে, মেয়েটিকে সেই বেস্তোঁরায় স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জন করতে দেওয়া উচিত ছিল। নিষ্ক্রিয়তার মেরুতে উদাহরণ হিসেবে দেখাতে পারি বেলুচিস্তানের ঘটনাটি [নকশা ৩৩] যেখানে উপজাতিদের পানি নিয়ে বিরোধের নিষ্পত্তি করা হয় পানি বাষ্প হয়ে উবে যেতে দিয়ে, যা ছিল ঐ এলাকায় স্বর্ণের মতো দামী। নতুন যুবক প্রশাসক বিশ্বাস করতে পারেনি যখন তাঁর আই সি এস ওপরওয়ালা বলছিলেন— তাচ্ছিল্য, নিষ্ঠুরতা ও সিনিসিজম সহকারে— এভাবেই আমলাদেব সমস্যা নিষ্পত্তি করতে হয়।

সক্রিয়তা ও নিষ্ক্রিয়তার দুই মেরুর মধ্যবর্তী অঞ্চলে রয়েছে অসংখ্য পরিস্থিতি যার সম্মুখীন হতে হয় প্রতিনিয়ত সব সাধারণ নাগরিককে বিভিন্ন সরকারী সংস্থায়। প্রতিটি সংস্থাতেই খুব অল্পসংখ্যক ব্যতিক্রমধর্মী বিবেকবান কর্মী আছেন, যাঁরা কোন লাভ-লোকসানের পরোয়া না করে সঠিক কর্তব্য সম্পাদন করেন। যদি ভাগ্যবশে একজন সাধারণ নাগরিক কোন সরকারী দপ্তরে এমন একজন কর্তব্যনিষ্ঠ কর্মীর সংস্পর্শে এসে যান, তা'হলে কোন সমস্যা থাকবে না। কিন্তু, প্রায়

সর্বক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের ভাগ্যে যা জোটে তা সম্পূর্ণ অন্যরকম। সরকারী দপ্তরে পদার্পণ করা মাত্র তিনি সম্মুখীন হন গভীর অনীহা ও ব্যাপক অকর্মণ্যতার, কাজে বাধা দেবার বা কাজ এড়াবার নানাবিধ কলাকৌশলের। অনেক সময়ে আবার এগুলির সঙ্গে আর্থিক পীড়নও যুক্ত থাকতে পারে।

আজ যদি কোন সাধারণ নাগরিককে এই প্রশ্ন করা যায়, তার দৈনন্দিন জীবনে সবচেয়ে গ্লানিকর অভিজ্ঞতা কখন ঘটে? তা'হলে হয়তো তিনি বলবেন, সেটি ঘটে তখনিই যখন তাকে সম্পূর্ণ আইনমাফিক ও ন্যায়সঙ্গত কোন চাহিদা পূরণের জন্য সরকারী বা আধা সরকারী সংস্থার দ্বারস্থ হয়ে নানাবিধ হয়রানি / অনাচারের শিকার হতে হয়। ব্যতিক্রম বাদ দিলে, এসব সংস্থার আমলাদের আচার-আচরণের নমুনা থেকে মনে হয় যে, সরকারী ও আধা সরকারী সংস্থায় মানুষের নিকৃষ্টতম বৈশিষ্ট্যগুলিই বিকাশ লাভ করে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। বাংলাদেশের (এবং ভারতেও) অনেক সংবাদপত্রে আমরা দেখেছি, সাধারণ অপরাধে অপরাধীকে (অনেক সময় নিরপরাধীও) বছরের পর বছর (এমনকি এক দশকও) আদালতে হাজির করা হয়নি। বাধ্য করা হয়েছে তাদের কারাগারে থাকতে।

এ প্রসঙ্গে দার্জিলিং ব্যাধির কথা বলতে পারি যাতে পুরো প্রশাসনিক প্রক্রিয়াটিই আক্রান্ত। কলকাতা যখন ব্রিটিশ-ভারতের রাজধানী ছিল তখন দার্জিলিং ছিল গ্রীষ্মকালীন রাজধানী। গ্রীষ্মে উচ্চপর্যায়ের আমলারা চলে যেতেন দার্জিলিং। কেরানী বাবুরা থাকতেন কলকাতায়। আমলা ক-এর একটি ফাইল দেখে মনে হল সেখানে আমলা খ-এর মন্তব্য দরকার। ফাইলটি ক পাঠালেন কলকাতায় তার অধস্তনের কাছে যেন সে নোট প্রস্তুত করে পাঠিয়ে দেয় খ-এর অধস্তনের কাছে। খ-এর অধস্তন তা আবার পাঠাবে দার্জিলিং-এ খ-র বিভাগে। কিন্তু ইচ্ছে করলে ক এই প্রক্রিয়ায় না গিয়ে পুরো ব্যাপারটির মীমাংসা করতে পারতেন খ-এর কাছে গিয়ে যিনি তার পাশের রুমে বসেন। প্রতিদিন তাদের দেখা হয় মধ্যাহ্ন বা নৈশ্য ভোজে। সেখানে বিষয়টি আলোচনা করা যেত। কিন্তু দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে তাদের কোন আগ্রহ ছিল না। তারা আক্রান্ত হয়েছিলেন দার্জিলিং ব্যাধিতে। যদিও হারিয়ে গেছে ব্রিটিশ-ভারতীয় সাম্রাজ্য, সরকারী অফিস আদালতে রয়ে গেছে দার্জিলিং ব্যধির প্রকোপ এখনও।[৭]

একই ধরনের সমস্যা যতক্ষণ না পরিণত হয় সংকটে ততক্ষণ তা মনোযোগ আকর্ষণ

করে না আমলাদের। এমনকি সংকটও যদি হয়—যেমন, শহরের একটি হাসপাতালের ছাদ ভেঙে পড়ল, মেগাপলিসে আগুন নিয়ন্ত্রণে পানির অভাব, উজাড়-হয়ে-যাওয়া বনজ সম্পদ রক্ষা করা [কমপক্ষে দেশের দশ শতাংশে বন থাকা উচিত]— এসব ক্ষেত্রেও আমলাদের ঔদাস্য চীনের প্রাচীরের মতো দুর্ভেদ্য। এ প্রসঙ্গে কৃষন চন্দরের সেই বিখ্যাত গল্পের কথা উল্লেখ করা যায়, যেখানে এক ব্যক্তি গাছের নীচে চাপা পড়ে কিন্তু তাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি মৃত্যু পর্যন্ত কাবণ গাছ কেটে উদ্ধার করা কোন্ বিভাগের আওতায় পড়ে সেটি ঠিক করতে পাবেনি কর্তৃপক্ষ। এ ধবনেব সংকটের সময় আমলারা প্রায়ই বলে থাকেন—দ্রুত কিছু করা সম্ভব নয় বা ভালো বিকল্প নেই। পুরনো কাগজপত্র ঘেঁটে খোঁজ করলে দেখা যাবে, একই ধরনের সংকটে একই ধরনের অজুহাত দেওয়া হয়েছে এক দশক বা তাবও আগে। এ পরিপ্রেক্ষিতে সরকারী কর্মচারীদের ঘন ঘন বদলির কথা উল্লেখ্য। সংকটকালীন অবস্থার দায়িত্ব অর্পণের জন্য কাউকে তখন চিহ্নিত করা যায় না।

মোটামুটিভাবে সরকারী ও আধা-সরকারী দফতরে আমলা কয়েকটি অলিখিত অনুশাসন মেনে চলায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছেন। এই অনুশাসনগুলি হল : কাজ/দায়িত্ব এড়িয়ে চলতে হবে ; সেজন্য নাগরিকদের নানা উপায়ে হয়রানি করতে হবে ; এ সত্ত্বেও কাজ নিজের ঘাড়ে এলে কাজ সময়ে সমাপ্ত করা হবে না, হয়তো কোনদিনই সমাপ্ত হবে না ; দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে কাজটি তাড়াতাড়ি শেষ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু ঐ প্রতিশ্রুতি পালন না করলেও ক্ষতি নেই। এই ন্যক্কারজনক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবসরগ্রহণের আগে উচ্চপদস্থ আমলারা বোধহয় বড় একটা সচেতন থাকেন না, কারণ যেসব কাজের জন্য নাগরিকদের সরকারী ও আধা-সরকারী সংস্থায় হয়রান হতে হয়, তাঁদের সেসব কাজ উচ্চপদস্থ আমলাদের জন্য তাঁদের নিম্নপদস্থ সহকারীরাই করে দেন। তাই হয়তো অবসর গ্রহণের পর এরকম কোন হয়রানি ভোগ করলে তা নিয়ে এঁরা দীর্ঘ বিবরণী লিপিবদ্ধ করেন—যেমন, 'ইণ্ডিয়ান পলিসিজ অ্যাণ্ড প্র্যাকটিস' গ্রন্থে একজন আই সি এস-এর সদস্য প্রায় পাঁচ পাতা লিখেছেন, কিভাবে তাঁকে [অবসরগ্রহণের পরে] মোটরগাড়ি লাইসেন্স নবীকরণের দফতরে নানাবিধ দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েছিল। যেসব তীক্ষ্ণধী উচ্চপদস্থ প্রশাসক অবসরগ্রহণের পূর্বেই এই দুর্ভোগ সম্পর্কে [অভিজ্ঞতাহীন হওয়া সত্ত্বেও] সচেতন, তাঁরা কেউ কেউ হয়ত প্রশাসনকে পরেও জন-বিযুক্ত করে তোলেন। কারণ, তাঁদেরই সমর্থনে পুষ্ট ফ্র্যাংকেনস্টাইনের হাতে অবসরোত্তর দুর্ভোগ

এড়াবার জন্য তাঁরা অবসরের আগে রাজনীতিকদের হাতে নিজেদের সম্পূর্ণ বিকিয়ে দেন, এবং অপরূপ কলাকৌশলে ৬০/৬৫ বৎসর বয়স অবধি নানা সরকারী ও আধা-সরকারী সংস্থার সঙ্গে অন্তত খণ্ডকালীন চাকুরি নিয়েও নিজেদের জড়িত রাখেন।

বাংলাদেশে, সামরিক শাসনের পৌনঃপুনিকতা দায়িত্বহীন প্রশাসনের ব্যাপ্তি ও তীব্রতা বৃদ্ধি করেছে। এ বইয়ের বিভিন্ন নক্শা তার উদাহরণ। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, সামরিক শাসকদের, বেসামরিক প্রশাসন চালানোর প্রাথমিক সাধারণ জ্ঞান এবং যোগ্যতা কম এবং বেসামরিক আমলা থেকে নিজেদের ক্ষমতা / সুবিধা বৃদ্ধিতে তারা ঢের সাহসী। ফলে বাণিজ্যিক পুঁজি [বিদেশী পুঁজির সঙ্গে] আরো নিষ্ঠুরভাবে শোষণ করে দেশকে এবং বেসামরিক আমলা থেকে সামরিক আমলারা আরো নির্লজ্জভাবে কলুষিত করতে পারে সমাজকে। যেমন, তরুণদের মাঝে অস্ত্র ও অর্থ বিলি করা।[৮]

বর্তমানে, যেভাবে প্রশাসনের সামরিকায়ন হচ্ছে তা শুধু বেসামরিক আমলা-তন্ত্রেই নয় সারা দেশের জন্য সৃষ্টি করবে মারাত্মক পরিণতির। সামরিক শাসন শক্তি যোগাবে মৌলবাদীদের,[৯] বৃদ্ধি করবে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা যার আলামত আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি। এবং এভাবে গত দু'দশকে বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে দেশ যেটুকু প্রগতির পথে এগিয়েছে সেটুকুও নষ্ট হয়ে যাবে (অনেকে ঠাট্টা করে বলেন, বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের আর কোন দরকার নেই। আই এ পাস করে সেনাবাহিনীতে ঢুকতে পারলে জীবন নিশ্চিত যেটা এম এ পাস করে বেসামরিক কাজে ঢুকলে হবে না। ঐ জীবন শুধু যে নিশ্চিত ও স্বাচ্ছন্দ্যে ভরা তা নয়, কালচক্রে হয়তো হয়ে যেতে পারে যে কেউ রাষ্ট্রপতি।

সামরিক শাসনে, সামরিক আমলাদের হাতেধরা রাজনীতিকদের কথাও বলতে হয় এ প্রসঙ্গে। সামরিক শাসকরা পৃষ্ঠপোষকতার সাহায্যে চেষ্টা করে তাদের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তুলতে এবং তা সবসময়ই ব্যর্থ হয়। গত চল্লিশ বছরের ইতিহাস তার প্রমাণ। কারণ কখনই এঁরা সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেন না। এবং সামরিক শাসনামলে জননিপীড়ক প্রশাসনের জন্য এই রাজ-নীতিকরাও দায়ী। তারা বড়-মাঝারী-ক্ষুদে আমলাদের এটা বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন যে শুধুমাত্র যে কাজে [বা ফাইলে] মন্ত্রীরা আগ্রহী, সেটি দ্রুত নিষ্পন্ন হলেই যথেষ্ট, অন্য কাজ বিলম্বিত / অসম্পূর্ণ থাকলেও আমলাদের কোন ক্ষতি হবে না। তবে, রাজনৈতিক তীরন্দাজীতে আত্মনিয়োগ করার ফল সবসময় আমলাদের পক্ষে সুখবহ না-ও হতে পারে। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা যেমন রাজনৈতিক জুয়ো

খেলায় মেতে উঠতে পারেন, তেমনি পারেন নিম্নপদস্থ কর্মচারীরা। কে কাকে পথ দেখিয়েছেন অথবা উভয়কেও একই সময়ে রাজনীতিকবাই পথ দেখিয়েছেন কিনা, এই বিতর্ক শুরু না করে যেটা মনে রাখা উচিত সেটা হল যে নিম্নপদস্থদের রাজনৈতিক ক্ষমতা শুধুমাত্র সংখ্যাধিক্যের জন্য অনেক সময়েই উচ্চপদস্থদের থেকে বেশি হয়, ফলে বিড়ম্বিত হবেন এ কারণে নানাভাবে উচ্চপদস্থ প্রশাসকরা।

আগেই উল্লেখ করেছি, বাংলাদেশের আজকের দুরবস্থার জন্য প্রায় সম্পূর্ণভাবে দায়ী আমলারা। সামগ্রিক পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ বাংলাদেশেব একজন লেখক লিখেছেন — Power-elite-এর হৃদয় পরিবর্তিত হতে হবে। দেশের মানুষ ও মৃত্তিকার প্রতি জান্তব বন্য ভালোবাসাই শুধু সে-পরিবর্তন আনতে সক্ষম। গভীর দুঃখ ও হতাশার সঙ্গে না বলে পারি না, অভিজ্ঞতা বারংবাব শেখাচ্ছে যে তাঁদের হৃদয় নির্মম, সংবেদনহীন, অপরিবর্তনযোগ্য। তা হলে বলব : তাঁদের হৃদয় নয়, তাঁরা, সেই মানুষগুলো, যাঁরা নিপীড়িত জনগণের শ্রমের অন্নে ও প্রদত্ত রাজস্ব বা ট্যাক্সেব কল্যাণে জীবন যাপন করছেন, Power-elite শিবোপাব মুকুটধারী, তাঁদের নির্বাসন চাই। এবং তাঁদের বদলে যাঁরা আসবেন তাঁরা যেই হোন, এমন মানুষ আসুন 'যাঁদের রক্তে শৈশব-স্মৃতি, পিতামহের মুখ, দুঃস্থ নিরন্ন জন্মগ্রামের ছবি কখনোই মোছে না, মাতৃভূমি ও মাতৃভাষাকে যাঁরা জন্মের ঋণ মানেন।'[১০]

তবে, একথাও সত্যি যে, এ ধবনের প্রতিকূল অবস্থায়, বাংলাদেশের ক্ষুদ্র একদল আমলা জনস্বার্থ ও পেশাগত দক্ষতার উদাহরণ দেখিয়েছেন সাহস ও আন্তরিকতার সঙ্গে। এ বইয়ের বিভিন্ন নকশায় আমরা দেখেছি কিভাবে প্রতিকূল অবস্থায় ব্যক্তি নেতৃত্ব দিতে পারে, সংবেদনশীল মন নিয়ে জনসাধারণের দুর্ভোগ মোচনে সহায়তা করতে পাবে। বিভিন্ন সার্ভিস সমিতির মারফত প্রশাসকেরা যূথবদ্ধ হয়ে প্রশাসনের ভিত্তি ন্যায় নীতি ও জনস্বার্থের ওপর রচনা করবেন— এটাই অসহায় মানুষের প্রত্যাশা। প্রশাসকরা একজোট হলে [যেটা অনস্বীকার্যভাবে কঠিন] তাঁরা ব্যবসায়ী-সমাজবিরোধী এবং তথাকথিত রাজনীতিবিদদের চক্রান্ত প্রতিরোধ করতে অনেকটা সফল হবেন। প্রশাসকদের ওপর এই আস্থাকে যদি কোন পাঠক অবাস্তব মনে করেন, তা'হলে তাঁর সান্ত্বনার জন্য প্রাক্তন একজন আই সি এস-এর বক্তব্য পেশ করা যেতে পারে— ভারতের (উপমহাদেশে) সাধারণ নাগরিক, যিনি প্রাজ্ঞতা স্থিরতা অবজ্ঞা ব্যঙ্গের অনুপম সংমিশ্রণের সহায়তায় চার হাজার বৎসর ধরে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সঙ্গে যুঝে টিকে আছেন, তিনিই একজন সৎ প্রশাসকের কাছে আনন্দ ও প্রেরণার উৎস।[১১]

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, আমাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনাকালে সংবেদনশীল অনেক আমলাই স্বীকার করেছেন, দেশের বর্তমান অবস্থাব জন্য তাঁরাই দায়ী।[১২] অপেক্ষাকৃত তরুণদের অনেকে অস্থির, প্রশাসনের সামরিকীকরণেব জন্য। কারণ, তাঁরা পেরিয়ে এসেছেন ১৯৬৯ ও ১৯৭১-এব দিনগুলি [উচ্চ-পর্যায়ের সামরিক আমলাদের অধিকাংশ তখন পশ্চিম পকিস্তানে। সুতরাং গণ আন্দোলন কি তাঁরা তা বোঝেন না]। এবং ঐ সময় রাজপথে তাঁরা নেমেছিলেন এরকম বাংলাদেশের জন্য নয়। তাঁরা একথাও বলেছেন, চকচকে বুট থেকে ছেঁড়া স্যাণ্ডেলই ভালো অর্থাৎ সামরিক শাসন থেকে পার্লামেণ্টারি ব্যবস্থাই ভালো, কেননা সেখানে নিজের আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে। আমলাদের একাংশের এ ধরনের আত্মসমালোচনা ও মোহভঙ্গ আশার কথা। আমরা তাঁদের পক্ষে। কিন্তু একথাও বলা দরকার যে, সামরিক শাসন ও তার পক্ষে সামবিক-বেসামরিক আমলাজোটের পক্ষাবলম্বন দেশে গণঅভ্যুত্থান করে তুলবে অবশ্যম্ভাবী। সে অভ্যুত্থান সমাজ ব্যবস্থা পাণ্টাবে কি পাণ্টাবে না তা আমরা জানিনা [সমাজ ব্যবস্থার বদল হলে এ আমলাতন্ত্রও এই ফর্মে থাকবেনা]। তবে, সেই গণ-অভ্যুত্থান যদি প্রতিনিধিত্বশীল সবকারের সৃষ্টি করে তা হলে আমরা মনে করি প্রতিনিধিত্বশীল রাজনীতিবিদদের দায়িত্ব হবে, রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা / কলহ ও প্রশাসনিক ব্যর্থতা এমন পর্যায়ে যাতে না যায় সেখানে আবার সুযোগ আসে সামরিক শাসন স্থাপনে এবং লুপ্ত হয় গণতন্ত্র। দ্বিতীয়ত, অগ্র-পশ্চাত বিবেচনা না করে বা তাড়াহুড়ো কবে এমন কোন প্রশাসনিক সংস্কারের প্রবর্তন করা না হয় যাতে বিপর্যস্ত হয় প্রশাসন। শুধু তাই নয়, পার্লামেণ্ট অটুট রাখা, সংবাদপত্র / বাক্ স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখাও এ দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত এবং এতে আমলাতন্ত্র নিয়ন্ত্রণে থাকবে অনেকটা। আমলাতন্ত্রেব যারা যেটুকু সুযোগ সুবিধা (স্বার্থ) লাভ করেছেন এ সমাজে তা অটুট রাখতে চাইলে এ ব্যবস্থা মেনে নেওয়াই শ্রেয়। নয়তো অদূর ভবিষ্যতে নিজেদের স্বার্থ তো বটেই, উত্তরাধিকারী-দের জন্য যা সংগ্রহ করে গেছেন তাও ভেসে যাবে। কেউ রুখতে পারবে না তা। অত্যন্ত ইতিহাস তাই বলে।

তথ্যপঞ্জী

১. **সেই ব্রিটিশ আমলে, (বিশ শতকের চল্লিশ দশকে) লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে সিভিল সার্ভিসের ওপর লেখা থিসিসে অক্ষয়কুমার ঘোষাল লিখেছিলেন :**

'The company's service handed down the same tradition from generation to generation. In course of time it grew up to be a fine bureaucracy able to keep the machine going, but lacking initiative and the imagination necessary to deal with changing situations and new problems. Akshoy kumar Ghosal, *Civil Service in India Under the East India Company*, University of Calcutta, Calcutta, 1944, p. 407.

২. বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন, সিরাজুল ইসলাম, বাংলাদেশের ইতিহাস : ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪, সপ্তম ও

৩. For details see Jayanta Kumar Ray's Introduction of Administrators in a Mixed Polity, Macmillan, Delhi, 1981.

৪. 'The civil service, in the absence of a regular organ of criticism and control, grew up to be a bureaucracy with all its virtues and vices. Moreover, the working of the patronage system had the effect of keeping down the average level of ability and resulted in a general prevalence of mediocrity in the service. It did not tackle major problems unless these were forced upon it, so much engrossed was it with the technique and minutiae of administration, when it did, it did so in an opportonistic way'. Akshoy kumar Ghosal, *op. cit.*, p. 406.

৫. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আশির দশকে বাংলাদেশের সমাজ, পৃ. ৬০-৬১।

৬. সিরাজুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, নবম অধ্যায়।

৭. পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদে একবার এ প্রক্রিয়া নিয়ে কথা উঠেছিল। অপ্রয়োজনে প্রতিটি ফাইল যেতে হত যাদের মাধ্যমে— ডেপুটি অ্যাসিস্টেন্ট, হেড অ্যাসিস্টেন্ট, আণ্ডার সেক্রেটারি, অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারি, ডেপুটি সেক্রেটারি, জয়েন্ট সেক্রেটারি এবং সেক্রেটারি। ***EPLAP*, First Session, 1957, pp. 192-96; 206-07**। এই প্রক্রিয়া এখনও অব্যাহত

এবং দেখা যায় প্রায় ক্ষেত্রে সেকশান অফিসাব যে সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন সেটিই বলবৎ থাকছে।

৮. বদরুদ্দিন উমব, বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনেব কয়েকটি দিক, পৃ. ১৩৮-৩৯।

৯. Paul A Baran and Paul M Sweezy, *op. cit.*, p. 203.

১০. হায়াৎ মামুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

১১. R. P. Noronha, A *Tale Told by an Idiot,* Vikas, Delhi, 1976, পৃ. ১২৫। এই একই আশা প্রতিধ্বনিত হয়েছে অতি সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গেব একজন আই এ এস অফিসাবেব লেখায়– 'আশা মানুষেব চিবন্তন হয়ে থাকে।' এস এম মুর্শেদ, 'বাঁচাতে পাবিনি বন্ধু বংশীব জীবন,' আনন্দবাজাব পত্রিকা, ২০. ১০. ১৯৮৬.

১২. একই ধবনেব আত্মসমালোচনা কবেছেন এস এম মুর্শেদ 'মানুষেব স্মৃতি-শক্তি সাধাবণত খুবই ক্ষীণ। আব সবকাবি কর্মীদেব দাযিত্ববোধ ক্ষীণ তাব থেকেও।' ঐ।

নির্দেশিকা